
উপহার

লেখক-লেখিকার সূচী


সূচীপত্র

বিষয়		লেখক-লেখিকা		পৃষ্ঠা
গল্প—				
অমৃতগুপ্ত	...	প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	...	৩১০
যুগের চাকা		মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৪১৭
রং বদল	...	আশাপূর্ণা দেবী	...	১৬১
'মুরকাট্টা বাবা'	..	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	...	২৬৩
মা	..	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	...	২৫৪
দুই ওস্তাদ	...	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	...	১১১
খোকা	...	নীহাররঞ্জন গুপ্ত	·	২০৮
হীরাকুনি	...	সুকুমার দে সরকার	·	৪০৯
বুনো আতা	...	মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়	...	৯৮
যজ্ঞিবাড়ির ব্যাপার	...	স্বপনবুড়ো	...	২১৯
পণ্ডিত আর অতিপণ্ডিত	·	রাধারানী দেবী	·	২৭৪
আঁধারে ফুটল আলো	...	সুধীন্দ্রনাথ রাহা	·	৪২৮
শুধু একটা শেয়ালের গল্প	...	দৃষ্টিহীন	...	১৪০
দুর্ভাগার মুক্তি	...	অপর্ণা রায়	·	৩১৬
সাজা	...	তপতীরানী	...	৪৯৫
ঐতিহাসিক গল্প—				
সিংহগড়ের সিংহবিক্রম	...	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	...	১৪৫
'দুরাশা' ও আশা	...	সজনীকান্ত দাস	...	৭০
"বীরাঙ্গনা, পরাক্রমে ভীমা-সমা"		হেমেন্দ্রকুমার রায়	...	২৩৫
রূপকথা—				
লাবু	...	নরেন্দ্র দেব	...	১৮৫
বেঁটে বাটুলের বুদ্ধি	...	বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র	...	৩৪৬
অপরূপ কথা	...	দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	...	৪৫৭
হাসির গল্প—				
ভ্যাবাচাদার 'হাহাকার'	...	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	...	৩৩৬
বিজয়ার পর দিগ্বিজয়	...	শিবরাম চক্রবর্তী	...	৩৯৬
ভটঠাকুরের ভাগবত পাঠ	...	জসিমউদ্দিন	...	১৩০
শিকার কাহিনী—				
[illegible]	...	ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (লালগোলা)	...	৪৪৮

পাদপূরণের সূচী

সোনালী কথা

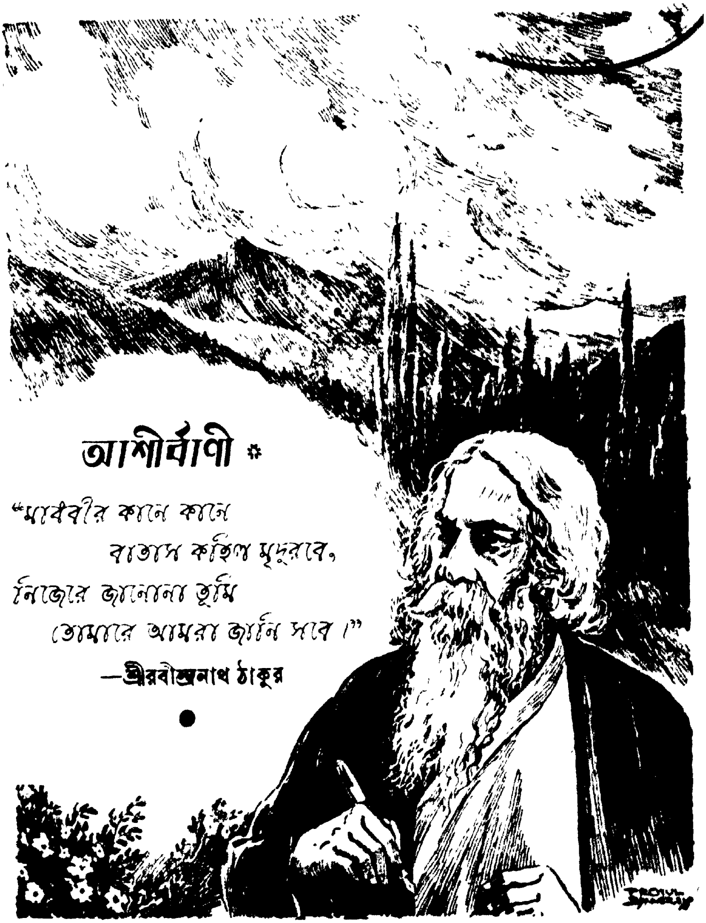
বিদেশী সাহিত্যের কয়েকটি উজ্জ্বল মণি-মাণিক্য

মণি ও মুক্তা



পটলকে নিয়ে একটা পার্কে এসে বসলাম।

[পৃষ্ঠা—২৫৮



* শ্রীকল্যাণ দাসের সৌজন্যে।

চিত্রসূচী



গোল্ডেন-গুজ পালা

—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[অধিকারী, পাঠক, ভুড়ি-হুড়ি, দোস্ত-
দোহারের প্রবেশ]

(গীত)

আরে চোখ মেলো গোল গোল
বেড়াল-আঁখি, চেরা পটোল
কাজল-ঘেরা ডবোল ডবোল ॥
বসে যাও হাতে নিয়ে হংসনামার প্রোগ্রাম
হয়ো না হাত টান
শুনে নাও পেতে কান
শুরে প্রাণ—গান ক'খান।
করতে হয় কর যাচ্ছেতাই সমালোচনা।
বাজে বকোনা আবোল তাবোল,
সভার কাজে বাধিও না গোল,
বলে ছিরি খোল ধিরি ধিরি বোল
হাটে করে গোল বিচ্ছিরি ঢোল ॥

পাঠক। বলি ও অধিকারী মশায়, বলি দর্শন পাবো তো? অধিকন্তু অধি-রাজা, ছার মহারাজা ভুঁই-নাস্তি ভুঁয়োরাজা বহুত দেখেছি—গোল্ডেন গুজ তো কখনো দৃষ্টি গোচর হন্‌নি!

অধিকারি। তিনি নিত্য ঐ পুস্কর

হ্রদের জলে একটি করে স্বর্ণডিম্ব প্রসব করেই নিজেকে তামস পর্দ্দাবৃত করে অন্তরালে রাত্রিবাস করেন, তাই বড় একটা কেউ তাঁকে দেখতে পায় না।

পাঠক। তা, তিনি কি আজ গোচরীভূত হবেন অভাগাদের চর্ম্মচক্ষে? দেখা পাই তো তাঁকে বলে কয়ে আমার এই হংসনামাখানা সোনার জলের মলাটে যাতে করে ছাপিয়ে নিতে পারি—

অধিকারি। ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা কর; পুষ্কর হ্রদের তীরে এসে তার দর্শন দুর্লভ হবে এমন তো বোধ হয় না।

পাঠক। পুষ্কর তপস্যার ফলে হংস-নামা লিখেছি দাদা, শেষরক্ষে যেন হয় দেখো!

অধিকারি। হংসনামা শোনবার যখন তাঁর ইচ্ছে তখন নিশ্চয় এদিকে আগমন করবেন। প্রস্তুত হয়ে থাকো; আসা মাত্র তোমরা হংসনামার নান্দি সুরু করে দিও। নজর পড়লে আর ভাবনা নেই—কৃপা হবেই!

পাঠক। ভাই, বামনাই কপাল,—কি জানি কি হয়। বিলম্ব হচ্ছে, সন্ধ্যা প্রায় উৎরে গেল, ক্রমে যে অন্ধকার হয়ে এলো—গোল্ডেন গুজের আসবার তো কোনো লক্ষণ দেখিনে! গেল বুঝি দর্শন ফসকে!

অধিকারি। অত ব্যস্ত হও কেন? রোসো দেখি—হাঁ ঐ যে হ্রদের পশ্চিম পারে হোগলা-ঝাড়ের কাছে স্বর্ণ অণ্ড একটি ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে—সময় হল, প্রস্তুত থাকো।

পাঠক। দেখি দেখি, সোনার ডিম কি বল! এ যে বিরাট একটা তরমুজ দেখায়! খরমুজ ও তরমুজ বিশেষ স্বর্ণের আভায় দিগ্দিগন্ত উজ্জ্বল করে জলে ডুবতে চল্লো। একখানা জাল হলে তুলে নেওয়া যেতো দাদা।

(গীত)

সকলে। হায় জাল বুনে যাই
জাল বুনে যাই
মনে মনে স্বপনেরই জাল
তোমায় ধরব বলে মরুথলে
নয়ন জলে ফেলে যাই জাল।
ধরা দিবে কি খাঁচাকলে
ওরে আমার কাঁচা সোনার ডিমেভরা পাখি
তুমি হবে কি আমার
কপাল ক্রমে বন্দি
নাকি আজ-কাল করে
বসেই রব চিরকাল।

অধিকারি। স্থিরো ভব, স্থিরো ভব! ভাগ্যলক্ষ্মী অদৃষ্টে যদি শূন্য অঙ্ক না লিখে থাকেন তো ঐ-টি টুপ্ করে জলে ডোবা মাত্র স্বশরীরে কলিকালের সুপর্ণগড়ুর তোমাদের সম্মুখে হাজির হয়ে কৃপা বিতরণ করে যাবেন। কোনো জালের কর্ম্ম নয়।

● গোল্ডেন গুজ পালা
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(গীত)

ও সে সোনার কঙ্ক ধরনা অতীত
ও কী কারো জালে পড়ে কদাচিৎ
রহিলি অবোধ কি লাগি বসিয়া
বাতাসের ফাঁদ আকাশে কসিয়া
ভরিয়া চলেছ তবালা কবজ ॥

তুড়ি। আয়াতি চ যদা লক্ষ্মী
নারিকেল ফলাম্বুবৎ।
জুড়ি। প্রয়াতি চ যদা লক্ষ্মী
গজভুক্ত কপিত্থবৎ ॥

(গীত)

দোহার-দোহার। আইসেন লক্ষ্মী এড়ায়ে দৃষ্টি
পইসেন নারকেলে জলটুকু মিষ্টি
যাইচেন লক্ষ্মী অলক্ষ্যে সরিয়া
গজভুক্ত কপিত্থ যাইলেন ধরিয়া
মিষ্টি তিক্ত লক্ষ্মীর দৃষ্টি
এই অনাসৃষ্টি এই সোনা বৃষ্টি ॥

পাঠক। পায়ের ধুলো দাও দাদা ভাগ্যে যেন দর্শন পাই—ও গজরাজভুক্ত কৎবেলের সোনার খোলাটা পেলেও কাজ চলে যাবে। ওহে শাঁখ ঘণ্টা দাও, বিলম্ব করোনা, আসচেন বোধ হচ্চে—নজর রাখ !

(শঙ্খ ঘণ্টা সহিত কারণ্ডবের দৈকালিকী তাণ্ডব নৃত্য ও গীত)

ও দেখ, ডুবলো বেলা ফুরিয়ে দিয়ে
রঙের মেলা
বেলা ডুবিল রে
জলের পারে আলো ডুবিল রে

উদিল সাঁঝের তারা
মেঘের পারে রাতের তারা
দিনের পাখী বাসা নিল
ঘুমে ঘুমালে রে।

পাঠক। ওহে আমাকে এগিয়ে যেতে দাও, তোমরা যে ভীড় করলে, পথ ছাড়, পথ ছাড়,—আড়াল ছাড় না হে—কেমন মানুষ তোমরা—ও অধিকারি—

এ যে দর্শন মেলা ভার তোমাদের ভিড়ে
লক্ষ্মী যেন চন্দ্রমার পক্ষি যেন নীড়ে ॥

ভীড় কর কেন ? ভীড় কর কেন ? এঃ নিরাশ হতে হয় বুঝি—ও আসা-বরদার, ও চোপদার ভীড় ঠেকাও না এসে।

(আসা-বরদার প্রবেশ)

(গীত)

আসা যাওয়ায় গোল নয়
ওধারে কে ও কথা কয় ?
ঠাসাঠাসি বসা হোক
হাতা-হাতি ধাক্কা-ধাক্কি ভালো নয়,
ভালো নয়।
রাস টানা-টানি কানা-কানি মহাশয় !!

পাঠক। আমি পাঠক—হংসনামা—এই দেখ কথা শোনে না—আঃ ঠেলাঠেলি কর কেন ?

● গোল্ডেন গুজ পালা
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর



(রামদা হাতে চোপদারের প্রবেশ)

(গীত)

বস্ স্টোপ্ মারবো কোপ্
চোপ্ স্টোপ্ স্টোপ্
ভীড় ছাড়—খিড়কীর পথ সাফ্ হোক্।
(কারপরদাজের প্রবেশ ও গীত)
কার চোপদার জর্দ্দা সোনার
হংসরাজার পর্দ্দাপার্টি ঘরের কোনার।
রাজহংসিনী হংসনাদিনী সখি সঙ্গিনী
অন্তরঙ্গিণী
সুবচনী কলহংসিনী লয়ে হয়েছেন বার
চোখ বন্ধ হোক বাজে লোকজনার॥

(সুবচনী খোঁড়া হাঁসের প্রবেশ)

সুবচনী। পর্দ্দানসীনগণ জর্দ্দা-জরীন্ গোল্ডেন গুজের নিমন্ত্রণে আর, এস্, ভি, পি লিখতে চলেছেন পদ্মপত্রে! শোভাযাত্রা করে আসছেন তাঁরা এই বাগে। হাবিলদার, চোপদার এবং রাজসরকারের তাঁবেদার কোটাল ও

কিলেদার ছাড়া সকলে চোখ বন্ধ করে মুখ-বন্দি মিষ্টান্নের জন্যে অপেক্ষা করেন।

(স্বচনীর পর্দ্দার অন্তরালে প্রস্থান)

পাঠক। ওহে ও অধিকারি, মুখবন্ধ চোখ বন্ধ করতে বলে যে, হংসনামা পাঠ করি কি প্রকারে ?

অধিকারি। উঁহু (চোখ বন্ধ মুখ বন্ধ করুন)।

তুড়ি জুড়ি। চোখে কেমন চকা চোঁ লেগে গেল।

(ক্রন্দন গীত)

নিশায় স্বপন সম ঠেকিতেছে সব
যেন আসি পশিলাম কোন মরুস্থলে
উচ্ছলিত স্বর্ণদীপে আছিল সুন্দর এ স্থান
মুখর কলহংস রবে শব্দিত কুল কলে
নবীন পল্লবে। এযে দেখি শুখায়েছে সব !
নিভেছে দেউটি। নীরব উল্লাসহীন
সবস্থান, নিঃসাড় উজাড় চারিদিক।
পরিত্যক্ত ভূতগ্রস্ত আলয় যথা—
হত বিনষ্ট ভগ্নশ্রী ॥

পাঠক। বামনাই কপাল—হায় হায় দেখতে দেখতে যে পর্দ্দার মধ্যে অন্তর্দ্ধান হয়ে গেল।

(গীত)

আরি আরি ও চোপদার ও অধিকারি
পর্দ্দার ভেতোরে কি যাইবার পারি ?
আছে কি টিকিট কমপ্লিমেন্টারি—
প্রাইভেট এন্ট্রি একটা ?
আমি যে ডেলি-কাগজের স্বত্বাধিকারী।

হবে যে কাণ্ড—
এক কলমে তার প্রকাণ্ড
সমালোচনা লিখে দিতে পারি
যেতে দাও হে অধিকারি !!

অধিকারি।

ওটা ভিতর নয় ভেতোর
ওস্থানে তোমার খাটবেনা জোর

দেখছ আসছেন কে শীরে তাজ হল কারি। গুজরী বিবিকে দেখেই অজ্ঞান হলে যে। গোল্ডেন গুজ আসছেন, ঠিক হয়ে থাক হংসনামার পুঁথি ধরে।

পাঠক। অ্যাঁ গোল্ডেন গুজ এসে পৌঁছান নি ?—আসছেন ? আর নয় দেখাশোনা ! এই হংসনামার পুঁথির পাতায় চোখ রাখলেম, দেখি কি করেন বিধাতার বাহন। এবারে ফস্‌কাতে দেব না। ওকে তুড়ি জুড়ি তোমরা নজর রেখো —আমাকে একটু চাঙ্গা করে দিও।

(স্বর্ণশৃঙ্খল বহে গোল্ডেন গুজকে টেনে বন্দিগণের প্রবেশ ও গীত)

মহাশ্চর্য্য মহৈশ্বর্য্য শ্রীসৌন্দর্য্য গাম্ভীর্য্য আকর
নিশ্চেষ্ট নির্গুণ অথচ সকল গুণের সাগর ॥
যার তেজ তপন তাপে তপ্ত কৈল মহী
আকাশে গড়ুড় কাঁদে পাতালে কাঁদে অহি।
সর্ব্ব ধর্ম্ম কর্ম্ম নর্ম শর্ম্মেতে প্রবর
অবর্ব্বর গর্ব্ব খর্ব্ব স্বর্ণ বর্ম্ম ধর ॥

অধিকারি। নাও পাঠক এইবার নান্দিপাঠ হংসনামার—

● গোল্ডেন গুজ পালা
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাঠক। কষ্টাষু সর্ব্বস্থাপি—এঃ ভুলে যাচ্ছি—

কষ্টাষু সর্ব্বস্থামমপি দর্শনেন হংসস্য
শব্দেন সর্ব্ব সিদ্ধি
নামানি হংসস্য শৃণোতি যস্থ
প্রয়াস্তি দুরিতানি তস্য ॥

নাও হে অস্থার্থ করনা তুড়ি জুড়ি।

(গীত)

তুড়ি জুড়ি। দেখলে পরে রাজহংস
পরাকাষ্ঠা লভে বংশ
শুনলে পরে হংস শব্দ
সর্ব্ব সিদ্ধি হয় লব্ধ।
যাত্রাকালে হংস নাম
দুরিত হরণ করে যান ॥

গুজ। বাঃ বেশ গেয়েছ। অধিকারিকে বোলো আমি বড় খুসি হয়েছি। বোলো, ভুলো না—মন দিয়ে সকলে হংসনাম দেখ —না পাঠক ওঠা হচ্ছে না, বোসো। তুড়ি জুড়ি দোস্ত দোহার ছোকরা তোমরা বেশ গেয়েছ। নাও একটা একটা পালক টুপিতে গুঁজে ফেল।

পাঠক। আজ্ঞে আমি—আমার হংস-নামাখানা—

গুজ। (হংসনামা লয়ে) আমার শয়নের সময় হল। অধিকারি তুমি রইলে—

তুড়ি জুড়ি। আমাদের একটা করে গোল্ড মেডেল—

পাঠক। হুজুর আমার হংসনামাটা—

(চোপদার গীত)

চুপ গোল কোরোনা কেউ,
শয়নে চল্লেন গোল্ডেন গুজ
চজুর গুজুর গুজ।
গোলমাল করোনা কেউ গুজ গুজ
বসে কেন উঠে দাঁড়াও
আসর ছেড়োনা কেউ।

(সকলে বাদ্য-গীত)

চজুব চজুর গোল্ড গুজুব
গুজুব গুজুর ফুসুর ফুসুব কি কয়?
কণ্ঠটা তুলে ধর
দেখে নাও মুটিয়া মজুর
ওল্ড গোল্ড নয় রোল্ড চজুব!

(গুজের প্রস্থান)

পাঠক। হুজুর আমার হংসনামা—

অধিকারি। আরে হংসনামা করে খেপলে যে, পাঠ সুরু কর—

পাঠক। আরে পুঁথিখানা যে নিয়ে গেলেন কর্ত্তা, পাঠ করি কি দেখে?

অধিকারি। অ্যা! তবে তো মুস্কিলে ফেল্লে। তোমার মত ত মুখ্যু দেখিনি। পুঁথি ছেড়ে দিলে কি বলে?

পাঠক। কি জানি কি হতে কি হয়ে গেল। আমার দ্বারা পাঠ অসম্ভব। দূর তোর হংসনামা—চল্লেম আমি ঘরে—

অধিকারি। যাত্রার কি হবে?

পাঠক। যা হয় তুমি কর। তুড়ি জুড়ি সবাই আছে, পাঠও মুখস্থ করেছে সবাই—আমার আহারের সময় হল।

অধিকারি। বলি ও পরমটার, তুমি

● গোল্ডেন গুজ পালা
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাই তোমার চোঁতা খুলে পড়ে চল—যেমন যেমন লেখা আছে ঠিক ঠাক। আমি তামাক খেয়ে নিই। এসহে পাঠক তামাক খেয়ে নাও, হতাশ হয়ো না। রাত কাটলেই গোল্ডেন গুজ আর একটি স্বর্ণ-ডিম্ব প্রসব করতে এই পথ দিয়েই সমুদ্র পারে যাবেন, সেই সময় ধোরো—ফল হবে।

পাঠক। তবে ভাই আমি একটু ঘুম দিয়ে নিই। ভোরের দিকটায় হাজির হব—প্রম্‌টার ততক্ষণ কাজ চালিয়ে নিন।

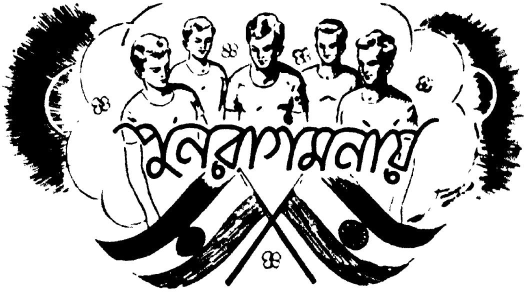
(প্রস্থান উভয়ের)



সোনালী কথা

ওব্‌লোমভ্ (আইভান গন্‌চারভ্)

রুষ-কথাসাহিত্যে ওব্‌লোমভ্ একখানি ক্লাসিক নভেল। এই কাহিনীর নায়কের নাম থেকে এই উপন্যাসের নামকরণ হয়েছে, ওব্‌লোমভ্। এই উপন্যাসের প্রধান বিশেষত্ব হলো, তার নায়কের চরিত্র। জগতের সাহিত্যে যে-সব টাইপ-চরিত্র অমর হয়ে আছে, ওব্‌লোমভ্ তাদের মধ্যে এমন একটা টাইপ চরিত্র যা আর কোন সাহিত্যিকই সৃষ্টি করেন নি। ওব্‌লোমভ্ হলো আদর্শ অলস এবং এই কর্ম-ব্যস্ত জগৎকে রীতিমত ভয় ও ঘৃণা করে। যদি কোন কাজ নিরুপায় ভাবে ঘাড়ে এসে পড়ে সে তার নিজস্ব কৌশলে তাকে সরিয়ে রাখে, মনকে সান্ত্বনা দেয়, কাল করবে। কিন্তু সে কাল আর আসে না। আমাদের সকলের মধ্যে অল্প-বিস্তর এই ওব্‌লোমভ্ লুকিয়ে আছে কিন্তু বিখ্যাত রুষ-সাহিত্যিক গন্‌চারভ্ এই চরিত্রটিকে দীর্ঘ উপন্যাসের ভেতর যে-পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছেন, তা সত্যই বিচিত্র। বিগত-শতাব্দীর জারের রাশিয়ায় এক শ্রেণীর ধনী ছিলেন, পিতৃ-পুরুষের সঞ্চিত অর্থে অথবা প্রজাদের অর্থে তাঁরা নিরঙ্কুশ কর্মহীন বিলাসিতায় জীবন যাপন করতেন। ওব্‌লোমভ্ হলো সেই শ্রেণীর একজন কিন্তু বিলাসের জীবন যাপন করতে হলেও যেটুকু হাত-পা নাড়তে হয়, ওব্‌লোমভ্ তাতেও নারাজ। নায়কের সঙ্গে সঙ্গে গন্‌চারভ্ নায়কের সঙ্গী ও সহায়রূপে একটি ভৃত্যের চরিত্র (জাহার)ও এঁকেছেন, কর্মবিমুখ অলস প্রভুর যে উপযুক্ত ছায়া। যদি কোন পোকামাকড় মারা যায়, এই ভয়ে সে ঘরদোর পরিষ্কার করে না! বই-এর শেষে ওব্‌লোমভ্ তার শোচনীয় অন্তিম মুহূর্তে দেখছে, রাস্তা দিয়ে তার প্রিয় ভৃত্যও জীর্ণশীর্ণ পথ-ভিক্ষুকরূপে রাস্তায় ধুঁকে মরছে। আজ সোভিয়েট রাশিয়ায় ওব্‌লোমভ্ আর তার মতন যারা, তাদের স্মৃতি পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।



[অপ্রকাশিত]

—যতীন্দ্রমোহন বাগচি

(১৫ই আগষ্ট—'৪৭, স্বাধীন ভারতের শুভ-সূচনায়)

একে-একে দুয়ে-দুয়ে কা'রা ওই নিঃশব্দ চরণে
শূন্য পথে ভেসে এসে' দেখা দেয় বিস্মিত নয়নে ?
একবার মনে হয়, চেনা-চেনা বুঝি এরা সব,
আরবার ভাবি ফিরে, বক্ষে বুঝি করি অনুভব
ইহাদেরই ধ্যান-মূর্তি অন্তরের নিভৃত মন্দিরে,
স্বপ্নে কিম্বা জাগরণে তাই দেখা পাই ফিরে ফিরে'।
উভয়ের মাঝখানে বুঝি না কোন্‌টা সত্য ঠিক,
রহস্যের কুয়াসায় অন্ধ হয়ে আসে চারিদিক।

—কিন্তু ও কিসের চিহ্ন কণ্ঠদেশে হেরি সবাকার ?
মৃত্যু কি পরায়ে গেছে প্রণয়ের শেষ অলঙ্কার

অবিচ্ছিন্ন আলিঙ্গনে,—অক্ষুন্ন স্মৃতির নিদর্শন,—
নীলকণ্ঠ করি' তারে মৃত্যুঞ্জয় শিবের মতন ?
এই আসে, আরও আসে অস্পষ্ট স্মরণ পথ দিয়া
অর্দ্ধ শতাব্দির ভ্রষ্ট প্রাণ-পুষ্পে নূতন করিয়া
গাঁথি' লয়ে কণ্ঠমালা অমৃত অম্লান শতদলে,
পরাইতে নবপ্রাতে মৃত্যুহীন জীবনের গলে।

একে-একে দুয়ে-দুয়ে তবু তারা আসে, ওই আসে
নিঃশব্দ চরণপাতে নিঃসীম বক্ষের মহাকাশে!
—ত্যাগের অগ্রজ এরা অ-মরার বক্ষে তাই স্থান—
সপ্তকোটি বাঙ্গালীর বীরশ্রেষ্ঠ বরিষ্ঠ সন্তান।
বিশ্বজিৎ দান-যজ্ঞে আজীবন সর্ব্বস্ব সঁপিয়া
দেশের সে অগ্নি-যুগে যে দাবাগ্নি উঠিল জ্বলিয়া,
সাগ্নিক তপস্যা তেজে, এরাই যজ্ঞের হোতা তার ;
দধীচির বংশধর, তোমাদের করি নমস্কার।
আজিকার এই উৎসব যতই খণ্ডিত ক্ষুদ্র মানি,—
তোমাদেরই সাধনার সিদ্ধিফলে সত্য বলে জানি।

মণি ও মুক্তা

নমন্তি সফলা বৃক্ষাঃ নমন্তি সজ্জনা জনাঃ
শুষ্ক কাষ্ঠঞ্চ মূর্খাশ্চ ন নমন্তি কদাচন।

—ভবভূতি

ফলবান গাছ ফলের ভারে নুয়ে পড়ে, সজ্জন তাঁর গুণের ভারে নত হন। শুষ্ক কাঠ আর মূর্খ কিছুতেই নত হতে জানে না।

নবীন চীনের তরুণ জীবন

—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

দু বছর আগে ১৯৫৭ সালে আমি চীন দেশ গিয়েছিলাম। আগে বলতাম—মহাচীন। বর্তমানে বলি 'জনগণের রাষ্ট্র চীন', ইংরেজীতে বলা হয় People's Republic of China. নিমন্ত্রণ করেছিলেন ওখানকার 'লেখক সংঘ'। তার আগের বৎসরে চীনের লেখক সংঘ ভারত সরকারের কাছে নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন—তাঁদের বর্তমান চীন সাহিত্যের জনক 'লু-সুন'এর বিংশতিতম তিরোধান দিবস উপলক্ষ্যে বিশ্বসাহিত্য সম্মেলনে দুজন ভারতীয় লেখক প্রতিনিধি পাঠাবার জন্য। ভারত সরকার যে দুজন প্রতিনিধি নির্বাচন করেছিলেন, তার মধ্যে আমি ছিলাম একজন এবং অপর জন ছিলেন হিন্দী-সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখক শ্রীজৈনেন্দ্রকুমার। তিনি গল্পলেখক, ঔপন্যাসিক, কবিতাও লেখেন সুতরাং কবিও বটেন। এ যাত্রায় আমায় দুর্ভাগ্যবশতঃ রেঙ্গুন পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসতে হয় কারণ রেঙ্গুনে পৌছে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ি। পরের বৎসর 'চীনের লেখক সংঘ' আবার আমাকে নিমন্ত্রণ পাঠালেন,—'আমাদের দেশে আসুন—আমরা নতুন দেশ গড়ছি—নতুন আমাদের আদর্শ; কিন্তু ভারতবর্ষ আমাদের বহু প্রাচীন কালের বন্ধু; তাঁদের সঙ্গে দেওয়া-নেওয়া যেটা সেটা শাসন-শোষণের মধ্য দিয়ে কোনদিন হয়নি, হয়েছে মিত্রতার মধ্যে; তাও শুধু বস্তু বিনিময়ের অর্থাৎ বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে নয়, হয়েছে ধর্ম সংস্কৃতি জ্ঞান বিনিময়ের মধ্য দিয়ে। সেটা আজও বজায় রয়েছে, সুতরাং আপনি আসুন—আমাদের দেশ দেখুন—আপনাদের সাহিত্যের খবর বলুন—আমাদের খবর শুনুন। সামনেই আমাদের অক্টোবর দিবস—সে দিনের উৎসবে যোগদান করুন।

তোমরা নিশ্চয় সকলেই জান যে আমরা যে সময় অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে ইংরেজদের শাসনপাশ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন হই তার বছর পরই—১৯৪৮ সালে মহাচীনে—জাপানী যুদ্ধের পর—গৃহযুদ্ধ বা বিপ্লব শেষ হয় এবং চিয়াং কাইশেকের দল মহাচীনের মূল ভূখণ্ড ছেড়ে ফরমোজা দ্বীপে আশ্রয় নেন, জয়ী হন বীর মাও-সে-তুঙের নেতৃত্বে চীনের কৃষক মজুর এবং সাধারণ মানুষ নিয়ে গঠিত কম্যুনিস্ট দল। আজকের পৃথিবীতে কম্যুনিস্ট দল এবং কম্যুনিজিমের আদর্শ ও স্বরূপ নিয়ে যে মতভেদ—মতান্তর এবং স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যে আলোচনা তার তুলনা একমাত্র হিমালয়। হিমালয় পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত—উত্তর-দক্ষিণে—তার যেমন দুই দিক, কম্যুনিজিমের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে মতের পরিমাণও তেমনি তার দুই দিক্। কিন্তু আসল সত্য যে কি—তা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু একটা কথা ঠিক যে তাঁরা দেশে নতুন গড়নের কাজ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ক'রে যাচ্ছেন। যাঁরা কঠোর সমালোচক তাঁরাও একথা স্বীকার ক'রে বলেন—এতে আর আশ্চর্যের কি আছে? কারণ মানুষেরা সেখানে প্রায় শৃঙ্খলাবদ্ধ, ব্যক্তি স্বাধীনতা নেই সুতরাং হুকুমমত তাদের খাটিয়ে কাজ আদায় ক'রে নেওয়া হয় জিজিয়া করের মত। যাই সত্য হোক—তাই দেখবার আগ্রহ নিয়ে চীনে গিয়েছিলাম। পৌঁচেছিলাম ২৮শে সেপ্টেম্বর, ফিরেছিলাম ২৯শে অক্টোবর—একমাস ছিলাম। ঠিক একমাস। এই একমাসে দেখেছি কম নয়, অনেক ঘুরেছি এবং দেখেছি, কলকাতা থেকে হংকং—সেখান থেকে ক্যান্টন—ক্যান্টন থেকে পিকিং, পিকিংএর চারিপাশে গোথামার পল্লী-অঞ্চল—সেখান থেকে চুংকিং, এ সবই এরোপ্লেনে। চুংকিং থেকে স্টীমারে ইয়াংসিকিয়াং নদীপথে প্রায় হাজার মাইল—এবং এই হাজার মাইলের প্রায় ৫০০।৬০০ মাইল পাহাড়-কাটা খদের মধ্য দিয়ে ঘুরেছি। হাঙ্কাও শহরে এসে ইয়াংসিকিয়াং নদীর উপর প্রথম ব্রিজের উদ্ঘাটন সমারোহের মধ্যে উপস্থিত থেকেছি—সেখান থেকে সাংহাই—সাংহাই থেকে হাংচু; সেখান থেকে আবার ক্যান্টন হংকং হয়ে কলকাতা। মাইলের মাপে তো কম পথ নয়; বিশ হাজারেরও বেশী। তার মধ্যে বড় ছোট ঘটনা ঘটেছে অনেক। সমস্ত লিখলে একখানা বই নিশ্চয়ই হয়। কিন্তু সে বই আমি লিখি নি। কারণ এই নবীন রাষ্ট্র চীনের বয়স মাত্র দশ বৎসর (১৯৫৭ সালে)। তার সম্পর্কে বই লিখে একটা মতামত প্রকাশ করবার মত সময় এখনও আসে নি। যেটুকু হয়েছে সেটুকুর দাম হিসেব করবার সময় চীনের ইতিহাস মনে রাখলে বলতেই হবে তার মূল্য অসাধারণ। তবে সে যখন সম্পূর্ণ হবে তখনই তার আসল বিচার হবে। যেমন আমাদের দেশে। ময়ূরাক্ষী—দামোদর ভ্যালী—পথঘাট—ব্রিজ—স্বাস্থ্যকেন্দ্র এ তো কম হয়নি। কিন্তু তার মূল্য কত সে প্রমাণ হবে তার ফলে।

● নবীন চীনের তরুণ জীবন
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সে যাক। তোমাদের কাছে চীনের তরুণ-তরুণীদের কথা বলি। এখানে আমাদের দেশের সঙ্গে চীনের প্রভেদ আকাশ-পাতাল। সেখানে তাদের দেশের নব-সংগঠন সম্পর্কে যে উৎসাহ দেখে এসেছি তার শতাংশের একাংশও যদি এখানে থাকত তবে এ দেশের বারো বছরের মধ্যে সোনার দেশ হতে পারত। আমাদের দেশে ২৬শে জানুয়ারি এবং ১৫ই আগস্ট দুটি জাতীয় উৎসব হয়। একটি রেপাবলিক ডে অন্যটি ইনডিপেনডেন্স ডে। এই দিনে তরুণ-তরুণী ছাত্র-ছাত্রীদের যে মিছিল চোখে পড়ে তাদের হাতে বিভিন্ন দলের ঝাণ্ডা ওড়ে। কেউ হাঁকে—ইয়ে আজাদী ঝুটা হায়। কেউ হাঁকে—ইয়ে সরকার মুর্দাবাদ। কেউ হাঁকে স্বাধীন ভারত জিন্দাবাদ। কিন্তু ওখানে গিয়ে



ছাত্রীদল এগিয়ে আসছে। প্রত্যেকের হাতে কাগজের ফুলের গুচ্ছ। এগুলো তারা মাথার উপর ধরে ছিল।

১লা অক্টোবর যে জাতীয় উৎসব দেখলাম—তাতে বালক-বালিকা, ছাত্র-ছাত্রী, শ্রমিক কৃষক, ব্যায়াম-জীবী, তরুণ-তরুণী, নর্তক-নর্তকী একবাক্যে হেঁকে গেল—নয়া চীন জিন্দাবাদ। সে কি উৎসাহ! যেন সমুদ্রের ঢেউ। কল্লোল তুলে জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও কর্ণধারদের বসবার উচ্চ মঞ্চের পাদপীঠে আছাড় খেয়ে পড়ে নতি এবং আনুগত্য জানিয়ে গেল। দলের পর দল। এক একটি দল যেন ঠিক এক একটি চলন্ত ফুলের বাগিচা। দেখলাম—একটি হলুদ ফুলে ফুলময় একখানি ফুল বাগিচা চলে আসছে। হঠাৎ ফুলগুলি নেমে গেল—তখন দেখা গেল কোন একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের ছেলে-

● নবীন চীনের তরুণ জীবন
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মেয়েরা মাথার উপর ফুলের গুচ্ছগুলি ধরে তার তলায় আত্মগোপন করে চলে আসছিল। ওদের পর এল ব্যায়ামজীবী খেলোয়াড়েরা, লরীর উপর ব্যায়াম দেখাতে দেখাতে যাচ্ছে, সাইকেলে চেপে ব্যায়াম করতে করতে চলেছে, একচাকার যানের উপরেও একজনের ঘাড়ে আর একজন তার ঘাড়ে একজন চেপে চলেছে। চীনের সদময় কর্তৃত্বের নেতা শ্রদ্ধেয় মাও-সে-তুঙের সামনে এসে সবাই ধ্বনি দিয়ে যাচ্ছে—নয়া চীন জিন্দাবাদ, চীনা জনগণ জিন্দাবাদ, মাও-সে-তুঙ জিন্দাবাদ!


।উপরে এক চাকার সাইকেল চালিয়ে কসরত দেখাচ্ছে একটি ছোট ছেলে।

এর আগেও ঠিক এই দেখেছি। পিকিং পৌঁচেছিলাম ২৮শে সেপ্টেম্বর। ছিলাম ছিনমিন হোটেলে তিনতলায় একখানা রাস্তার ধারের ঘরে। পশ্চিমে দক্ষিণে দু'দিকে রাস্তা। আমি ছিলাম একা। অর্থাৎ আমার কোন দল ছিল না। সাধারণতঃ বিদেশের নিমন্ত্রণে—বিশেষ ক'রে কম্যুনিস্ট দেশগুলির নিমন্ত্রণে দলবদ্ধ হয়ে ডেলিগেশন হিসেবেই যাওয়া আসা চলে। আসাটা কম, যাওয়াটাই বেশী। আমাদের দেশ থেকে সরকারের সঙ্গে সংস্রবহীন ডেলিগেশনই বেশী। ওদের দেশের শিক্ষক সংঘ—লেখক সংঘ—শিল্পী সংঘ—নানান সংঘ সরাসরি এদেশে নিমন্ত্রণ পাঠান—আমাদের দেশ থেকে ৫ জন ৭ জন ১০ জন মিলে ডেলিগেশন হিসেবে যান। তবে যুব উৎসব—শান্তি উৎসব—এ সব উৎসব যখন হয় তখন দল ভারী হয়ে ৫০।১০০ কি তারও বেশী হয়ে দাঁড়ায়। আমার ক্ষেত্রে কিন্তু আমি ছিলাম একক। এই একাকীত্ব বিদেশে কিন্তু ভারী

নয়া চীনের তরুণ জীবন
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

অসুবিধের কারণ হয়ে ওঠে। নিজের ভাষায় কথা বলবার লোক মেলে না, একলা একলা থাকতে হয়, ঘরের মধ্যে যে সময়টুকু সেটুকু আর কাটতে চায় না। যত দুশ্চিন্তা এসে জোটে। কথাটা বলছি এই জন্যে যে পিকিংয়ে হোটেলে সবরকম সুখস্বাচ্ছন্দ্য সত্ত্বেও ভাল ঘুম হত না। একটু রাত্রি থাকতেই ঘুম ভেঙে যেত। আমি রাস্তার দিকে ১০ ফুট ৬ ফুট কাচের জানালার ধারে চেয়ার টেনে বসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। তখন থেকেই রাস্তায় গাড়ি আসত; মিউলে টানা গাড়ি, একটা মিউলে টানা—তুটো মিউলে টানা, এসব গাড়ি বাইরে থেকে খাবার নিয়ে এসে ঢুকত পিকিংয়ে। ক্রমে ভোর হতে হতে লরী আসত; তার মধ্যে নিত্যই দেখতাম কিছু লরীতে যেত ৮।১০ থেকে ১৪।১৫।১৬ বছরের ছেলেমেয়ের দল। চলে যেত আবার ঘণ্টাতিনেক পর ফিরত। তাদেরও সেই এক ধ্বনি। আমার ইণ্টারপ্রিটার ছিলেন একটি চীনা তরুণী। নাম মিস ল্যু। সে সদ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষায় গ্রাজুয়েট হয়ে বেরিয়ে লেখক সংঘে ইণ্টারপ্রিটারের চাকরি নিয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম —এদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়?

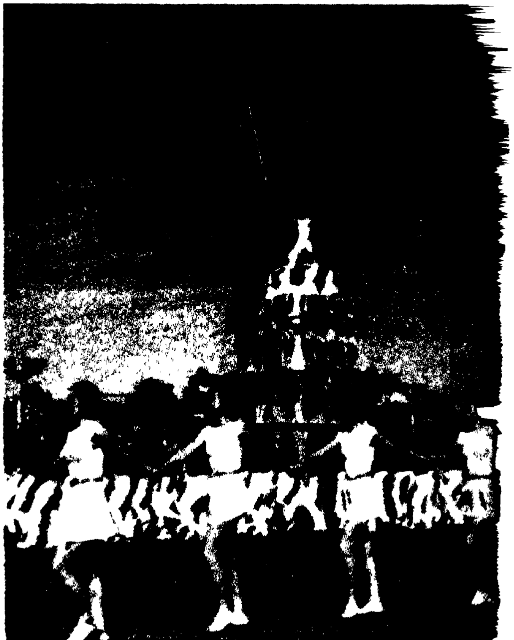
ল্যু বলেছিল—এই অক্টোবর ডে আসছে—তার জন্য প্যারেডে মহড়া দিতে যায়।

প্রশ্ন করেছিলাম—কি বলে চীনা ভাষায়?

—কেন? জনগণের চীনা রাষ্ট্র জিন্দাবাদ। মাও-সে-তুঙ জিন্দাবাদ। মাও-সে-তুঙ শতায়ু হোন।

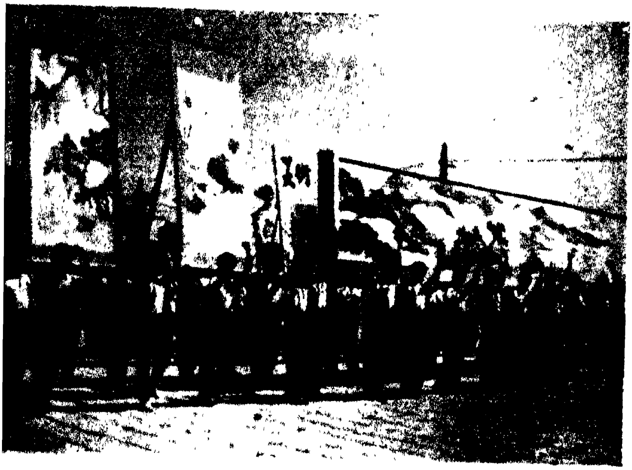
প্রশ্ন করেছিলাম—মাও-সে-তুঙকে তোমরা খুব ভক্তি কর; না?

—নিশ্চয়। ভক্তি করব না? জনগণের মুক্তিদাতা! একটু থেমে বলেছিল—জান আমি যতদিন পিকিংএ



ছাত্র ও ছাত্রীবৃন্দ—হাতে জাতীয় পতাকা।

● নবীন চীনের তরুণ জীবন
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়



চিত্র শিল্পীদের মিছিল প্রদর্শনী। নিজেদের আঁকা ছবি সব কাঁধে করে নিয়ে চলেছে।

এসেছি ততদিন প্রত্যেক বার ইউনিভারসিটির দলের সঙ্গে প্যারেড করেছি। কেন জান? মাও-সে-তুঙকে একবার দেখতে পাব। এই এইবার প্রথম যোগ দিচ্ছি না। তোমার ইন্টারপ্রিটারের কাজ করছি এবার অতিথি-দের আসনে তোমার সঙ্গে দাঁড়াতে পাব, এবং অনেক কাছ থেকে অনেকক্ষণ ধরে তাঁকে দেখতে পাব। আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম—দেশের মুক্তিযুদ্ধের নেতা—নববিধানের সর্বময় নায়কের প্রতি এই সুগভীর অনুরাগ দেখে।

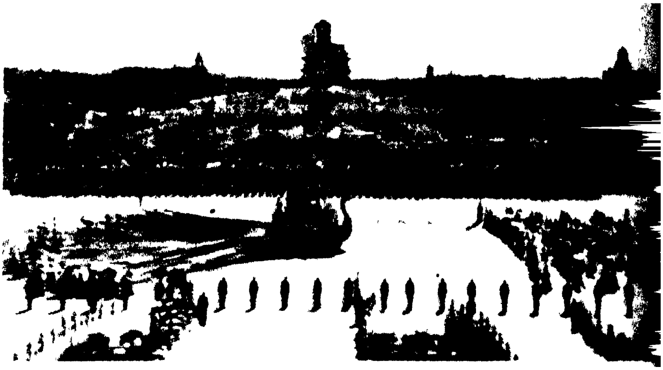
মনে মনে প্রশ্ন করেছিলাম—আমাদের দেশে এই অনুরাগ আছে কি?

নিঃসংশয়ে নিজেই উত্তর দিয়েছিলাম—অনুরাগ অংশুই আছে কিন্তু এই অনুরাগ নেই।

এর উত্তরও আছে। চীন দেশ একটি রাজনৈতিক দলের দেশ। সেখানে কম্যুনিস্ট পার্টির একচ্ছত্রত্ব প্রতিষ্ঠিত। শোনা যায় আরও দু'একটি রাজনৈতিক দল আছে বটে কিন্তু সে নামেই। এই একচ্ছত্রত্বের জন্য তরুণ-তরুণীর দল যাঁরা দেশের সেবা করতে চান তাঁরা ওই দলে গিয়েই যোগ দেন। এবং কম্যুনিস্ট পার্টি ডিক্টেটারের অধীন বলেই ডিক্টেটার এমন দুর্লভ শ্রদ্ধাভক্তির পাত্র হয়ে ওঠেন। অবশ্য মাননীয় মাও-সে-তুঙ পৃথিবীতে যুগে যুগে যে সব যুগপ্রবর্তক বিরাটপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে একজন। কিন্তু অত্যাচারী ডিক্টেটারও আমাদের বর্তমান যুগে দেখেছি। এবং তিনি যতদিন ডিক্টেটার থেকেছেন—ততদিন সে দেশের মানুষদের কাছে বিশেষ ক'রে দলের কর্মীদের কাছে এমনি সভয় সশ্রদ্ধ অনুরাগ ও আনুগত্য পেয়েছেন। আর আমাদের দেশ গণতন্ত্রের দেশ—এ দেশে ব্যক্তিস্বাধীনতা অবাধ, এবং আমাদের রাষ্ট্রনায়কেরা ওদেশের সর্বাধিনায়ক অপেক্ষা অনেক সুলভ। সেই কারণে এই আনুগত্য দেখা যায় না এবং তা আমাদের কাম্যও নয়।

নবীন চীনের তরুণ জীবন
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

এই সঙ্গে আরও একটি কথা বলতে হবে। না-হলে মিথ্যা বলা হবে, চীনের নববিধানের প্রতি অন্যায় করা হবে। সেটাও এই অনুরাগ ভক্তির অন্যতম কারণ। সেটি হল চীন কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রতন্ত্রের এই বালক-বালিকা তরুণ-তরুণীর জীবন সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তোলবার প্রতি যত্ন এবং বিপুল



অক্টোবর উৎসবে—ময়ূরপঙ্খিতে নর্তক-নর্তকীর দল।

আয়োজন। সে এক আশ্চর্য ব্যবস্থা। শহরে গ্রামে শিক্ষায়তন। প্রতিটি ছেলে সেখানে পড়ছে। শহরে শ্রমিকদের এলাকায় নার্সারী ইস্কুল। নেহাত বাচ্চারা সেখানে ফুলের বাগানে বাঁধানো আঙিনায় খেলে বেড়াচ্ছে। চীনের মত বিরাট দেশ—যে দেশের লোকসংখ্যা পৃথিবীর সব দেশ থেকে বেশী—সেই দেশে—দশ বছরের মধ্যে অশিক্ষার অন্ধকার তাঁরা দূর করেছেন। শুধু শিক্ষা নয়—স্বাস্থ্য গড়ে তুলবার জন্য, বালক-বালিকা তরুণ-তরুণীদের আনন্দের জন্য—শহরে শহরে ছেলেদের পার্ক (গ্রামে এটা পাই নি—এখনও গড়ে নি—তবে গড়বে) স্টেডিয়াম। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত, দলের পর দল আসছে খেলছে আবার কাজে চলে যাচ্ছে। যে সব শহরে শীত বেশী সে সব শহরে ঢাকা স্টেডিয়ামের বন্দোবস্ত। বিরাট হলের মধ্যখানে ভলিবলের কোর্ট, টেনিস খেলার কোর্ট, ব্যাডমিন্টন কোর্ট। রাত্রেও খেলা চলে আলো জ্বেলে। খোলা স্টেডিয়ামে মাঝখানে ফুটবল খেলা হচ্ছে, চারি পাশে রেস চলছে—ঘোড়দৌড় রেস নয়, তরুণ-তরুণীরা ছুটছেন; সাইকেল রেস হচ্ছে। সব থেকে আশ্চর্য হলাম প্যারাচুট ট্রেনিং খেলা দেখে। একটা আলাদা জায়গায় দশ থেকে পনের ষোল বছরের ছেলেরা প্যারাচুট ট্রেনিং নিচ্ছে খেলার আমোদের মধ্যে। প্রায় পঞ্চাশ ষাট ফুট উঁচু পোল, সেই পোলে হুক দিয়ে প্যারাচুট লাগানো আছে; সেই প্যারাচুটের সঙ্গে এক একজনকে বেঁধে দিয়ে কপিকলের সাহায্যে টেনে উপরে তুলে দিলে প্যারাচুটিস্ট একটা দড়ি টানলে হুকটা

● নবীন চীনের তরুণ জীবন
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

খুলে যায় এবং সে তখন খোলা প্যারাচুটের সাহায্যে আস্তে আস্তে নিচে নামে। একটা পোল আছে সেটা অনেক উঁচু, অন্তত ১০০ ফুট। এই প্যারাচুট স্টেডিয়ামে ছেলেমেয়েদের অসম্ভব ভিড়। সাংহাইয়ের খেলার মাঠে দেখেছি—পাশাপাশি ৮টা গ্রাউণ্ডে ১৬টি টিমের খেলা চলছে। হাইজাম্প চলছে একপাশে—লংজাম্প চলছে। খেলাধুলার অন্ত নেই। ছোট শিশুদের জন্য কোন কোন শহরে পার্কের মধ্যেই স্বতন্ত্র খানিকটা জায়গা আছে। সেখানকার বন্দোবস্ত দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল—মন ভরে উঠল! সে কি ব্যবস্থা। নানান ধরনের রকিং চেয়ার, কোনটা ঘোড়া কোনটা ভালুক কোনটা বাঘ কোনটা পাখি কোনটা গণ্ডার; কোনটা সিংহাসন কোনটা নৌকো কোনটা কিছু—হরেক রকমের রকিং চেয়ার; দোলনা; স্লাইড নাগরদোলা চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে। খানিকটা জায়গা টিনের ছাউনি করা; বর্ষাবাদলে তার মধ্যে ছেলেরা ঘোরাফেরা করবে, ছুটবে; দোল খাবে। চারিপাশে বেঞ্চ, সেখানে মায়েরা বসে থাকেন ছেলেদের ছেড়ে দিয়ে। ভবিষ্যৎ জাতি তৈরি হচ্ছে—এই সব পার্কে স্টেডিয়ামে ও ইস্কুলে। চুংকিং শহরে নজরে পড়ল—সকাল বেলা জনতিনেক তরুণী নারী কর্মী পাঁচ বছর থেকে আট-দশ বছরের ছেলে-মেয়েদের মার্চ করিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বয়েজ স্কাউটদের মতই পোশাক, গলায় লাল রঙের রুমাল বাঁধা। এই লাল রুমাল সহজে মেলে না, কৃতিত্ব দেখিয়ে অর্জন করতে হয়। সে কৃতিত্ব কি তা ঠিক বলতে পারব না। তবে এ তাদের এবং তাদের অভিভাবকদের পক্ষে খুব গর্বের কথা। আমার ইন্টারপ্রেটার মিস ল্যু আমাকে এ বিষয়ে একটা কথা বলেছিল সেটা বললেই সকলে বুঝতে পারবেন। ল্যু সাংহাই অঞ্চলের মেয়ে—ওর বাপ ছিলেন ওদেশের ডাক্তার। স্কুলের পড়া শেষ করে ও পিকিংএ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়েছিল ছয় বছর আগে। সেই অবধি সাংহাই আসে নি; আসবার সুযোগ হয় নি। ছ' বছর পরে আমার সঙ্গে আসার সুযোগ ফুরসত দুই-ই হল। এসেই আমায় বলে সে ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেল। আমি তাকে বললাম, তুমি সারাদিনটাই সেখানে থাকবে ল্যু। আমি ঠিক চালিয়ে নেব। পরের দিন সে ফিরে প্রথম কথাই বললে—আমার ভাই পো—যাকে আমি ছ' বছর আগে মায়ের কোলে দেখে গিয়েছিলাম ব্যানার্জী—সে এবার লাল স্কার্ফ অর্জন করে ছেলেদের মধ্যে লীডার হয়ে গেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—লাল স্কার্ফ বুঝি সম্মানের ব্যাপার!

—ওরে বাপরে! ওকি সকলে পায়? ও তো মস্ত লোক হবে! আমরা অভিভাবকরা কি গর্ব অনুভব করি জান না।

সাংহাই শহরে যে হোটেলে ছিলাম, সে হোটেলের সামনেই পার্ক। এবং আমি সাংহাই

পৌঁচেছিলাম শনিবার দুপুরবেলা। বেলা তিনটে থেকেই পার্কে এই ছেলে-মেয়ে বালক-বালিকাদের কুচকাওয়াজ স্পোর্টস এবং বক্তৃতা আরম্ভ হল। প্রকাণ্ড এবং শক্তিশালী আলো জ্বালিয়ে চলল বারোটা একটা পর্যন্ত। পরদিন রবিবার সকাল বেলা সাড়ে সাতটা আটটা থেকে আবার শুরু হল—বিরামহীন ভাবে চলল রাত্রি ন'টা দশটা পর্যন্ত।

পিকিংয়ে ছিলাম আট দিন। এই আট দিনের মধ্যে কয়েক দিনই আমি বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চল দিয়ে গিয়েছি। একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরেও গিয়েছিলাম এবং ওখানে যাঁরা ভারতীয় সরকারী ভাষা হিন্দী শেখেন তাঁদের ক্লাসে বক্তৃতাও ক'রে এসেছি। সে কথা পরে বলব। তার আগে এই বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলে বাইরে যা দেখেছি তাই বলি। এখানকার রাস্তাঘাট অপেক্ষাকৃত নির্জন। পুরনো রাস্তা ভেঙেচুরে বড় করা হচ্ছে। এই রাস্তায় যুবক ছাত্রদের দৌড় অভ্যাস করতে দেখেছি। হাফ প্যান্ট—কেডস জুতো—গায়ে গেঞ্জি প'রে দলবন্দী ছেলেরা দৌড়ুচ্ছে। পাঁচ সাত দশ মাইল যে যেমন পারে দৌড় অভ্যাস করে। পিকিংয়ে অক্টোবরে বেশ শীত। নভেম্বরের প্রথম থেকেই বরফ পড়ে শুনেছি। সেই শীতে তারা ঘেমে যেন নেয়ে উঠেছে।

এই ভাবে যে জাতির বালক-বালিকা যুবক-যুবতী গড়ে উঠছে তারা তো অল্প কিছু-দিনের মধ্যেই শক্তিতে সংহতিতে বিশ্বজয়ী হয়ে উঠবে। তাদের পথ রোধ করবে কে? এবং এই যে দলাদলিশূন্য চীন রাষ্ট্র এর গঠনকর্ম একদিনে দশদিনের কর্ম সম্পন্ন করবে তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে।

তবে শৃঙ্খলা বড় কঠিন। হয় তো বা সে-ক্ষেত্রে নিয়মকানুন নিষ্ঠুর। আমি চীন যাবার কিছুদিন] আগে সরকার থেকেই সরকারী দোষ-ত্রুটির সমালোচনা নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। ফলে একদল বিরোধী পক্ষ বেশ কথা বলবার সুযোগ পান এবং সত্য অর্ধসত্য নানান ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে কিছুটা হৈ-চৈ হয়; এবং আমাদের দেশের ছাত্রেরা যেমন বিক্ষোভ দেখান—মিছিল করেন, তেমনি (এতখানি নয়) খানিকটা বিক্ষোভ দেখাতে চেয়েছিলেন একটি শহরের একদল তরুণ। সরকার সে-ক্ষেত্রে কঠোর হস্তে সে বিক্ষোভ দমন করেছিলেন। খবরটি আমাকে দিয়েছিলেন আমাদের ভারতীয় দূতাবাসের একজন বাঙালী কর্মী। যার ফলে এ ধরনের আন্দোলন বা বিক্ষোভ চীনের মত রাষ্ট্রে অসম্ভব। এ ভালো না মন্দ কি ক'রে বলব? কারণ ব্যক্তিস্বাধীনতা বড় না জাতীয় স্বার্থ বড় এ বিচার সহজ নয়। আমাদের দেশে এই ব্যক্তিস্বাধীনতার ফল ছেলেদের রাজ্যে কি চেহারা নিচ্ছে তার একটি খবর এই সেদিন খবরের কাগজে বেরিয়েছে। বেলঘরিয়া অঞ্চলের এক চাকুরে ভদ্রলোক তাঁর বালক পুত্রকে কোন আচরণের জন্য প্রহার বা তিরস্কার করেছিলেন বা দুইই করেছিলেন। শাসন ক'রে ভদ্রলোক আপিসে গেলেন। ছেলেকে প্রহারের জন্য মন একটু খারাপও ছিল, আবার ছেলেকে

● নবীন চীনের তরুণ জীবন
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মন্দ পথে যাওয়ার জন্য শাসন করেছেন বলে কর্তব্যপালনের তৃপ্তিও অনুভব করছিলেন। আপিস থেকে ফেরবার সময় হয় তো ছেলের জন্য একটা কিছু কিনেও নিয়েছিলেন। ভাবছিলেন ছেলেকে দেবেন, বুঝাবেন; ছেলেও খুশি হবে—বুঝবে এবং অনুতাপ প্রকাশ ক'রে বলবে—'এমন সব কাজ আর করব না বাবা। এবার থেকে ভাল হব তুমি দেখো।' কিন্তু বেলঘরিয়ায় নেমে খানিকটা বাড়ির দিকে অগ্রসর হতেই ছেলের সঙ্গীর দল তাঁকে ঘিরে ফেলে চিৎকার ক'রে উঠল—মেরে ধ'রে বাপগিরি ফলানো—

—চলবে না। চলবে না। চলবে না।

বিমূঢ় হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। ওদিকে ধ্বনি তখন চলছে—ইটের বদলে—

—পাটকেল।

—মারের বদলে—

—মার!

এবং মার মার শব্দে প্রকম্পিত হয়ে উঠল সারা অঞ্চলটি। ভদ্রলোক মারও খেলেন। এখন ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিণতি যদি এই হয় তবে আমি বলব ওতে দরকার নেই। কড়াকড়ি ভাল। আমাদের গ্রামে একটি ছেলে ছিল, সে কিছুতেই পড়ত না। বাপ ছিলেন উদারপন্থী এবং আধুনিক। শেষ পর্যন্ত ভেবে চিন্তে বিদ্যেসাগরী প্রথমভাগ বর্ণপরিচয় বাদ দিয়ে সে-কালের 'হাসি-খুসী' ছড়া ও ছবির বই কিনে আনলেন। ছেলেকে দেখালেন—দেখ তো বাবা কেমন ছবি!

ছেলে বললে—ভাল। দেখি বাবা।

ছেলে ছবি দেখতে বসল। বাপ পাশে বসে অ-এ অজগরের ছবিটা দেখিয়ে বললেন—বল—অ-এ অজগর আসছে তেড়ে।

ছেলে লাফ দিয়ে



বাজিকর দল—চীনের বিখ্যাত ড্রাগন মিছিল।

উঠে দাঁড়াল এবং—ওরে বাপরে, সাপরে! বলে ছুটে পালাল। অতঃপর বাপ আর থাকতে পারলেন না, ছুটে গিয়ে ছেলের কানে ধ'রে এনে গালে চড় কষিয়ে বললেন—পড়!

কাজ হল।

এ তো একটা দুটো কি চারটে ছেলের ব্যাপার। আর রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে গোটা জাত নিয়ে কথা। গোটা জাতের চরিত্র গঠনের দায়িত্ব যখন রাষ্ট্রের তখন রাষ্ট্রের আদুরে ছেলের ননীগোপাল বাপ সাজলে চলবে কেন? চীনের কঠোরতা সম্পর্কে তাই নিন্দাই বা করি কি ক'রে? দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি আগামী দশ বছরে চীন জগতের শ্রেষ্ঠ শক্তি ও সমৃদ্ধিশালী দু' তিনটি জাতির মধ্যে একটি। হয় তো বা দুটির মধ্যে একটি।



ব্যায়ামকারিণীর দল এগিয়ে চলেছে খেলা দেখাতে দেখাতে।

এর একটি আশ্চর্য ভাল দিকের কথা বলি। সেদিন প্রথম চীনে প্রবেশ করছি। সীমান্ত থেকে ক্যান্টন পর্যন্ত প্রায় সোত্তর মাইল পথ ট্রেনে যেতে হয়। হংকং সীমান্তে নানান দেশের অতিথি-পর্যটক-সরকারী ডেলিগেশন আসছেন। সীমান্ত থেকেই প্রত্যেক দলের জন্য স্বতন্ত্র ইন্টারপ্রেটার এসেছেন। ইন্টারপ্রেটাররা শুধু ইন্টারপ্রেটার নন এঁরাই গাইড, এঁরাই সুখ-সুবিধে দেখেন, এবং এক কথায় চীন সরকারের বা নিমন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি। এঁদের ত্রুটি হলে সেটা দেশের ত্রুটি বলেই ধরা হবে। এখন আমার সঙ্গে এক কামরায় পাকিস্তানের এক সরকারী ডেলিগেশন চলেছিলেন। হংকং সীমান্তেই এঁদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল এবং আমি আলাপ করতে গিয়ে বেশ একটু ধাক্কা খেয়েই সাবধানে সরে বসেছিলাম। তার একটু বিবরণ দিলেই এঁদের স্বরূপটা স্পষ্ট হবে। পাকিস্তান থেকে ডেলিগেশন—সুতরাং কেউ-না-কেউ ঢাকার বাঙালী থাকবেন। বাংলা ভাষা বলতে পারব। এবং একই ভারতবর্ষের দুই অংশ—এক ভাষা এক গান এক সুর এক মন, এক অন্ন

● নবীন চীনের তরুণ জীবন
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

এক জল এক বাতাস—হলেই বা ধর্ম ভিন্ন, এ মানুষ কি পর হতে পারে? এই ভেবে নিজেই এগিয়ে গেলাম। গোটা দলের (৭১৮ জনের দল) নিখুঁত সাহেবী পোশাক। কিন্তু সেটা গ্রাহ্য করি নি, কারণ সাহেবী পোশাক ভারতবর্ষে বাংলা দেশেও আছে। প্রশ্ন করলাম—আপনারা পাকিস্তান থেকে আসছেন?

ইংরেজীতে জবাব হল—কি বলছেন জেণ্টলম্যান?

তখন ইংরেজীতেই বললাম। তিনি জবাব দিলেন—ই-য়া-স। কামিং ফ্রম কেরাচি!

জিজ্ঞাসা করলাম—আপনাদের দলে ঢাকার কেউ নেই? আমি কলকাতার লোক।

—ও। তার পরই হাঁকলেন—হে সেলিম, দিস জেণ্টলম্যান ওয়াণ্টস য়্যু।

সেলিম এগিয়ে এলেন; চমৎকার চেহারা, টাইটা অনাবশ্যক ভাবে টেনে সোজা বা বাঁকা করে নিয়ে বললেন—ওয়েল হোয়াট ক্যান আই ডু ফর য়্যু?

আমি বললাম—আলাপ করতে চাই। আপনি বাঙালী। আমিও বাঙালী, কলকাতা থেকে আসছি। খাঁটি বাংলায় বললাম। এবং ঢাকার ভাষা-আন্দোলন স্মরণ করেই একটু অহংকার করে বললাম—আমি একজন সাহিত্যিক। আমার নাম তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি ইংরেজীতে বললেন—আমি কখনও শুনি নি। এবং আমি বাংলা বইটই পড়িনে। ওয়েল গুডবাই। বলে চলে গেলেন। সীমান্ত পার হয়ে গাড়িতে উঠে দেখলাম—তাঁরাও সেই কামরায় এবং মাঝের রাস্তার ওপাশেই দল বেঁধে জমিয়ে বসেছেন। আমি সতর্ক হয়েই ব'সে রইলাম। কারণ ওই দলটির আচার-আচরণে একটা অভদ্রতার প্রকাশ ছিল অত্যন্ত স্পষ্টভাবে। কিছুক্ষণ পরই দেখলাম সেই ইণ্টারপ্রেটার তরুণটিকে ঘিরে সপ্তরথীর মত অভিমন্যু বধের পালা অভিনয় করছেন। তার আগে চীন আমেরিকার সম্পর্ক এবং আমেরিকা পাকিস্তান সম্পর্কের কথাটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। আমেরিকানদের ছ' পাঁচজনের সঙ্গে আলাপ আছে, তাঁরা চীন সম্পর্কে প্রকাশ্য-ভাবেই বিরূপ, তবে তাঁদের অভদ্র ভাষা প্রয়োগ করতে দেখি নি। তবে মন্তব্য করতে গিয়ে কিছুটা শক্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু এই পাকিস্তানী দল এই ছেলেটিকে ঘিরে তাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তাকে দিয়েই স্বীকার করাতে চাইলে যে—চীনে অত্যাচার অনাচারের সীমা নেই, দারিদ্র্য অশিক্ষা কুশিক্ষার অন্ত নেই। আর ছেলেটি অত্যন্ত ভদ্রভাবে অক্ষুণ্ণ মর্যাদার সঙ্গে তার জবাব দিয়ে যাচ্ছিল।

যেমন,—দু' একটি কথা আমার মনে আছে।

—তোমাদের রাজ্যে তো বিচার বন্দুকের নলের মুখে। সামান্য সন্দেহ হলেই তো হয়ে গেল।

● নবীন চীনের তরুণ জীবন
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

—না। তা কেন হবে। আইন আছে। বিচারালয় আছে। সব দেশেই যেমন বিচার হয়, তেমনিভাবেই বিচার হয়।

—সে বিচার তো বিচারের ভান মাত্র। সব আসামীই তো দোষ স্বীকার করে নেয়।

—তা অনেকে নেয়। কিন্তু স্বীকারোক্তি সব দেশেই কিছু কিছু লোক করে।

—তোমরা ব্রেন ওয়াশ করাও। সে পদ্ধতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর।

—আপনারা অন্য দেশের মিথ্যাপ্রচারে বিশ্বাস করেছেন।

—তোমরাও মিথ্যাপ্রচার কর।

—প্রচার করি। কিন্তু মিথ্যা কেন করব ?

এই ধরনের প্রশ্ন। যে প্রশ্ন একমাত্র আদালতে বা প্রকাশ্য সভায়—জেরার ক্ষেত্রে বা বাদানুবাদের ক্ষেত্রে চলে, গৃহস্থের ঘরে এসে কোন অতিথি এমন প্রশ্ন গৃহস্থকে করেন না। আমার কানে অত্যন্ত রূঢ় ঠেকছিল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এই তরুণ ইন্টারপ্রেটারটি বারেকের জন্য বা মুহূর্তের জন্য ধৈর্য হারায় নি। অত্যন্ত সংযত বিনয়ের সঙ্গে অনুদ্ধত মর্যাদায় নিজেকে স্থির রেখে সে উত্তর দিয়ে গেল, ক্যান্টন স্টেশন পর্যন্ত।

এই নতুন চীনের তরুণ সম্প্রদায়ের কথা। অবশ্য চীনের সকলেই কম্যুনিস্ট নয়। অকম্যুনিস্টই বেশী। তাদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ হয় নি। তবে আমার বিশ্বাস তারা এই নববিধানে জীবনে কম্যুনিস্টরা যা পেয়েছে তা না পেলেও কম পায় নি। মুক্তি পেয়েছে জমিদার ধনী সম্প্রদায়ের দাসত্ব থেকে। এ দাসত্ব প্রায় ক্রীতদাসত্বেরই মত। এ প্রথা আমাদের দেশে কোন কোন দেশীয় রাজ্যের রাজাদের অন্দরে থাকলেও সাধারণভাবে ভারতবর্ষের সমাজে ছিল না। আর পেয়েছে অন্ন। ওদেশে অন্ন যথেষ্ট। বস্ত্র কম—কিন্তু বস্ত্রও তারা পেয়েছে। শিক্ষা পাচ্ছে। এই দশ বৎসরের মধ্যে এটা কিছুতেই সম্ভবপর হত না যদি না কম্যুনিস্টদল একচ্ছত্র অধিকারে কাজ করবার ও করাবার সুযোগ না পেতেন। এবং যদি না সাধারণ মানুষ, সে ভয়েই হোক আর ভক্তিতেই হোক শৃঙ্খলাপরায়ণ ও অনুগত না হত। আমি নিজে অহিংসায় বিশ্বাসী। বিশ্বাস করি অহিংসাই মানুষের সমাজে একমাত্র শান্তি সুখের পথ, অবশ্যম্ভাবী ধ্বংস থেকে পরিত্রাণের পথ। কিন্তু সেই সঙ্গে এও বিশ্বাস করি—অহিংসা দুর্বলের ধর্ম নয়, অহিংসা শ্রেষ্ঠ শক্তিমানের পক্ষেই পালন করা সম্ভব। অহিংসা তাঁরই ধর্ম যিনি কোন অন্যায়কে ক্ষমা করেন না। যিনি সত্যে অধিষ্ঠিত তাঁরই ধর্ম অহিংসা। দুর্বলের অহিংসা পরাজয়েরই নামান্তর। অন্যায়কে ক্ষমা প্রকারান্তরে দুর্নীতিকে প্রশ্রয়। ব্যক্তিস্বাধীনতা সেখানে উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হবেই। দুর্বল নেতৃত্ব কখন সবল শক্তিমান জাতি গঠন করতে পারে না। অসম্ভব।



মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও শ্রীরামকৃষ্ণ

—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'শুনেছি দেবেন্দ্র ঠাকুর ঈশ্বরচিন্তা করে।' মথুরবাবুকে বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'তাকে ভারি দেখতে সাধ হয়। তার বাড়িতে নিয়ে যাবে একদিন?'

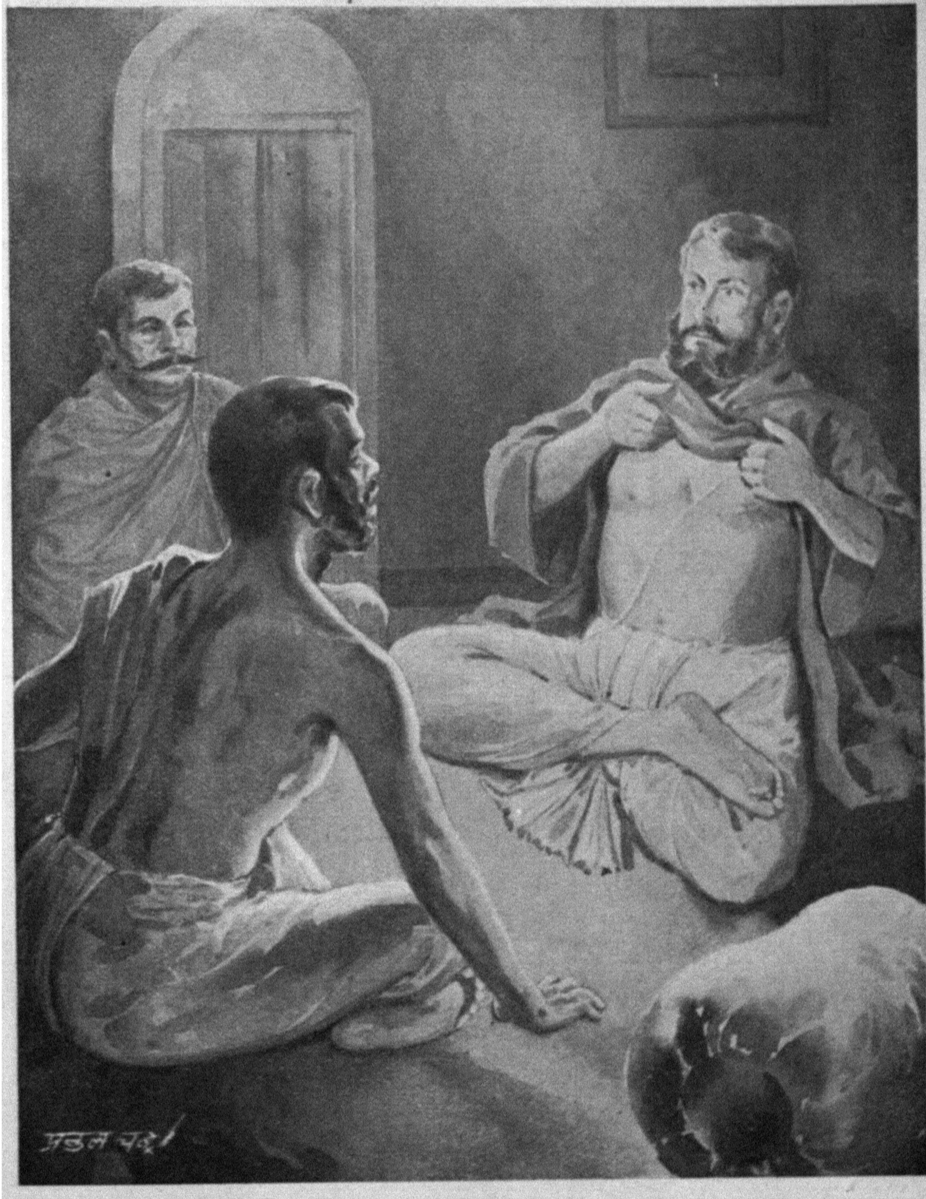
'নিয়ে যাব।' এক কথায় রাজি হল মথুর।

'তোমার সঙ্গে তার আলাপ আছে?'

'বা, আমরা যে একসঙ্গে পড়েছি হিন্দুকলেজে। একসঙ্গে মানে এক ক্লাসে।' মথুরবাবু উৎফুল্ল চোখে বললে, 'তার সঙ্গে আমার খুব জানাশোনা।'

'তবে একদিন নিয়ে চলো সঙ্গে করে।' শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে ঝরে পড়ল ব্যাকুলতা।

'ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার—তুমি সেখানে যাবে কি! কত বড় রাজপ্রাসাদের মতো তার বাড়ি। তার বাবা দ্বারকানাথ ঠাকুরের রাজতুল্য বিত্ত। বলতেই বলে প্রিন্স দ্বারকানাথ। কত তাদের জাঁকজমক কত তাদের বোলবোলা। তোমাকে সেখানে কে পুঁছবে?



অনায়াসে দেবেন্দ্রনাথ গায়ের জামা তুলে ধরল।

দ্বারকানাথ নেই কিন্তু তার বড় ছেলে দেবেন্দ্রনাথ তারই মত হাঁকডেকে লোক। জানো, ব্যবসা করে অনেক টাকা লোকসান দেয় দ্বারকানাথ, পাহাড়প্রমাণ ঋণ রেখে যায় ছেলের ঘাড়ে। দেবেন্দ্রনাথ শেষ ক্রান্তি পর্যন্ত সেই ঋণ শোধ করে দিয়েছে।

কলেজে-পড়া কৃতবিদ্য ব্যক্তি। কত বড় কর্মী, কত মহৎ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি স্বদেশের উন্নতির পথে অন্তরায়—এই আন্দোলন চালাচ্ছে ইংরেজ শিক্ষক আর পাদ্রীরা, আর তারই অন্ধস্রোতে গা ভাসিয়েছে উগ্রপন্থী ছাত্রের দল। তারই বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে অগ্রণী এই দেবেন্দ্রনাথ। নিজের ধর্মে অনাস্থা, নিজের সংস্কৃতির প্রতি অশ্রদ্ধা ও পশ্চিমকে অনুকরণ করবার লালসার বিরুদ্ধে তার অভিযান। তারই জন্যে রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তন করলেন আর তার প্রধান ব্যাখ্যাতা দেবেন্দ্রনাথ। ব্রাহ্মধর্ম তো হিন্দুধর্মের বিরোধী বা বিসম্বাদী নয়, আসলে তা হিন্দুধর্মেরই সার, নির্যাসরস।

এ নিয়ে দেবেন্দ্রনাথের কত লেখা কত বক্তৃতা।'

'আমি অতশত জানতে চাই না।' বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'সে ঈশ্বরভক্ত তো?'

'সে ঈশ্বরে শরণাগত। ঈশ্বর বই সে আর কিছু জানেনা। ঈশ্বরের কাছে সে যে দীক্ষা নিয়েছে তা আরামের দীক্ষা নয়, তা আগুনের দীক্ষা। যে ঘরে পূজা হয় সেই ঘরে গৃহস্থ যেমন জাগ-প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে, নিবতে দেয়না, তেমনি জীবনে সে একটি অনির্বাণ ভক্তির প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছে। সমস্ত জীবনই তার পূজার ঘর। আর সে প্রদীপে শুধু আলোই নয় দাহও আছে। দুঃখ-দুর্দিনের দাহ কিন্তু সত্যের আলো।

যে এই দীপ জ্বালায় সে আর ঘুমুতে পারে না। সেই দীপই তাকে জাগিয়ে রাখে। জাগিয়ে রাখে সতর্ক প্রহরায়। দুর্যোগের ঝোড়ো হাওয়ায় তা না নিবে যায় অকস্মাৎ, আলস্যে-ঔদাসীন্যে না স্তিমিত হয়। আর কোনো ভার ভার নয় যেমন এই দীপরক্ষার ভার। তাতে যোগাও নিষ্ঠার তেল, উস্কে দাও উৎসাহের কাঠি দিয়ে, আর তাকে ঘিরে রাখো তোমার বিশ্বাসের দেয়াল দিয়ে। তাই ঘোর কষ্টের দিনে যদিও দেবেন্দ্রনাথের আত্মীয় গেল, সমাজ গেল, বিত্ত গেল, প্রভুত্ব গেল, নিন্দায় ছেয়ে গেল দশদিক, ধনী-মানী বন্ধু-স্বজন, সহায়-সম্বল, সব তাকে ত্যাগ করল, তবু দীপের অকম্প শিখা নিবতে দিল না কিছুতেই। সেই শিখাকে বুকে করে লোকালয় ছেড়ে ঘুরতে লাগল অরণ্যে-পর্বতে। সেই আলোকে দেখতে লাগল রুদ্রের প্রসন্ন মুখ। যিনি ভয়ের ভয় ভীষণের ভীষণ, তাঁর বজ্রমুষ্টির অন্তরালে খুঁজে নিয়েছে বরাভয়ের অমৃত।'

● মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও শ্রীরামকৃষ্ণ
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'রাজার ছেলে ঋষি—এমন মহাপুরুষকে দেখব না স্বচক্ষে ?'

'কিন্তু তোমাকে পাত্তা দিলে তো! তার উপর দেখ না কত বড় পণ্ডিত, কেমন সব জ্ঞানের কথা বলেছেন।

—সংসারাসক্ত বিষয়-মত্ত লোক বিষয় পেয়েও কেন মনে যথার্থ সুখ পায় না ? যে জিনিসের উপর আমাদের সবচেয়ে বেশি মমতা, বেশি আকর্ষণ, যার বিনাশ বা বিচ্ছেদের কল্পনাতেও আমাদের দুঃসহ কষ্ট তা থেকেই কেন আমরা সর্বাগ্রেই বঞ্চিত হই ? কেনই বা পার্থিব সুখ অনর্থক ও অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয় ? কেন মনে হয় একটা উৎকৃষ্টতর সুখ কোথাও আছে, নইলে, কেন, কেন তবু আমাদের ভোগস্পৃহা ? এই সব সিদ্ধান্ত করতে গেলে মনে হয় ঈশ্বর এমন বিধান করেছেন যে শুধু তাঁতেই আমাদের আসল সুখ। শুধু তিনিই সমস্ত তৃপ্তির হেতু। যতক্ষণ আমরা তাঁকে চোখের সামনে রাখি, তাঁর ইচ্ছার অনুগত হয়ে কাজ করি ততক্ষণই আমাদের যথার্থ আনন্দ।

আরো কী বলছেন শোনো।

—আমরা ক্ষুদ্র জীব হয়ে যে ঈশ্বরকে জানবার অধিকারী হয়েছি এই আমাদের সর্বোত্তম সৌভাগ্য। কিন্তু এই মহত্তম অধিকারের উপযুক্ত হতে হলে আমাদের সর্বভাবে পবিত্র হতে হবে। যেমন ভদ্র সমাজের উপযুক্ত হবার জন্যে ভদ্র হতে হয়, সাধুর সঙ্গে বসবাসের জন্যে সাধু হতে হয় তেমনি সেই পবিত্র-স্বরূপের সান্নিধ্য পেতে হলে পবিত্র হওয়া চাই। বাহ্যিক সাধুভাব প্রকাশ করতে পারলে সাধু সঙ্গে কখনো-কখনো বিনয় রক্ষা করা যায় বটে কিন্তু পরমেশ্বরের সকাশে সেরূপ হবার নয়। সর্বান্তর্যামী পরমেশ্বরের কাছে বিনয় রক্ষা করতে গেলে মন, বাক্য ও কার্য যুগপৎ পবিত্র রাখা দরকার।'

'তবে ? এমন সুন্দর যার কথা, এমন গভীর যার ঈশ্বর সম্বন্ধে অনুভব, চলো তাকে দেখে আসি দু'চোখ ভরে। তাকে দেখে আসাও পুণ্য।'

'যদি তোমাকে ঢুকতে না দেয় বাড়িতে ? তুমি কোথাকার কে এক হেঁজিপেঁজি লোক—' মথুর নিরস্ত করতে চাইল।

হাসলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। 'যদি ঢুকতে না দেয় ফিরে আসব। অন্তত দেখে আসব তো তার বাড়িটা। তার বাড়িটাই তো তীর্থ।' তারপর বললেন আশ্বাসের সুরে, 'তা হয়না। পারবেনা আমাকে ফিরিয়ে দিতে। যদি শোনে আমিও ঈশ্বর-ঈশ্বর করি—কাছে ডেকে নেবে হাত বাড়িয়ে, আনন্দের কথা শোনাবে।'

নিয়ে গেল মথুর। একেবারে সটান দেবেন্দ্রনাথের কামরায়।

● মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও শ্রীরামকৃষ্ণ
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'চিনতে পারো ?'

'আরে মথুর না ? চেহারাটা একটু বদলেছে দেখছি। ভুঁড়ি হয়েছে।' হাসির রেখাটুকু মিলিয়ে যেতেই উৎসুক চোখে জিজ্ঞেস করল দেবেন্দ্রনাথ : 'ইনি কে ?'

'ইনি ঈশ্বর-ঈশ্বর করে পাগল।' বললে মথুর, 'তোমাকে দেখতে এসেছেন।'

কে কাকে দেখে !

তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল দেবেন্দ্রনাথ।

'দেখি তোমার গা দেখি।' মুখভাবে প্রসন্ন বন্ধুতা, সহজ সুরে বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ। আশ্চর্য, পারলেন বলতে। এতটুকু কুণ্ঠা হল না।

আরো আশ্চর্য দেবেন্দ্রনাথের ব্যবহার। অনায়াসে সে গায়ের জামা তুলে ধরল।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেখলেন দেবেন্দ্রনাথের গায়ের রঙ গৌর, তার উপর এক রাশ সিঁদুর ছড়ানো।

তার মানেই দেবেন্দ্রনাথের দিব্য ভাব উপস্থিত। তিনি এসেছেন ঈশ্বর-সান্নিধ্যে। আগুনের সামনে এসেছেন বলেই তাঁর গায়ে এই সতেজ রক্তিমা।

'ঠিক লোকের কাছেই এসেছি।' পাশে বসে পড়লেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বললেন, 'আমাকে কিছু বলো।'

'আমি কী বলব !

'না, বলো। তুমি কত বড় পণ্ডিত। সমস্ত বেদ-উপনিষদ তোমার নখদর্পণে। এ পাণ্ডিত্যও তোমার প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ। বলো কিছু শুনি। ঈশ্বরীয় কথার কি কিছু শেষ আছে ? যত বলবে তত নতুন।'

বলতে লাগল দেবেন্দ্রনাথ। 'এই জগৎ যেন একটা বিরাট ঝাড় লণ্ঠন, আর জীব হচ্ছে এক-একটি ঝাড়ের দীপ। এ জগৎ কে জানত ? ঈশ্বর মানুষ করেছেন তাঁর মহিমা প্রকাশ করবার জন্যে। ঝাড়ের দীপ না থাকলে সব অন্ধকার, ঝাড় পর্যন্ত দেখা যায় না।'

'আরো একটু বলো।'

'ঈশ্বরের মহিমা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। প্রভাতে আমাদের নিমীলিত নয়ন মুক্ত হওয়া মাত্রই তাঁর চক্ষু আমাদের উপরে স্থাপিত দেখি। আমরা যদি তাঁর জন্যে ব্যাকুল হই, যদি সরল হৃদয়ে তাঁকে প্রার্থনা করি, যদি ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুতেই আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণার নিবারণ না হয়, তবে অন্তরে-বাহিরে দূরে-নিকটে সকল স্থানেই তাঁর প্রকাশ দেখতে পাই। যখন নিজেকে পবিত্র করি, ঈশ্বরের কাছে মুক্ত করি হৃদয় দ্বার, সত্বঞ্চ

● মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও শ্রীরামকৃষ্ণ
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

হয়ে অন্বেষণ করি তাঁকে, তখন গিরিগুহা, উদ্যান-কানন, নির্জন-সজন সকল কিছুই তাঁতে ভরে ওঠে।

এবার আপনি কিছু বলুন।' অনুরোধ করল দেবেন্দ্রনাথ।

'তুমি কলির জনক, তোমাকে দেখে আমার খুব আনন্দ।' ভাবময় উজ্জ্বল মুখে বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'জনক এদিক-ওদিক দু'দিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি। তুমি সংসারে থেকেও ঈশ্বরে মন রেখেছ, তুমিই তো বাহাদুর, তুমিই তো বীরপুরুষ! তাই তো তোমাকে আমার দেখতে আসা।

জনক একদিকে নিজের হাতে লাঙল নিয়ে চাষ করছে, আরেক দিকে দেশদেশান্তর থেকে আসা জ্ঞানপিপাসুদের ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছে।'

'আরো একটু বলুন।'

'এক হাতে কাজ করো আরেক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাকো। কাজ শেষ হলে দু' হাতে ঈশ্বরকে ধরবে।

যুদ্ধ যখন করতেই হবে, সংসারীদের বলি, কেল্লার মধ্যে মানে সংসারের মধ্যে থেকেই যুদ্ধ করা সহজ। মাঠে দাঁড়িয়ে, মানে সংসার ছেড়ে এসে যুদ্ধ করার অনেক বিপদ। যদি খেতে না পাও ঈশ্বর-টিশ্বর সব ঘুরে যাবে।

যা চাও তাই কাছে রয়েছে। অথচ লোকে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। ব্যস্তবাগীশ লোক কাছের জিনিসও দেখতে পায়না। একজন গামছা খুঁজে খুঁজে তার-পর দেখে কাঁধেই রয়েছে। আরেকজন, শোননি বুঝি, তামাক খাবে বলে অনেক রাত্রে এক প্রতিবেশীর বাড়ি টিকে ধরাতে গেছে। কিন্তু তারা তখন সব ঘুমিয়ে। অনেকক্ষণ ধরে দরজা ঠেলাঠেলি করায় একজন বেরিয়ে এসে জিগগেস করলে,—কি গো, এত রাত্রে কি মনে করে? তখন সেই লোক বললে,—আরে ভাই, জানো তো তামাকের নেশা আছে, তাই এই টিকেখানা ধরাব বলে এসেছি। দেশলাই আছে? তখন প্রতিবেশী বললে,—বাঃ, তুমি তো বেশ লোক। এত রাত্রে দোর ঠেলাঠেলি করে আমাদের ঘুম ভাঙালে। তোমার হাতেই তো লণ্ঠন।'

দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করল। 'আপনাকে আসতে হবে আমাদের উৎসবে।'

'সে ঈশ্বরের ইচ্ছা। তবে দেখছ তো আমার অবস্থা।' সংক্ষিপ্ত বেশবাসের দিকে ইঙ্গিত করলেন: 'কখন কী ভাবে তিনি রাখেন কিছু ঠিক নেই।'

'বেশ তো, ধুতি আর উড়ুনি পরে এস। জামা-টামা নাই পরলে।' ভদ্রতায় স্নিগ্ধ দেবেন্দ্রনাথ: 'তোমাকে এলোমেলো দেখে কেউ কিছু বললে আমার কষ্ট হবে।'

● মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও শ্রীরামকৃষ্ণ
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'তা পারবনা। আমি পারবনা বাবু হতে।'

মথুর আর দেবেন্দ্রনাথ হাসতে লাগল।

দেবেন্দ্রনাথ তখন আছেন গঙ্গার উপর নৌকায়, উত্তেজিত ঝড়ের মত তাঁর নিভৃতকক্ষে ঢুকে পড়ল নরেন। জিগগেস করল, 'আপনি দেখেছেন ঈশ্বরকে?'

'আমি?' অভিভূতের মত তাকালেন দেবেন্দ্রনাথ।

'দেখলে আপনিই তো দেখবেন। আপনি বর্তমান বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু।' প্রগাঢ়স্বরে বললে নরেন, 'আপনি মহর্ষি।'

'কিন্তু আমি দেখলে তোমার লাভ কি?' বললেন মহর্ষি। 'তোমাকে নিজে দেখতে হবে।'

'আমি কোথেকে দেখব?' বিশাল চোখে তাকিয়ে রইল নরেন।

'দেখবে, দেখবে—তোমার এমন যোগীচক্ষু, তুমি দেখবে না?' অভয় আশ্বাসে প্রসারিত হলেন মহর্ষি।

যোগীচক্ষু দিয়ে আমি কী করব? আমি চর্মচক্ষে দেখতে চাই ঈশ্বরকে। আর, এক্ষুনি—এক্ষুনি। দেরি করবার আমার সময় নেই। তোমরা কেউ যদি ঈশ্বরকে দেখে থাকো, আমাকে দেখিয়ে দাও। এক-জন পারলে কেন আরেকজন পারবে না?

পারো, কেউ পারো দেখাতে?

আমি পারি।

তুমি পারো, কে তুমি?



'দেখবে, দেখবে—তোমার এমন যোগীচক্ষু, তুমি দেখবে না?' বললেন মহর্ষি।

আমি কেউ না, কিছু না। আমি মুখখু গেঁয়ো পুজুরী বামুন। আমি দক্ষিণেশ্বরে থাকি। তুই আয় আমার কাছে। আমি কত দিন ধরে তোর জন্যে পথ চেয়ে বসে আছি। তোকে আমি দেখাব ঈশ্বর।



একটি কুকুর ছানা ও দুটি ছেলে

—বুদ্ধদেব বসু

কী ভালো লাগে সেই সব দিনের কথা ভাবতে, যখন জীবন ছিল সহজ ও সবুজ, ছিলো হালকা, পাখির মতো, পাখির পালকের মতো হালকা, ছিলো আস্তে-আস্তে বাতাসে-ভেসে-চলা শাদা-শাদা মেঘের মতো স্বাধীন। কী ভালো লাগে আজ, সেই ছেলেবেলার কথা ভাবতে।

গন্ধে ভরপুর ছিলো জগৎটা, ধুলোর গন্ধ, ফুলের গন্ধ, পানা-পড়া পুকুরের গন্ধ, পেনসিলকাটা গুঁড়োর গন্ধ, রোদে-রাখা লেপ তোশক বালিশের গন্ধ, আর মায়ের গায়ের গন্ধ এক মন্দিরের মতো। স্পর্শে ভরপুর ছিলো জগৎটা;—খেলার বল, ছুরির বাঁট, চায়ের প্যাকেটের সীসের পাত, বিস্কুটের টিনের কোঁকড়া কাগজ—কিছু ছিলো না, যা তার আপন ও গোপন স্পর্শ দিয়ে আমাকে খুশি ক'রে না-তুলতো। এমনকি মাসিকপত্রের রঙিন ছবিরও আলাদা একটি স্পর্শ ছিলো—আবার ভূগোলের বইয়ে রঙিন ম্যাপের স্পর্শ টি একটু অন্য রকম।

সেই ছেলেবেলায় আমি একজনকে ভালোবেসেছিলাম।

—একজনকে নয়, অনেককেই ভালোবেসেছিলাম। ছেলেবেলায় যাদের দেখেছি তাদের

মনে আছে সেদিন তর্ক করেছিলাম তার সঙ্গে।—'সব সময় ও-রকম "বড়োলোক-বড়োলোক" বোলো না তো!'

'কেন বলবো না?'

'ঐ কথাটা বিশ্রী লাগে আমার, জঘন্য লাগে।'

'কথাটা জঘন্য, কিন্তু ব্যাপারটা বেশ ভালো—না?'

'প্রথম কথা, তুমি যাকে "বড়োলোক" বলো আমি তা নই। দ্বিতীয় কথা, যদি তা হতামও, তা ছাড়া আমার আর কি পরিচয় নেই?'

'শুধু তুমি কেন, জিলা স্কুলের সব ছেলেই বড়োলোক। কারো বাবা মুন্সেফ, কারো বাবা ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট, আর কারো বা মেসোমশাই নামজাদা উকিল। সব ছেলেরই পকেটে পয়সা থাকে, তারা ইচ্ছেমতো ছোলাভাজা লজঞ্চুষ খায়, সপ্তাহে একদিন সিনেমায় যেতে হ'লেও তাদের ভাবতে হয় না।'

'কিন্তু তুমিও তো ঐ স্কুলেরই ছেলে!'

'আমি?' মাথা ঝেঁকে হেসে উঠলো বীরেন, হাসিটা কর্কশ শোনালো। 'আমার কথা আলাদা। আমার সঙ্গে অনেক তফাৎ তোমাদের।'

'আমি তো কিছু তফাৎ দেখি না।'

'সে তুমি ইচ্ছে ক'রে চোখ বুজে আছো ব'লে। এই তোমার কথাই ধরো না, বিনয়—তোমার অবশ্য বাবা নেই, কিন্তু বাবার টাকা আছে, আছে নিজেদের এই বাড়ি, তোমার মা-র এক ছেলে তুমি—কত সুখে তুমি আছো তুমি তা নিজেও জানো না। আর আমরা থাকি ভাড়া-বাড়িতে, দু-কামরার টিনের ঘরে বারো জন মানুষ—কিছু তফাৎ আছে বইকি।'

সে-মুহূর্তে আমার ইচ্ছে হ'লো হঠাৎ আমাদের বাড়িতে বাজ পড়ুক একদিন, মা-র হাতে যা টাকা আছে (যদি কিছু থাকে), কোনো অলৌকিক উপায়ে সব নষ্ট হ'য়ে যাক—আমাদের যেন একবেলা খেয়ে কুঁড়েঘরে ঘুমোতে হয়, বছরে দু-খানার বেশি কাপড় না জোটে—শুধু যেন ও-রকম সুরে কথা না বলে বীরেন, ও-রকম ক'রে আমার দিকে আর না তাকায়।

'কিন্তু কার কত টাকা আছে বা নেই সে-কথাটাই কি সবচেয়ে জরুরি? তার বুদ্ধি কিছু নয়? গুণ কিছু নয়? তাকে তোমার ভালো লাগে কি লাগে না সেটা কিছু নয়?'

'তুমি অন্য দিকটা বড়ো ক'রে দেখছো কেননা তোমার পক্ষে সেটাই সুবিধের।'

'সুবিধের মানে?'

'মানে—অন্যদের চাইতে সুখে আছো ব'লে মনে-মনে তোমার একটু অস্বস্তি আছে তো,

সেই অস্বস্তিকে চাপা দেবার উৎকৃষ্ট উপায় হ'লো নিজেকে এই কথা বোঝানো যে মানুষের টাকাটা কিছু নয়—বুদ্ধি সব, গুণপনাই সব। কিন্তু আসলে মানুষের মধ্যে দুটো জাত আছে: গরিব আর বড়োলোক, অসংখ্য ধাপ আছে অবশ্য তার, কিন্তু এই দুটো মাত্র দল অনবরত লড়াই করছে পরস্পারের সঙ্গে—চুরি, ডাকাতি, জোচ্চোরিতে দিনে-দিনে আরো বেশি ওস্তাদ হ'য়ে উঠছে বড়ো লোকেরা, এদিকে গরিবরাও পণ করেছে নিজেদের ন্যায্য পাওনা ফিরে পাবেই। ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—' আমি উৎসাহের ঝোঁকে ব'লে উঠলাম—'সকলেই তার ন্যায্য পাওনা ফিরে পাক, সকলেই সুখী হোক—কিন্তু কেউ যেন আর অন্যের সঙ্গে লড়াই না করে!'

অন্ধকারে বীরেন একবার তাকালো আমার দিকে, তারপর গম্ভীর গলায় বললো, 'আমি বাড়ি যাই।' আমি যথারীতি তাকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম, যেতে-যেতে আরো অনেক নতুন কথা হ'লো তার সঙ্গে।

এর পরে কয়েকটা সপ্তাহ—দু' মাস কিংবা আড়াই মাস সময়—সত্যি আমি অন্তরঙ্গ হলাম তার সঙ্গে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা চলে তার সঙ্গে আমার; ছোটো অক্ষরে ছাপানো চটি-চটি বই সে পড়তে দেয় আমাকে—আসামের চা-বাগানে, আফ্রিকার হীরের খনিতে, যবদ্বীপের রবারের ক্ষেতে—নানা দিকে মানুষের উপর অপমান আর অত্যাচারের কথা পড়তে-পড়তে আমার মাথার শির দপদপ করে, রাত্রে ঘুম হয় না। সত্যি—বীরেন কত বেশি জানে আমার চাইতে, কত বেশি ভেবেছে—আর এতদিন আমি কী ছেলেমানুষই ছিলাম। দু-জনে ব'সে-ব'সে (কি নদীর ধারে হাঁটতে-হাঁটতে) পৃথিবীর এক স্বর্ণযুগের কল্পনা করি, যখন কেউ কাউকে অপমান করবে না আর, কেউ কারো উপর অত্যাচার করবে না, যুদ্ধ থেমে যাবে, ভয়, হিংসা, ঘৃণা প্রভৃতি শব্দগুলো অভিধান থেকে লুপ্ত হ'য়ে যাবে। কিন্তু তার আগে—বীরেন আমাকে ফিশফিশ ক'রে বলে—তার আগে চাই বন্যা, চাই আগুন, চাই রক্তস্নান, ধ্বংস ক'রে দিতে হবে যা-কিছু পুরোনো আর পচা,—যা-কিছু কৃমির মতো কিলবিল করছে ঝকঝকে পোশাকের আড়ালে, আর সেই 'ধ্বংসযজ্ঞে'র জন্য (ঠিক 'ধ্বংসযজ্ঞ' কথাটাই সে ব্যবহার করেছিলো)—চাই সাহস, শক্তি, ঘৃণা আর গুপ্ত চক্রান্ত।

এ-সব কথা শুনে আমার যে একটু ভয় না করে তা নয়, কিন্তু সেই ভয় থেকেই আরো বেশি রোমাঞ্চ জাগে আমার মনে, বীরেনকে একজন বীর ব'লে মনে হ'তে থাকে আমার, তার কোনো কাজে লাগতে পারলেই আমি যেন সার্থক হলাম। ঐ কয়েকটা দিন—কয়েকটা সপ্তাহ—আমি গভীরতম অর্থে সুখে ছিলাম, যাকে ভালোবাসি তার মধ্যেই মগ্ন, সব প্রশ্ন যেন থেমে গেছে সেখানে, সব তর্কের অবসান হয়েছে। যেমন স্বপ্নের ঘোরে কোনো-কোনো মানুষ ছাদের কার্নিশের উপর দিয়ে হেঁটে চ'লে যায়, তেমনি আমিও কোথায় চলেছি তা জানি না।

● একটি কুকুরছানা ও দুটি মেয়ে
বুদ্ধদেব বসু

আর তারপরেই সেই ছোট্ট ঘটনাটি ঘটলো।

শীত প'ড়ে আসছে তখন, আমাদের অ্যান্‌ট্রেন্স পরীক্ষার আর খুব বেশি দেরি নেই। একদিন সন্ধের একটু আগে নদীর ধার থেকে বাড়ির দিকে ফিরছি দু-জনে। ডাকবাংলো ছাড়িয়ে যে রাস্তাটি শহরের দিকে ঘুরে গেছে তাতে লোক-চলাচল কম, মস্ত-মস্ত বাগানওলা খানকয়েক বাড়ি আছে শুধু, তাতে পাটের কলের সাহেবরা থাকে ;—অন্য একটা রাস্তা দিলে আরো কাছে হয়, কিন্তু নির্জনতার জন্য আমরা প্রায়ই এটাই বেছে নিতাম। সাহেবদের বাড়িগুলো যেখানে শেষ হয়েছে তার খানিকটা পরে বাবুবাজারের মোড় ; তার কাছাকাছি এসে হঠাৎ আমি থমকে দাঁড়ালাম।


আমি নিচু হ'য়ে ঝুঁকে পড়লাম রাস্তার উপর।

'কী হ'লো ? হোঁচট খেলে নাকি ?'

'না। কী-একটা এখানে প'ড়ে আছে দেখছি।'

'কী ?'

'একটা বাচ্চা কুকুর। দেখছো না ?'

'বাচ্চা কুকুর এই প্রথম দেখলে নাকি তুমি ?'

'না—আমি ভাবছি—ছাখো, কী সুন্দর !'

আমি নিচু হ'য়ে ঝুঁকে পড়লাম রাস্তার উপর। একেবারে ছোট্ট একটা কুকুর, সবেমাত্র জন্মেছে মনে হয়, দিন সাতেকের বেশি বয়স হবে না, এখনো চার পায়ে দাঁড়াতে পারে না ভালো ক'রে, তুলো-তুলো গায়ের রং, মুখটা ছুঁচোলো, ল্যাজটি দেহের পক্ষে একটু বেশি লম্বা। হঠাৎ দেখলে মস্ত একটা ইঁদুর ব'লে ভুল হয়। রাস্তার ধারের ঘাসের উপর দিয়ে ছোট্ট বেঁটে পা ফেলে-ফেলে একটু-একটু হাঁটছে বেচারা,

● একটি কুকুরছানা ও দুটি ছেলে
বুদ্ধদেব বসু

লম্বা ল্যাজটা অসহায়ভাবে প্রায় মাটি ছুঁয়ে আছে—একটু গিয়ে থেমে যাচ্ছে, উল্টে প'ড়ে যাচ্ছে, আবার একটুখানি গিয়ে হয় ফিরিয়ে নিচ্ছে নয়তো আর চলতে পারছে না। আমাকে থামতে দেখে চকচকে করুণ চোখ তুলে আমার দিকে তাকালো, নিশেনের মতো ল্যাজটি নাড়তে-নাড়তে কুঁইকুঁই আওয়াজ বের করলো গলা দিয়ে।

আমি ব'লে উঠলাম, 'কী সুন্দর !'

'সুন্দর-সুন্দর বলছো কেন বার বার ? আমি তো সুন্দর কিছু দেখছি না।'

'না, মানে—' একটু লজ্জিত হলাম আমি—'বেচারা বোধহয় পথ হারিয়েছে। বোধহয় শীত করছে ওর। কোনো বাড়ি থেকে পালায়নি তো ? কারো পোষা ব'লে মনে হচ্ছে না তোমার ?'

'পোষা না হাতি! স্ট্রীট-ডগ—চোদ্দ পুরুষের স্ট্রীট-ডগ। পথে-ঘাটে কত পাওয়া যায় ও-রকম! চলো!' ব'লে বীরেন আমার কনুই ধ'রে ঝাঁকানি দিলে।

কুকুর ছানাটি আবার আওয়াজ করলো, 'কুঁ—কুঁ—কুঁ।'

আমি বললাম, 'ওর বোধহয় খিদে পেয়েছে।'

'ওর খাবার ঠিক জুটে যাবে—শহরে আঁস্তাকুড়ের অভাব নেই।'

আমি একটু ভিতু গলায় বললাম, 'ওকে—ওকে ফেলে যাবো এখানে ?'

'ফেলে যাবে না তো কী ?' বীরেন হা হা ক'রে হেসে উঠলো। 'আর ফেলে যাওয়া না যাওয়ার কথাই বা ওঠে কিসে ? তুমি তো ঐ কুত্তার ছাকে আনোনি এখানে, ওর জন্যে কোনো-রকম দায়িত্বও নেই তোমার। কী, দাঁড়িয়ে আছো যে ? যাবে না ?'

ঐ ছোট্ট, অসহায়, নির্বোধ জীবটির দিকে আবার তাকালাম আমি। আবছা আলোতেও তার কালো আর করুণ চোখ আমার চোখে পড়লো। যেন দেহের সবটুকু শক্তি প্রয়োগ ক'রে ব্যাকুলভাবে ল্যাজ নাড়তে লাগলো সে, তারপর হঠাৎ সামনের পা দুটি উঁচু ক'রে আমার পায়ের কাছে আস্তে-আস্তে আঁচড়াতে শুরু ক'রে দিলে। আমি তক্ষুনি নিচু হ'য়ে তাকে কোলে তুলে নিলাম।

বীরেন চেঁচিয়ে উঠলো, 'করছো কী তুমি ?'

'ওকে নিয়ে যাই বাড়িতে।'

'বাড়ি নিয়ে যাবে ? ঐ নেড়ির বাচ্চাটাকে !' আবার হা-হা ক'রে হেসে উঠলো বীরেন। 'কী করবে নিয়ে গিয়ে ?'

'পুষবো।'

'পুষবে ? তা বেশ—তোমার বাড়ি, তোমার টাকা—আর আমি কী বলবো। কিন্তু পুষতে

● একটি কুকুরছানা ও দুটি ছেলে
বুদ্ধদেব বসু

হ'লে অন্তত একটা ভালো জাতের কুকুর-ছানা তো বেছে নিতে পারো। এই পাটের সাহেবরাই বেচে মাঝে-মাঝে, খোঁজে থাকলেই পাওয়া যায়।'

আমি কোনো জবাব দিলাম না কথার, নিঃশব্দে তার পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম। আমার চাদরের তলায় গরম একটা বলের মতো কুঁকড়ে আছে কুকুর-ছানাটি, তার নিশ্বাসের ওঠা-পড়া অনুভব করছি আমি, ছোট্ট হৃৎপিণ্ডটি দপদপ করছে আমার বুকের কাছে। ভারি ভালো লাগছিলো, কিন্তু বীরেনের কথা ভেবে খারাপও হ'য়ে যাচ্ছিলো মনটা: আমি তার সব কথাই মেনে নিয়েছি, আর সে কি আমার কিছুই মেনে নেবে না?

খানিক পরে আমি বললাম, 'বীরেন, তুমি কি রাগ করেছো আমার উপর?'

'না, রাগ করবো কেন?'

'বোঝো তো—' আমি জবাবদিহির সুরে বলতে লাগলাম—'ওখানে প'ড়ে থাকলে হয়তো গাড়ি চাপা প'ড়ে ম'রে যেতো বেচারা। কিংবা অন্ধকারে কেউ মাড়িয়ে দিয়েই ওকে মেরে ফেলতো। একেবারেই বাচ্চা, এখনো ভালো ক'রে হাঁটতেও শেখেনি।'

'ওরা অত সহজে চাপা পড়ে না, বিনয়। রাস্তায় জন্মায়, রাস্তাতেই বেঁচে থাকে—এমনি হাজার-হাজার রোজ জন্মাচ্ছে আর মরছে। তুমি দৈবাৎ এ-পথে এসেছিলে ব'লেই এটা প্রমাণ হয় না যে তোমাকে দিয়ে ওর দরকার ছিলো।'

'কিন্তু দৈবাৎ যখন এসেই পড়েছি, তখন পাশ কাটিয়ে চ'লে যাই কী ক'রে?'

বীরেন একটু অসহিষ্ণুভাবে জবাব দিলো, 'ও একটা বাবুগিরি তোমার—তা ছাড়া আর-কিছুই না। যে-দেশে মানুষের এত কষ্ট সে-দেশে কুকুর নিয়ে এত বাড়াবাড়ি কি ভালো? বললে ভালো শোনায় না—কিন্তু ঐ কুকুর-ছানা ম'রে গেলেই বা ক্ষতি ছিলো কী? মানুষের অনেক কাজ আছে এই সংসারে—যারা সত্যি কোনো কাজ করে এ-সব ছোটোখাটো ব্যাপার নিয়ে নষ্ট করার মতো তাদের সময় থাকে না।'

যেমন আগে অনেকবার হয়েছে, তেমনি এবারেও বীরেনের কাছে তর্কে আমি হেরে গেলাম। আবার বুঝলাম যে বীরেনের তুলনায় এখনো আমি অনেক কাঁচা, অনেক ছেলেমানুষ। কিন্তু আমার বুকের কাছে ঐ নিশ্বসিত পিণ্ডটি আমার সারা শরীরে সুখের তাপ ছড়িয়ে দিলে।

বাড়িতে পা দিয়েই ডাক দিলাম—'মা, ছাখো কী নিয়ে এসেছি।'

রাত ন-টা পর্যন্ত অখণ্ড উত্তেজনায় কাটলো ঐ কুকুর নিয়ে। দুধের মধ্যে গরম ভাত চটকে-চটকে মা ওকে খাইয়ে দিলেন; খাওয়ামাত্র এত ফুর্তি হ'লো যে তুরতুর ক'রে হাঁটতে লাগলো সারা ঘরে, দেয়ালে ছায়া দেখে দূরে দাঁড়িয়ে কেঁউ-কেঁউ ক'রে চেঁচিয়ে উঠলো, ফুর্তির চোটে নিজেই

চিৎপাত হ'য়ে উল্টে যেতে লাগলো বার-বার, আর তিন ঘণ্টার মধ্যে অন্তত বার চারেক ঘর নোংরা ক'রে দিয়ে আমাদের দিকে এমনভাবে তাকাতে লাগলো যেন খুব তারিফ করার মতো কিছু করেছে। আমি তক্ষুনি তার নাম দিলাম কুড়ুনি: কুড়ুনি, কুড়োনি, কুড়ুন—এই ব'লে বার-বার ডেকে ডেকে তার শিক্ষার প্রথম পর্ব শুরু ক'রে দিলাম—আর এমন বুদ্ধি ওর যে এক ঘণ্টা পরেই কুড়ুনি ব'লে ডাক দিলে ঠিক ছুটে চ'লে আসে। রাত্রে মা নিজের বিছানায় লেপের তলায় শোওয়ালেন ওকে, আর আমি ঘুমিয়ে পড়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কুড়ুনির কথাই ভাবলাম শুধু: আর-কিছুই মনে পড়লো না, বীরেনের কথাও না।

পরের দিন ঠিক নিয়মমতোই সব চললো। স্কুলে গেলাম, বিকেলে বীরেনের সঙ্গে বেড়ালাম, তাকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে দ্রুত হেঁটে বাড়ি ফিরে এলাম। কুড়ুনির কথা বীরেনও কিছু জিগেস করলে না, আমিও কিছু বললাম না। কিন্তু বাড়ি ফিরেই মেতে উঠলাম কুড়ুনিকে নিয়ে।

তার পরের দিন সকালবেলাতেই বীরেনের গলা শোনা গেলো—'বিনয়, বিনয়!'

সকালবেলায় সাধারণত সে আসে না; আমি ব্যস্ত হ'য়ে বেরিয়ে আসতে আসতে বারান্দাতেই তার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো।

'বিনয়, একটা খবর আছে, জরুরি খবর!' খুব উত্তেজিত মনে হ'লো তাকে, তার গলার আওয়াজে একটা অন্য রকম উৎসাহ শুনলাম।

'কী, কী ব্যাপার?'

'ছাখো—এই ছাখো!' ব'লে পকেট থেকে একটা হ্যাণ্ডবিল বের করলে বীরেন।

'কী ওটা?'

'আঃ—প'ড়েই ছাখো না!'

দেখলাম, একটি কুকুর-ছানা হারাবার বিজ্ঞাপন। একটি খাটি ফক্স-টেরিয়ারের বাচ্চা হারিয়ে গেছে, তার গায়ের রং ধূসর, নাক চোখা, ল্যাজ একটু বেশি লম্বা। কেউ যদি কুড়িয়ে পেয়ে থাকেন দয়া ক'রে তিন নম্বর জুট মিলস এস্টেটে এ. টি. জোন্স-এর কুঠিতে ফিরিয়ে দেবেন। পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দেয়া হবে।

আমি কাগজটা প'ড়ে নিঃশব্দে বীরেনের হাতে ফিরিয়ে দিলাম।

'তোমার কি মনে হয় যে পরশু আমরা যে-বাচ্চাটিকে কুড়িয়ে পেলাম, এই সেই?'

আমার মনে হ'লো আমি যেন আস্তে-আস্তে ডুবে যাচ্ছি। ক্ষীণস্বরে বললাম, 'সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।'

'তাহ'লে—তুমি এখন কী করবে?' এটুকু কথা বলতেই বীরেনের গলা কেঁপে গেলো।

● একটি কুকুরছানা ও দুটি ছেলে
বুদ্ধদেব বসু

'কী আবার করবো। ফিরিয়ে দেবো।'

'ফিরিয়ে দেবে? ভেবে দ্যাখো—খাঁটি কল-টেরিয়ার, দামি কুকুর।'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই ফিরিয়ে দেবো। এই একদিনেই আমাদের যে-রকম মায়া প'ড়ে গেছে ওর উপর—' বীরেনের মতো আমিও গৌরবে বহুবচন ব্যবহার করলাম—'জোন্স-সাহেবের সারা বাড়িতে কী যেন হুলুস্থুল হচ্ছে এতক্ষণ ধ'রে!'

'হ্যাঁ, তা-ই—ঠিক বলেছো! এই হ্যাণ্ডবিলে সারা শহর ছেয়ে দিয়েছে। আমার দৈবাৎ চোখে পড়লো একটা ল্যাম্পোস্টের গায়ে—তক্ষুনি ছিঁড়ে নিয়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছি।—তাহ'লে ফিরিয়েই দেবে?'

'যার জিনিশ তাকে ফিরিয়ে দেবো না? তুমি কী বলো?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই—সে-বিষয়ে আর কথা কী। তা—ঐ—ঐ পু-পুরস্কারের টাকা?'

'ছি! টাকা কেন নেবো?'

'নিয়ে কোনো সৎকর্মে দান করতে পারো।'

'আমার দাতা হবার কোনো ইচ্ছে নেই।'

হঠাৎ আমার হাত চেপে ধরলো বীরেন।—'বিনয়, আমার একটা কথা রাখবে? আমাকে দিয়ে দাও কুকুর-ছানা, আমি জোন্স-সাহেবকে ফিরিয়ে দিয়ে আসি। বলো, দেবে?' তার চোখ দুটো ছুরির মতো চকচক ক'রে উঠলো, আমার হাতের মধ্যে কেঁপে উঠলো তার হাত। কিন্তু আমি তার চোখের দিকে তাকাতেই সে চোখ নামিয়ে নিলে।

একটু চুপ ক'রে থেকে আমি বললাম, 'বেশ, তা-ই হবে। এ-বেলাটা থাক, স্কুলের পরে বিকেলে এসে নিয়ে যেয়ো।'

'ঠিক? ঠিক দেবে? কথা দিচ্ছো?'

'বললাম তো।'

সেদিন স্কুলে বীরেনকে দেখলাম না, বিকেলেও অনেকক্ষণ তার পাত্তা নেই। আসছে না কেন—হঠাৎ অসুখ করলো নাকি—তার বাড়িতে একটা খোঁজ নিলে কেমন হয়—এই সব ভাবতে-ভাবতেই তাকে দেখতে পেলাম। তখন সন্ধে হ'তে আর দেরি নেই; নিঃশব্দ ছায়ার মতো আস্তে গেট দিয়ে ঢুকলো সে। অন্তদিন তার গায়ে থাকে পুলওভার, আজ একটা ড্রাইভরের আলোয়ান জড়িয়েছে, হাতে ঝুলছে বেতের একটা বড়ো ঝুড়ি। আমার মন ভালো ছিলো না, বারান্দার সিঁড়িতে চুপচাপ ব'সে ছিলাম, একটু দূরে মা একটি মোড়ায় ব'সে—আর এই দু-জনের মধ্যে ছুটে-ছুটে খেলা করছে কুকুনি, মাঝে-মাঝে আমার পিঠে খাঁচড় দিচ্ছে—কিন্তু আমি তার দিকে বেশি তাকাচ্ছি না।

● একটি কুকুরছানা ও দুটি ছেলে
বুদ্ধদেব বসু

বীরেনকে দেখে আমি উঠে দাঁড়ালাম। 'আজ স্কুলে যাওনি, বীরেন?'

'না, যেতে পারিনি। একটা জরুরি কাজে অন্য জায়গায় যেতে হয়েছিলো। সেই জন্যেই আসতে দেরি হ'লো।' হঠাৎ যেন একটু হাসির আভাস দেখতে পেলাম ওর ঠোঁটে। পরমুহূর্তেই আবার বললে, 'তোমার খুব খারাপ লাগছে নিশ্চয়ই?'



নতুন কোনো খেলা ভেবে কুড়ুনি ঝাঁপিয়ে পড়লো ঝুড়ির মধ্যে।

'এক্ষুনি নিয়ে যাবে?'

'আর দেরি ক'রে লাভ কী। রাতও হ'য়ে এলো। তুমি কী বলো?'

'না, দেরি ক'রে লাভ নেই। এখনই নিয়ে যাও।'

'এই ছাখো—নতুন একটা ঝুড়িও কিনেছি, ওর কোনো কষ্ট হবে না—আলোয়ানে জড়িয়ে দিব্যি ঝুলিয়ে নিয়ে যাবো। আ-তু-তু—ডগি, পাপি, বাঃ, সুন্দর কুকুর! খাঁটি ফক্স-টেরিয়ার—এর ব্যাপারই আলাদা। এখনই কী রকম গলা হয়েছে—অ্যাঁ?' কুড়ুনিকে দু-হাতে তুলে গায়ে হাত বুলিয়ে-বুলিয়ে আদর করলো বীরেন, তারপর ঝুড়িটা এগিয়ে ধরলো ওর দিকে, নতুন কোনো খেলা ভেবে কুড়ুনি ঝাঁপিয়ে পড়লো তার মধ্যে। —'তাহ'লে চলি।' তক্ষুনি ঝুড়িটা তুলে নিয়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলো বীরেন। মা-র আর আমার একটি বিষণ্ণতম সন্ধ্যা কাটলো সেদিন।

পরের দিন স্কুলে টিফিনের সময় বীরেন আমাকে সবিস্তারে সব জানালে। কুড়ুনিকে খোল-সাহেবের কুঠিতে ফিরিয়ে দেয়নি সে, রায়পুরের জমিদার-বাড়িতে বেচে দিয়েছে। জমিদারবাবুর খুব কুকুরের শখ, তিনি দু-শো টাকা দাম দিয়েছেন—বা দিয়েছিলেন—হাতে-হাতে নগদ দু-শো টাকা। অবশ্য কাজটি সহজে হয়নি, সকালবেলা দু-ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে থেকে আট-দশজন দরোয়ান, চাকর, নায়েব, গোমস্তা, মোসাহেব প্রভৃতি পার হ'য়ে-হ'য়ে, তবে দেখা পেয়েছে রাজা-

● একটি কুকুরছানা ও দুটি ছেলে
বুদ্ধদেব বসু

বাবুর, এবং সেই মোলাকাতের পরেও নায়েব-মশাইকে অনেকক্ষণ তৈলমর্দন করতে হয়েছে। তারপর নায়েব-মশাই তাঁর নজর বাবদ পঁচিশ টাকা কেটে রাখলেন, চাকর দরোয়ানকে বকশিশ দিতে-দিতে আরো পাঁচ টাকা বেরিয়ে গেলো। নেট্ একশো সত্তর তার হাতে আছে—তার বাবার প্রায় ছ-মাসের মাইনে—কিন্তু এই টাকাটা বাবাকে দেবে না সে, একটা আধুলিও দেবে না, সংসার চালাতে বাবার যত কষ্টই হোক সেটা বাবার ভাবনা, বাবার দায়িত্ব, তার কিছু না। টাকাটা বেমালুম লুকিয়ে রাখবে সে—লুকিয়ে-লুকিয়ে ব্যবসা করবে এ দিয়ে—কী ব্যবসা, তাও সে ভেবে ফেলেছে। কিন্তু এই টাকায় আমারও কিছু অংশ আছে ব'লে মনে করে সে—'হাজার হোক আমরা দুজনেই কুকুর-ছানাটি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম, তাই তুমি যদি চাও, বিনয়, অর্ধেক টাকা এক্ষুনি তোমাকে দিয়ে দেবো—কোনো আপত্তি করবো না—আমি তো ইচ্ছে করলে পুরো ব্যাপারটা লুকোতে পারতাম তোমার কাছে—কিন্তু দেখছো তো, লুকোলাম না—অন্যকে যারা এক্সপ্লয়ট করে তাদের যেমন ঘৃণা করি আমি, তেমনি আমিও কাউকে এক্সপ্লয়ট করবো না কোনোদিন—এই আমার প্রতিজ্ঞা। তা, বিনয়—তুমি কিছু বলছো না?'

ব'লে বীরেন আমার মুখের দিকে তাকালো, কিন্তু আমি গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বের করতে পারলাম না, তার মুখের দিকে তাকাতেও পারলাম না—আস্তে-আস্তে চ'লে এলাম সেখান থেকে। কয়েক দিন পরেই অ্যানুএল পরীক্ষা হ'য়ে গেলো, পরীক্ষার পরে আমি অন্য স্কুলে ট্র্যান্সফার নিলাম, পরের বছর ম্যাট্রিক পাশ ক'রে কলকাতায় চ'লে এলাম কলেজে পড়তে। তার পরে বীরেনকে আর চোখে দেখিনি। ভাগ্যিস পৃথিবীটা বেশ বড়ো।

রাজানং প্রথমং বিন্দেৎ ততো ভার্যাং ততো ধনম্।
রাজন্যসতি লোকস্য কুতো ভার্যা কুতো ধনম্॥

মহাভারত—যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্ম

মণি ও মুক্তা

শরশয্যায় রাজনীতি সম্বন্ধে উপদেশ দিতে গিয়ে ভীষ্ম বলছেন, আগে রাজার আশ্রয়কে বেছে নিতে হয়, তারপর ভার্যা আর ধন। রাজরক্ষণ না থাকলে ভার্যা বা ধন কিছুই নিরাপদে থাকতে পারে না।



চিড়িয়াখানায় ঘর

—অন্নদাশঙ্কর রায়

পায়রা ছিল চড়ুই ছিল জুটল এবার শালিক
আমরা কেবল ভাড়া যোগাই ওরাই বাড়ির মালিক।
          হরি, হরি, ওরাই বাড়ির মালিক।
ওরা থাকে ঘুলঘুলিতে বেঁধে ওদের বাসা
ওপর থেকে ময়লা পড়ে এমন সর্বনাশা।
          হরি, এমন সর্বনাশা।
কেউ বা করে বকম বকম কেউ বা কিচিমিচি
হৈ চৈ করছে কারা করছে মিছিমিছি।
দিনের বেলার চেঁচামেচি রাত্রে কিছু কম
রাত দুপুরে শুনতে পাই ব-ক-ম ব-ক-ম।
কখন ওদের ফোটে ডিম কখন গজায় ডানা
ঘরের মেজেয় হঠাৎ দেখি নতুন পাখির ছানা।



উড়তে সবে শিখছে কিনা, ফড়ফড়ানি সার
কেমন করে ফিরে যাবে ঘুলঘুলিতে আর।
ওদিকে যে বেড়াল আছে চার চার শিকারী
আমার খাট আমার গদি ওরাই অধিকারী।
কেমন করে বাঁচাই ছানা এ বড় সমস্যা
দোর জানালা বন্ধ করে চালাই তপস্যা।
টেবিলের পর চেয়ার পাতি চেয়ারের পর মোড়া
মোড়ার ওপর খাড়া হতে কাঁপে চরণ জোড়া।
ঘুলঘুলিতে বাড়াই হাত পাখির কাছাকাছি
দেখি ওদের মায়ে ছায়ে কেমন নাচানাচি।



টলমলে সেই পিরামিডের চূড়ায় খাড়া আমি
পা হড়কে পড়ার ভয়ে সাধ্য নেই যে নামি।
আমি তো যাই বাঁচাতে, আমায় কে বাঁচায়?
বন্ধ দুয়ার, তাই তো আমার বন্ধু মেলা দায়।
টাল সামলে কোনো মতে বসি মোড়ার পরে
বাকীটুকুন শক্ত নয়, নামি চেয়ার ধরে।
ওদিকেতে হলো বেড়াল দিচ্ছে খালি হানা
চিড়িয়া তো গেল এখন কোথায় পাবে খানা।



সন্ত তুলসীদাস

(অপ্রকাশিত)

—অনুরূপা দেবী

—তুলসী ! ও তুলসী ! বাড়ি আছো ? সদর-বাড়ি থেকে হাঁক দেন পাড়ার পাঁচজন মাতব্বর। তুলসীর সাড়া নেই ! তুলসীর স্ত্রী রান্নাঘরে। রান্নাঘর থেকে তিনি শুনলেন তাঁদের ডাক !···

স্বামী সে-ডাকে সাড়া দেন না···ব্যাপার কি ? কোথাও গেলেন নাকি ? না, ঘরেই আছেন কোনো চিন্তায় বেহুঁশ হয়ে ?···

দেখতে হবে···দেখে স্বামীকে হুঁশ করিয়ে দেওয়া দরকার। উনুনগোড়া থেকে তিনি উঠে ফিরে দাঁড়ালেন···দরজার দিকে দু-পা এগুলেন।

—ওকি, কোথায় যাও ?

পিছনে রান্নাঘরের কোণ থেকে স্বামীকে হঠাৎ এ-কথা বলতে শুনে স্ত্রী থমকে দাঁড়ালেন ; হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি রান্নাঘরে এসে সেঁধুলে কখন ? আমি মোটেই টের পাইনি।

সে কথার জবাব না দিয়ে তুলসী শুধু বড় বড় চোখ মেলে স্ত্রীর পানে চেয়ে রইলেন, তাঁর দু'চোখের দৃষ্টিতে যেমন তৃপ্তি, তেমনি কাকুতি !

স্বামী কত ভালোবাসেন,…স্ত্রী তার কত পরিচয় পান নিত্য। স্ত্রীর কোনো সাধ স্বামী অপূর্ণ রাখেন না। স্ত্রী আবদার তোলেন, রাগ করেন…কোনো কিছুতে স্বামীর বিরাগ নেই, বিরক্তি নেই!

আরো পাঁচটা বাড়িতে ছোটবড় নানা ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর কত বিবাদ-বিরোধ হয় —কত কলহ-খিটিমিটি—এ সংসারে তার কিছুমাত্র না। কখনো না! স্বামী অভিমান করতে জানেন না, রাগ করতে জানেন না। পাড়ার পাঁচজনে বলে, সোনার সংসার।

স্ত্রী বললেন—সদরে ওঁরা এসে ডাকছেন, যাও। শুনে এসো।

তুলসী বললেন—আমার ভালো লাগে না। কারো সঙ্গে আমি কেমন মিশতে পারি না।

স্ত্রী বললেন—না, ছি, যাও, পাঁচজনের সমাজে বাস করছো, তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা চাই। রাখা উচিত।

তুলসী বললেন—কি হবে সম্পর্ক রেখে? পাঁচজনের পাঁচরকম মত, তাদের মনের সঙ্গে আমি যে মন মেলাতে পারি না।

দু'চোখের দৃষ্টিতে ভৎসনা করে স্ত্রী বললেন—না, আমি কোনো কথা শুনবো না। তোমাকে যেতেই হবে। শুনে এসো, ওঁরা কেন এসেছেন। লোকে নিন্দা করবে—বলবে, দিনরাত শুধু ঘরে বসে থাকে। এতে আমার কতখানি লজ্জা হয়, বলো দিকিনি…আমি যে পাঁচজনের কাছে মুখ দেখাতে পারি না! না যাও, সাড়া দাও, শুনে এসো, ওরা কি বলেন, কেন ডাকছেন।

একান্ত অনিচ্ছাতেও উঠে যেতে হলো তুলসীকে। ফিরে এলেন একটু পরেই—অত্যন্ত বিরক্তভাবে। কাল একটা সালিসি আছে গাঁয়ে। কোনো দলাদলির ভিতর থাকেন না বলে তুলসীকেই দুই পক্ষ সালিস মেনেছে।

মোড়লরা এসে সেই খবর দিয়ে গেলেন। তার কোনো আপত্তিই কানে তোলেননি। দশজনে যা চাইছে, তুলসীকে তা করতেই হবে।

স্ত্রী বললেন—ঠিক কথাই বলেছেন ওঁরা।

পরের দিন সালিসি করতে যেতেই হলো তুলসীকে।

গ্রহের ফের। তুলসীও বেরিয়েছেন, তাঁর শ্বশুরবাড়ি থেকে লোক এলো তক্ষুনি। খবর খারাপ। সেখানে স্ত্রীর ভাইয়ের খুব শক্ত অসুখ। ভাইকে যদি দেখতে চায়, তাহলে তুলসীর স্ত্রীকে এখনই যেতে হয়।

ভাইকে যদি দেখতে চায়! এ-কথার পর কি আর একদণ্ড অপেক্ষা করা চলে?

তিনি তখনই বেরিয়ে পড়লেন—স্বামী বাড়ি নেই—তাঁকে জানিয়ে, অনুমতি আনিয়ে যদি যেতে হয়, তাহলে দেরি হয়ে যাবে অনেকটা। ভাইয়ের যে রকম অবস্থা, তাতে দেরি করাও চলে না কিন্তু। অনেক ভেবে তুলসীর স্ত্রী তাই বেরিয়ে পড়লেন। চাকর-দাসীদের বলে গেলেন—স্বামী ঘরে এলে তাঁকে যেন সব বুঝিয়ে বলে তারা।

আর একটা চিন্তাও ছিল ব্রাহ্মণীর মনে—স্বামীকে জানিয়ে যেতে হলে যাওয়াই হবে না হয়তো। বিবাহের পর কয়েকটা বৎসর কেটে গিয়েছে। একটি দিনের জন্য স্বামী তাঁকে একা কোথাও যেতে দেন না। বাপের বাড়ি হোক, গঙ্গাস্নানে হোক, নিজে সব সময়ে সঙ্গে গিয়েছেন, এক-পলকের জন্যও স্ত্রীকে স্বামী চোখের আড় করতে চান না।

কিন্তু আজ? স্বামী গিয়েছেন গাঁয়ে পাঁচজনের কাজে—ফিরতে কত দেরি হবে, কে জানে! এমনও হতে পারে যে সালিসির কাজ আজ শেষ হলো না, কাল পর্যন্ত তার জের চলবে! এ অবস্থায় স্বামী তাঁর সঙ্গে যাবেন কেমন করে? এ-কথা শুনলে সঙ্গেই তিনি যাবেন, সালিসির কাজ ফেলে রেখে। তাহলে সে কি দারুণ লজ্জার ব্যাপার হবে, এই সব সাত-পাঁচ ভেবেই তুলসীর স্ত্রী একা চলে গেলেন তুলসীকে না বলেই।

ভাইয়ের খুব শক্ত অসুখ! যেতে যেতে তিনি ভগবানকে ডাকছেন—'হে ঠাকুর! গিয়ে যেন ভাইকে ভালো দেখতে পাই!'

এদিকে তুলসী—

তুলসীর মনটা একদম বিগড়ে রয়েছে। সকালে দু'টি অন্ন কোনোমতে গলা দিয়ে নামিয়ে তাঁকে এসে বসতে হয়েছে এই সালিসিতে। এতে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। এসব ঝামেলায় তিনি যেতে চান না। তবু গাঁয়ের লোক কেন যে তাঁকে টেনে নিয়ে আসে এর ভিতর, তিনি বুঝতে পারেন না। থেকে থেকে বাড়ির কথা মনে হয়। একটানা এতক্ষণ ব্রাহ্মণীকে ছেড়ে এর আগে তিনি কখনো থাকেননি। আজ এই সালিসির পাল্লায় পড়ে থাকতে হচ্ছে। 'দুর ছাই সালিসি'—হঠাৎ তিনি ফরাশ ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন, বললেন,—"বেলা গেল, আজ এই পর্যন্ত থাক। আমার ভয়ানক মাথা ধরেছে।"

কারও কাকুতি-মিনতি কানে তুললেন না তুলসী, ছুটে চলে এলেন ঘরে। দোর গোড়া থেকেই আকুল স্বরে ডাকলেন,—"ব্রাহ্মণী!"

জবাব নেই।



তুলসী শুধু বললেন—"তুমি—তুমি—চলে এলে!" [পৃষ্ঠা—৫০

এ কেমন ধারা? সারাদিন বাইরে কাটিয়ে তুলসী ঘরে এলেন, ডাকলেন, ব্রাহ্মণীর সাড়া নেই? বুকটা দুরুদুরু কেঁপে উঠলো। অসুখ করেনি তো তাঁর?

ছুটে শোবার ঘরে গেলেন তুলসী, তারপর রান্নাঘরে, ভাঁড়ারে, সর্বত্র—কোথাও স্ত্রীকে পেলেন না।

"রমাইয়ের মা! ও রমাইয়ের মা"—বুড়ী দাসীকে ডাকতে লাগলেন তুলসী। গলা দিয়ে স্বর যেন বেরুতে চায় না! দারুণ আতঙ্ক তাঁর মনে। কী জানি, রমাইয়ের মা এখনই এসে হয়ত কী ভয়ানক অমঙ্গলের কথাই বা তাঁকে শুনিয়ে দেয়! ব্রাহ্মণী বেঁচে আছেন তো? সাপে কামড়ে মেরে ফেললো না তো হঠাৎ?

কিংবা রাঁধতে গিয়ে কাপড়ে আগুন লেগে—? না হলে তিনি সাড়া পান না কেন?

রমাইয়ের মা জলের ঘটি গামছা নিয়ে এলো আস্তে আস্তে। জলচৌকির সামনে রাখতে রাখতে সে বললে—"মায়ের যেতে মোটেই ইচ্ছে ছিল না বাবা, কিন্তু ভাইয়ের অমন অসুখের কথা শুনলে কোন্ মেয়ে না গিয়ে পারে, বলো?"

যেতে ইচ্ছে ছিল না! কোথায় যেতে? রমাইয়ের মা কী যে ব'লে চলেছে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার কোনো অর্থ ই ঢুকলো না তুলসীর মাথায়!

তারপর যখন তা ঢুকলো—তিনি জানলেন সব—পড়ে রইলো ঘটিভরা জল আর পাট-করা গামছা; যেমন ছিলেন, তেমনি ছুটে বেরিয়ে গেলেন তুলসী। আগে কখনো পাল্কি ছাড়া তুলসী শ্বশুরবাড়ি যাননি। আজ পাল্কির কথা মনেও হলো না। সারা দিনের ঘামে ভেজা জামাটা তখনো গায়েই ছিল, নাগরাটা দোর-গোড়ায় খুলে রেখেছিলেন—দৌড়ে বেরুবার সময় সেটাকে ডিঙিয়ে বেরিয়ে গেলেন, সে জোড়া পায়ে গলিয়ে নেবার কথা মনেও হলো না তুলসীর!

রাত তখন গভীর।

রোগী একটু ভালো আছে দেখে বাড়ির বেশীর ভাগ লোক আজ একবার বিছানা পেতে শুয়ে পড়েছে। দু'একজন জেগে আছে রোগীর পাশে। তুলসীর স্ত্রীও আছেন।

নিঃঝুম স্তব্ধতা চারিদিকে। কেউ যেন লাফিয়ে নামলো পাঁচিল থেকে। হঠাৎ কী-একটা ভারি জিনিস পড়লো যেন উঠানে। ডাকাত না হয়ে যায় না।

তুলসীর স্ত্রীই চেঁচিয়ে ডাকলেন ঘুমন্ত লোকদের। "ডাকাত! ডাকাত! ওঠো সবাই!"

● সন্ত তুলসীদাস
অনুরূপা দেবী

উঠে সবাই দেখে—উঠোনে একটা মানুষ লম্বা হয়ে পড়ে আছে। লাফ দিয়ে নামতে গিয়ে চোট খেয়েছে বোধ হয়! উঠতে পারছে না তাই!

এই তো সুযোগ! এলোপাথাড়ি লাঠি পড়তে লাগলো তুলসীর পিঠে।



লোকেরা তিন হাত পিছিয়ে গেল।

আর্তনাদ ক'রে তুলসী পাশ ফিরলেন—তখন তাঁর মুখ দেখতে পেয়ে বাড়ির লোকেরা চমকে লাফিয়ে পিছিয়ে গেল তিন হাত! আর তুলসীর স্ত্রী?

সে-বেচারী হাহাকার ক'রে কেঁদে গিয়ে লুটিয়ে পড়লেন তুলসীর পায়ের উপরে!

জল! জল! পাখা!—চারিদিকে ভিড়!

তুলসীর স্ত্রী কেবল বলেন —"তোমরা সরে যাও! আমি ওঁকে সুস্থ ক'রে তুলছি!"

তুলসীর মুখে যখন কথা ফুটলো, ব্রাহ্মণীর দিকে তাকিয়ে তিনি শুধু বললেন—"তুমি—তুমি—চলে এলে!"

স্ত্রীর চোখে জল ঝরছে অঝোরধারে। কাঁদতে কাঁদতে স্ত্রী বললেন—আমি তোমার স্ত্রী—সামান্য মানুষ—এই তুচ্ছ মানুষকে এত ভালোবাসো! ভগবানকে যদি তুমি এমনি ভালোবাসতে পারতে, তাহলে কত আনন্দ, কত তৃপ্তি তুমি পেতে! তোমার জীবন ধন্য হ'তো, সার্থক হ'তো।

তুলসীর যেন চমক ভাঙলো। জ্ঞানহীনা স্ত্রীলোকের মুখে এ কি ইঙ্গিত! এ কি নির্দেশ! ভগবান! আনন্দ! তৃপ্তি! জীবন ধন্য হবে, সার্থক হবে!

● সন্ত তুলসীদাস
অনুরূপা দেবী

* * *

সারা বাড়ি আবার নিঝুম নিস্তব্ধ হয়ে এলো। জামাইয়ের যোগ্য বিছানায় শুয়ে আছেন তুলসী—সেবা করতে করতে স্ত্রী তাঁর পায়ের তলাতেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। তুলসী এইবার উঠলেন।

তোমার জীবন ধন্য হবে, সার্থক হবে!—স্ত্রীর এই কথা কটি তাঁর কানে বাজে সারাক্ষণ! ঘর-সংসার, বিষয়-বিভব—স্ত্রী······তুলসীর মনে হয়, সব তুচ্ছ! নিঃশব্দে তিনি দরজা খুলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন।

বেরিয়ে তিনি যান নিজের গাঁয়ের দিকে নয়—পৃথিবীর বিশাল বুকে··· লক্ষ্যহীন গতি··· নিরুদ্দেশের পথে!

ভালোবাসতে তিনি জানেন—এই ভালোবাসার মোড় ঘুরিয়ে দিতে হবে··· কিন্তু কে দেবে ঘুরিয়ে? ভগবানই দেবেন! স্ত্রীর মুখ দিয়ে ভগবানই এই ইঙ্গিত দিয়েছেন!



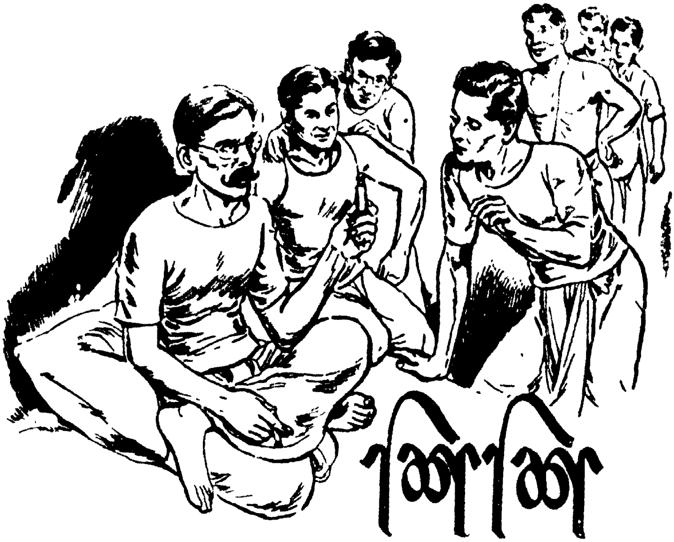
তুলসীদাস—যাঁর রামায়ণ ভক্তিভরে পাঠ করে কোটি-কোটি নরনারী।

কত তীর্থ! কত গুরু! কত বৎসরের নিভৃত সাধনা! ভালোবাসা মোড় ঘুরে দুর্বার স্রোতে ভগবানের প্রেমসমুদ্রে মিশলো গিয়ে। ভারতের গগনে উদয় হলেন সন্ত তুলসীদাস—যাঁর দোঁহার ছন্দে ছন্দে অমৃত ঝরে পড়ে—যাঁর রামায়ণ আজও ভক্তি-ভরে পাঠ করে ভারতের কোটি-কোটি নরনারী।

চন্দ্র সূর্য বন্দনা

—পরশুরাম

চাঁদের জয় হোক,
পরোপকারী ভদ্রলোক,
আদ্ধ খেঁদো ফালি সব অবস্থাতে
যথাসাধ্য লণ্ঠনের কাজ করে রাতে ॥
সূর্যিকে নমস্কার,
এই দেবতাটি মহা ফাঁকিদার,
চৌপর রাত দেখা নেই মোটে,
দিনের বেলা রূপ দেখাতে ওঠে,
যখন তার কিছু দরকার নেই—
আরে, আলো তো ভরদিন থাকেই ॥
তবে লোকে সূর্যিকে কেন চায়?
কবিরা বলেন বটে—জ্যোৎস্নায়
ফুল ফোটে, মলয় বয়, হেন হয় তেন হয়,
কিন্তু কচি ছেলের কাঁথা কি চন্দ্রালোকে শুখয়?
আমসত্ত্ব, ঘুঁটে আর কাঁচা চম্ম,
এসব শুখোনো কি চাঁদের কম্ম?
আজ্ঞে না। আমার জানা আছে যদ্দুর,
এর জন্য চাই কাঠফাটা রোদ্দুর।
সূর্য সৃষ্টির কারণই মশাই এই;
বিধাতার রাজ্যে অনর্থক কিছু নেই ॥
অতএব গাও চাঁদের জয়, সূর্যির জয়,
দুটোর একটাও ফেলবার নয় ॥



ঝিঝি

প্রেমেন্দ্র মিত্র

আপনাকে চুরি!—প্রায় কেলেঙ্কারিই করে ফেলেছিলাম বেফাঁস কথাটার সঙ্গে কাশি চাপতে গিয়ে বিষম খেয়ে। তাড়াতাড়ি সামলে বললাম,—এত বড় সাহস!

ঘনাদা ঠাণ্ডা হয়ে রহস্যময় হাসি হেসে বললেন,—সাহস নয় দায়!

ব্যাপারটা যে বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের তা বলাই বাহুল্য, কিন্তু গোড়া থেকে শুরু করাই নিশ্চয় উচিত।

ফন্দিটা মাথায় এসেছিল গৌরের। আমরা সবাই সেটার যোগান দিয়েছি মাত্র।

কিন্তু শেষে নিজেদের ফাঁদে নিজেরাই পড়ে জব্দ হ'ব কে জানত!

সব দিক বেঁধে-ছেঁদেই ব্যবস্থা করেছিলাম কিন্তু কোথায় যে ছিদ্রটুকু ছিল আগে ধরতে পারিনি।

শিবু দামী কার্ডটা ছাপিয়ে এনেছে, তার আগে ঘনাদার দিবানিদ্রার সুযোগে আমরা ক'জনে মিলে চিঠিটার ভাষার খসড়া করেছি অনেক মাথা ঘামিয়ে।

সুবিধে ছিল এই যে সে সময়ে বিজ্ঞান কংগ্রেস হচ্ছে কলকাতাতেই। দেশ-বিদেশের বড় বড় সব বিজ্ঞানের রথী মহারথীরা এসেছেন এই শহরে। যেন তাঁদেরই একজনের নাম দিয়ে কার্ডটা ছাপান। ভূগোলবিশারদ নামকরা মানচিত্রকার মঁসিয়ে সুস্তেল যেন পৃথিবীর অজ্ঞাত দুর্গমতম স্থানের অদ্বিতীয় আবিষ্কারক ও পর্যটক ঘনশ্যাম দাস এই কলকাতা শহরেই সশরীরে উপস্থিত এই আশাতীত খবর পেয়ে আহ্লাদে গদগদ হয়ে তাঁকে বিজ্ঞান কংগ্রেসের এক বিশেষ ভূগোল-বৈঠকে উপস্থিত দেশ-বিদেশের সুধীমণ্ডলীকে তাঁর ভাষণ শুনিয়ে কৃতার্থ করবার জন্যে বিনীত অনুরোধ জানিয়েছেন। কবে ও কখন তিনি স্বয়ং গাড়ি নিয়ে ঘনশ্যাম দাসকে নিতে আসবেন তাও এ অনুরোধের চিঠিতে জানানো আছে।

আগে থাকতে মহলা দিয়ে যেমন যেমন ঠিক করে রাখা গিয়েছিল ঠিক সেইমতই প্রথম অভিনয় সবাই করেছি। বসবার ঘরের মার্কামারা আরাম-কেদারায় ঘনাদা এসে গা এলিয়ে বসবামাত্র শিশির যথারীতি তার সিগারেটের টিন সামনে খুলে ধরেছে। আমি লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরিয়ে দিয়েছি সসম্ভ্রমে। ঘনাদা প্রথম টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে শিশিরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করেছেন,—কত হ'ল?

বেশী নয়, এই চার হাজার দু'শ' একুশ মাত্র!—শিশির জানিয়েছে সংকুচিতভাবে।

একুশ কেন হবে, উনিশ না?—ঘনাদার ভ্রূ কুঞ্চিত হতে না হতে শিশির তাড়াতাড়ি পকেট থেকে নোটবই বার করে খুলে দেখে লজ্জায় জিভ্ কেটেছে।—হ্যাঁ হ্যাঁ উনিশ-ই তো!

ঘনাদা সন্তুষ্ট হয়ে আর একটি টান দিয়ে চোখ দু'টি প্রায় নিমীলিত করার পরই আমি আনন্দে যেন কথাটা চাপতে না পেরে বলেছি,—আমরা কিন্তু সবাই শুনতে যাচ্ছি সেদিন ঘনাদা!

সবাই শুনতে যাচ্ছ!—ঘনাদা চোখ খুলে তাকিয়েছেন।—কি শুনতে?

বাঃ আপনার বক্তৃতা!—আমি যেন ঘনাদার বিস্মৃতিতে অবাক হয়েছি।

ঘনাদা বাক্যস্ফূর্ত করার আগেই শিশির সোৎসাহে বলে উঠেছে,—একেবারে ভোরবেলা থেকে 'কিউ' দিতে হবে কিন্তু। নইলে জায়গা মিলবে না।

ভোরবেলা থেকে কি!—শিবু শিশিরকে ধমকেছে,—আগের রাত্তির থেকে বল্! মোহন-বাগান ইস্টবেঙ্গলের শীল্ড্ ফাইন্যাল হার মেনে যাবে দেখিস্। সায়েন্স কংগ্রেসে একটা হাজাহাজামা না হয়ে যায় না!

ঘন ঘন সিগারেট টানা আর চোখ-মুখের ভাব দেখেই ঘনাদার অবস্থাটা বুঝতে

● শিশি
প্রেমেন্দ্র মিত্র

পারা গেছে তখন। নেহাত মানের দায়েই সোজাসুজি রহস্যটা সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারছেন না।

শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে আর পারেননি। যথাসম্ভব গম্ভীর হয়ে নিজের চাল বজায় রেখে একটু ঘুরিয়ে বলেছেন,—সায়েন্স কংগ্রেসে আমি বক্তৃতা দিচ্ছি, তোমরা জানলে কোথা থেকে ?

কোথা থেকে জানলাম !—আমরা সমস্বরে নিজেদের বিস্ময় প্রকাশ করেছি।

শিবু বিশদ ব্যাখ্যার ভার নিয়েছে,—শহরে কে না জানে ! তবে মঁসিয়ে সুস্তেল নিজে সব আয়োজন করেছেন আর নিজেই যে তিনি আসছেন আপনাকে নিয়ে যেতে এটা অবশ্য সবাই জানে না।

ঘনাদার মুখে আশানুরূপ আশঙ্কার ছায়া দেখে আমরা উৎসাহিত হয়ে উঠেছি।

ঘনাদা অস্বস্তিটা বিরক্তির ছলে প্রকাশ করেছেন,—ওঃ! মঁসিয়ে সুস্তেল বলে তো আমার গুরুঠাকুর নয়! তিনি এসে ধরলেই আমায় যেতে হবে! সায়েন্স কংগ্রেসে বক্তৃতা দেবার জন্যে আমি হেদিয়ে মরছি না কি ?

কি যে বলেন ঘনাদা !—শিশির সমস্ত সায়েন্স কংগ্রেসের হয়ে যেন ঘনাদার রাগ ভাঙাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে,—আপনি হেদিয়ে মরবেন কি, হেদিয়ে মরছে তো তারা! এ যে কত বড় সৌভাগ্য তা কি তারা জানে না। নইলে মঁসিয়ে সুস্তেল নিজে বাড়ি বয়ে এসে আপনাকে নিমন্ত্রণের চিঠি দিয়ে যান !

নিমন্ত্রণের চিঠি! কি চিঠি ?—ঘনাদা সত্যিই আকাশ থেকে পড়েছেন।

আমরাও একেবারে যেন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছি,—সে কি! নিমন্ত্রণের চিঠি আপনি দেখেননি ? আপনি তখন বিকেলে লেক-এ বেড়াতে গেছেন। মঁসিয়ে সুস্তেল কত খোঁজ করে এসে কতক্ষণ বসে রইলেন, তারপর আমাদের কাছে চিঠিটা দিয়ে দেখা না হওয়ার জন্যে কত দুঃখু করে গেলেন। বার বার করে বলে গেলেন যে আপনাকে নিতে তিনি নিজেই পরশু মানে শনিবার বিকেল চারটেতে আসছেন! সে চিঠি—সে চিঠি, হ্যাঁ গৌরই তো চিঠিটা রাখলে আপনাকে দেবার জন্যে !

আমরা যেন রেগে আগুন হয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এসে গৌরের নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু করেছি তারপর। গৌরও শশব্যস্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বিরক্তির ভান করেছে,—কি ব্যাপার কি! হঠাৎ এত চেঁচামেচি কিসের !

চেঁচামেচি কিসের !—আমরা গৌরকে গালাগাল দিতে আর বাকি রাখিনি—আহাম্মক, অকর্মার ধাড়ি কোথাকার! কলকাতা শহরের মুখে চুন কালি দিয়ে সায়েন্স কংগ্রেসকে তুমি ডোবাতে বসেছ! মঁসিয়ে সুস্তেলের সে চিঠি তুমি ঘনাদাকে দাওনি !

● শিশি

প্রেমেন্দ্র মিত্র

গৌর লজ্জায় যেন মাটিতে মিশিয়ে গিয়ে হাতে হাতে ধরা পড়া চোরের মত মুখ কাঁচু-মাচু করে ঘর থেকে কার্ডটি এনে ভয়ে ভয়ে ঘনাদার হাতে দিয়ে বলেছে—মাপ করবেন ঘনাদা। একেবারে মনে ছিল না।

তাচ্ছিল্যভরে কার্ডটা ধরলেও ঘনাদার চোখ দেখে বোঝা গেছে কি মনোযোগ দিয়ে কার্ডটা তিনি পড়েছেন।

কার্ডে কোন খুঁত যে নেই তা আমাদের জানা, ঘনাদাও নিশ্চয় ধরতে পারেননি।

ভেতরে যাই হোক বাইরে ঠাট বজায় রেখে একটু অবজ্ঞার সুরে বলেছেন—সুস্তেল! দাঁড়াও দাঁড়াও, কোন্ সুস্তেল ঠিক মনে পড়ছে না!

বাঃ—মঁসিয়ে সুস্তেলকে মনে পড়ছে না!—শিশির ঘনাদার স্মৃতিশক্তিকে একটু উস্কে দেবার চেষ্টা করেছে—সেই বিখ্যাত কার্টোগ্রাফার, মানে মানচিত্রের ব্যাপারে দুনিয়ায় যাঁর জুড়ি নেই বললেই হয়।

হুঁঃ—সংক্ষিপ্ত একটি ধ্বনিতে যা বোঝাবার বুঝিয়ে ঘনাদা ঘর থেকে উঠে গেছেন।

তারপর শনিবার দিন সকাল থেকেই আমরা সজাগ। আধা নয়, সে শনিবার কিসের যেন একটা পুরো ছুটি ছিল। দুপুরের খাওয়া দাওয়া পর্যন্ত কিছু যে হবে না তা জানতাম। কারণ ছুটির দিন বলে সকালে বাজারটা একটু ভালোরকম করা হয়েছে। মাছের থলের বড় বড় গলদা চিংড়িগুলো ঘনাদাকে কায়দা করে দেখিয়ে রাখতে ভুলিনি।

বেলা একটা নাগাদ ভূরিভোজ শেষ হবার পরই আমাদের সজাগ থাকার সময়।

এবারের সজাগ থাকা একটু অবশ্য আলাদা ধরনের। ঘনাদা পাছে পালিয়ে যান সেই ভয়ে পাহারা দেওয়া নয়, তিনি কোন্ ফাঁকে কি ভাবে মেস থেকে সরে পড়েন, নিজেরা গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে তাই দেখে মজা করা.

দুপুরের খাওয়ার সময়ই জমি তৈরি করে রাখা হয়েছে। ভরপেট খেয়ে আমাদের সকলেরই যেন ঘুমে চোখের পাতা জুড়ে আসছে। ছুটির দিন বলে সেদিন আর তাই খেলাধুলো আড্ডা নয়, যে যার বিছানায় পড়ে ঘুম—এই কথাটাই জানিয়ে রেখেছি।

কিন্তু বিছানায় কতক্ষণ মটকা মেরে শুয়ে থাকা যায়! একটার পর দুটো বাজল। দুটোর পর তিনটে। ঘনাদা এখনো করছেন কি! ঘরের দরজা জানলা বন্ধ। কান খাড়া করে আছি ঘনাদার পায়ের শব্দের জন্যে। পাল্লা করে জানলার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে তেতালা থেকে নামবার সিঁড়িটার ওপর চোখও রাখছি, কিন্তু ঘনাদার কোন সাড়াশব্দই নেই।

● শিশি

প্রেমেন্দ্র মিত্র

তিনটের পর চারটে বাজল। ঘনাদা কি সত্যিই ছাদ ডিঙিয়ে পালালেন! কিন্তু সেদিকেও তো আমাদের রামভুজকে পাহারায় রেখেছি, ঘনাদার সে রকম কোন চেষ্টা দেখলেই নিচে থেকে 'রামা হো' বলে গান ধরবে। তাহলে? ঘনাদা কি সত্যিই অন্তর্ধানমন্ত্র গোছের কিছু জানেন না কি!

ঘনাদার ঘরের দিকেই একবার খোঁজ করে আসব কিনা ভাবছি এমন সময়ে সশব্দে তাঁর ঘরের দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। তারপর তেতলার সিঁড়ির ওপর থেকে তাঁর পাড়া-কাঁপানো ডাক—কই হে! সব গেলে কোথায়! দিনের বেলা আর কত ঘুমোবে!

এ ওর মুখের দিকে তাকালাম ফ্যাল ফ্যাল করে। শেষে ঘনাদাই আমাদের খুঁজছেন নিজে থেকে!

ঘনাদার ডাক না শুনে উপায় কি! গুটি গুটি একে একে ভিজে বেড়ালের মত তাঁর তেতলার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

শিবু ওরই মধ্যে একটু নিজেদের মুখরক্ষার চেষ্টা করে বললে,—আপনি এখনো তৈরী হননি ঘনাদা! চারটের সময়ে না আপনাকে নিয়ে যাবার কথা!

নিজের আধময়লা ফতুয়া আর ধুতিটার দিকে একবার চেয়ে বিছানার মাঝখানিতে উঠে বসে ঘনাদা অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে বললেন,—আর কি তৈরী হব! কেন এই সাজে যাওয়া যাবে না?

বাধ্য হয়ে এ বিদ্রূপও হজম করতে হল। শিবু আর একবার স্বাকা সেজে মান বাঁচাবার চেষ্টা করলে,—মঁসিয়ে সুব্রেল-এর না আসাটা কিন্তু আশ্চর্য!

ঘনাদা একটু হাসলেন এবার। অবজ্ঞাভরে বললেন,—সুব্রেল যে আসবে না আমি জানতাম!

আপনি জানতেন,—বেশ সন্ত্রস্ত হয়েই আমরা ঘনাদার দিকে তাকালাম। কিন্তু যা ভয় করছিলাম ঘনাদা সেদিক দিয়ে গেলেন না। শিশিরের দিকে তর্জনী ও মধ্যম আঙুল ফাঁক করে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে অনুকম্পার সুরে বললেন,—হ্যাঁ জানতাম। আমি ছিলাম না জেনেই সেদিন এসেছিল, নইলে আমার সামনে এসে দাঁড়াবার ওর সাহস নেই।

পরম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সাগ্রহে এবার উস্কানি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—কেন বলুন তো? অমন পৃথিবীজোড়া নাম, অতবড় কার্টোগ্রাফার।

হুঁঃ, কার্টোগ্রাফার! ঘনাদা নাসিকাধ্বনি করলেন।

শিশির তৈরী হয়েই এসেছিল। ততক্ষণে ঘনাদার আঙুলের ফাঁকে যথারীতি সিগারেট বসিয়ে দিয়ে দেশলাইয়ের কাঠি জেলে ফেলেছে।

● শিশি
প্রেমেন্দ্র মিত্র

ঘনাদা প্রথম টানটি দিয়ে খানিক চুপ করে থেকে ধোঁয়া ছাড়লেন। আমরা চাতকের মত তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে। ঘনাদার শ্রীমুখ থেকে কি শুধু ধোঁয়াই বেরুবে?

ধৈর্য ধরতে না পেরে শিবু একটু ঝাঁকুনি দেবার চেষ্টা করলে,—সত্যি কার্টোগ্রাফার নয় বুঝি? জাল?

জাল হবে কেন!—ঘনাদা মৃদু ধমক দিলেন,—আসল কার্টোগ্রাফারই বটে। কিন্তু তাতে হয়েছে কি? নাম-ই গালভরা, আসলে জরিপদারের জেঠা ছাড়া তো কিছু নয়। বনজঙ্গল পাহাড়-পর্বতেরই খবর রাখে। জানে কি 'সোহম্ অ্যাবিস্যাল প্লেন' কোথায় আর কতখানি, মেপেছে কখনো 'মুইর' কি 'প্লেটো সি-মাউন্ট' কত উঁচু?

অভিভূতের মত বললাম,—মঙ্গলগ্রহের ভূগোলে আছে বুঝি? নামও তো কখনো শুনিনি!

ঘনাদা অনুকম্পার হাসি হাসলেন,—তোমাদের ওই সুস্তেলই কি জানত! ডোবার পুঁটি হয়ে গেছল সমুদ্রের তিমির সঙ্গে ফচকেমি করতে! ওই একটি শিশিতেই বাছাধন কুপোকাত।

তক্তপোশের ওপর থেকেই হাত বাড়িয়ে পেছনের শেলফ থেকে যে শিশিটা তুলে ঘনাদা আমাদের এবার দেখালেন তাতে আমরা-ও থ'।

ওই শিশি! ওটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধের না?

শিবুর অসাবধান মুখ এক মুহূর্তের জন্যে ফস্‌কে গিয়ে প্রায় ঘাটে এসে ভরাডুবি হয়েছিল আর কি!

হোমিওপ্যাথিক!—ঘনাদা প্রায় ফেটে পড়ছিলেন, শিবুই তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললে,—মানে প্রায় সেইরকম দেখতে কিনা। বোকা লোকেরা তফাত ধরতেই পারবে না।

ঘনাদা ফণা নামালেন, একটু অবজ্ঞাভরে হেসে বললেন,—তোমাদের ওই সুস্তেলও পারেনি। সাত সাগর খুঁজে নারবরো দ্বীপে আমায় চুরি করতে আসবার সময় এ অন্ততঃ জানত না, যে এই শিশির মধ্যে তাদের পরমায়ু লুকোন থাকবে!

আপনাকে চুরি!—হাসি চাপতে গিয়ে বিষম খেয়ে প্রায় যাই আর কি! অতিকষ্টে সেটা সামলে ও কেলেঙ্কারি বাঁচিয়ে বললাম,—এত বড় সাহস!

সাহস নয় দায়!—ঘনাদার মুখে রহস্যময় হাসি দেখা গেল। আমাদের মুখগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে তিনি শুরু করলেন,—নারবরো দ্বীপের নাম নিশ্চয় শোননি, গ্যালাপ্যাগোসের নামই হয়ত জানো না। দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পশ্চিমে ইকোয়েডর থেকে প্রায় ছ'শো পঞ্চাশ মাইল দূরের এই ক'টি ছোট-বড় আগ্নেয়দ্বীপের জটলায় এক'শ চব্বিশ বছর আগে সেকালের একটি পালতোলা জাহাজ টহল না দিতে গেলে বিজ্ঞানের এ যুগের সবচেয়ে একটা দামী

● শিশি
প্রেমেন্দ্র মিত্র

মতবাদের জন্মই হ'ত কিনা সন্দেহ। সে পালতোলা জাহাজের নাম এচ. এস. এম. বীগল্, সে জাহাজের বৈজ্ঞানিকের নাম চার্লস ডারউইন, আর সে মতবাদ হ'ল বিবর্তনবাদ।

গ্যালাপ্যাগোস দ্বীপগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় হ'ল অ্যালবেমার্ল বা ইসাবেলা। দেখতে খানিকটা ইংরিজী জে হরফের মত। সেই ইসাবেলার মাথার বাঁ দিকে একটি বড় ফুটকি হ'ল নারবরো দ্বীপ, ফার্নানডিনা-ও বলে কেউ কেউ। পৃথিবীর একমাত্র সামুদ্রিক গিরগিটির জাত সি-ইগুয়ানা-র ভালো করে পরিচয় নিতে সেই দ্বীপে তখন কিছুদিনের জন্যে ডেরা বেঁধেছি। পেরুর লিমা থেকে একটি ছোট স্টিমার আমাকে আর আমার এক অনুচর নিমারাকে সেখানে নামিয়ে দিয়ে গেছে। মাসখানেক বাদে আবার সেই স্টিমারই আমাদের নিয়ে যাবে।

আমার অনুচরটি ইকোয়েডরের আদিবাসীর জাত। এমনিতে কাজকর্মে চৌকশ কিন্তু একেবারে ভীতুর শেষ। একে এই জনমানবহীন পাথুরে দ্বীপ তার ওপর চারদিকের বালির চড়ায় বিদঘুটে চেহারার ইগুয়ানারা গিজগিজ করছে সারাক্ষণ। দু'দিন যেতেই নিমারাব ভয়ে প্রায় নাড়ি-ছাড়ার অবস্থা। সে ধর্মে খ্রীষ্টান। তার ধারণা কোনো অজানা পাপের শাস্তিতে বেঁচে থাকতেই সে নরকে পৌছে গেছে।

আমি যত তাকে বোঝাই যে দেখতে ভয়ংকর হলে কি হয় এ দ্বীপের ওই সব প্রাণী একেবারে নিরীহ. মানুষকে পর্যন্ত তারা ভয় করতে শেখেনি, আর লড়াইএর পায়তাড়া কষলেও নিজেদের মধ্যেও রক্তারক্তি মারামারি কখনো করে না, কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। রাত্রে সে ভালো করে ঘুমোয় না পর্যন্ত। তার বিশ্বাস চোখের দু'পাতা এক করলেই সাক্ষাৎ শয়তানের ওসব দুত চুপিচুপি হানা দিয়ে তাঁবু সুদ্ধ আমাদের চিবিয়ে শেষ করে দেবে।

নিমারার অবস্থা দেখে বেশ একটু ভাবনাতেই পড়ে গেলাম। খাওয়া নেই ঘুম নেই, লোকটা শেষ পর্যন্ত পাগলই হয়ে যাবে নাকি! সঙ্গে যে কুদে ওয়্যারলেস ট্র্যান্সমিটারটি ছিল তাই দিয়ে লিমাতে যে দিন স্টিমারটা তাড়াতাড়ি পাঠাবার জন্যে খবর দিয়েছি সেই রাত্রেই নিমারা একেবারে ক্ষেপে গেছে মনে হ'ল।

সারাদিনের ঘোরাফেরার পর ক্লান্ত শরীরে সবে তখন খাওয়াদাওয়া সেরে একটু ঘুমিয়েছি হঠাৎ নিমারা হুড়মুড় করে তাঁবুর দড়িদড়া প্রায় ছিঁড়ে কাঁপতে কাঁপতে আমার একেবারে গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

বাঁচান, হুজুর বাঁচান!

ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে প্রথমটা তো তাকে একটি চড় কষাতেই যাচ্ছিলাম। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে জিজ্ঞাসা করলাম রেগে—কি হয়েছে কি!

● শিশি

প্রেমেন্দ্র মিত্র

এবার শয়তান নিজেই এসেছে হুজুর। আর রক্ষে নেই!

রক্ষে যদি নেই জানিস তো আমার ঘুম ভাঙালি কেন হতভাগা!—বিছানা থেকে উঠে পড়ে বললাম,—কই কোথায় তোর শয়তান দেখাবি চল।

নিমারা সহজে কি যেতে চায়। শয়তানকে একবার সে দেখে এসেছে, আর একবার সামনে গেলেই তার দফা রফা এ বিষয়ে তার কোন সন্দেহ নেই।



...এবার শয়তান নিজেই এসেছে হুজুর।

কোনরকমে টানা-হেঁচড়া করে তাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে তার ভীত ইশারায় যা দেখলাম তাতে আমারও চক্ষুস্থির।

নারবরো দ্বীপের মাঝখানে মরা আগ্নেয়গিরির প্রায় চূড়ার কাছে আমাদের তাঁবু খাটান হয়েছে।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। চারদিকের সমুদ্রে যেন গাঢ় নীল কালি গোলা। সেই গাঢ় নীলকৃষ্ণ সমুদ্রের জলে নারবরো আর ইসাবেলা দ্বীপের মাঝখানের সংকীর্ণ প্রণালীতে বিরাট কি একটা জলজন্তু ভাসছে দেখতে পেলাম। সেটাকে সবচেয়ে বড় জাতের নীল তিমি বা সিবাল্ড'স্ ররকোয়াল ভাবতে পারতাম, কিন্তু নীল তিমিও তো ছেষট্টি সাতষট্টি হাতের বেশী লম্বায় কখনো হয় না। তা ছাড়া নীল তিমির গা থেকে থেকে-থেকে এরকম আলো ঠিকরে বেরোয় বলে তো কখনো শুনিনি। গ্যা লা প্যা গো সে র সবই অদ্ভুত। অতল সমুদ্রের কোনো অজানা বিরাট বিভীষিকাই আমার দেখবার সৌভাগ্য হল নাকি?

● লিপি
প্রেমেন্দ্র মিত্র

দেখতে দেখতে বিরাট জলজন্তুটা সমুদ্রে ডুবে গেল। নিমারা তখন আর দাঁড়াতে না পেরে বসে পড়ে দু'হাতে মুখ ঢেকেছে।

তাকে ধমক দিয়ে বললাম,—অত ভয়ের কি আছে। তোমার শয়তান তো সমুদ্র থেকে ডাঙায় ওঠেনি। তাছাড়া নিজেই সে ভয়ে ডুব মেরেছে চেয়ে দেখো।

চোখ না খুলেই নিমারা বললে,—না হুজুর, ও শুধু শয়তানের ছল। এখন ডুব দিয়েছে কিন্তু দেখবেন ঠিক আবার অন্য মূর্তিতে এসে হাজির হবে।

নিমারার কথাই এক দিক দিয়ে অক্ষরে অক্ষরে তার পরদিন ফলল বলা যায়।

রাত্রে-দেখা সেই অজানা বিশাল জলচরের কথা মাথায় থাকলেও, রোজকার মত সকালে বেরিয়ে ক্যামেরায় ক'টি অদ্ভুত প্রাণী ও দৃশ্যের ছবি তখন তুলেছি। নারবরো দ্বীপে হিংস্র প্রাণী একেবারে নেই বলা ঠিক নয়। একধরনের সাপই এই অহিংসার রাজ্যের কলঙ্ক। একটা ফণিমনসা জাতের অদ্ভুত গাছের ঝোপে সেই সাপের একটি বড় গিরগিটি ধরে খাওয়ার ছবি তন্ময় হয়ে তুলছি, এমন সময় পিঠে একটা খোঁচা খেয়ে চমকে উঠলাম।

নিমারার অবস্থা কাহিল। তাকে তাঁবুতেই রেখে এসেছি শুইয়ে। সুতরাং হঠাৎ একেবারে ক্ষেপে গেলেও সে এমন চুপি চুপি এসে আমার পিঠে নিশ্চয় খোঁচা দেবে না। তাহলে এই জনমানবহীন দ্বীপে কে এসে আমার পিছনে দাঁড়িয়ে খোঁচা দিয়েছে!

বলতে এতক্ষণ লাগলেও পলকের মধ্যে এসব ভাবনা বিদ্যুতের মত মাথার মধ্যে খেলে গেল। তারপর পেছন ফিরতে যাচ্ছি পিঠে আরো জোরে একটা খোঁচার সঙ্গে ভারি গম্ভীর গলায় শাসানি শুনতে পেলাম—ফেরবার চেষ্টা কোরো না, যেমন আছ সেইভাবে এগিয়ে চলো। তোমার পিঠে দোনলা বন্দুক ঠেকানো তা বোধ হয় বুঝেছ।

শুধু ওইটুকুই নয় আরো অনেক কিছুই তখন বুঝে ফেলেছি। কথাগুলো ফরাসীতে বলা হলেও তাতে একটু বাঁকা টান। আলজিরিয়া কি মরক্কো-তে যারা কয়েক পুরুষ কাটিয়েছে সেই ফরাসীরা যেভাবে কথা বলে সেই রকম কতকটা। আশ্চর্যের বিষয়, এই গলার আওয়াজ আর এই কথার টান কেমন যেন আমার চেনা বলেই মনে হ'ল। কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব?

কয়েক পা হুকুমমত এগিয়ে গিয়েই হঠাৎ হেসে উঠে ফিরে দাঁড়ালাম। খবরদার হাঁকের সঙ্গে সঙ্গে একটি বন্দুক আর একটি রিভলভার আমার দিকে উঁচিয়ে উঠল।

রিভলভার যার হাতে, তালগাছের মত লম্বা রোগা পাকানো যুড়োটে চেহারার সে লোকটিকে

● শিশি
প্রেমেন্দ্র মিত্র

কখনো দেখিনি, কিন্তু দোনলা বন্দুক আমার পিঠে ঠেকিয়ে যে হুকুম করেছিল শুধু গলা শুনেই তার পরিচয় ঠিকই অনুমান করেছিলাম, দেখলাম—সে তোমাদের এই সুস্তেল।

গৌর হঠাৎ একটা হেঁচকি-ই যেন তুলল মনে হ'ল।

ঘনাদা কথা থামিয়ে সন্দিগ্ধভাবে তার দিকে চাইতেই আমরা বলে উঠলাম—জল খেয়ে নে না একটু।

জল খাব কি!—গৌরই খেঁকিয়ে উঠল আমাদের—ঘনাদার দিকে দু' দুটো বন্দুক উচানো না? তা বন্দুক আর রিভলভার তারা ছুড়ল তো?



...একটি বন্দুক ও একটি রিভলভার আমার দিকে উঁচিয়ে উঠলো। [পৃষ্ঠা ৬১

না।—ঘনাদার মুখে রহস্যময় হাসি।

গুলি ছিল না বুঝি? না, খেলার বন্দুক?—শিশিরের বোকার মত প্রশ্ন।

খেলার বন্দুক নয়, গুলিও ছিল।—ঘনাদার মুখ আবার গম্ভীর হ'ল।

তবে?—আমরা সবাই বেকুব।

ঘনাদা আবার হাসলেন,—গুলি ছুড়বে কি করে? সেই কথাই হাসতে হাসতে তাদের বললাম। বললাম,—কই ছোড়ো গুলি! দেখি। একটু চুপ করে থেকে তাদের হতভম্ব মুখগুলো একটু উপভোগ করে আবার বললাম,—ভড়কিতে আর লাভ কি! সারা দুনিয়া চুঁড়ে এই অখদ্দে দ্বীপে আমায় গুলি করে মারবার জন্যে হানা যে দাওনি তা বুঝেছি। এখন মতলবটা কি খোলাখুলি-ই বলো।

খোলাখুলি-ই বলছি।—বুড়োটে লম্বা লোকটিই বজ্রগম্ভীর স্বরে ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে এবার কথা বললেন,—আমাদের সঙ্গে আপনাকে যেতে হবে।

কোথায়? কেন?

● পিপি
প্রেমেন্দ্র মিত্র

জানতে পাবেন না।—বুড়োর মুখ নয় যেন লোহার মুখোশ।

তাহলে কি করে যাই বলুন। ভাঙা ইংরিজির বদলে যদি নিজের ভাষায় কথা বলতেন তবু আপনার জাতটা দেশটা কি বুঝতে পারতাম। সুস্তেলের তো ওসব বালাই নেই। টিউনিশিয়ার জন্ম, জার্মানীতে শিক্ষা। যুদ্ধের পর রুশেরা কিছুদিন আটকে রেখেছিল বলত। তারপর ইংলণ্ডের হয়ে অজানা জায়গার মানচিত্র আঁকার ছুতোয় আফ্রিকায় আর বলিভিয়ায় ইকোয়েডরে কিছুদিন ঘোরাঘুরি করে হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ বলে সবাই জানে। আপনাদের মত দুই অজানা অঘাটার মানুষের সঙ্গে কিছু না জেনে যেতে কি মন চায়।

এত কথা যে সুযোগের জন্যে বলছিলাম তা এবার মিলে গেল। সুস্তেল আমার টিটকিরিতে এতক্ষণ রাগে ফুলছিল। আমার কথা শেষ হতেই হুকার দিয়ে উঠল,—তবু তোকে যেতেই হবে ইটকে দাদর। ভালোয় ভালোয় না যাস তোর মত পুঁচকে ফড়িংকে দু' আঙুলে টিপে নিয়ে যাবো!

তা চেহারার দিক দিয়ে সুস্তেল সে দর্প করতে পারে। সুস্তেলকে তো দেখেছ? মাংসের একটা পাহাড়, কিংকং তার কাছে কোন ছার!

কিন্তু আমরা যে রোগা চিমসে দেখলাম!—এমন একটা সুবিধে ছাড়তে না পেরে শিবু ফস করে বলে ফেললে।

সে তাহলে ভুগে ভুগে হয়েছে। তিন মাইল সমুদ্রের তলায় তিন দুকুনে ছ'হপ্তা ডুবে থাকা তো চারটিখানি কথা নয়। সেই থেকেই ওর অসুখ!—অম্লান বদনে শিবুর খোঁচা এবার অগ্রাহ্য করে আমাদের সত্যিকার হাঁ করে দিয়ে ঘনাদা আবার শুরু করলেন,—তখন সে একটা দৈত্য-বিশেষ। কিন্তু গর্জনের সঙ্গে আচমকা আমার একটি হাইকিক্-এ হাতের বন্দুকটা ছিটকে পড়তেই প্রথমটা একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। তারপর মনে হ'ল বুনো ক্ষ্যাপা একটা হাতীই ছুটে আসছে আমার দিকে। ডিগবাজি খেয়ে হাত পাঁচেক দূরে ছিটকে পড়েও তার রোখ কি যায়! গা ঝেড়ে ঝুড়ে উঠে, আগুনের ভাঁটার মত দু'চোখ দিয়ে আমায় যেন ভস্ম করতে এবার সন্তর্পণে দু' হাত বাড়িয়ে এগুতে লাগল। ধোবি-পাটে তাকে রাম-পটকান দেবার জন্যে তৈরী হচ্ছি এমন সময় ঘাড়ে পিঁপড়ের কামড়ের মত কি একটা জ্বালা পেয়ে ফিরে দেখি সেই পাকানো লম্বা বুড়ো শয়তানের মত আমার পিছনে হাতে কি একটা নিয়ে দাঁড়িয়ে।

তারপরে আর জ্ঞান নেই।

জ্ঞান যখন হ'ল তখন প্রথমটা স্বপ্ন দেখছি কিনা বুঝতে পারলাম না। এ কোথায় এলাম! ছোট্ট একটা জানলা-দরজাহীন কোটর বললেই হয়। ছাদটা এত নিচু যে বিছানার ওপর উঠে

● শিশি
প্রেমেন্দ্র মিত্র



বললেই যেন মাথায় ঠেকে যাবে। নারবরো দ্বীপ বিষুবরেখার ওপরে বলে সেখানে ছিল বেশ গরম আর এখানে বিশ্রী ঠাণ্ডা। তাছাড়া বাতাসেও কেমন একটা ওষুধ ওষুধ গন্ধ। স্থির হয়ে ব্যাপারটা ভেবে নিচ্ছি এমন সময় খুট্ করে একটা আওয়াজ হয়ে সামনের দেওয়ালেরই খানিকটা যেন সরে গেল। এক গাল হাসি নিয়ে পাহাড়ের মত শরীরটা কোনরকমে সেই গা-দরজার ফাঁক দিয়ে গলিয়ে সুরেন আমার বিছানারই এক ধারে এসে বসে পড়ে বলল,—যাক্ ঘুম তাহলে ভাঙল এত দিনে!

এতদিনে! মনে যা হ'ল মুখে তা প্রকাশ করলাম না। বরং তাচ্ছিল্যের সুরে একটু হেসে বললাম,—ভাঙল নয়, তোমরা ভাঙালে বলো! তা, কতদিন ওষুধপত্র দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখলে?

তা মন্দ কি! প্যাসিফিক্-এ শুয়েছ আর অ্যাটলান্টিকে জাগলে। এখন আইসল্যাণ্ড ছাড়িয়ে চলেছি।

হুঁ—একটু চুপ করে থেকে বললাম,—কিন্তু এ নিউক্লিয়ার সাবমেরিনটি কোথায় পেলে? 'অ্যাটমিক্ ডুব' তো শুধু মার্কিন মুলুকেরই আছে জানতাম।

'অ্যাটমিক ডুব্!'—সুরেন সত্যিই চমকে উঠল,—কে বললে তোমায়!

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে জেনেছি বোধহয়, যেমন সাত সমুদ্র খুঁজে আমায় কি জন্যে চুরি করে এনেছ তাও জানতে পেরেছি।

সুরেন প্রথম অবাক হওয়ার ধাক্কাটা খানিকটা সামলে বললে,—কি জন্যে এনেছি বলো দেখি?

—যে জন্যে এনেছ অ্যাটলান্টিকের তলা দিয়ে লুকিয়ে যাবার সে একটি মাত্র রাস্তার খোঁজ জিজ্ঞাসা করলে তো আমি এমনিই বলে দিতে পারতাম। তার জন্যে ছুঁচ ফুটিয়ে অজ্ঞান করে চুরি করে আনবার দরকার ছিল না।

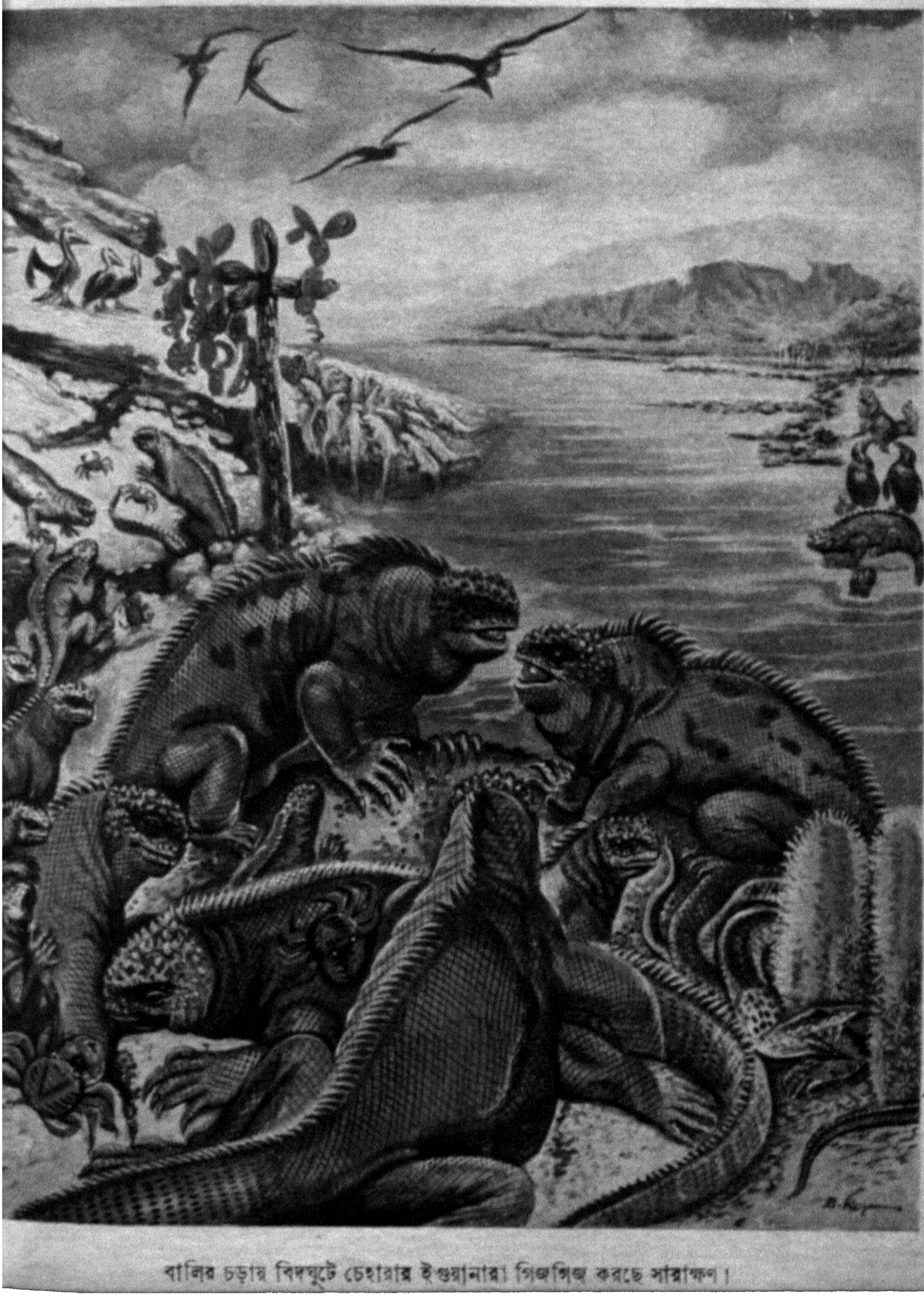
—দরকার ছিল।—বলে সুরেন একটু হাসল।—আন্দাজ তুমি অনেকটা করেছ, সবটা পারনি। অ্যাটলান্টিকের তলায় রিজ্ টু ভ্যালির খাদের খবর তোমার চেয়ে ভালো কেউ জানে না এটা ঠিক, কিন্তু সে খাদ ছকে দেওয়ার চেয়ে বড় কাজ তোমায় দিয়ে করাতে হবে।

ঘনাদা থামলেন। শিবুর কাশিটা মাঝে মাঝে এমন বেয়াড়া হয়ে ওঠে!

ফাঁক পেয়ে আর ঘনাদার মেজাজ পাছে বিগড়ে যায় এই ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—রিজ্ টু ভ্যালিটা কি ব্যাপার ঘনাদা?

● শিশি

প্রেমেন্দ্র মিত্র



বালির চড়ায় বিদঘুটে চেহারার ইগুয়ানারা গিজগিজ করছে সারাক্ষণ।

ঘনাদা খুশী হয়ে বললেন,—পৃথিবীর ওপরকার নয় অ্যাটলান্টিক সমুদ্রের তলার এ একটা আঁকাবাঁকা দুই পাহাড়ের মাঝখানকার লম্বা গিরিখাত, আইসল্যাণ্ডের তলা থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার মাথা ছাড়িয়ে চলে গেছে। এক ধারে মিড্‌অ্যাটল্যান্টিক রিজ্‌ আর এক ধারে রিফ্‌ট পাহাড়। এ রাস্তায় কোন সাবমেরিন চুপিসারে গেলে আমেরিকা কি ইউরোপ হদিসও পাবে না। সুস্তেলের কথায় জানলাম শুধু এই ডোবা গিরিখাত চেনানো নয়, অ্যাটলান্টিকের ক'টি ডুবো পাহাড়ের হদিসও আমায় দিয়ে তারা পেতে চায়। ডাঙার পাহাড়-পর্বতের তুলনায় এ সব ডুবো পাহাড় যে পেট্রোল থেকে শুরু করে দামী সব ধাতুর কুবেরের ভাণ্ডার এ খবর তারা জানে।

সমস্ত কথা শুনে একটু হেসে বললাম,—আমায় যদি এতই দরকার তাহলে এ সাবমেরিনটা কাদের আমায় বলা উচিত নয় কি?

অস্বস্তিভরে এদিক ওদিক চেয়ে সুস্তেল যেন একটু ভয়ে ভয়েই বললে,—বলতে মানা আছে।

মানা আছে!—তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে তীব্রস্বরে বললাম,—তাহলে দুনিয়ার ওয়াকিব মহলে যে কানাঘুষা চলেছে তা মিথ্যা নয়! আমেরিকা ও রাশিয়া ছাড়া আর একটি গোপন তৃতীয় শক্তি কে বা কারা সত্যিই গড়ে তুলছে! আমেরিকা কি রাশিয়া যার যে ভুল বা দোষই থাক তারা মানুষের সত্যি কল্যাণ চায়, কিন্তু এই তৃতীয় শক্তির সে সব কোন দুর্বলতা নেই। আর যাই হোক, তোমার গায়ে ফরাসী রক্ত তো কিছু আছে, কি বলে শুধু পয়সার লোভে তুমি এদের কাছে নিজেকে বেচে দিয়েছ? নিজের দেশ বলে কিছু না মানো, মানুষ জাতের ওপরও কি তোমার মমতা নেই?

সুস্তেল কিরকম যেন বিহ্বল হয়ে পড়ল। দু'বার ঢোঁক গিলে বললে,—দেখো দাস, আমার চেহারাটা প্রকাণ্ড হলেও ভেতরে ভেতরে সত্যি আমি দুর্বল। মনের জোর এত কম যে অন্যায় বুঝেও হঠাৎ প্রলোভনের কাছে হার মেনে বসি। বিশ্বাস করো যা আমি করেছি তার জন্যে আমার আফসোসের সীমা নেই। আমি পুরস্কারের লোভে তোমার খবর দিয়ে ওভাবে ধরবার ব্যবস্থা না করলে ওরা তোমার খোঁজও পেত না। কিন্তু এখন উপায় কি?

সুস্তেলের কথাগুলো যে আন্তরিক তা তার মুখ দেখেই বুঝলাম। তাকে এ কথার উত্তরে যা বলতে যাচ্ছিলাম তা কিন্তু আর বলা হ'ল না। সেই শয়তানের মত বুড়ো তখন দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। কামরার ভেতর ঢুকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমায় একবার লক্ষ্য করে সে ভাঙা ইংরিজীতে সুস্তেলকে-ই বললে,—যা বোঝাবার বুঝিয়ে দিয়েছ তো?

হ্যাঁ, এই দিচ্ছি!—বুড়ো হঠাৎ এসে পড়ায় সুস্তেল একটু যেন ভড়কে গেছে।

আচ্ছা, বুঝিয়ে কমিটিরুমে এসো। এখানে বেয়াড়াপনার শাস্তি যে কি তাও জানাতে ভুলো না। —বলে আমায় একটু সম্ভাষণ পর্যন্ত না জানিয়ে বুড়ো চলে গেল।

● শিশি

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বুড়ো যেতেই আগ্রহভরে বললাম,—উপায় কি তুমি জিজ্ঞাসা করছিলে?

সুস্তেন সভয়ে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চাপা গলায় বললে,—সাবধান! বেফাঁস আর কিছু বোলো না। এ ঘরে লুকোনো মাইক আছে। তোমার ঘুমের সময় বন্ধ ছিল এখুনি চালু হবে।

তার কথা শেষ হতে না হতে প্রায় অস্পষ্ট খুট্ করে একটা আওয়াজে বুঝলাম মাইক সজাগ।

কি এখন করা যায়! সুস্তেনকে গোটাকতক কথা এখুনি না বললে নয়।

তাকে চোখের ইশারা করে ধীরে ধীরে বললাম—তিন, একশ বাইশ, সাতাত্তর।

সে খানিক হতভম্ব হয়ে থেকে হঠাৎ উৎসাহভরে বললে,—ছয়!

বললাম,—তেইশ, চারশ পাঁচ, এগারো।

সুস্তেন তৎক্ষণাৎ উঠে ওই কামরারই একটি টেবিলের ওপর থেকে কাগজ পেন্সিল নিয়ে এল।

ব্যাপারটা কি হ'ল?—আমরা হাঁ করে ঘনাদার দিকে তাকালাম।

কি আর, সাংকেতিক কথা!—ঘনাদা একটু হাসলেন।

সাংকেতিক কথা তো বুঝলাম!—গৌর বললে,—কিন্তু ও তো শব্দ নয় সংখ্যা। আর আপনি বলতেই সুস্তেন বুঝল কি করে?

লোগোগ্র্যাফি জানলেই বুঝবে!—ঘনাদা অনুকম্পাভরে আমাদের দিকে চেয়ে বললেন,—লোগোগ্র্যাফিতে দু' হাজার পর্যন্ত সংখ্যা দিয়ে মোটামুটি সব কিছুই বলা যায়। সকলের অবশ্য অত মুখস্থ থাকে না। সঙ্গে লোগোগ্র্যাফির আলাদা অভিধান রাখতে হয়।

এর পরে আর ট্যাঁ ফোঁ করবার কিছু নেই, তবু চোখ কপালে তুলে বললাম,—আপনার বুঝি সব মুখস্থ?

ঘনাদার মুখে স্বর্গীয় হাসি দেখা দিতেই শিবু জিজ্ঞাসা করলে,—ওই সব হিজিবিজি অঙ্ক যে বলাবলি করলেন তার মানে কি?

মানে?—ঘনাদা বুঝিয়ে দিলেন,—মানে প্রথমে জিজ্ঞাসা করলাম,—তুমি লোগোগ্র্যাফি জানো? সুস্তেন তাতে জানালে, হাঁ। তখন তাকে খাতা পেন্সিল আনতে বললাম।

একটু থেমে আমাদের মুখের চেহারাগুলো দেখে নিয়ে ঘনাদা আবার শুরু করলেন,—খাতা পেন্সিল আনবার পর কাগজে লিখে সব কথাবার্তা সেরে ফেললাম। চুক্তি হয়ে গেল যে দুশমনদের চোখে ধুলো দেবার ফন্দিতে সুস্তেন আমার সহায় হবে গোপনে। কিন্তু সুস্তেনের সব সাধু সংকল্প শেষ পর্যন্ত তার মনের দুর্বলতায় ভণ্ডুল হয়ে গেল। তার এবং সাবমেরিনের সকলের প্রাণ বাঁচানোর কৃতজ্ঞতাটুকু পর্যন্ত সে দেখাল না। লোগোগ্র্যাফিতে তার কাছে জেনে নিয়েছিলাম যে নারবরো দ্বীপ থেকে আমায় অজ্ঞান করে আনবার সময় নিমারাকে সঙ্গে না নিলেও আমার ক'টি

● শিশি
প্রেমেন্দ্র মিত্র

দরকারী বাক্স ব্যাগ সাবমেরিনে তুলে নিয়েছিল। আইসল্যাণ্ড ছাড়িয়ে রিক্‌টু ড্যানির খাদে সাবমেরিন ঢোকবার পর সেই ব্যাগ আর বাক্স না থাকলে এ গল্প আর এখানে বসে করতে হত না। সেইখানেই সাবমেরিনটির কবর হয়ে যেত!

কেন? অ্যাটমিক সাবমেরিন না?—মুখ থেকে বেরিয়ে গেল আপনা থেকে।

হ্যাঁ, অ্যাটমিক সাবমেরিনও বেগড়ায়। একসঙ্গে তখন ওপরে ভাসিয়ে তোলার আর হাওয়া শোধনের কল গেছে খারাপ হয়ে। সে সব যন্ত্র মেরামত করতে যতক্ষণ লাগবে তার আগেই কার্বন ডায়োক্সাইডের গ্যাসে আমাদের কারুর আর জ্ঞান থাকবে না! স্ভেন্সনের মুখ তো ছাইএর মত ফ্যাকাশে। সেই শয়তান বুড়ো পর্যন্ত কেমন একটু দিশাহারা।

আমার ব্যাগ থেকে ওই শিশি তখন বার করলাম।

ওই শিশি—এক সঙ্গে সবাই বলে উঠলাম! ওই শিশিতে সাবমেরিন ভাসল?

সাবমেরিন ভাসবে কেন?—ঘনাদা অধৈর্যের সঙ্গে বললেন, হাওয়ার সমস্যা মিটল।

ওই শিশিতে?—আমরা আবার হাঁ।

—হ্যাঁ ওই শিশিতে। ও শিশিতে কি ছিল জানো? ক্লোরেলা নামে একরকম আনুবীক্ষণিক ফাঙ্গাস্—যাকে ছত্রাক বা ছাতা বলে। সিকি আউন্স জলে প্রায় চার কোটি ক্লোরেলা থাকে। কার্বন ডায়োক্সাইড থেকে তাড়াতাড়ি অক্সিজেন ছেঁকে বার করতে তার জুড়ি নেই। শিশি থেকে নানান পাত্রে সেই ক্লোরেলার কৌটা জলে ফেলে সমস্ত সাবমেরিনের নানা জায়গায় রাখবার ব্যবস্থা করলাম।

সময়মত যন্ত্রপাতি মেরামত হ'ল। তারপর প্রায় একমাস ধরে সমুদ্রের তলায় সমস্ত রিক্‌টু গিরিখাদ আর মরক্কোর পশ্চিমের মাদিরা অ্যাবিস্যাল প্লেন থেকে প্লেটো আর অ্যাটলান্টিস সি-মাউন্ট হয়ে সার্গাসো সমুদ্রের উত্তরে সোহ্‌ম্ অ্যাবিস্যাল প্লেন পেরিয়ে বার্মুদা পেডেস্টাল পর্যন্ত আতলান্তিকের বিশাল অতল রাজ্যের সন্ধান নিয়ে একদিন নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের এক নির্জন তীরে গিয়ে উঠলাম।

সেই শয়তান বুড়োর মতলব এবার স্পষ্ট বোঝা গেল। একটি নির্জন খাঁড়িতে ঢুকে সাবমেরিন থামবার পর বুড়ো এসে হঠাৎ বাইরে তার সঙ্গে একটু ঘুরে আসার অনুরোধ জানালে।

হেসে বললাম,—যা কুয়াশার দেশ, এখানে টহল দেবার শখ আমার নেই।

তবু একবার বেড়িয়েই আসি চলো না। এখানকার সীল মাছ একটা শিকারও করা যেতে পারে।

প্রতিবাদ নিস্ফল জেনে ওভারকোট পরে নিয়ে বেরুলাম। দেখলাম শুধু বুড়ো নয় স্ভেন্সনও সঙ্গে চলেছে। শিকারের লোভ দেখালেও বন্দুক শুধু বুড়োরই হাতে।

● শিশি
প্রেমেন্দ্র মিত্র

তীর ছাড়িয়ে কিছুদূর যেতেই বুড়ো সোজাসুজি আসল কথা পাড়লে—লুকোনো ম্যাপটা এবার দাও দাস।

উঁচিয়ে ধরা বন্দুকটা অগ্রাহ্য করেই অবাক হয়ে বললাম,—অ্যাটল্যান্টিকের তলার ম্যাপ! সে তো সাবমেরিনেই আছে।

না,—বুড়োর গলার স্বরে যেন বাজ ডাকল—সে ম্যাপ ফাঁকি। সুস্তেল সব আমার কাছে স্বীকার করেছে। আসল ম্যাপ তুমি নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছ! দাও।

সুস্তেলের দিকে জলন্ত দৃষ্টিতে তাকালাম। সে একেবারে অমানুষ নয়। অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে থতমত হয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলে।

বুড়োর দিকে ফিরে বললাম,—যদি না দিই।

তাহলেও ও ম্যাপ আমি পাব, শুধু এই নির্জন তীরে তোমায় শেষ নিশ্বাস নিতে হবে। কেউ জানতেও পারবে না কিছু।

বুড়ো বন্দুকের সেফটিক্যাচটা সরালো।

সুস্তেল হঠাৎ এগিয়ে এসে বললে,—দাঁড়ান, ওই ছুঁচোর জন্যে গুলি খরচ করবার দরকার নেই। একবার আমায় বেকায়দায় কাবু করেছে, তার শোধ আমি নিজে হাতে নিতে চাই।

শোধ সে সত্যিই নিলে। দু'বার আমার প্যাঁচে মাটি নিয়ে তিনবারের বার আমার পিঠের ওপর ঘটোৎকচের মত চেপে বসল ঘাড়টা লোহার মত হাতে আমার পেছনে টেনে ধরে। প্রায় মটকে যায় আর কি!

বুড়ো এবার এগিয়ে এসে সব খুঁজে শেষ পর্যন্ত জুতোর সুকতলার নিচে থেকে ভাঁজ করা ম্যাপটা বার করে নিয়ে বললে,—ছেড়ে দাও কালা ভূতটাকে।

ছেড়ে-ই তারা রেখে গেল। তারপর একা সেই জনমানবহীন খাঁড়ির পাড়ে।

দিন তিনেক উইলো গ্রাউসের বাসা খুঁজে খুঁজে শুধু ডিম খেয়ে কাটাবার পর, এক সীল-শিকারী দলের মোটর বোট সেখানে না এলে আর ফিরতে হ'ত না।

ঘনাদা থামলেন। শিশিরের মুখে-ই আমাদের সকলের প্রশ্ন সবিস্ময়ে বার হ'ল।

—বলেন কি ঘনাদা! আপনি সুস্তেলের কাছে হারলেন, আবার যে ম্যাপের জন্যে এত তাও ওরা কেড়ে নিলে!

ঘনাদা রহস্যময় হাসি হেসে বললেন,—সুস্তেলের কাছে না হারলে ওই জাল ম্যাপ ওরা বিশ্বাস করে কেড়ে নিয়ে যায়! সুস্তেলকে ওইটুকুর জন্যেই ক্ষমা করেছি।

● শিশি

প্রেমেন্দ্র মিত্র

অভিভূত হয়ে ঘনাদাকে শেষ একটা সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে যাবার সময় শিশির মেঝে থেকে কি যেন একটা কুড়িয়ে নিল মনে হ'ল।

নিচে নেমে জিজ্ঞাসা করলাম,—কি একটা কুড়িয়ে নিলি তখন?

শিশির ছেঁড়া পাকানো কাগজটা আমাদের সামনে খুলে ধরে বললে —আমাদের সব ফন্দি যাতে ফাঁস সেই আসল জিনিস।

দেখি ক'জনে মিলে সুস্তেলের নামে যে চিঠি বানিয়েছিলাম তারই হাতে লেখা খসড়াটা। ঘনাদা কখন কোথায় যে কুড়িয়ে নিয়েছেন জানতেও পারিনি।

সোনালী কথা

দি স্টোরি অফ্ স্যান মিচেল (এ্যাক্সেল্ মুন্থি)

এ্যাক্সেল্ মুনথি য়ুরোপের একজন খ্যাতনামা ডাক্তার ও মনস্তত্ত্ববিদ। আজ দশবছর হলো তিনি মারা গিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি ফ্রান্সে ও ইতালীতে ডাক্তারী করেন। শেষ জীবনে সুইডেনের রাজা তাঁকে সুইডেনে ডেকে আনেন, সুইডেন হলো ডাক্তার মুন্থির জন্মভূমি, এবং সেখানে রাজ-পরিবারের ডাক্তার হিসেবেই অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন। জীবনের মধ্যপথে তিনি নিজে ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে বিখ্যাত ক্যাপ্রি দ্বীপের স্যান মিচেল শহরে বসবাস করেন। সেখানে থাকবার সময় তিনি তাঁর ডাক্তারী জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সত্য কাহিনীকে এক অপূর্ব উপন্যাসে রূপ দেন, সেই উপন্যাসই জগতে দি স্টোরি অফ্ স্যান মিচেল নামে খ্যাত। ডাক্তার হিসেবে তিনি জীবনের সংগোপন অন্তঃপুরের যে বিচিত্র রূপ দেখেছিলেন, এই উপন্যাসে তা এক বিস্ময়কর মানব-জীবনের নথী হিসেবে রয়ে গিয়েছে। তখন তিনি প্যারিসে ডাক্তারী করছেন, হঠাৎ রাত্তিরে এক নামজাদা নার্স তাঁকে ফোন করলো। তিনি ঠিকানায় এসে দেখলেন বিছানায় অজ্ঞান অবস্থায় এক সুন্দরী তরুণী শুয়ে, মুমূর্ষু। পরীক্ষা করে দেখলেন, মেয়েটি সন্তানসম্ভবা। পেটের ছেলেটিও মুমূর্ষু। ডাক্তার বহু চেষ্টা করে তরুণী আর ভবিষ্যৎ ছেলেকে বাঁচালেন। তরুণীর কাছে একটা দামী হীরের ব্রোচ ছিল, তার কাপড়-চোপড়ের মধ্যে। ডাক্তার ব্রোচটিকে নার্সের জিম্মায় রেখে দিলেন। তারপর আর সেই তরুণীর কোন খবর তিনি পান নি। তিন বছর পরে হঠাৎ দেখলেন খবরের কাগজে একটা খবর বেরিয়েছে, সেই নার্সটিকে পুলিস কারারুদ্ধ করেছে, শিশু-হত্যার অপরাধে। কৌতূহলী হয়ে ডাক্তার নার্সের সঙ্গে দেখা করলেন। নার্স সেই হীরের ব্রোচটা ডাক্তারকে দিয়ে দিলো এবং ডাক্তারের জেরায় সেই তরুণীর শিশুপুত্রের ঠিকানাও দিল। ডাক্তার সেই ঠিকানায় গিয়ে দেখলো, এক মুচী সেই রুগ্ন ছেলেটিকে দত্তক হিসেবে নিয়েছে, কিন্তু ছেলেটা দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে, কোন কথা বলে না, হাসে না, ছেলেটাকে আর সে রাখতে চায় না। দয়াপরবশ হয়ে ডাক্তার সেই শিশুকে নিয়ে এলো এবং আসল উপন্যাস পড়ে তোমরা দেখবে কি করুণ পরিস্থিতিতে একদিন সেই শিশু তার আসল মার সন্ধান পায়। কিন্তু মা আর তার শিশুকে পেলো না, কারণ এবার সত্যি সত্যি সে মারা গেল।



দুরাশা ও আশা

—শ্রীসজনীকান্ত দাস

রবীন্দ্রনাথের "দুরাশা"র নায়িকা বদ্রাওনের নবাব গোলাম কাদের খাঁর পুত্রী, সিপাহী-বিদ্রোহের নেতা বীর কেশরলালের শৌর্যে ও ধর্মবিশ্বাসে আকৃষ্ট হয়ে হিন্দুধর্মের আচরণ ও অনুষ্ঠানের দ্বারা শেষ পর্যন্ত অনুভব করেছিলেন—

"মূর্তিপ্রতিমূর্তি, শঙ্খঘণ্টাধ্বনি, স্বর্ণচূড়াখচিত দেবালয়, ধূপ-ধুনার ধূম, অগুরুচন্দন-মিশ্রিত পুষ্পরাশির সুগন্ধ, যোগীসন্ন্যাসীর অলৌকিক ক্ষমতা, ব্রাহ্মণের অমানুষিক মাহাত্ম্য, মানুষ ছদ্মবেশধারী দেবতাদের বিচিত্র-লীলা, সমস্ত জড়িত হইয়া আমার নিকটে এক অতি পুরাতন, অতি বিস্তীর্ণ, অতি সুদূর অপ্রাকৃত মায়ালোক সৃজন করিত, আমার চিত্ত যেন নীড়হারা ক্ষুদ্র পক্ষীর ন্যায় প্রদোষকালের একটি প্রকাণ্ড প্রাচীন প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইত। হিন্দু সংসার আমার বালিকাহৃদয়ের নিকট একটি পরম রমণীয় রূপকথার রাজ্য ছিল।"

১৮৫৭ সন। ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে নিদারুণ সংঘর্ষে সাংঘাতিক আহত হয়ে "রণক্ষেত্রের অনতিদূরে যমুনার তীরে আম্রকাননচ্ছায়ায় কেশরলাল এবং তাঁহার ভক্তভৃত্য দেওকিনন্দনের মৃতদেহ" পড়ে ছিল। নবাবপুত্রীর শুশ্রূষায় জীবন ফিরে পেয়ে কেশরলাল পরে কি করেছিলেন সে কাহিনী "দুরাশা"য় নবাবপুত্রীই বিবৃত করেছেন। বীর দেওকিনন্দনের কথা "দুরাশা"য় বলা হয়নি।

দেওকিনন্দনও যমুনার শীকরস্নিগ্ধ সমীরণ বীজনে ধীরে ধীরে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিলেন এবং ভারতবাসীর মনে ইংরেজের পরাধীনতাপাশ ছিন্ন ক'রে স্বাধীন হবার প্রবৃত্তি পুনর্জাগরণের জন্যে সন্ন্যাসীর বেশে আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষ টহল দিয়ে ফিরেছিলেন। তাঁর বিস্ময়কর কীর্তিকলাপ কোনও ইতিহাসে লেখা নেই, কিন্তু আমরা জানি বিদ্রোহের বহ্নিকে তিনিই তুষানলের মত জাগিয়ে রেখেছিলেন মারাঠী চিৎপাবন ব্রাহ্মণদের মধ্যে, পাঞ্জাবের শিখেদের অন্তরে এবং বাঙালীর স্বদেশী মেলায়। অনন্ত দুরাশার মধ্যে তিনিই সঞ্চার করেছিলেন তীব্র আশা। এই আশার কথা, দেওকিনন্দনের শেষ জীবনের কাহিনী রবীন্দ্রনাথের লেখনীমুখে প্রকাশ পেলে আমাদের স্বাধীনতা দীর্ঘবিলম্বিত হত না।

দেওকিনন্দন শেষ পর্যন্ত ফরাসী চন্দননগরে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেখানেই ১৮৮৫ সনের শেষ দিনে ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেহরক্ষা করেন। তাঁর ইহজীবনের সমস্ত সম্পত্তি একটি ছোট টিনের তোরঙ্গে সযত্নে রক্ষিত ছিল। তার মধ্যে ছিল একটি ডাইরি বা দিনলিপি—১৮৫৭ সনের ডিসেম্বর মাসের ১লা তারিখ থেকে ১৮৮৫ সনের ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁর চিন্তাধারা এই ডাইরিতে লিপিবদ্ধ ছিল। নিদারুণ নৈরাশ্যের মধ্যে তিনি কার কাছ থেকে আশার ক্ষীণালোক পেয়েছিলেন ১৮৬৮ সনে ২৫শে ফেব্রুয়ারি তারিখের দিনলিপিতে তা স্বীকার করেছেন। সেদিনের দিনলিপিটি প্রকাশ ক'রে যে মহান্ বিদেশী ঐতিহাসিকের রচিত "ভারতের বাণী" পড়ে দেওকিনন্দন নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তাঁকেই আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

দেওকিনন্দনের দিনলিপি, ১৮৬৮, ২৫শে ফেব্রুয়ারি, চন্দননগর

আজ ভোরে উঠে গঙ্গার ধারে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ সৌম্যদর্শন ফরাসী আচার্য মহাত্মা জেকলিয়টের সামনে পড়ে গেলাম। তিনিও পায়চারি করছিলেন। আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলাম বলে আগে তাঁকে দেখতে পাইনি। বৃদ্ধ সস্নেহে আমার কাঁধের ওপর হাত রেখে বললেন, দেওকিনন্দন, তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তোমার

● 'দুরাশা' ও আশা
শ্রীসজনীকান্ত দাস

আশাভঙ্গ হয়েছে, তুমি নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছ। বিশ্বাস হারানোকে আমি অধর্ম বলে মনে করি। আমি আজ এইমাত্র আমার 'ভারতে বাইবেল' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি শেষ করলাম। আজ ভোরে উঠে লিখেছি বইয়ের ভূমিকাটি, শিরোনামা দিয়েছি "ভারতের বাণী"। তুমি এসো আমার সঙ্গে, সেটি তোমাকে শোনাব।



বৃদ্ধ আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন—দেওকিনন্দন, মনে হয় তোমার আশাভঙ্গ হয়েছে!

তাঁরই অনুসরণ ক'রে গেলাম তাঁর ধ্যান-মন্দিরে। কত বই, কত মানচিত্র। দেওয়ালের তাকে তাকে পুঞ্জীভূত জ্ঞান! মনে হ'ল কোনও প্রাচীন বৌদ্ধ-গুম্ফায় প্রবেশ করেছি। বৃদ্ধ তাঁর "ভারতের বাণী" পড়ে শোনালেন। শুনতে শুনতে আমার সমস্ত জড়তা কেটে গেল, আমার জ্ঞান-চক্ষু যেন সদ্য খুলে গেল। শ্রদ্ধায় আমার মন ভরে উঠল। আমি তাঁকে আভূমি প্রণাম করলাম।

"ভারতের বাণী"র একটি নকল নিয়ে এসেছি। এই সঙ্গে সেটি গেঁথে রাখলাম। আমার এই দিনলিপি কখনও কারো চক্ষুগোচর হবে কিনা জানি না, যদি হয়, এই "ভারতের বাণী" সবাই শুনতে পাবে, আমার মত সবাই উদ্বুদ্ধ হবে এবং আমার দিনলিপি সার্থকতা লাভ ক'রে আমার ক্ষুব্ধ আত্মার শান্তি বিধান করবে।

● 'দুরাশা' ও আশা
শ্রীসজনীকান্ত দাস

ভারতের বাণী

ওগো প্রাচীন ভারতের মৃত্তিকা, মানব-সভ্যতার সূতিকাগার তুমি, তোমাকে প্রণাম। প্রণাম মানবতার ধাত্রী মহিমান্বিতা তোমাকে, সক্ষমা তোমাকে—তোমার সযত্ন লালনে বহু শতাব্দীব্যাপী নৃশংস বৈদেশিকদের অবিরাম আক্রমণেও তোমার সন্তান-গরিমা ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়ে বিলুপ্ত হয়নি। ধর্মবিশ্বাস, মানবপ্রেম, কাব্য ও বিজ্ঞানের তুমি জন্মদাতা—তোমাকে প্রণাম। প্রতীচীর ভবিষ্যৎ তোমার অতীতের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক।

তোমার রহস্যময় অরণ্যের গভীরে আমি প্রবেশ করেছি। তোমার বিরাট প্রকৃতি-সত্তার ভাষা আমি আয়ত্ত করেছি সেই গহনে। সেখানকার বট-অশ্বত্থ-তিন্তিড়ীর শাখাপ্রশাখায় পত্রপল্লবে সান্ধ্য সমীরণের মৃদু মর্মরধ্বনি আমার অন্তরাত্মার কানে কানে তিনটি ঐন্দ্রজালিক শব্দের গুঞ্জন তুলেছে—সত্য, শিব, সুন্দর।

প্রাচীন মন্দির ও দেবায়তনের অলিন্দে দাঁড়িয়ে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের আমি প্রশ্ন করেছি। তাঁরা বলেছেন—

"বাঁচা মানেই চিন্তা করা, চিন্তা করা মানেই ঈশ্বরকে জানা—যে ঈশ্বর একমেবাদ্বিতীয়ম্ হয়েও সকলের মধ্যে বিরাজ করছেন।"

ঋষি ও মহাত্মাদের বাণী আমি শুনেছি। তাঁরা বলেছেন—"বেঁচে থাকা মানে শেখা, শেখা মানেই বিচার করা এবং ঐশী শক্তির অসংখ্য প্রকাশের মধ্যে সেই অরূপের অনুভূতিগ্রাহ্য রূপকে আবিষ্কার করা।"

দার্শনিকদের শরণাপন্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করেছি—

"ছ'হাজার বছরের অচল জ্ঞান নিয়ে তোমরা এখনো বেঁচে আছ কেন? ওই গ্রন্থখানিই বা কী যা সামনে রেখে নাড়াচাড়া করছ?"

তাঁরা মৃদুহাস্যে জবাব দিয়েছেন—

"বেঁচে থাকা মানেই পরার্থে বেঁচে থাকা, ন্যায়পথে চলে বেঁচে থাকা। এই গ্রন্থখানিতে তারই নির্দেশ আছে। এর নাম বেদ। এতে আছে জ্ঞানের শাশ্বত বাণী এবং সে পরম বাণী আমাদের পূর্বপুরুষদের ধ্যানে ধরা পড়েছিল।"

কবিদের গান আমি শুনেছি। প্রেম, সৌন্দর্য ও পুষ্প-সুরভির গান গেয়ে তাঁরা ঈশ্বর-মহিমাই কীর্তন করেছেন।

কাঁটার শয্যায় শুয়ে যোগীদের হাসিমুখে দৈহিক যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করতে দেখেছি; দেখেছি জ্বলন্ত আগুনের আসনে বসে দুঃখজয়ের দ্বারা ঈশ্বর-লাভের সাধনা করতে।

● 'দুরাশা' ও আশা

শ্রীসজনীকান্ত দাস

গঙ্গার উৎস-মুখ গঙ্গোত্রীতে আরোহণ করেছি আমি, দেখেছি হাজার হাজার ভক্ত নতজানু হয়ে পুণ্যতোয়া নদীর ধারে প্রত্যূষের উদীয়মান সূর্যকে বন্দনা করছে। সে বন্দনার ভাষা ভেসে এসেছে আমার কানে—"ক্ষেত্র শস্যে শ্যামল, বৃক্ষ ফলভারে আনত, হে দেব, এ তোমারই দান। তোমাকে প্রণাম।"

কিন্তু এই অগাধ বিশ্বাস, এই সঞ্জীবনী-জ্ঞান, ব্রাহ্মণ-পুরোহিত-ঋষি-দার্শনিক-শিল্পী-কবির এই দিব্য শিক্ষা সত্ত্বেও, হে হতভাগিনী জননী-ভারত, আমি দেখলাম তোমার সন্তানেরা ধীরে ধীরে নির্বীর্য, জীর্ণ ও আদর্শভ্রষ্ট হয়ে গেল। পাশ্চাত্য পশু-শক্তির কাছে, মুষ্টিমেয় অতিলোভী, অত্যাচারী বণিকের হাতে দেখলাম তোমার রক্তক্ষয়; তোমার বিত্ত অপহৃত হল, লাঞ্ছিতা হল তোমার কন্যারা। তোমার স্বাধীনতা হল পদদলিত। তোমার দুর্ভাগা সন্তানেরা এই শোষণ, অপহরণ, লাঞ্ছনাকে মেনে নিল অদৃষ্ট বলে, দেবতার কাছে পর্যন্ত নালিশ জানালে না।

তারপর শুনে আসছি দিনান্তের স্নিগ্ধ বাতাসের সঙ্গে ভেসে-আসা ভগ্নকণ্ঠের করুণ আর্তনাদ। কার এ ক্রন্দন, কোথা থেকে আসছে? মরু-জলাভূমি থেকে, দুর্গম পথের প্রান্ত থেকে, নদীতীরের শ্মশান থেকে, না অরণ্যের অন্ধকার থেকে? মনে হয়েছে—বুঝি বা হৃত গৌরব আর বিলুপ্ত ঐশ্বর্যের জন্যে বর্তমানের বুকে ভর ক'রে অতীতই হাহাকার করছে!

অথবা এ কি বিদ্রোহ বিধ্বস্ত হবার পর সিপাহীদের স্ত্রীপুত্রকন্যার আর্তনাদ! লালকোর্তা ব্রিটিশ সৈন্যেরা অবাধে গুলি চালিয়ে হতভাগ্যদের নিঃশেষ করতে করতে নিজেদের দুঃস্বপ্ন, নিজেদের আতঙ্ক ভুলতে চাইছে হয়তো!

দুর্ভিক্ষে অনাহারে মৃতা মাতার শীতল বুকে জীবনরস না পেয়ে অসহায় শিশুরা কান্নায় ভেঙে পড়ছে না তো?

এ সব ভয়াবহ দুঃখযন্ত্রণার মর্মভেদী প্রকাশ আমাকে দেখতে হয়েছে।

যাদের লৌহ-হস্তের নিষ্পেষণে হে ভারত, তোমার সন্তানেরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছে, তাদেরই শাসন মেনে নিয়ে তারা নিরুৎসাহের হাসি হাসছে। দেখতে পাচ্ছি তারা স্বহস্তে, হয়তো সোল্লাসে অতীত গরিমা ও স্বাধীনতার স্মৃতির কবর খুঁড়ে চলেছে।

আমি নিজের মনকে প্রশ্ন করেছি, কোন্ পিশাচের ছোঁয়া লেগে ভারতের পূত দেহে পচন শুরু হয়েছে? এ কী শুধু কালধর্মে? মানুষ যেমন বৃদ্ধ অক্ষম জরাজীর্ণ হয়ে মরে, একটা জাতও কি তেমনি মরে? এও কী সম্ভব—

● 'দুরাশা' ও আশা
শ্রীসজনীকান্ত দাস

ভারতের প্রাচীন ঋষিবাক্য, অপৌরুষেয় বেদের বাণী কি এভাবে ব্যর্থ ও বিনষ্ট হতে পারে!

হে ভারত, তোমার অতীত সম্পদ বিনষ্ট হতে পারে না। কাল তোমার গৌরবকে কুক্ষিগত করতে পারেনি—যেমন পেরেছে সহস্রতোরণ থিবিসকে, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বাবিলনকে, পিরামিড-শোভিত মিশরকে, দিগ্বিজয়ী গ্রীসকে, প্রবল-প্রতাপান্বিত রোমকে। সিনাই পর্বতশিখর থেকে বর্ষিত হয়েছিল হিব্রুজাতির যে বিধান-প্রস্তর-ফলক, তার ভাষা কবে হারিয়ে গেছে কিন্তু আমি আজও শুনতে পাচ্ছি—প্রাচীন ব্রাহ্মণ, ঋষি, দার্শনিক-কবিরা তোমারই অরণ্য-পর্বতে অমর আত্মার যে জয়োচ্চারণ করেছিলেন, স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে সামাজিক সদাচারের যে মাহাত্ম্য কীর্তন করেছিলেন এবং সেই পরম দেবতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানুষের মনে যে জিজ্ঞাসা জাগিয়েছিলেন, তা মরেনি, তা হারায়নি, তা নষ্ট হয়নি। এখনও মন্দির-প্রাঙ্গণে, পর্বত-গুহায়, অরণ্যের গভীরে গীত হচ্ছে সেই গান, জাগ্রত আছে সেই জিজ্ঞাসা এবং সমাজকে এখনও ধারণ করে আছে সেই সদাচার। মাভৈঃ, মাভৈঃ ভারতবর্ষ, তুমি আবার জয়যুক্ত হবে। ভারতবাসী আজও যখন বৈদিক মন্ত্রেই নতি নিবেদন করছে সেই দেবতাকে, যিনি দিয়েছেন নির্মেঘ আকাশে প্রদীপ্ত সূর্যালোক, যিনি মেঘবর্ষণে বারংবার সুফলা করেছেন মাটিকে, তখন সে আলোক নির্বাপিত হবে না, সে মাটি হবে না ঊষর।

আমি আবার স্মরণ করলাম সেই রহস্যময় অতীতকে। আবার কালের কালো যবনিকা ঠেলে কী বিপুল ঐশ্বর্য উদ্ভাসিত হ'ল আমার দৃষ্টিতে; সহস্র মন্দিরগাত্র থেকে গৌরবময় ঐতিহ্য কথা কয়ে উঠল, মুখর হ'ল প্রাচীন কীর্তিস্তম্ভ ও নগর-প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ; ঝল্‌মল্‌ ক'রে উঠল বেদ-উপনিষৎ-স্মৃতি পুরাণের পাতা।

ভয় নাই ভারত, তুমি অমর, তুমি চিরজয়ী। কুয়াশা আচ্ছন্ন করেছে উত্তুঙ্গ হিমালয়কে, মেঘ ঢেকেছে সূর্যকে—এ সাময়িক, এ ক্ষণিক। এ কুয়াশা দূর হবে, এ মেঘ কেটে যাবে।

* * * *

দেওকিনন্দনের দিনলিপিতে এরপর এইটুকু মাত্র লেখা আছে—"মানুষ গভীর অরণ্যে পথ হারিয়ে পথ খুঁজে পেলে তার যেমন আনন্দ হয় আমি তেমনি আনন্দ পেলাম এই 'ভারতের বাণী' শুনে। আশায় আমার বুক ভরে গেল। কল্পনানেত্রে দেখতে পেলাম, পূর্বদিগন্ত লাল হয়ে উঠেছে, স্বাধীনতা-সূর্যোদয় হ'ল বলে।"



সেকালের ছোটবেলা

—প্রবোধকুমার সান্যাল

ছোটবেলাকার কথা মন দিয়ে যখন ভাবতে বসি তখন, কি জানি কেন, একটু দুঃখই পাই। এখনকার জগতে বাস ক'রে তখনকার কালটি ভাবতে গেলে বুঝতে পারি, কেমন যেন একটা আধমরা যুগে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হত। তখন ভাল ক'রে বাঁচবার সুযোগ যে ছিল না তা নয়, কিন্তু এখনকার মতো এমন বিচিত্র মালমসলা তখন কোথায় ছিল? সকাল বিকেল ছিল পড়াশুনোর চিন্তা, মাঝখানে খালি হাতে কিছুটা খেলাধুলো,—চারদিকের সমাজটা ছিল বড় কৃপণ। রূপকথার গল্প শোনা যেতো,—বড় জোর রামায়ণ আর মহাভারত। কিন্তু এখন যেমন প্রতি পদক্ষেপে গল্প আর কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে, তখন এসব কোথায় ছিল? এখন প্রতিদিন আমাদের চোখের সামনে যেন বিভিন্ন উপকরণ এসে প্রতিক্ষণে ভিড় করছে, তখনকার দিনে এ ভিড় ছিল না। মানুষের এত আবিষ্কার, বিজ্ঞানের এমন জয়যাত্রা, দুঃসাহসীদের এমন অভিযান, জ্ঞান ও বিদ্যার এমন বিপুল সমারোহ,—এসব আমাদের ছোটবেলায় স্বপ্নবৎ ছিল।

ইউরোপ এবং আমেরিকার দিকে আমরা চেয়ে থাকতুম নতুন কথা শোনবার জন্য। তখন খবরের কাগজ ছিল কম, সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা ছিল নগণ্য, ইস্কুল

কলেজের পড়াশুনো ছিল পাঠ্য বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ,—এমনিধারা অবস্থায় টুকিটাকি বাইরের কোনও আজব খবর শুনতে পেলে আমরা তাই নিয়েই হৈ চৈ বাধিয়ে তুলতুম। তাছাড়া তখনকার দিনে ইংরেজ গভর্নমেণ্টও এটা চাইত না যে, এত বেশী বাইরের খবর এসে আমাদের কানে ঢোকে।

সিনেমার ছবি আরম্ভ হয়েছিল আমাদের ছোটবেলায়। কিন্তু অভিভাবকদের শাসন আর বিধিনিষেধ অমান্য ক'রে সিনেমায় যাওয়া ছিল এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। তখনকার দিনে চার আনা পয়সা একসঙ্গে যোগাড় করা একপ্রকার অসম্ভব ছিল। এক মণ চাউলের দাম তখন ছিল তিন টাকা, কিন্তু গৃহস্থঘরে পয়সা ছিল বড় কম। খাঁটি ঘি যখন সেকালে পাওয়া যেত, তখন কেনবার ক্ষমতা ক'জনেরই বা ছিল? এক দিস্তা কাগজের দাম যখন ছিল চার পয়সা, তখন সেটাকেই মনে হত অনেক বেশী। এরকম অবস্থায় চার আনা দিয়ে সিনেমার ছবি দেখা,—কার এমন বুকের পাটা?

আস্তে আস্তে কলকাতায় এক আধখানা ক'রে মোটরগাড়ি দেখা দিতে লাগল। তখন ওর নাম ছিল হাওয়াগাড়ি। সেই গাড়ি রাস্তা দিয়ে আওয়াজ ক'রে গেলে তাকে দেখবার জন্য বাড়ির দরজা জানলায় ভিড় জমে যেত। ট্যাক্সি এল অনেক দেরিতে। এক মাইল ট্যাক্সিতে চড়ে যেতে গেলে খরচ পড়ত চার আনা। সাধারণ লোকের সাধ্যে কুলোত না। বড়লোকদের ছিল পালকি গাড়ি, তাদের বাড়িতে থাকত ঘোড়া, নয়ত আস্তাবলে,—তাই চ'ড়ে তারা আনাগোনা করত। কারো ছিল ফীটন, কারো বা ল্যাণ্ডো। সাধারণ লোকের দরকার হলে ছ্যাকরা গাড়ি ভাড়া ক'রে আনতে হত। তখনকার দিনে গৃহস্থঘরের মেয়েরা কেউ পথে বেরোত না। যদি দরকার হত, পালকি এসে দাঁড়াত দরজায়। কেউ কারো বাড়ির মেয়েছেলেকে সহজে দেখতেই পেত না। শুধু মহাষ্টমী আর পালপার্বণে গঙ্গার ঘাটে মেয়েদেরকে দেখা যেত।

আকাশে উড়োজাহাজ যেদিন দেখা গেল,—বেশ মনে আছে, অনেকের বাড়িতে সেদিন উত্তেজনার জন্য রান্না চড়েনি। পাড়ায়-পাড়ায় জনতা, বাড়িতে-বাড়িতে কলরব, ঘরে-ঘরে তর্কের ঝড়। জার্মানীর জেপলীনের গল্প শুনেছিলুম, বোধ হয় যেন কাগজেও তার ছবি ছাপা হয়েছিল, কিন্তু সে সব তো ইউরোপের রূপকথা! চোখের সামনে দিয়ে উড়োজাহাজ আকাশপথে উড়ে গেল, এবং তার মধ্যে মানুষ বসে রয়েছে, এমন বিচিত্র দৃশ্য আর কে কবে দেখেছে? আমরা তখন বড়াই ক'রে বলতে আরম্ভ ক'রে দিলুম, আমাদের রামায়ণ আর মহাভারতে পুষ্পকরথের কথা লেখা আছে! সকলের আগে নাকি এই ভারতবর্ষেই এককালে উড়োজাহাজ তৈরি হয়েছিল।

● সেকালের ছোটবেলা
প্রবোধকুমার সান্যাল

দেব দেউল

ছোটবেলায় কলের গান আমরা জানতুম। কিন্তু রেডিও আবার কি! এ আবার এক আশ্চর্য ব্যাপার এসে দাঁড়াল। টেলিফোন নয়, তারের সংযোগও নেই,—অথচ চাবি ঘুরিয়ে ঠিক জায়গায় কাঁটাটি ছোঁয়াতে পারলে দিব্যি গানবাজনা! পৃথিবীর সব জায়গা থেকে মানুষের আসল গলার আওয়াজ বয়ে নিয়ে আসছে এই রেডিও,—এর চেয়ে বিস্ময় আর কি হতে পারে? এ যুগ যেন আমাদের মনে একটার পর একটা প্রবল ধাক্কা দিয়ে চলেছে!



টকির যুগ এল, এল টেলিভিশন, এখন আবার আসছে সিনেরামা। সূর্যলোকে রকেট উড়ে চলল, রাডার দাঁড়িয়ে রইল দিগন্তের খবর নিয়ে, স্পুটনিক চলে গেল মহাশূন্যেরও বাইরে, চাঁদে যাবার পথ পাওয়া যাচ্ছে, মরা মানুষ মাঝে মাঝে বেঁচে উঠছে,—এর পরে বিজ্ঞানীরা আরও নাকি এগিয়ে চলবে। এটম্ বোমা, অম্লজান বোমা, ব্যালিস্টিক্ মিস্‌ল্—এরা দেখতে দেখতেই পুরনো হয়ে এল।

আমাদের ছোটবেলায় মানুষের কৌতূহল ছিল সীমাবদ্ধ, অল্পেই তারা খুশী থাকত, সামান্য কিছু পেলেই সেলাম ঠুকে তারা মাথায় তুলে নিত। আজ সে সব আর নেই। ক্ষুধা তৃষ্ণা এখন বেড়েছে, জ্ঞানের সীমা আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, বিদ্যার পথ কতদূর অবধি আরও এগিয়ে চলবে কেউ জানে না। বিজ্ঞানের আবিষ্কার, মানুষের বুদ্ধি আর প্রতিভা, যন্ত্রপাতির উন্নতি,—এদের শেষ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তাই বলছিলুম, একটু হিংসে হচ্ছে। যারা আজ ছোট তাদের সামনে কী আশ্চর্য সুন্দর ভবিষ্যৎ।

হাওয়াগাড়ি দেখবার জন্ত বাড়ির দরজা জানলায় ভিড় জমে যেত।

যাদের বয়স হয়েছে, চুলে পাক ধরেছে, যারা জীবনের সব খেলাধুলো প্রায় শেষ ক'রে এল, তারা আজ বড়ই দুর্ভাগ্য। অনেক নতুন আসছে, আসছে অনেক অনাবিষ্কৃত জীবন, আসছে চারিদিক থেকে বিচিত্রের কৌতুক সম্ভার,—কিন্তু আমাদের কালের অনেকেই আর থাকবে না। নতুনের হাতে আমরা সর্বস্ব দিয়ে একদিন হাসিমুখে বিদায় নেব।

———



যাস্‌না রে ভাই-

—সুনির্মল বসু

(অপ্রকাশিত)

যাস্‌না রে ভাই 'হাস্‌নাবাদে',
মেজাজ যদি খারাপ থাকে,
হাস্‌তে হবে দিন-রাত্তির,
পড়তে হবে ঘোর-বিপাকে ;
হাসির নিয়ম ভাঙ্‌বে সেথায় শক্তি এমন নাইক কারো,
কাঁদতে গিয়ে গোমরা মুখে তোমরা হেসে উঠ্‌বে আরো।
অশ্রুটুকু 'শ্মশ্রু'বেয়ে পড়বে ঝরে অভিমানে,
এমন ব্যাপার তাদের দেশে নাইক লেখা অভিধানে।
গর্বে হাসি হাস্‌তে হবে, হয় যদি ভাই সর্বনাশও,
আছাড় খেয়ে হাস্‌তে হবে, আচার খেয়ে যেমন হাসো।
কিল্‌টি খেয়ে খিল্‌খিলিয়ে হাস্‌বে হাসি মিঠে-মিঠে,
পিঠের উপর পড়লে লাথি, ভাব্‌তে হবে খাচ্ছ 'পিঠে'।
নিন্দা শুনে চিন্তা যদি 'মনের' কোণে আস্‌তে থাকে,
ছেলে বুড়ো সবাই মিলে হল্লা করে হাস্‌তে থাকে।
মরলে পরে আত্মীয় কেউ সাধ্যিও নাই কাঁদবে কেহ,
ভীষণ হেসে শ্মশানঘাটে বইতে হবে মৃতের দেহ।
সরস সবার ধরন-ধারণ, মরণকালে সবাই হাসে,
অবিশ্বাসের কথা তো নয়, হাসি বেরোয় নাভিশ্বাসে।

দাঙ্গা-ফ্যাসাদ, হাঙ্গামা আর অত্যাচারে, হত্যাকালে,
অট্টহাসি হাস্‌বে সবাই হট্টগোলে, সমান তালে।
'হাস্‌নাবাদে' হাসির আবাদ, হাসির শহর আজগুবি সে,
সবাই সেথায় 'হাস্য-রসিক', জ্যাঠা-খুড়ো-মেশো-পিশে।
শহর জুড়ে হাসির বহর, হাসির লহর কেবল ওঠে,
হাঁসফাঁসিয়ে উঠ্‌ছে সবাই দম-ফাটানো হাসির চোটে।
গুরুমশাই কুঁচকে ভুরু মুচ্‌কে হাসে ফোক্‌লা-দাঁতে,
বেত্র খেয়ে ছাত্র-দলে উঠছে হেসে পাঠ্‌শালাতে।
হাঁসুলি গলায় হাস্‌ছে মেয়ে হাস্‌না-হানা গাছের তলে,
হেঁসেল জুড়ে বামুন উড়ে বিকট হেসে পড়ছে ঢলে।
ইতিহাসের উল্‌টে পাতা হাস্‌ছে পোড়ো ইস্কুলে সে,
হেঁসো হাতে চাষার দলে ফসল কাটে সরল হেসে।
পাতিহাঁসের হাসি দেখে নাতি হাসে ঠাকুর্দাদার,
মানুষগুলোর হাস্য দেখে পাচ্ছে হাসি কুকুর গাধার।
জেলখানাতে চোর-কয়েদী জোর হেসে সব টান্‌ছে ঘানি,
পিঁজরাপোলে অট্টরোলে অকেজো সব হাস্‌ছে প্রাণী।
হাস্‌ছে রুগী হাসপাতালে, হাস্‌ছে যুগী আশ্রমেতে,
'হাস্‌নাবাদে' যাস্‌না রে ভাই,—হাসির নেশায় উঠ্‌বি মেতে।

সমানীব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।
—ঋগ্‌বেদ্‌

মণি ও মুক্তা



তোমাদের সংকল্প সমান হোক্‌, সমান হোক্‌ তোমাদের সকলের হৃদয়। একমন হয়ে সকলে মিলে লাভ কর চরম ঐক্য।



একালে বিজ্ঞানের বিচিত্র অগ্রগতি !

[পৃষ্ঠা—৭৮

বাপ ও ছেলে



—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

[১]

তিন পুরুষ ধরে এই কাঠের ব্যবসা।

হরবিলাস রায়ের তখন মাত্র পনেরো বছর বয়স, সবে সেকেণ্ড ক্লাসে উঠেছে, বাপ পশুপতিনাথ রায় স্কুল ছাড়িয়ে ছেলেকে কাঠের গোলার তক্তাপোশের ওপর এনে বসালেন।

বিশ্বস্ত পুরানো কর্মচারী মণ্ডলমশাইকে ডেকে বল্লেন, মোড়ল মশাই, বড়খোকাকে কাঠ চেনান্!

সে আজ প্রায় তিন যুগ আগেকার কথা।

সেদিন লোকে বলতো রায়েদের কাঠের গোলা, আজ হরবিলাস রায়ের তত্ত্বাবধানে সেই কাঠের গোলার নাম হয়েছে রায় এণ্ড রায় টিম্বার মার্চেন্টস্...সেদিন কর্মচারীর সংখ্যা ছিল বারো জন, আজ রায় এণ্ড রায়ের মাইনের খাতায় একশো বারো জনের নাম...তার মাইনে-করা এজেন্টের দল আসামে, বর্মায়, মালয়-উপদ্বীপে......

রায়েদের কাঠের গোলার সে তক্তাপোশ আর নেই···তার বদলে আজ দু-তলা বাড়ি জুড়ে রীতিমত আধুনিক অফিস···কর্তা হরবিলাস রায় যে-ঘরে বসেন, সে-ঘরের মেঝে কার্পেট দিয়ে মোড়া···সেই কার্পেটের ওপর বড় বড় সরকারী অফিসর, বড় বড় ফার্মের সাহেব-সুবো, বড় বড় এন্‌জিনিয়ারদের ধুলোহীন দামী জুতোর চাপ পড়ে···হরবিলাস রায় অকুণ্ঠভাবে ভুল ইংরেজীতে তাঁদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলেন···ভুল ইংরেজী সত্বেও তাঁরা সকলে হরবিলাস রায়কে শ্রদ্ধা করেন, তাঁরা জানেন যে লোকটি যেকথা বলে, সে কথার নড়চড় হয় না···এক রকম কাঠের নমুনা দেখিয়ে অন্য রকমের কাঠ চালাবার চেষ্টা করে না, নিজের পাওনা কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নেয়, অপরের পাওনাও কড়ায় গণ্ডায় অযাচিতভাবে ডেকে বুঝিয়ে দেয়···ব্যবসার ক্ষেত্রে এ-জাতীয় লোকের বিশেষ স্থান আছে···

হরবিলাস রায় জানতেন, কি কঠোর পরিশ্রমে, কি কঠোর নিষ্ঠায়, এই স্থান তাঁকে অধিকার করতে হয়েছে এবং তার জন্যে···

ভাবতে গেলেই ইদানীং এক সুগভীর দীর্ঘশ্বাস সমস্ত বুককে চলিয়ে আপনা থেকে যেন বেরিয়ে আসতো···

সেই কিশোর-কাল থেকে আর আজ এই প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত, যারাই হরবিলাস রায়কে কাছে থেকে দেখেছে, তারাই জানে, একদিনের জন্যেও, আধবেলার জন্যেও এই লোকটি কাজকে ফাঁকি দেন নি, তাঁকে দেখলে বোঝা যায় কাজের নেশা কাকে বলে···

সকালবেলা ঘড়িতে সাতটা বাজতেই হরবিলাস রায় বাড়ি থেকে এসে অফিসে তাঁর চেয়ারটিতে বসতেন···সেই চেয়ারটিতে বসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটা স্বস্তি বোধ করতেন। তখন তাঁর অফিসের কোন কর্মচারীই আসতো না···তিনি একা বসে বাতিল-রসিদের উলটো দিকের সাদা পাতায় সারা দিনের কাজের একটা চার্ট তৈরি করতেন···আগের দিনের চার্ট-টাও সেই সঙ্গে একবার দেখে নিতেন, গতদিনের কোন কাজ অসমাপ্ত আছে কি না···তার পর দরোয়ান ডাকের যে সব চিঠি দিয়ে যেতো, নিজে সেই সব চিঠি পড়ে তার ওপর ইন্‌স্ট্রাকশান্ লিখতেন···তারপর দশটা নাগাদ তাঁর দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ নিবারণবাবু আসতেন···নিবারণবাবুর সঙ্গে এগারোটা পর্যন্ত নতুন প্লান সম্বন্ধে আলোচনা করতেন···ঘড়িতে এগারোটা বাজতো, হরবিলাস রায় চেয়ার থেকে উঠতেন। বাড়িতে স্নান-আহার সেরে ঠিক একটার সময় আবার অফিসে চেয়ারে এসে বসতেন···তিনি চেয়ারে বসলে ঢং করে ঘড়িতে একটা বাজতো, হেসে একবার ঘড়িটার দিকে দেখতেন। তারপর রাত্রি আটটা পর্যন্ত লোকের সঙ্গে চীৎকার ক'রে, ঝগড়া ক'রে, কর্মচারীদের প্রত্যেকটি কাজের খুঁটিনাটির ওপর খবরদারি ক'রে, এজেন্টদের বিল

● বাপ ও ছেলে
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

নিয়ে ছোটখাটো সংগ্রাম ক'রে, নিবারণবাবুকে কারণে-অকারণে এবশো বার ধমকে যখন চেয়ার থেকে উঠতেন তখন নিবারণবাবু ছাড়া অফিসে আর কেউ থাকতো না। ঠিক আটটা পনেরো মিনিটের সময় নিবারণবাবুকে সঙ্গে নিয়ে মোটরে উঠতেন···এক ঘণ্টা মোটরে হাওয়া খেয়ে তাঁকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে দশটার মধ্যে বাড়ি ফিরতেন।

দিনের শেষে গঙ্গার দিকে রাত্তিরে যখন বেড়াতে যেতেন, দেখতেন চৌরঙ্গীপাড়ায় বড় বড় হোটেলে আলো জ্বলছে···বিলিতী বাজনার আওয়াজ আসছে···সিনেমার সামনে নিওন আলোর কায়দায় বিচিত্র বিচিত্র সব ছবির বিজ্ঞাপন জ্বলছে নিভছে···হেসে নিবারণবাবুকে বলতেন, নিবারণবাবু চলুন, নেমে একটু দেখে আসা যাক!

নিবারণবাবু শুধু নীরবে হাসতেন, তিনি জানতেন, হরবিলাস রায় জীবনে কাজ ছাড়া আর কোন আনন্দ উপভোগ করেননি···সব-আনন্দ, সব-উৎসব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে তিনি জীবনকে এমনভাবে কাজের বেড়া দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন যে সত্যি ইচ্ছা থাকলেও কোথায় যেন আজ সংকোচ লাগে, তিনি পারেন না······

[২]

দীর্ঘ ত্রিশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজ হরবিলাস রায় শহরের শ্রেষ্ঠ ধনীদের একজন······বিপুল ধন সংগৃহীত হয়ে গিয়েছে, ধন-সংগ্রহের আর আগ্রহ নেই, আছে শুধু একটা অভ্যাসের প্রেরণা···ত্রিশ বছর ধরে কাজ করে এসেছেন, নতুন নতুন কাজ তৈরি করে তাতে মেতেছেন, আজ ভেতরে কোথায় ক্লান্তি বোধ হয়, কাজের নতুনত্বের আর কোন প্রয়োজন নেই ···আজও তেমনি ঘড়ি ধরে অফিসে আসেন, তেমনি পরিশ্রম করে চলেন, কিন্তু অভ্যাসের বশে···দিনের শেষে তেমনি নিবারণবাবুর সঙ্গে মোটরে হাওয়া খেতে বেরোন··চৌরঙ্গীপাড়ায় সেই আলো-ঝলমল উৎসব-মুখর নৈশ আবহাওয়ার মধ্যে এসে পড়লেই ভেতরটা কেমন মোচড় দিয়ে ওঠে, মনে হয় ত্রিশ বছর ধরে কাঠের গোলায় কাঠের পর কাঠ ভর্তি করেছেন কিন্তু ভেতরটা সেই অনুপাতে যেন খালি থেকে গিয়েছে···কাজের নেশার মধ্যে অন্তরের শূন্যতার সে-খবর ধরা পড়েনি, আজ কাজ থেকে নেশা চলে গিয়েছে, তাই সব কাজের ভেতর থেকে হালকা শোলার মতন শূন্য মন ভেসে ভেসে ওঠে···রূপ-রস-গন্ধ-ভরা এই বিপুল ধরণীর বিচিত্র স্বাদ যখন নেবার বয়স ছিল, তখন মনের সব দরজা-জানলা বন্ধ ক'রে সেগুন কাঠের সঙ্গে শাল কাঠের তফাত বুঝতেই কেটে গিয়েছে···আজ জীবনের ভাটার টানে যখন সামনে জেগে উঠছে বার্ধক্যের বালুচর তখন কোথা থেকে মনের ভেতর জেগে ওঠে, কেন জেগে ওঠে, আকুল-করা বিচিত্র সব কামনা?

● বাপ ও ছেলে
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যা

…ত্রিশ বছর ধরে প্রতিদিন যাদের সঙ্গে মিশেছেন, উঠেছেন, বসেছেন, আজ ফ্যাল-ফ্যাল করে তাদের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন, দেখেন তাদের মধ্যে একজনও কেউ নেই যাকে বন্ধু বলে কাছে টেনে বসাতে পারেন, যার সঙ্গে মনের দুটো কথা মন খুলে বলতে পারেন! এ শূন্য মন কার সামনে তিনি তুলে ধরবেন?

এই ত্রিশ বছরের অন্ততঃ এক হাজার মানুষের সঙ্গে এক-হাজার-রকম সম্পর্কের ভেতর একটাও অন্তরের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি!

হরবিলাস রায় তাঁর প্রচণ্ড ঐশ্বর্যের মধ্যে সহসা অনুভব করেন, তিনি একা!

একদিন বাড়িতে স্ত্রীর সামনে অন্যমনস্কভাবে বলে ওঠেন, একা একা বড় অস্বস্তি লাগছে!

স্ত্রী অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন, বিস্মিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন, অফিসে, বাড়িতে, চারদিকে তোমার লোক·· একা একা আবার কি! কিসের অস্বস্তি?

হরবিলাস রায় কাউকে বোঝাতে পারেন না, তাঁর কিসের অস্বস্তি!

নিবারণবাবুকে দু'একদিন বলতে গিয়েছিলেন, নিবারণবাবু হেসে বলেছিলেন, আপনার আবার দুঃখ!

[৩]

হরবিলাস রায়ের রাত্রিতে ঘুম হয় না।

বিরাট বাড়ি…লোক-জন, আত্মীয়-স্বজনে ভর্তি…সকলেই ঘুমুচ্ছে…হরবিলাস রায় ঘুমুতে পারেন না…

রাত্রিতে ঘুমুতে পারেন না, সে কথা কাউকে বলতেও পর্যন্ত পারেন না।

ছেলেবেলা থেকে নিজের চেষ্টায় নিজেকে গড়ে তুলেছেন…

এই দম্ভ একদিন তাঁকে শক্তি দিয়েছে, আজ এই দম্ভই তাঁর সব চেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারুর কাছেই তিনি তাঁর নিজের অসহায়তার কথা বলতে পারেন না…

মাঝে মাঝে কান্নার মতন কি-একটা গলার কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠে, কাঁদতে পারেন না, যদি কেউ দেখতে পায়, যদি কেউ শুনতে পায়!

যে-কাজ তাঁর নেশার মতন ছিল, সেই কাজ আজ বিস্বাদ লাগে…অথচ কাজ করা তাঁর অভ্যাস …সারাদিন নিজেকে নিয়ে কি করবেন?

সারাক্ষণ মনের ভেতর এই প্রশ্ন মনকে উদ্‌ব্যস্ত করে তোলে…কাজে ভুল হয়ে যায়…

কর্মচারীরা সব বলাবলি করে, কি হলো কর্তার?

● বাপ ও ছেলে
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

[৪]

হঠাৎ একদিন বিদ্যুৎ-ঝলকের মতন তাঁর মনে জেগে উঠলো···

শংকরনাথ তাঁর একমাত্র সন্তান···তাঁর বিরাট ব্যবসা···তাঁর বিপুল ঐশ্বর্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী···তার জীবনকে আনন্দ-মুখর করে গড়ে তোলাই হবে তাঁর কাজ!

তার আনন্দের ভেতর দিয়ে তিনি নতুন করে পাবেন আনন্দের স্বাদ!

সুন্দর···স্বাস্থ্যবান···তারুণ্যের অমলিন জ্যোতিতে ঝলমল করছে চোখ-মুখ···পুত্রের মুখের দিকে চাইতেই সংগোপনে মনে এক বিপুল উল্লাস জেগে ওঠে!

পুত্র সম্বন্ধে কোনদিন তাঁর মনে বিশেষ কোন ভাব জাগেনি, পিতা যা স্বাভাবিক কর্ত্তব্য নিষ্ঠাসহকারে তা পালন করে এসেছেন মাত্র, আজ সহসা পুত্রের দিকে চেয়ে তাঁর মনে জেগে উঠলো, পুৎ-নামক নরক থেকে তাঁকে ত্রাণ করবে, কি করবে না, তা তিনি জানেন না···তবে জীবনের এই চরম অসম্পূর্ণতার বেদনা থেকে আজ সে-ই একমাত্র তাঁর ত্রাণকর্তা!

পুত্র শংকরনাথ, আজ তাঁর চোখে এক অপরূপ নতুন মূর্তিতে জেগে উঠলো···পুত্র আজ তাঁর ত্রাণকর্তা···তাঁর ইষ্ট···জীবনের সব নৈবেদ্য তার জন্যে!

[৫]

কিন্তু···

এতদিন ধরে পিতা আর পুত্রের মধ্যে যে-সম্বন্ধ ছিল, বাইরের দিক থেকে তা ছিল শুধু কর্ত্তব্যের সম্বন্ধ। সে-কর্ত্তব্যে কোন ত্রুটি ছিল না, কিন্তু প্রকাশ্য কোন অনুরাগ ছিল না। উত্তাপ ছিল না।

হরবিলাস রায়ের মনে পড়ে, যখন শংকর সবে জন্মেছে, শ্বশুরবাড়িতে দেখতে গেলেন··· শাশুড়ী শিশুকে এনে তাঁর হাতে তুলে দিলেন···হরবিলাস লজ্জায় সংকোচে শিশুকে কোলে নিতে পারলেন না···এই লজ্জা, এই সংকোচ নিঃশব্দে বেড়েই চলেছিল। হরবিলাস রায় স্বভাবতঃই সেই ধরনের মানুষ, যারা বাইরে অনুরাগে উচ্ছল হতে পারে না। বাইরে থেকে লোকে দেখে তাদের বলে, কড়া মানুষ। হরবিলাস রায় ছিলেন সেই কড়া মানুষ।

বড়লোকের বাড়ি, শিশুকাল থেকেই শংকরের দেখাশোনার জন্যে বিশেষ ঝি-চাকরের বন্দোবস্ত ছিল···সেখানে কোন ত্রুটিই হয়নি···তিন-চারজন শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন তার পড়াশোনার জন্যে। যখন আরো একটু বয়স হলো, তখন কিশোর শংকরনাথের জন্যে একজন বিশেষ চাকর নিযুক্ত হলো, তার কাজ শুধু শংকরনাথের দেখাশোনা করা, বাড়ির পুরানো চাকর কেষ্ট-র ওপরই সেই ভার পড়লো।

● বাপ ও ছেলে
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

শংকরনাথের খাওয়া-দাওয়া, শোয়া-বসা, ওঠা-হাঁটা, সবই দেখতে হতো কেষ্টকে। হরবিলাস পুত্রের খবর নিতেন কেষ্টর কাছ থেকে। পুত্রের যা-কিছু আবদার বায়না, তা কেষ্টর মারফতে তাঁর কাছে এসে পৌঁছত। শংকরনাথ সামনাসামনি পিতার কাছে বড়-একটা আবদার করবার সুযোগ পেতো না। সবাই হরবিলাস রায়কে কড়া মানুষ বলেই চিনতো, শংকরনাথও সেই আবহাওয়ায় পিতাকে ছেলেবেলা থেকেই ভয়ের চোখে দেখতে শিখেছিল। বালক-কালে এক-একদিন কেষ্টর সঙ্গে সে অফিসে বেড়াতে যেতো, কিন্তু দূর থেকে শুনতে পেতো হরবিলাস রায় কর্মচারীদের চীৎকার করে শাসন করছেন···সমস্ত অফিস ভয়ে তটস্থ···শংকরনাথ চুপি চুপি কেষ্টকে বলতো, কেষ্টদা, চল, বাড়ি ফিরে যাই! হরবিলাস রায় যখন দিনের কাজ সেরে বাড়ি ফিরতেন, তখন বালক শংকরনাথ তার নিজের ঘরে ঘুমিয়ে থাকতো।

আজ শংকরনাথ স্কুল ছেড়ে কলেজে ভর্তি হয়েছে। কিন্তু আজও পিতাকে তেমনি ভয়ের চোখে দেখে, পিতার কাছে কিছু চাইতে হলে সে সোজা পিতাকে গিয়ে বলে না, বলে কেষ্টকে।

পিতা পুত্রের এই সম্বন্ধের মধ্যে কোথাও যে কোন অস্বাভাবিকতা আছে বা কোন ত্রুটি আছে, তা কোনদিন হরবিলাস রায়ের মনে হয়নি।

আজ সহসা বুঝতে পারেন, কোথায় যেন কি ভুল হয়ে গিয়েছে। পুত্রকে নিবিড়ভাবে, অন্তরঙ্গভাবে কাছে পেতে গিয়ে তিনি বুঝতে পারেন, পিতা-পুত্রের সম্বন্ধের মধ্যে এমন একটা আড়ষ্টতা গড়ে উঠেছে যাকে ডিঙিয়ে সহজ আর অন্তরঙ্গ হওয়া খুবই কঠিন। পুত্রকে একান্ত ভাবে কাছে টানতে গিয়ে দেখেন, পুত্র তাঁর কাছ থেকে বহু দূরে সরে গিয়েছে। অথচ পুত্রের বিরুদ্ধে এতটুকু অভিযোগ করবার তাঁর কিছু নেই। সব কর্মচারী একবাক্যে শংকরনাথের প্রশংসা করে, হরবিলাস রায়কে শুনিয়ে সুযোগ পেলেই তারা বলে, এমন বিনয়ী, এমন শান্ত এমন ভদ্র ছেলে আজকাল দেখা যায় না!

পুত্রের এই প্রশংসা শুনলে হরবিলাস আগে মনে মনে সন্তুষ্ট হতেন কিন্তু ইদানীং পুত্রের এই প্রশংসা শুনলেই মনে মনে ক্ষেপে উঠতেন···আপনার মনে গুমরে উঠতেন···মুখ বুজে ঘাড় হেঁট করে না থেকে, কেন সে দুরন্ত ছেলের মতন তাঁর কাছে এসে দাবি করে না? আজ যে তিনি তাকে সব দেবার জন্যে বসে আছেন, সেখানে যদি সে ঘাড় হেঁট করে চুপ করে থাকে, কি করে তিনি তাকে বোঝাবেন, তাঁর জীবনের একমাত্র আনন্দ থেকে সে তাঁকেই বঞ্চিত করছে!

সেই সময় শহরে বিলেত থেকে এক বিখ্যাত শিল্পীর দল এলো···তাদের নাচগান, অভিনয় দেখবার জন্যে শহর ভেঙে পড়লো।

● বাপ ও ছেলে
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখতে দেখতে হরবিলাসের চোখ জ্বলে উঠলো!

নিজে গিয়ে চারখানা ভাল সীট রিজার্ভ করে টিকিট নিয়ে এলেন···জীবনে এই প্রথম!

বাড়িতে এসে শংকরনাথকে ডেকে পাঠালেন।

শংকরনাথ এসে দাঁড়ালো, গায়ে একটা আধ-ময়লা অতি সাধারণ টুইলের শার্ট, পায়ে একটা স্ট্র্যাপ-ছেঁড়া পুরানো স্লিপার···

শংকরনাথ সাধারণতঃ এই পোশাকেই ঘোরে ফেরে কিন্তু তার অস্বাভাবিকতা কোনদিন হরবিলাসের নজরে লাগেনি···আজ পুত্রকে সেই পোশাকে দেখে হরবিলাস ক্ষেপে উঠলেন, যেজন্যে ডেকেছেন সেকথা ভুলে চাপা রাগে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠলেন,

—তুমি কি লোককে জানাতে চাও, তোমার বাবা তোমাকে খেতে পরতে দেয় না?



হরবিলাস তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠলেন—তুমি কি লোককে জানাতে চাও, তোমার বাবা তোমাকে খেতে পরতে দেয় না?

শংকরনাথ বুঝতেই পারে না, হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন উঠলো, ফ্যাল ফ্যাল করে পিতার মুখের দিকে চেয়ে থাকে!

—আমার অফিসে ঘর ঝাঁট দেয় যে আর্টলু···তারও পোশাক তোমার চেয়ে ভাল!

● বাপ ও ছেলে
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

শংকরনাথ কুণ্ঠিতভাবে নিজের পোশাকের দিকে চায়।

—কেন, আমি তো রোজই এই রকম পরি···

হরবিলাস চীৎকার করে ওঠেন, কেন পরো? তোমার বাবার কি এমন পয়সার অভাব··· কেষ্ট! কেষ্ট!

কেষ্ট এসে দাঁড়ায়।

হরবিলাস গর্জে ওঠেন, শংকরবাবুর জামা-কাপড় নেই, সেকথা আমাকে বলো না কেন? কিসের জন্যে তুমি আছ? কাজ করতে যদি আর ভাল না লাগে, পেনসন নিয়ে বাড়ি চলে যাও!

কেষ্ট কিছু না বলে, ঘরের ভেতর এসে আলমারিটা খোলে।

—দেখুন, আলমারি ভর্তি জামা-কাপড়···না পরলে, আমি কি করবো বলুন?··· আর তো ছোট-টি নেই যে জোর করে পরিয়ে দেবো!

হরবিলাস দেখেন, বৃহৎ আলমারি ভর্তি থাকের পর থাক, কাপড়, জামা, কোট, প্যাণ্ট···

পুত্রের দিকে চেয়ে দেখেন, দেখেন শংকরনাথ মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে···সারা মুখ যেন তার থম্ থম্ করছে!

—এ সব কাপড়-জামা যদি না পর, তৈরি করিয়েছ কেন?

শংকরনাথ একান্ত শান্তকণ্ঠে বলে, আমি তৈরি করাইনি!

পুত্রের সেই শান্ত প্রতিবাদের মধ্যে হরবিলাস মহা-আতঙ্কে উপলব্ধি করেন···যেন তাঁর পুত্র আর তাঁর মাঝখানে মহা-ভয়ংকরের মতন কে দাঁড়িয়ে!

হরবিলাস কণ্ঠস্বরকে সংযত করে বলেন, তুমি তৈরি করাওনি, সে আমি জানি···কিন্তু তোমার জন্যেই এই সব তৈরি হয়েছে, তা তো জান!

তেমনি শান্ত নম্রকণ্ঠে শংকরনাথ বলে, এ সব জামা-কাপড়···আমার কোন দরকার নেই!

হরবিলাস জামার পকেটে বিলিতী থিয়েটারের টিকিটগুলো আঙুল দিয়ে মুচড়ে দুমড়ে ফেলেন। পড়ো-বাড়ির ভেতর ঝড়ো হাওয়ার আর্তনাদের মতন তাঁর মনে আর্তনাদ করে ওঠে সেই দুটি কথা—দরকার নেই!

সামান্য জামা-কাপড়ের যার দরকার নেই—তার জন্যে মনে মনে তিনি যে বিরাট ঐশ্বর্যের নৈবেদ্য সাজিয়েছেন···

হরবিলাস রায় আর ভাবতে পারেন না। একবার চেষ্টা করলেন জিজ্ঞাসা করতে, কেন দরকার নেই? কিন্তু পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে সাহসে কুলোলো না, যদি এর চেয়ে কোন অপ্রিয় কথা···

● বাপ ও ছেলে
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

গম্ভীরভাবে শুধু বল্লেন, যাও!

শংকরনাথ চলে গেলে, পকেট থেকে চারখানা টিকেট বার করে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে জানালা দিয়ে ফেলে দিলেন।

[৬]

সারারাত হরবিলাস রায় ঘুমুতে পারলেন না···

তাঁর মনের কোণে একটা অস্পষ্ট ভাবনার ছায়া-মূর্তি জেগে ওঠে···শংকরনাথ কি তাঁর অজ্ঞাতে কোন রাজনৈতিক দলের প্রভাবে পড়েছে? তার মতন ব্যক্তিত্বহীন নরম-ছাঁচের ছেলের পক্ষে কোন রাজনৈতিক নেতার প্রভাবে পড়া আশ্চর্য নয়···বিশেষ করে আজকাল, য়ুরোপ থেকে আমদানি হয়েছে সাম্যবাদ···

হরবিলাস রায় অন্ধকারে বিছানায় উঠে বসেন—

হঠাৎ মনে পড়ে, অফিসের জানলা থেকে সেদিন দেখেছেন এই রকম এক সাম্যবাদী দলের শোভাযাত্রা···শোভাযাত্রীদের পোশাক ঠিক শংকরের পোশাকের মতন, গায়ে আধ-ময়লা শার্ট, পায়ে ছেঁড়া শ্লিপার···

হরবিলাস রায় ভয়ে শিউরে ওঠেন।

মাইনে-করা লোক রেখে তিনি ভেবেছিলেন, ছেলের সম্বন্ধে যা করা কর্তব্য তা তিনি ঠিকই করে চলেছেন···আজ নিদ্রাহীন নিশীথে স্পষ্ট বুঝতে পারেন, যে সঙ্গ পুত্রকে দেওয়া উচিত ছিল, তা তিনি দেননি···সেই ফাঁকে তাঁর পুত্র তাঁর কাছ থেকে বহু দূরে সরে গিয়েছে···

ভারতবর্ষের অরণ্যে অরণ্যে কোথায় কি কাঠ আছে, তা তিনি নিখুঁতভাবে জানেন কিন্তু তাঁর নিজের ছেলের, একমাত্র ছেলের, মনের খবর কিছুই জানেন না···

প্রতিজ্ঞা করেন, এ ত্রুটি সংশোধন করতে হবে···এমন কার এত প্রভাব, কিসের এত প্রভাব যে তাঁর ছেলেকে তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে?

[৭]

চিরকাল প্ল্যান করে কাজ করে এসেছেন এবং প্রত্যেক প্ল্যানই তিনি সার্থক করে তুলেছেন···

রায় এণ্ড রায় কোম্পানির সমস্ত কাজ ভুলে তিনি মনে মনে প্ল্যান করেন, কি করে শংকরনাথকে তাঁর আয়ত্তের মধ্যে আনবেন···ধীরে ধীরে শংকরনাথকে তাঁর চেয়ারে বসিয়ে তিনি অবসর নেবেন···

● বাপ ও ছেলে
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

যেটুকু জীবন অবশিষ্ট আছে, প্রতিটি মুহূর্ত তার আনন্দে উপভোগ করবেন···উপভোগ করবেন, তাঁর পুত্রের আনন্দের ভেতর দিয়ে···

ঠিক করলেন, ঘটা করে শংকরনাথের জন্মতিথি পালন করবেন···

বাগান করবেন বলে গঙ্গার ধারে বিরাট এক বাগানবাড়ি কিনেছিলেন···গোড়ায় গোড়ায় ছুটির দিন সেখানে যেতেন···কিন্তু আজকাল আর ভুলেও সেদিকে যান না···মালীরা মাঝে মাঝে নানারকমের তরকারি পাঠিয়ে দেয়, তাতেই তিনি খুশি···

ঠিক করলেন, এই বাগানবাড়িতেই শংকরনাথের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে উৎসবের আয়োজন করবেন···

নিবারণবাবুকে পাঠিয়ে দিলেন, বাগান পরিষ্কার করাতে।

নাম-করা ডেকরেটর মান্না কোম্পানিকে ডেকে পাঠালেন, শামিয়ানা, চেয়ার-টেবিল ইত্যাদি দিয়ে বাগান সাজাতে···

শংকরনাথকে ডেকে পাঠিয়ে বল্লেন, তোমার বন্ধু-বান্ধবদের একটা লিস্ট আমাকে দাও! এবার তোমার জন্মতিথিতে তাদের সকলকে নেমন্তন্ন করো···প্রতুলবাবুকে দিয়ে একটা ভাল ডিজাইন করিয়ে নিয়ে কার্ড ছাপাও···লেটেস্ট ভাল ছবি, কি দেখানো হচ্ছে?

উল্লসিত হওয়া দূরে থাক, শংকরনাথের মুখের দিকে চেয়ে হরবিলাস বুঝলেন যেন সে নিজেকে বিপন্ন বোধ করছে!

হরবিলাস চেষ্টা করে শান্তকণ্ঠে বলেন, ও রকম বোকার মতন মুখ করে আছ কেন?

শংকরনাথ কোন রকমে বলে, আমার জন্মতিথির দিন···আমি···বরানগরে যাব···

—বরানগরে যাবে? কেন?

—সেখানে···স্বামীজীর আশ্রমে···

হরবিলাস রায় চীৎকার করে ওঠেন, কি বল্লে?

ভীত শুষ্ক কণ্ঠে শংকরনাথ বলে, বরানগরে স্বামীজীর আশ্রমে যাব···

হরবিলাস রায়ের মনে আতঙ্কের যে ছায়ামূর্তি ছিল, তা যেন স্পষ্ট রূপ ধরে সামনে জেগে ওঠে। সারা গা দিয়ে যেন আগুনের হল্‌কা উঠতে থাকে। সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে ভেতর থেকে নিজেকে সংবরণ করে নিয়ে শান্ত স্বাভাবিক কণ্ঠে হেসে বলেন, ওঃ···ভালই তো··স্বামীজীর আশ্রমে না হয় আর একদিন যাবে···

পিতার মুখে হাসি দেখে সহজ সরল শংকরনাথের মনে সাহস ফিরে আসে, সহজভাবেই বলে, অন্য দিন গেলে হবে না বাবা···সেদিন আমার জন্যেই স্বামীজী হোম করবেন···হোম না হওয়া পর্যন্ত আমাকে উপোস দিয়ে থাকতে হবে বলেছেন···

● বাপ ও ছেলে
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

হরবিলাস রায় তেমনি হেসে বলেন, এই স্বামীজীর কাছে তুই প্রায়ই যাস্ বুঝি ?

আশ্বস্তভাবে শংকরনাথ বলে, হ্যাঁ···তিনি আমাকে খুব ভালবাসেন···

—কই, তাঁর কথা তো আমাকে কিছু বলিস্ নি কোনদিন ?

—তুমি রাগ করবে বলে, বলিনি !

—কি করে জানলি যে আমি রাগ করবো ?

শংকরনাথ কোন জবাব দিতে পারে না।

তেমনি শান্তকণ্ঠে হরবিলাস জিজ্ঞাসা করেন, জন্মতিথির দিন চিরকাল হয়ে আসছে, ছেলেকে ছত্রিশ ব্যঞ্জন দিয়ে খাইয়ে বাপ্-মার আনন্দ···অতি গরীব যে, সে-ও সেদিন ছেলেকে ভাল-মন্দ যা হোক্ খাওয়াতে চেষ্টা করে, সেদিন তুমি উপোস দেবে কেন ?

শংকরনাথ উৎসাহিতভাবে বলে, তিনি বলেছেন !

হরবিলাস রায় আর নিজেকে সংযত করে রাখতে পারেন না। ক্রুদ্ধ সিংহের মতন গর্জন করে ওঠেন, তিনি যে-ই হোন্, তিনি যদি স্বয়ং ভগবানও হন···আমার হুকুম, জন্মতিথির দিন তুমি এক-পা বাড়ি থেকে বেরুতে পাবে না···যদি অবাধ্য হও, পায়ে শিকল-দিয়ে ঘরে বন্ধ করে রাখবো···যাও ! যাও, আমার সামনে থেকে !

এতক্ষণে হরবিলাস রায় বুঝতে পারেন পুত্র শংকরনাথের ময়লা শার্ট আর ছেঁড়া স্লিপারের রহস্য !

বোঝার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে শিউরে ওঠেন।

আজ তাঁর একান্তভাবে দরকার তাঁর ছেলেকে···যে-আনন্দ নিজে কখনো ভোগ করেন নি, আজ পুত্রের মুখ দিয়ে সে-আনন্দ ভোগ করবেন···তার জন্যে মনে মনে হাজার রকমের নৈবেদ্য সাজিয়ে রেখেছেন···এর চেয়ে সহজ আকাঙ্ক্ষা আর কি হতে পারে ?

কল্পনাও করতে পারেননি, এই সব-চেয়ে-সহজ আকাঙ্ক্ষার পথে বাধা হবে, ধর্ম !

বহু শত্রুর সঙ্গে লড়াই করেছেন কিন্তু এ শত্রুর সঙ্গে কি করে লড়বেন, তার কোন সন্ধানই জানেন না !

নিজেকে নিতান্ত অসহায় লাগে।

তীব্র বেদনায় তাঁর অন্তর থেকে প্রশ্ন জেগে ওঠে !

যে গাছ ছায়া দিতো, ফল দিতো, ফুল দিতো, সে-গাছকে কেটে যারা উনুন জ্বালায় তাদের বিরুদ্ধে আইন আছে······

অকালে জীবনকে যারা কেটে শুকিয়ে ফেলে তাদের বিরুদ্ধে আইন নেই কেন ?

● বাপ ও ছেলে

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

[৯]

এতদিন যা করেননি, আজ তা করতে বাধ্য হলেন হরবিলাস রায়···

পুত্র সম্বন্ধে তন্ন তন্ন করে খবর নিলেন।

শংকরনাথের বালিসের তলা থেকে একটা ফটো পেলেন, বাঘের চামড়ার ওপর বসে এক স্বামীজী !

ধমক খেয়ে কেষ্ট বল্লো, ঘরে খিল দিয়ে খোকাবাবু এই ফটো বার করে তার সামনে চোখ বুঁজে বসে থাকে !

জেরা করতে ক্রমশঃ সে প্রকাশ করলো, খোকাবাবু মাংস খাওয়া অনেকদিন হলো ছেড়ে দিয়েছে···ইদানীং বড় মাছ হলে আর খায় না···ছোট ছোট চুনো পুঁটি হলে খায়·· জুতোতে কালি দিলে চটে যায় ···সাবান মাখে না··· স্নান করে চুল আঁচড়ায় না···রবিবার দিন কারুর সঙ্গে কোন কথা বলে না···সে দিন কেষ্টকে আকারে ইঙ্গিতে বুঝে নিতে হয় খোকাবাবু কি বলছে···



হরবিলাস গর্জে ওঠেন, এসব কথা তুই আমাকে জানাস্‌নি কেন ?

হরবিলাস গর্জে ওঠেন, এসব কথা তুই আমাকে জানাস্‌নি কেন ?

কেষ্ট বলতে বাধ্য হয়, এসব কথা যদি আপনাকে জানাই, তাহলে খোকাবাবু বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে বলেছে !

প্রচণ্ড রাগে হরবিলাসের সারা শরীরটা কেঁপে ওঠে, কিন্তু কার ওপর রাগ করবেন বুঝতে পারেন না!

সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়লো স্ত্রীর ওপর···সংসারে নেমে এলো অশান্তির ঘন কালো ছায়া।

বাড়ির ভেতরে যখনি যান, শংকরনাথের দেখা পান না। তীব্র বেদনায় বুঝতে পারেন, তাঁর পায়ের শব্দ পেলেই শংকরনাথ সরে যায়!

ঠিক করলেন, যত শীগ্‌গির পারেন ছেলের বিয়ে দেবেন!

কিন্তু স্ত্রীর মুখে শুনলেন, ছেলে বলেছে বিয়ে সে কিছুতেই করবে না!

আহত বাঘের মতন হরবিলাস রায় ভয়ংকর হয়ে ওঠেন···অফিসে চুপটি করে বসে থাকেন, কোন কাজ-কর্ম করেন না···নিবারণবাবু একটা অত্যন্ত দরকারি কাজের জন্যে ফাইল নিয়ে গিয়েছিলেন···ফাইলের দিকে চেয়েও দেখেননি···সমস্ত কাজ স্বাদহীন লাগে···জানলা থেকে মুখ বাড়ালেই নজরে পড়ে, বিরাট কাঠের গোলা।···সেই দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হয়, যেন কাঠের গোলায় আগুন লেগে গিয়েছে···চারদিক থেকে ধোঁয়া উঠছে···

এক একবার শুধু মনের ভেতর অসীম কৌতূহল জেগে ওঠে, শংকরনাথ কি বিন্দুমাত্র বুঝতে পারছে না, অকারণে কি নিদারুণ ব্যথা তাঁকে দিচ্ছে?

[১০]

শংকরনাথের জন্মদিনে ঘুম থেকে উঠেই হরবিলাস ছেলেকে ডেকে পাঠালেন···

সারারাত ঘুমোতে পারেননি, একটা সিদ্ধান্তের জন্যে ছটফট করেছেন···শেষকালে ঠিক করেন, সে যদি আজ স্বামীজীর আশ্রমে যেতে চায়, তিনি বাধা দেবেন না···

কেষ্ট এসে জানালো, খোকাবাবু বাড়িতে নেই!

—কোথায় গিয়েছে?

শুষ্ককণ্ঠে কেষ্ট কোনরকমে বলে, কাল রাত্তিরে বাড়ি ফেরেনি!

হরবিলাস যেন কিছু বুঝতে পারেন না।

শান্তকণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করেন, রাত্তিরে বাড়ি ফেরেনি, কে?

তেমনি শুষ্ককণ্ঠে কেষ্ট বলে, খোকাবাবু!

হরবিলাস রায় গর্জে ওঠেন না, চীৎকার করেন না, কেষ্টকে কোন রূঢ় কথা বলেন না···

তাঁর ছেলে রাত্তিরে বাড়ি ফিরে আসেনি···তাঁর জন্যেই!

হরবিলাস রায় হেসে ওঠেন!

● বাপ ও ছেলে

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

একা ঘরে কোথা থেকে কান্নার জোয়ার তাঁর সারা দেহকে কাঁপিয়ে তোলে···ছোট ছেলের মতন কেঁদে ওঠেন !

এত বড় পরাজয় তিনি কি করে মেনে নেবেন ?

[১১]

গাড়ি করে হরবিলাস রায় বরানগরে আসেন, স্বামী নিগমানন্দের মঠের সামনে এসে গাড়ি থামাতে বলেন।

গাড়িতে বসে তিনি খোলা দরজার ভেতর দিয়ে আশ্রমের দিকে চেয়ে দেখলেন,···দেখলেন আসা তাঁর সার্থক হয়েছে···গাড়ির আকর্ষণে সঙ্গে সঙ্গে আশ্রম প্রাঙ্গণের ভেতর ছোটাছুটি শুরু হয়ে গিয়েছে।

সামনেই খানতিনেক ছিটে-বেড়ার ঘর, মাঝখানে ছোট্ট বাগানের মতন খানিকটা জায়গা, তার ওপারে সান-বাঁধানো চত্বরের ওপর ছোট মন্দির···অসমাপ্ত···মন্দিরের গায়ে ভারা বাঁধা রয়েছে···

হরবিলাস দেখলেন, চত্বরের সিঁড়ি দিয়ে প্রায়-বৃদ্ধ সৌম্য-দর্শন এক সন্ন্যাসী খড়ম পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে আসছেন···

হরবিলাস গাড়ি থেকে নামেন।

সন্ন্যাসী সামনে আসতেই হরবিলাস হাত তুলে নমস্কার করেন ··

মধুর হেসে সন্ন্যাসী বলেন, চিনতে পারলাম না !

হরবিলাস বলেন, আপনার দর্শন-প্রার্থী !

—আসুন ! আসুন !

সন্ন্যাসী সমাদর করে হরবিলাসকে নিয়ে মন্দিরের চত্বরে বসেন। ইতিমধ্যেই একজন ভক্ত দুখানি ভাল আসন সেখানে পেতে দিয়েছিল। একজন একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন এনে রাখে।

হেসে সন্ন্যাসী বলেন, দরিদ্র আশ্রম, এখনো ইলেকট্রিক্ আলো নিতে পারিনি !

হরবিলাস সে-প্রসঙ্গ না তুলে বলেন, আপনিই কি···

সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে একজন প্রৌঢ় লোক মুখস্থ বলার মতন বলে ওঠেন, উনিই শ্রীশ্রীস্বামী নিগমানন্দ মহারাজ···এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা···আমাদের রক্ষাকর্তা !

শেষের কথাগুলো বলতে ভদ্রলোকের গলা যেন কেঁপে ওঠে।

বাপ ও ছেলে
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

হরবিলাস স্বামীজীর দিকে চেয়ে বলেন, আপনার কাছে এক আবেদন নিয়ে এসেছি···কিন্তু···

হরবিলাস আশেপাশের ভক্তদের দিকে চাইতেই স্বামীজী তাঁদের একজনকে ডেকে বলেন, মধুসূদন, তোমরা এখন···

কি ইঙ্গিত করেন, সঙ্গে সঙ্গে ভক্তরা সরে যান।

হরবিলাস সোজাসুজি বলেন, বুঝতেই পারছেন সারাজীবন ধনই সঞ্চয় করেছি··কিন্তু শান্তি পাইনি···আপনার কাছে আমার কিছু জানবার আছে···

স্বামীজী উল্লসিতভাবে বলেন, বেশ তো···বেশ তো···যদি আমার দ্বারা আপনার কোন কাজ হয়···

—হবেই···তবে তার আগে আপনাকে আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে হবে···আপনাকে একদিন আমার ওখানে আসতে হবে··আপনার সেবার কোন ত্রুটি হবে না···সেখানেই আমার কথা আপনাকে নিবেদন করবো!

স্বামীজী সহজেই রাজী হয়ে গেলেন।

[১২]

নির্দিষ্ট দিনে হরবিলাস মোটর পাঠিয়ে দিলেন। মোটরে গেলেন নিবারণবাবু···নিবারণবাবুকে তিনি শিখিয়ে দিলেন, তিনি যেন কোন কথাই না বলেন।

অফিসে তাঁর বিশ্রাম-কক্ষে স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করবার বিশেষ ব্যবস্থা করেন।

নিজে স্বামীজীকে মোটর থেকে নামিয়ে তিনি সঙ্গে করে নিয়ে এলেন।

ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিলেন।

হরবিলাসের সৌজন্যে স্বামীজী মুগ্ধ হলেন।

প্রাথমিক কথাবার্তার পর হরবিলাস সোজাসুজি তাঁর কথা পাড়লেন,

—আমার একটি ছেলে আছে, বড় সরল···এই যে দেখছেন আমার ব্যবসা···তিনপুরুষের সাধনায় তা গড়ে উঠেছে···প্রায় হাজার খানেকের মত লোক এই প্রতিষ্ঠান থেকে অন্ন পায়··· আমার সাধ, আমার ছেলে এই বিরাট কর্ম-প্রতিষ্ঠানের ভার নেবে···আমি আনন্দে অবসর নেবো···

স্বামীজীর ভ্রূ-টা একটু কুঁচকে ওঠে, জিজ্ঞাসা করেন, তাতে বুঝি কোন বাধা উপস্থিত হয়েছে?

● বাপ ও ছেলে
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

—আজ্ঞে হ্যাঁ···আজকাল তো চেনেন, দেশে ধর্ম-ব্যবসায়ী সাধু-সন্ন্যাসীর অভাব নেই··· এই রকম কোন সাধুর পাল্লায় আমার ছেলেটি পড়েছে এবং সাধুর শিক্ষায় তার তরুণ মন একেবারে কর্মবিমুখ হয়ে গিয়েছে···আপনিই বলুন, যে ধর্ম তরুণ মনকে কর্মবিমুখ করে, সে কি ধর্ম?



হরবিলাস স্থিরকণ্ঠে বলেন, তিনি আমার সামনেই বসে আছেন!

মহারাজ কোথায় যেন অস্বস্তি বোধ করেন, তবুও বলেন,

—না, না······আমাদের ধর্মে কর্মকে মস্ত বড় স্থান দেওয়া হয়েছে······উপযুক্ত ভাবে কর্ম শেষ করলে, তবে সন্ন্যাসী···

হরবিলাস বলেন, যদি কেউ সন্ন্যাস না নেয়, সে কি সংসারে থেকে ধর্ম-পালন করতে পারে না?

মহারাজ অতিরিক্ত জোর দিয়ে বলেন, অবশ্যই পারে নিশ্চয়ই পারে!

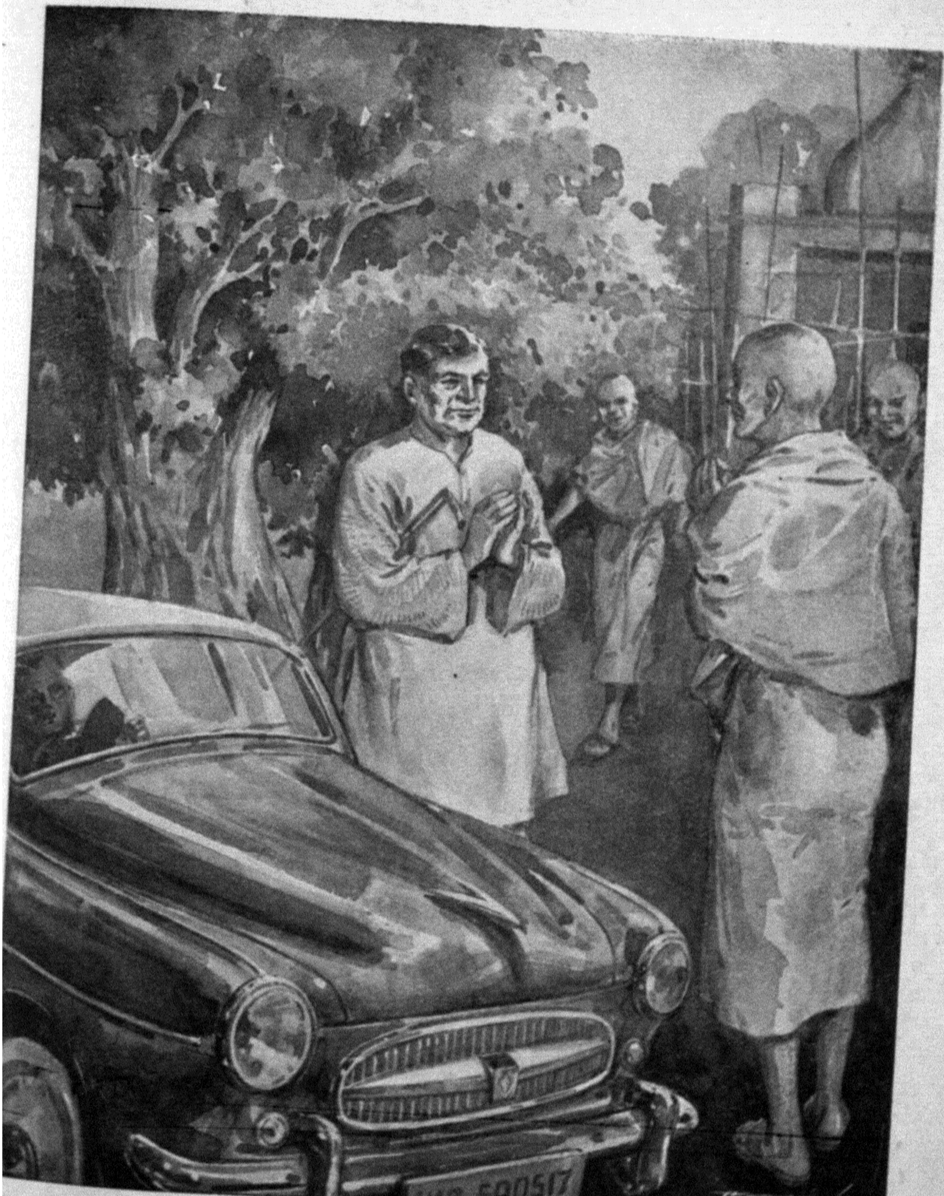
—অথচ সেই সাধুটির পাল্লায় পড়ে আমার ছেলের ধারণা হয়েছে যে বিয়ে করাও অন্যায়!

মহারাজ ভ্রূ কুঁচকে বলেন, না···না···এ তো ঠিক নয়···যে সময়ের যা···সে সাধুটি কে?

হরবিলাস স্থিরকণ্ঠে বলেন, তিনি আমার সামনেই বসে আছেন!

নিগমানন্দ মহারাজের মুখ শুকিয়ে যায়, তবুও নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন,

বাপ ও ছেলে
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়



হরবিলাস হাত তুলে নমস্কার করেন

[পৃষ্ঠা—৯৪

—আপনি কি বলছেন?

—আমার ছেলে শংকরনাথ আপনার আশ্রমেই যাতায়াত করে...

বহু চেষ্টায় যেন মহারাজের স্মরণে পড়ে,—হাঁ, হাঁ, শংকরনাথ...মনে পড়ছে বটে। একটি ছেলে মাঝে মধ্যে আসে বটে। আমি মনে করেছিলাম সাধারণ গরীবের ছেলে...

হরবিলাস বুঝতে পারেন, দায়ে পড়ে মহারাজ মিথ্যা কথা বলছেন। তাই ব্যঙ্গ করে বলেন, সেই তার জন্মদিনে ঘটা করে যজ্ঞ করেছিলেন?

নিত্যানন্দ মহারাজ আর বসে থাকতে পারেন না, উঠে দাঁড়ান।

—দেখুন, ডেকে এনে আপনি এভাবে আমাকে

—বিচলিত হবেন না...আপনাকে অপমান করবার জন্যে ডাকিনি। আপনাকে সাহায্য করবার জন্যেই ডেকেছি...কত টাকা হলে আপনার আশ্রমের অসমাপ্ত কাজ শেষ হয়?

মহারাজ ভেতরে ভেতরে আশ্বস্ত হন। মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

—সে তো অনেক টাকা হবে...পনেরো...কি বিশ হাজার মতন।

—আমি এখুনিই আপনাকে দিচ্ছি...আপনি শুধু কথা দিন

হরবিলাসের কথা শেষ না হতেই উৎসাহভরে মহারাজ বলে ওঠেন, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি। শংকরনাথকে আর আমি আশ্রমেই আসতে দেবো না...

—আপনি বসুন, আমি চেক নিয়ে আসছি...

তিনপুরুষে ব্যবসায়ী ঘরের বাইরে এসে দেখেন, নিবারণবাবুর সঙ্গে শংকরনাথ দাঁড়িয়ে......

শংকরনাথ ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে ....

নিবারণবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে হরবিলাস ইচ্ছা করেই শংকরনাথকে দরজার কাছে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন,...যাতে সে নিজের কানে তার আরাধ্য গুরুর কথা শুনতে পায়।

হরবিলাস রায় তাঁর চেয়ারে বসে চেক লিখছেন।

নীরবে শংকরনাথ ঘরে ঢোকে।

শান্তকণ্ঠে হরবিলাস জিজ্ঞাসা করেন, কি ব্যাপার শংকর?

শংকর টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে বলে, এ চেক আপনি দেবেন না!

হরবিলাস দেখেন শংকরনাথের চোখ ছল্ ছল্ করছে।

শান্তকণ্ঠে বলেন, তাতে কি হয়েছে? ব্যবসায়ে লাভ-লোকসান দুই-ই আছে! আর এতে আমার লোকসান তো হবে না...লাভই হবে!

চেক হাতে নিয়ে হরবিলাস রায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বুনো আতা



—শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

বুনো আতার ঝোপ থেকে খাবার উপযুক্ত দু-একটা আতা সংগ্রহ করা যায় কি না এই মহাকার্যে নবীন ছিল ব্যস্ত। ঝড়ের মতো ছুটে এসে অভী বল্লে—খবর শুনেছিস্?

নবীন এতক্ষণ খুঁজে পাকা আতা একটিও পায়নি। পাকবার সময় এখনও হয়নি বলে। সে আতার প্রয়াস ছেড়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে গা থেকে কুটোকাটা ঝাড়তে ঝাড়তে বল্লে—কি খবর?

—ধূলোল গাঁয়ে মস্ত মেলা হবে, সামনের পূর্ণিমের দিন।

—বলিস্ কি রে?

—হ্যাঁ, শুনে এলুম এইমাত্র। শুনেই তোকে খবর দিতে এলুম।

ধূলোল গ্রামের পক্ষে, বিশেষতঃ ধূলোল কলোনির ছেলেমেয়েদের পক্ষে এ একটা মস্ত খবর। এ রকম ঘটনা ধূলোল গ্রামের ইতিহাসে কখনো ঘটেনি—এই প্রথম ঘটছে।

ধূলোল গ্রাম থেকে পাঁচ মাইল দূরে ধূলোল কলোনি। পথটা একখানা পাহাড়ের নীচে দিয়ে চক্রাকারে ঘুরে গ্রামের সঙ্গে কলোনিকে যোগ করেছে।

এই পথ দিয়ে যাতায়াত করে পাথর বোঝাই মাল বোঝাই লরি আর জীপ্।

পথটা চক্রাকার বলেই গ্রাম থেকে কলোনির আসল দূরত্ব মোটেই পাঁচ মাইল নয়— পাহাড়টা টপ্‌কে কর্পূর বনের মধ্যে দিয়ে এক মাইলও নয় পায়ে-চলা রাস্তাটুকু। গাঁয়ের লোক কলোনিতে এবং কলোনির লোক গাঁয়ে এই পথেই যাতায়াত করে। বাঁধানো রাস্তায় যায় খনি-ভাঙা পাথর লরি বোঝাই হয়ে আর খনির কর্তাদের জীপ্-গাড়ি।

কিসের খনি, কোথায় যায় খনি-ভাঙা পাথর এ সম্বন্ধে নবীনের, অভীর এবং তাদের মতো ছেলেমেয়েদের ধারণা খুব অস্পস্ট। তারা শুনেছে এই পাথর গুঁড়িয়ে নাকি আলুমিনিয়ামের বাসন তৈরী হয়। কিন্তু সত্যিই হয় কি না এ বিষয়ে তাদের সন্দেহ আছে। তা ছাড়া এ নিয়ে বিশেষ কেউ মাথাও ঘামায় না। কলোনির ছেলে মেয়েদের কাছে খনির বা খনির কাজের বিশেষ আকর্ষণ নেই। তাদের মনোজগতকে অধিকার করে আছে ধূলোল কলোনির চারিপাশের বন্য-প্রকৃতি। পাহাড় আর বন, পাখি আর পাখালী, খোলা আকাশ, মেঘের খেলা, রোদের মেলা, ফুল আর লতা, ঝোপ ঝাপ ঘাসের বন এ সব তাদের নিজস্ব। এ ছাড়া কর্পূর বনের মধ্যে আছে ঝরনা, সেখানে চুপিসাড়ে বসে থাকলে হরিণ দেখা যায়। আর আছে বনের মধ্যে বড় বড় মৌচাক—যারা সন্ধান জানে তারা চাক-ভাঙা মধু নিয়ে ঘরে ফেরে।

ধূলোল কলোনিতে কোনো ইস্কুল নেই। বনের মাটি ফুঁড়ে গজিয়ে উঠেছে এই কলোনি সবে পাঁচ বছর। যে ক-ঘর লোক এখানে খনির কাজ নিয়ে এসে বাসা বেঁধেছে তারা বেশীর ভাগই সংসার ঘাড়ে করে এখানে নিয়ে আসেনি। যারা এসেছে তারা নগণ্য কয়েক ঘর মাত্র, যেমন নবীন আর অভীর বাপ-মারা। শুধু এদের ছেলেমেয়েদের জন্যে তো একটা ইস্কুল হতে পারে না। কাজেই এদের ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে পড়ে না, পড়ে বনের পাঠশালায়। নবীন খুঁজে ফেরে বুনো আতা, সোনালী পাখি আর বাবলার ঝোপে কাঠ-বিড়ালির বাচ্চা। অভী মৌমাছির পিছনে ছুট দিয়ে খুঁজে বার করে মধু-ভরা ছোট বড় চাক। কর্পূর বনের পথ দিয়ে ধূলোল গ্রামেও তারা যায়। কিন্তু সে শুধু বেড়াতে যাওয়া—হাঁটতে হাঁটতে বনের পথে গ্রামে পৌঁছে যাওয়া। গ্রামের মধ্যে এমন কিছুই নেই যা অভী-নবীনকে আকর্ষণ করে। তাদের মন পড়ে থাকে কর্পূর বন আর তার আশপাশের পাহাড়ী জঙ্গলের মধ্যে।

পূর্ণিমার দিনে ধূলোল গ্রামে মেলা বসার খবরটা তাই এমনই চমকপ্রদ যে নবীন আর অভীর চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীর রূপই বদলে গেল।

● বুনো আতা
শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

—কি থাকে রে মেলায় ?

—কে জানে কি থাকে। শুনি তো অনেক কিছু থাকে। ভাজাভুজির দোকান, খেলনার দোকান।

—হ্যাঁ রে, জিলিপি পাওয়া যাবে মেলায় ?

—নিশ্চয় যাবে। তিলেখাজাও আসবে। কাঠের ঘোড়াও তো থাকে মেলায়, না রে ?

—কোনগুলো ? সেই যে-গুলোতে চড়ে পাক খায় ? কত করে নেয় রে ?

—এক পয়সা করে। নাগর-দোলা নেয় দু-পয়সা।

—একটা বাঁশি কিনতে হবে মেলা থেকে। শিখবো ভেবেছি। ঐ যে ধূলোল গাঁয়ের কুলিগুলো যেমন বাজায় ? কি করে শেখা যায় বল তো ?

— কুলিগুলোকে বল্লেই শিখিয়ে দেবে—ও আর কি !

—না রে, আমি ওদের মতো সুর বাজাতে চাই।

— ও-ও ওরা শিখিয়ে দেবে।

নবীন আর অভীর মন রঙে রঙে রঙিন হয়ে গেল। অমন যে বন, হরিণের পায়ের ছাপ-ভরা ঝরনার তীর, সবই গেল তাদের চোখের সামনে থেকে লুপ্ত হয়ে। উঠতে বসতে কেবল তাদের কথা—কবে মেলা বসবে, কোথায় মেলা বসবে।

মেলার দিন অবশেষে এল। বাড়ি থেকে দু-জনে একটা করে টাকা পেল। অভীর আরো খুচরো ক-আনা জমানো ছিল সেগুলোও সঙ্গে নিলে। মেলার খরচ, বলা যায় না তো, কখন কি চোখে পড়ে। কর্পূর বনের মধ্যে দিয়ে ধূলোল গ্রামে যাবার পথে অভী বললে—হ্যাঁ রে, মেলায় ম্যাজিক আসে না ?

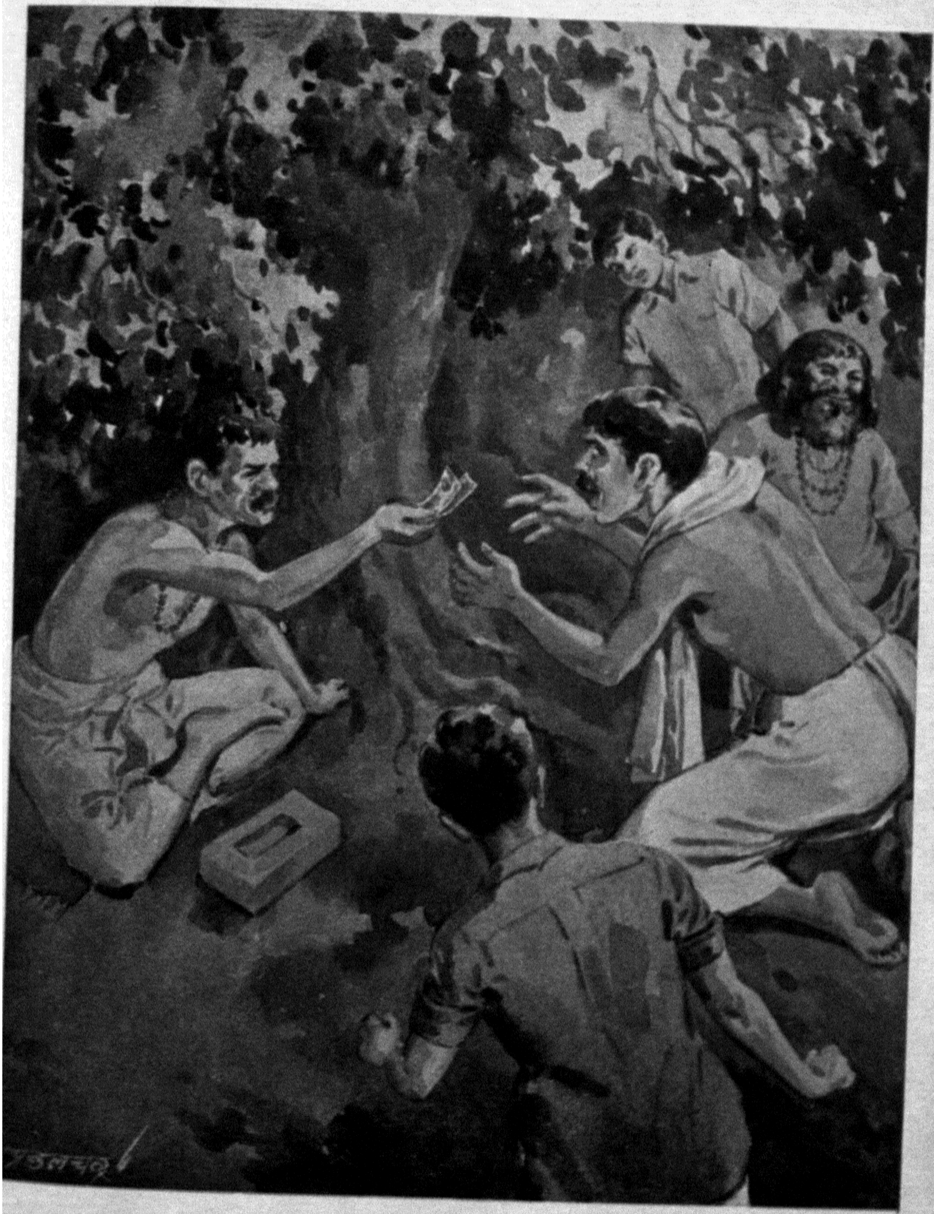
—কিসের ম্যাজিক ? তাসের ম্যাজিক ?

—না রে, তাসের খেলা তো সন্তোষ কাকা-ও দেখাতে পারে। কাটা-মুণ্ডু কথা কইবে, পেটির মধ্যে থেকে মানুষ উড়ে যাবে। যাবি দেখতে ?

—যেতে পারি।

মেলায় পৌঁছে নবীন আর অভী তাজ্জব হয়ে গেল। এতগুলো মানুষই তারা একসঙ্গে দেখেনি। আর কি-সব মানুষ—কেউ কারুর দিকে তাকায় না। সবাই করে ধাকাধাকি ঠেলাঠেলি। সারি সারি কত দোকান বসে গেছে। কতরকম গন্ধ, কতরকম আওয়াজ, কতরকম সুর। পাক-খাওয়া কাঠের ঘোড়া, নাগর দোলা সবই আছে কিন্তু অভী খুঁজে বেড়াচ্ছে তখন ম্যাজিক। কোথায় ম্যাজিকওয়ালা ? কোথায়

● বুনো আভা
শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়



শাগরেদ ইঁটের নীচে থেকে ছটো নোট বের করে এগিয়ে ধরল [পৃষ্ঠা—১০৩

সে তার পসার জমিয়েছে? মেলার এক-প্রান্ত থেকে আর এক-প্রান্ত পর্যন্ত খুঁজেও তারা ম্যাজিকওয়ালাকে পেল না।

নবীন বল্লে—ম্যাজিক আসেনি, চল্ ঘোড়ায় চড়ে পাক খাবি।

এমন সময় অভীর হঠাৎ চোখে পড়ল একটা ডাল-পালা ছড়ানো গাছের তলায় চট বিছিয়ে একজন দাড়িওয়ালা লোক বসে রয়েছে—তার সামনে অদ্ভুত সব জিনিস। মড়ার খুলি, গোসাপের চামড়া, হরেক রকম শিশি, মরা সাপ, গিরগিটি, নাম-না-জানা কতরকম সরীসৃপ আর টুকরো টুকরো হাড়, শুকনো ডাল শিকড় পাতার স্তূপ।



চট বিছিয়ে একজন দাড়িওয়ালা লোক বসে রয়েছে—তার সামনে অদ্ভুত সব জিনিস।

অভী নবীনকে টেনে নিয়ে বল্লে—দেখছিস্?

মড়ার খুলি দেখে অভীর মনে হয়েছিল লোকটা হয়তো জাদুকরই হবে কিন্তু কাছে গিয়ে শুনলে হাটের বদ্যি। ওর কাছে সব রোগের ওষুধ পাওয়া যায়।

শুনে তারা চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ দুজন লোকের ফিস্ফিস্ কথা শুনে তারা থমকে দাঁড়াল। তারা

● বুনো আতা
শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

বলাবলি করছে যে দাড়িওয়ালা লোকটা একজন গুণীন। অদ্ভুত ক্ষমতা। নোট ডবল করতে পারে।

—বল কি? কি করে করে?

—মন্ত্রের জোরে। মন্ত্রপূত জল আর কি!

—দেখেছ?

—দেখিনি আবার? ঐ যে পিছনে থান-ইঁট চেপে শাগরেদ বসে ওর হাতে নোটখানা দিলে নোটটা রেখে দেয় ইঁটের নীচে।

—তারপর?

—তারপর হোমিওপ্যাথি শিশিতে থাকে মন্ত্রভরা জল। ইঁটের উপর ছিটিয়ে দিলে একখানা নোটের জায়গায় হয় দুখানা।

অভীর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। সে এইবার দেখলে গাছের পিছনে একটা ঝোপের আড়ালে আধখানা গা ঢাকা দিয়ে থান-ইঁটের উপর একজন লোক বসে রয়েছে। এই তবে গুণীনের শাগরেদ। সে নবীনের কানে কানে বল্লে—আমার টাকাটা দিয়ে দেখব নাকি একবার?

নবীন কি বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় একজন লোক এসে গুণীনের হাতে একটা একটাকার নোট এগিয়ে ধরল। কি হয় দেখবার জন্যে অভী নবীনকে টেনে নিয়ে এগিয়ে গেল।

গুণীন বললে—কি চাই বেটা?

আমতা আমতা করে লোকটা জবাব দিলে—ঐ যে কি বলে, ডবল করে দেবার কথা বলছিলুম।

গুণীন একটু হেসে বললে—কপালে থাকলে তো? তারপর কি ভেবে বললে —আচ্ছা দেখা যাক। দাও শাগরেদকে।

শাগরেদ কোনো কথা না বলে নোটটা ইঁটের তলায় চালান করে বসে রইল।

লোকটা উসখুস্ করছে দেখে গুণীন বললে—বোস বেটা। নোটে তা দেওয়া হোক।

অভী আর নবীন আরো কাছে ঘেঁষে এল।

গুণীন এইবার সেই লোকটার দিকে কেমন করে যেন দেখতে লাগল। বললে—কাছে আয় তো।

লোকটা সরে আসতে বেশ খানিকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকে দেখে তার

ঘুনো আড্ডা
শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

দেহের অনেকগুলো গুপ্ত-রোগ সে ধরে ফেললো। লোকটা অবাক। গুণীনের উপর বিশ্বাস তার বেড়ে গেল। রোগগুলো ভয়ানক। তার পরিণাম আরো ভয়ানক। সব শুনে লোকটার মুখ শুকিয়ে গেল। গুণীন তখন রোগের ওষুধের কথা বললে। ওষুধ তারই কাছে আছে। কিন্তু রোসো—আগে তোমার নোটের কি হল দেখি। তা দেওয়া হয়ে গেছে—বাচ্চা ফুটবে মনে হয়—দাঁড়াও মন্ত্র পড়ি।

অভী আর নবীন নিঃশ্বাস বন্ধ করে আরো কাছে ঘেঁষে এলো।

কিছুক্ষণ পরে গুণীন একটা হোমিওপ্যাথি শিশি জলে ভরে নিয়ে দ্রুত-উচ্চারণে একটা মন্ত্র পড়ে চললো।

কান খাড়া করে রইল অভী। একই মন্ত্র বার বার বলছে গুণীন। অনেকগুলো শব্দ শোনা যাচ্ছে—বাকিগুলো হয় অতি অনুচ্চ নয় অতি দ্রুত উচ্চারণের ফলে ধরা যাচ্ছে না। অভী এগিয়ে এসে প্রায় গুণীনের পিঠ ঘেঁষে দাঁড়াল—যদি শোনা যায় মন্ত্রটা। ঐটেই তো আসল। মন্ত্রটা অভী শিখে নিতে চায়।

মন্ত্র পড়া শেষ করে গুণীন একবার কটমট করে অভীর দিকে তাকালো। অভী সরে যেতে গুণীন শাগরেদের হাতে শিশিটা দিয়ে লোকটাকে বললে—তোমার নোট ডবল হয়ে যাবে। এবার তোমার ওষুধটাও দিয়ে দি, নাও। শরীরকে যত্নে রেখ, বুঝলে?

লোকটা গদ গদ হয়ে উঠল। গুণীন তার হাতে ওষুধ-ভরা কয়েকটা শিশি গুঁজে দিলে। শাকরেদ ইঁটের নীচে থেকে দুটো নোট বার করে এগিয়ে ধরলে।

লোকটা বিস্ফারিত চোখে কম্পিত হস্তে নোট দুটো গ্রহণ করলে। অভী আর নবীনের মুখে রা নেই। গুণীনের মুখে স্মিত হাস্য।

লোকটা বল্লে—আজ্ঞে ওষুধের দামটা!

—শোন বেটা। এসব হল জীবন-দান ওষুধ। এর কি দাম হয়? তবে কিছু দাম না দিলে আবার ওষুধ লাগতে চায় না। তুই বরং পাঁচটা টাকা রেখে যা। সারা জীবন মনে থাকবে ওষুধের গুণ।

লোকটা মহা কৃতার্থ হয়ে খুঁট থেকে টাকা বার করে গুণীনের পা ছুঁয়ে চলে গেল।

এমন সময় এক হৈ হৈ ব্যাপার!

কোথা থেকে দু-জন পুলিস এসে গুণীনের দু-হাত চেপে ধরে বললে—চলো এখান থেকে। আর দু-জন শাগরেদকে ধরল। গুণীনের মহা আপত্তি। দু-পাঁচজন ভক্ত জুটে গিয়েছিল ইতিমধ্যে। তারাও পুলিসের এই ব্যবহারে বিষম ক্ষেপে গেল। কিন্তু পুলিসের লোক কোনোদিকে দৃক্‌পাত না করে গুণীন, শাগরেদ আর তাদের মালপত্র বেঁধে নিয়ে হন্ হন্ করে গ্রামের থানার দিকে চলে গেল।

● বুনো আতা
শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

গোলমাল শুরু হতে অভী আর নবীন সেখান থেকে সরে পড়েছিল। এইবার অভী বললে—একটা মস্ত বিছে শিখে নেওয়া গেল রে নবীন।

নবীন বল্লে—কি বিছে ?

—কেন, নোট ডবল করার বিছে। মন্ত্রটা তো প্রায় শিখেই নিয়েছি—শুধু একটু অভ্যেসের দরকার।

—সে কি রে! ওকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেল দেখলি নে! লোকটা চোর বাটপাড় নিশ্চয়, নইলে পুলিসে ধরে ? ওর আবার মন্ত্র !

—পুলিসে কাকে ধরে তার ঠিক কি ? তা ছাড়া চোরই হোক আর সাধুই হোক মন্ত্রটা ওর খাঁটি। তুইও তো দেখলি। ঐটেই আসল !

—তুই নোট ডবল করতে পারবি ?

—আলবত পারব, দেখিস্ !

—পুলিসে ধরবে না ?

—হাটের মাঝে করব নাকি ? পুলিসের সাধ্য কি ধরে। জঙ্গলে গিয়ে মন্ত্র পড়ব। চল্লুম জঙ্গলে।

এই বলে অভী কর্পূর বনের দিকে এগল।

নবীন বল্লে—মেলা দেখবি নে ? জিলিপি খাওয়া, ঘোড়ায় চড়া, বাঁশি কেনা, এসব কখন হবে ?

অভী বল্লে—দাঁড়া আগে টাকা ডবল করে আনি, সব দুনো দুনো হবে! তুই এখন থাক মেলায়।

মেলায় আর অভীর মন ছিল না। দোকান থেকে একটা ছোট্ট কাঁচের শিশি কিনে সে সোজা চলে গেল জঙ্গলে। তারপর ঝরনার ধারে বসে তার নোটখানা পাথর চাপা দিয়ে জলভরা শিশি মুখের কাছে রেখে উচ্চারণ করলো তার নতুন-শেখা মন্ত্র।

কিছুই ফল হল না। পাথর তুলে দেখা গেল নোট যেমন ছিল তেমনি আছে। অভী বুঝলে মন্ত্র পড়া অত সহজ নয়। নির্ভুল উচ্চারণ চাই—যেমন গুণীন বলছিল তেমনি অতি দ্রুত তালে বলা চাই। মন্ত্রের সাধন চাই, নইলে মন্ত্র লাগবে না। সে ঝরনার ধারে বসে মন্ত্রের সাধন শুরু করলে। সে কি সাধন! কখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা এল অভীর খেয়ালই নেই।

এদিকে সারাদিন নবীন একা-একা মেলায় ঘুরেছে। একটি পয়সাও খরচ করেনি। অভীর জন্যে অপেক্ষা করে আছে বেচারা। অভী এলে তবে বাঁশি কিনবে, ঘোড়ায় চড়বে, জিলিপি খাবে। সন্ধ্যায় ধুলোল গ্রামের মেলা জমে উঠল। ধুলোয়

● ঘুনো খাতা
শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

আকাশ লাল। মেলার গোলমালের শব্দ কর্পূর বনের গাছ-পাতার মধ্যে অভী যেখানে বসে সেখানেও এসে পৌঁচচ্ছে। কিন্তু অভীর কানে কিছু যাচ্ছে না। তার মন্ত্র পড়া চলেছে। এখনও যথেষ্ট দ্রুত হচ্ছে না—এখনও উচ্চারণের ওঠা-নামাগুলো দুরস্ত হচ্ছে না। অভী বাহ্যজ্ঞানহীন।

নবীন তাকে খুঁজতে এসে ঝরনার ধারে ঐ অবস্থায় আবিষ্কার করলে। চোখ লাল। মুখ শুকনো। উস্কোখুস্কো চুল। নবীন ভেবে এসেছিল অভীকে নিয়ে মেলায় ফিরে যাবে। কিন্তু তাকে ঐ অবস্থায় দেখে একরকম জোর করেই ধরে নিয়ে গেল বাড়ি।

অমন যে মেলা, অতদিন ধরে যার জন্যে অধীর হয়ে থাকা, তার কিছুই হল না। দু-জনে গিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ল। নিস্তব্ধ ধলোল কলোনি থম্থম্ করছে—লোকজন বেশীর ভাগই মেলায়। মেলা এতক্ষণ রীতিমত জমে উঠেছে। কিন্তু কর্পূর বন পার হয়ে কোনো আওয়াজ এখানে এসে পৌঁছয় না। নবীনের ভারি মন খারাপ। অভীর জন্যে মেলাটাই মাটি। হঠাৎ কেমন যেন হয়ে গেল অভীটা। নবীন শুয়ে-শুয়ে মেলার কথা ভাবছে, অভীটা কি ভাবছে কে জানে? ভাবতে ভাবতে সারাদিনের ক্লান্তির পর নবীন ঘুমিয়ে পড়ল।



অভী পাথর তুলে দেখল নোট যেমন ছিল তেমনি আছে। [পৃষ্ঠা ১০৪

পরদিন ভোরে উঠেই নবীন অভীদের বাড়িতে গিয়ে হাজির। গিয়ে দেখল অভী ভোরেই বেরিয়ে গেছে। এটা আগেই খানিকটা আঁচ করেছিল নবীন। সে

চললো কর্পূর বনে। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে ঝরনার ধারে দেখে তপস্বীর মতো বসে আছে অভী—বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ছে—চোখের দৃষ্টি শূন্য!

নবীন বল্লে—কি করছিস্ অভী?

অভী চমক ভেঙে বলল—মন্ত্র পড়ছি দেখছিস না। তুই তো জানিস্, আবার জিজ্ঞেস করছিস্ কেন?

—না অভী, এটা আমার ভালো লাগছে না। কি দরকার তোর মন্ত্রে?

—নোটটা ডবল করব। দেখ না হয়ে এলো বলে। আর একটু অপেক্ষা কর।

নবীন ঘাড় নাড়া দিয়ে বল্লে—অভী, ছেড়ে দে এ সব। কি হবে তোর টাকা ডবল করে? মেলা তো ভেঙে গেছে।

—অ্যাঁ? মেলা ভেঙে গেছে? অভীর চোখটা বিস্ফারিত হয়ে এল। তারপর বল্লে—তা হোক। দেখি না মন্ত্রটা খাটাতে পারি কি না। তুই এখন যা। দুপুরের দিকে বরং একবার আসিস্।

নবীন রাগ করে চলে গেল। একবার ভাবলে অভীর বাবাকে বলে দেয়। কিন্তু না, অভী তার বন্ধু—এমন মন-প্রাণ দিয়ে লেগেছে একটা কাজে, সেটাকে নষ্ট করে দেওয়া বন্ধুর কাজ হবে না। কিন্তু কি করে সে এখন? দুপুর পর্যন্ত একা-একা কাটায়ই বা কি করে? সব যেন তার শূন্য হয়ে গেছে। মেলার টাকাটা তখনও তার পকেটে—একটি পয়সা খরচ হয়নি। অত সাধ ছিল তার বাঁশি কেনবার তা-ও কেনা হয়নি। সবই অভীর দোষ। গুণীনকে দেখে অভীটা কেমন যেন হয়ে গেল। তার এই ঘোর-ঘোর ভাব কি কাটবে? মন্তর কি তার লাগবে?

নবীন আবার বেরল কর্পূর বনে ঠিক দুপুরের আগে। গিয়ে দেখল এবার অভী প্রায় ধ্যানস্থ। চোখ বুজেই মন্ত্র পড়ছে। পিছনে তার একখানা চাপড়া পাথর যার উপর জলের দাগ। কিছুক্ষণ আগেই বোধহয় তাতে শিশির জল ঢালা হয়েছে। নবীন অভীর পিছনে গিয়ে দাঁড়াতেও অভীর চেতনা হল না। আস্তে আস্তে সে পাথরটা তুললে। দেখল অভীর নোটটা পাথরের তলায় বিছানো রয়েছে। যেমন পাথর ছিল তেমনি আবার চাপা দিয়ে নিঃশব্দে সে উঠে দাঁড়িয়ে ঝরনা পার হয়ে ওপারে চলে গেল বুনো আতা খুঁজতে।

ঝরনার ধারে লম্বা ছুঁচোলো কাঁটার মতো ঘাসের ঘন ঝোপ, তারপর গোল-গোল গন্ধওয়ালা পাতা ভরা একটা সমান জমি। সেটা পার হয়েই পাথর-ভরা উঁচু জমি আরম্ভ হয়েছে—তাতে ছোট বড় পাঁচমেশালি গাছ—তাদেরই মধ্যে থেকে এখানে ওখানে আতাগাছের পাতা উঁকি দেয়—দূর থেকেই চেনা যায়।

● বুনো আতা
শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

কিছুক্ষণের মধ্যে নবীন দুটি সুন্দর পাকা আতা আবিষ্কার করে ফেললে। এতদিনে আতা পাকতে আরম্ভ হয়েছে। নবীন ভারী খুশী। এতবড় আতা-ও সাধারণতঃ বুনো গাছ থেকে পাওয়া যায় না। অভীকে খাওয়াতে হবে একটা এখনই।

নবীন গোল-গোল গন্ধওয়ালা পাতা-ভরা জমিটা পার হয়ে ঝরনার ধারে এসে পৌছতেই দেখতে পেলে অভী তার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে—তার হাতে দু'খানা এক টাকার নোট। তার চোখ খুশীতে উপচে পড়ছে। নবীনকে দেখেই অভী চেঁচিয়ে উঠল—

—মন্তর লেগেছে নবীন। দেখে যা ডবল হয়ে গেছে।

নবীন ছপ্ ছপ্ করে ঝরনা পার হয়ে চলে এল। অভীর দু আঙুলের ফাঁকে নোট দু-খানা হাওয়ায় উড়ছে। অভীর চেহারা অভীর চোখের দৃষ্টি আবার অভীর মতো হয়ে এসেছে।



নবীন আস্তে আস্তে পাথরটা তুললে। [পৃষ্ঠা ১০৬

নবীন বল্লে—মন্ত্র পেলি তাহলে?

—পাবো না? এ ত কষ্টের সাধনা?

—কি করবি টাকা দুটো নিয়ে?

—কি করব? মেলায়—ও, মেলা বুঝি ভেঙে গেছে, না রে? তবে কি করা যায়?

নবীন আস্তে আস্তে বল্লে—আমার কথা শুনবি অভী? নোট দুটো ঝরনার জলে ফেলে দে। ও আর তোর কোনো কাজে লাগবে না।

● বুনো আতা
শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

—ঠিক বলেছিস্ নবীন। মেলার জন্যেই তো নোটটা রেখেছিলুম। মেলাই যখন ভেঙে গেল ওরাও যাক।

নোট দুটো জলে ফেলে দিয়ে অভী বল্লে—মন্ত্রটার কি হবে নবীন? মন্ত্রটা যে পেয়েছি!

—মন্ত্র তুই আমায় বলে দে। যতক্ষণ গোপন ততক্ষণ ওর গুণ। আমায় বলে দে, গুণটা কেটে যাক। কি হবে তোর মন্ত্রে? ওর জন্যে এমন মেলাটাই তো মাটি হল। কি তোর লাভ হল?

—কিছুই লাভ হল না। শোন তবে মন্ত্র।

এই বলে নবীনকে কাছে টেনে তার কানের কাছে মুখ দিয়ে গম্ভীর স্বরে অভী মন্ত্রটা উচ্চারণ করল।

অভীর গলা দিয়ে বেরল সে এক অদ্ভুত স্বর। অভীর গলাই নয়। নবীনের সারা দেহে এক শিহরন বহে গেল। সে ভীত চোখে অভীর মুখের দিকে তাকালো। ক্রমান্বয়ে চোদ্দ ঘণ্টা দ্রুত উচ্চারণের ফলে এ কি শিখেছে সে? এর সত্যিই কোনো ভয়ানক গুণ আছে নাকি?

কিন্তু নাঃ, অভীর মুখের চেহারা আবার সহজ হয়ে এসেছে। ভয়ানক মন্ত্র তাকে ত্যাগ করে চলে গেছে। নবীন এইবার আতা দুটো বার করে অভীকে বল্লে—নে ধর। এত বড় আতা দেখেছিস্?

অভী লাফিয়ে উঠে বল্লে—আরে বাস্‌রে! কোথায় পেলি? আয়, ঝরনার ধারে বসে শেষ করি এ দুটোকে—যা' খিদে পেয়েছে।

দুই বন্ধুতে আতা খেয়ে উঠে দাঁড়ালো। নবীন বল্লে—চল্ এবার বাড়ি।

পথে যেতে-যেতে অভী বল্লে—কি করলি তুই মেলায়? নাগর-দোলায় চড়েছিস্?

নবীন বল্লে—চড়িনি আবার? নাগর-দোলা, পাক-খাওয়া ঘোড়া। জিলিপি খেলুম—কত কি!

—ইস্ আমার-ই হল না। কত খরচ করলি? পুরো টাকাটা খরচ করেছিস্?

—পুরো টাকাটা। কিচ্ছু বাকি নেই।

—বাঁশি কিনেছিস্?

নবীন হঠাৎ কেমন যেন হয়ে গেল। চোখটা ছল্‌ছল্ করে উঠল। তারপর সামলে নিয়ে বল্লে—এবারে আর কেনা হল না। সামনের বছর মেলা আবার হয় তো নিশ্চয় কিনবো!



হাত সাফায়ের দেখিয়ে খেলা
পথিকেরে অবাক করে দিতাম।



"আমি যদি জীপ্‌সী মেয়ে হ'তাম"

—শ্রীমতী সাধনা দাস

আমি যদি জীপ্‌সী মেয়ে হ'তাম
শতেক ছেঁদায় তাপ্পি মেরে,
তেলচিটে এক ঘাগরা পরে,
দেশ হ'তে দেশ দেশান্তরে
মনের সুখে একলা চলে' যেতাম।
আমি যদি জীপ্‌সী মেয়ে হ'তাম।

হরেক রকম পাখির ছানা,
কুকুর ছানা নাম না জানা,
চল্‌তি পথের পথিককে রে
বিকিয়ে দিতাম যখন যে দাম পেতাম।
আমি যদি জীপ্‌সী মেয়ে হ'তাম।

পথিক যারা দেখতো চেয়ে
আমার দিকে অবাক হ'য়ে
হাত সাফায়ের দেখিয়ে খেলা
আরো তাদের অবাক করে দিতাম।
আমি যদি জীপ্‌সী মেয়ে হ'তাম।

খাটিয়ে তাঁবু হাটে মাঠে,
সূর্য যখন বসত পাটে,
পাঁচ মিশালী সিদ্ধ ক'রে
এক্‌লা ব'সে মনের সুখে খেতাম।
আমি যদি জীপ্‌সী মেয়ে হ'তাম।

ঝ'ড়ো হাওয়া উঠ্‌লে কভু,
উড়িয়ে নিলে ছিন্ন তাঁবু,
দাঁড়িয়ে তখন বর্ষাজলে
স্নানের পালা এম্‌নি সেরে নিতাম।
আমি যদি জীপ্‌সী মেয়ে হ'তাম।

যাযাবরের জীবন সম
স্বাধীন হ'তো জীবন মম
স্বপ্নে দেখা সুখের পরশ
নিত্য আমি এমনি ক'রেই পেতাম।
আমি যদি জীপ্‌সী মেয়ে হ'তাম।

দুই ওস্তাদ



— শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

"তোমার নাম ?"

"হীরেলাল।"

"পুরো নাম বলো। হীরেলালের পর কী ? উপাধি ?"

"উপাধি জানি নে। ঐ হীরেলালই পুরো নাম।"

"কী মুশকিল ! লিখুন হুজুর নাম হীরেলাল, উপাধি অজানা। তারপর ?— বাপের নাম কী ?"

"বাপের নাম ? বাপ-টাপ ছিল না কোনোদিন !"

হেসে উঠলো আদালতশুদ্ধ লোক। ছেলেটা বলে কী ? বাপ ছিল না ? বরং বল্—বাপের নাম জানা নেই ; তার তবু একটা মানে হয়।

ন'-দশ বছর বয়সের ছেলে ; অত মানে-টানের ধার সে ধারে না। যে-সমাজে সে বাস করে, সেখানে কোনো ছেলেরই বাপ নেই, অন্ততঃ ধরা-ছোঁয়ার ভিতরে নেই। তাদের সবাইয়েরই আছে এক ওস্তাদ, দাড়িওয়ালা কিষেণলাল। সবাই

তাকে ওস্তাদ ব'লে ডাকে, খিদে পেলে তার কাছেই খাবার চায়। রোজগার হলে তার হাতেই এনে পয়সা বুঝিয়ে দেয়, আর কসুর করলে তার হাতেরই চড়টা-চাপড়টা খায়। কিষেণলাল ছাড়া আপনার-জন তাদের আর কেউ নেই। দশ-পনেরোটা ছেলে সব সময়েই থাকে কিষেণলালের কাছে; কিন্তু বছরের পর বছর একসঙ্গে বাস করেও কোনো-একটা ছেলে অপর-একটা ছেলেকে ভালোবাসতে শেখে না। শিখতে দেয় না কিষেণলাল। উল্টে বরং সে চেষ্টা করে—যাতে ছেলেগুলোর মধ্যে সব সময়ে একটা রেষারেষি ঝগড়াঝাটির ভাব বজায় থাকে, যাতে একজনের গলদের কথা আর-একজনের মুখ থেকে সে শুনতে পায়, যাতে একজনের বিপদ ঘটলে অন্য সবাই তার দরুন মুষড়ে না পড়ে!



"দেখে শুনে দাদু, দেখে শুনে! এখুনি চাকার তলায় যাচ্ছিলেন যে!"

বিপদ হামেশাই ঘটছে কারও-না-কারও। যেমন আজ ঘটে গেল হীরেলালের। হাফ-প্যাণ্ট আর বুশ-সার্ট প'রে দিব্যি ভদ্দরলোকের ছেলেটির মতোই সে সেজে এসেছিল। পায়ে অবশ্য জুতো ছিল না; তা পাড়ার ভিতরে কোন্ ছেলেটাই বা চব্বিশ ঘণ্টা পায়ে জুতো এঁটে বেড়ায়? জুতো না থাকাতে বরং পথের লোক ওকে কাছাকাছি পাড়ার ছেলে ব'লে ভাবছিল, সন্দেহ করবার কথা মনেই ওঠেনি কারো!

বুড়ো ভদ্দরলোক ট্রাম থেকে নামতেই হীরেলাল ধরে ফেলেছিল তাঁকে···পিছন থেকে কোমর জাপ্‌টে ধরেছিল একেবারে। দরদ-ভরা গলায় চেঁচিয়ে উঠেছিল—"দেখে শুনে দাদু, দেখে শুনে! এখুনি চাকার তলায় চলে যাচ্ছিলেন যে!"

● দুই ওস্তাদ
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

ভদ্দরলোক হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। "চাকার তলায়?"—অবাক হয়ে ব'লে উঠেছিলেন তিনি। বহুক্ষণ অপেক্ষা করেও ট্যাক্সি না পেয়ে তিনি ট্রামে উঠেছিলেন, ভয়-ভয় করছিল এ কথা ঠিক, কিন্তু নামবার সময় কোনো অসুবিধে তার হয়নি। তবু তিনি চাকার তলায় চলে যাচ্ছিলেন? কী ক'রে যাচ্ছিলেন, তা তো তিনি টের পাননি! তবু ছেলেটি বলছে যখন, নিশ্চয় একটা কিছু ঘটবার মতো হয়েছিল বৈ কি। হয়তো তার পা পড়তে যাচ্ছিল কলার খোসার উপর, পড়লে হয়তো হড়কে প'ড়ে যেতেন তখনি, আর, পড়লে তো চাকার তলাতেই গিয়ে পড়ে সবাই!

তাই তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন হীরেলালকে—"বেঁচে থাকো ভাই, বড়ো বাঁচিয়ে দিয়েছো আজ!"

"কিছু না দাদু, কিছু না"—বলতে বলতে পিছু হটতে শুরু করেছিল হীরেলাল; আর আধ মিনিট সময় পেলেই সে একখানা চলতি বাসের আড়ালে গিয়ে পড়তে পারতো, এবং পকেটের মনি-ব্যাগটা "সুলভ ভাণ্ডারের" দোরগোড়ায়-দাঁড়ানো করিমের হাতে তুলে দিয়ে···



পালাবার সুযোগ আর পেলো না হীরেলাল, ধরা প'ড়ে গেল বেচারী।

কিন্তু সে-আধমিনিট সময় পেলো না হীরেলাল। বুড়ো ভদ্দরলোক দেখতে পেলেন—সামনেই ফুটপাথে একটি মেয়ে বসে আছে ঘোমটা দিয়ে, তার পাশেই একটা ঘুমন্ত শিশু, আর শিশুর চারপাশে ছড়ানো রয়েছে কতকগুলো নয়া পয়সা। মেয়েটাকে কিছু ভিক্ষে দেবার জন্য তিনি পকেটে

● দুই ওস্তাদ
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

হাত দিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গেই চেঁচিয়ে উঠলেন—"পাক্‌ড়ো, পাক্‌ড়ো—পকেটমার! পকেটমার!"

চল্‌তি বাসখানা তখনো এসে হীরেলালকে আড়াল করতে পারেনি, আর আড়াল না-পাওয়ার দরুন ও-ফুটপাথে পৌঁছুবার জন্য জোর পা চালাতেও পারেনি বেচারী। সে ধরা প'ড়ে গেল রাস্তার লোকের হাতে, পকেট থেকে মনিব্যাগ বেরিয়ে পড়লো, মোড় থেকে ছুটে এল পুলিস; আর আধ ঘণ্টার ভিতর হীরেলাল বন্ধ হলো থানার হাজতে।

করিমের মুখে খবর পেলো কিষেণলাল। দাড়ি নেড়ে সে বললে—"বরাত রে বাচ্চা, বরাত! নইলে হীরেলাল কি আমার ধরা পড়ার মতো শাগরেদ! কী হাত-সাফাই! সোনার টুকরো ছেলে রে, সোনার টুকরো ছেলে!"

* * * *

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সেই সোনার টুকরো ছেলে দেখলো—বুড়ো ভদ্দরলোকটি ধীরে ধীরে এসে উঠছেন সাক্ষীর বাক্সে! একটা কথা মনে পড়তেই একটু মুচকি হাসি ফুটে উঠলো হীরেলালের ঠোঁটে! ঐ ভদ্দরলোকই সেদিন সকালে তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন—"বেঁচে থাকো ভাই, বেঁচে থাকো!" আর এখন?…এখন উনি কী বলছেন মনে মনে? "মরুক ছেলেটা, জেল খেটে মরুক!"—এই রকমই একটা-কিছু তাঁর মনের কথা নয় কি?

"আপনার নাম?"

"মহীতোষ রায় চৌধুরী।"

"পিতার নাম?"

"দেবতোষ রায় চৌধুরী।"

"বাড়ি?"

"নোদে জেলায় দুর্গাপুর।"

"আপনি কলকাতায় এসেছিলেন কেন?"

ভদ্রলোক থমকে গেলেন একটু। তারপর ধীরে ধীরে বললেন—"সে অনেক কথা। আমার ব্যক্তিগত কথা। সে কথা শুনে কোর্টের কোনো লাভ হবে না—মনে করি।"

হীরেলালের পক্ষ থেকে কোনো উকিল দাঁড়ায়নি দেখে গোড়াতেই হাকিম এক নতুন শামলাধারীকে ভার দিয়েছিলেন ওর পক্ষে হাজির হবার জন্য। সেই উকিলটি লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো এইবার, এবং দাবি করলো যে, ব্যক্তিগত কথাই হোক,

আর যাই হোক—বিদেশী ভদ্রলোকের কলকাতায় আসার কারণ কোর্টের অজানা থাকা উচিত নয়, এতে সুবিচারের ব্যাঘাত হতে পারে।

হাকিম তাই বাধ্য হয়েই হুকুম দিলেন—"আপনাকে ওকথা তাহলে বলতেই হয় মহীতোষ বাবু। অবশ্য, সংক্ষেপে বলতে পারেন, খুটিনাটির ভিতর যাবার দরকার নেই!"

"সংক্ষেপেই তাহলে বলছি"—মহীতোষ বাবুর গলাটা যেন ভাঙ্গা-ভাঙ্গা মনে হলো এবার। "আমি কলকেতায় এসেছিলুম, আমার গুরুদেবের আদেশে। তিনি সাধক মানুষ; ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান তাঁর নখাগ্রে। তিনি বলেছিলেন—ঐ দিন কলকেতায় এলে আমি এখানে আমার সাত-বছর-আগে হারানো নাতিকে খুঁজে পাবো। নাতিটি চুরি যায় আমাদের গাঁয়ের গাজনের মেলা থেকে। সেই থেকে এই সাত বচ্ছর কত ভাবে কত জায়গায় যে খুজছি তাকে!"

নবীন শামলাধারী রসিকতা করলেন একটু। বৃদ্ধকে চোখ ঠেরে বলে উঠলেন—"দেখুন তো ভালো ক'রে—ঐ কাঠগড়াতেই সে দাঁড়িয়ে আছে কিনা?"

সরকারী উকিল জোর-গলায় প্রতিবাদ জানালেন—"এ-রকম নিষ্ঠুর ঠাট্টা করা আমার মাননীয় সহযোগীর কখনোই উচিত হয়নি; তাছাড়া জবানবন্দীর সময় কথা কইবার অধিকারই তাঁর নেই; তাঁর সুযোগ আসবে জেরার সময়।"

শামলাধারীকে মুখ বন্ধ করতে হলো বটে, কিন্তু তাঁর টিপ্পনীটুকু নিয়ে কানাকানি শুরু হলো আদালতে। হাকিম পর্যন্ত একবার হীরেলালের দিকে, আর একবার মহীতোষের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। একটা আশ্চর্য-রকম মিল সত্যই দেখা যায় দু'জনের চেহারায়। প্রায় ষাট বছর বয়সের তফাত সত্ত্বেও সে-মিল কারও নজর এড়িয়ে যাবার মতো নয়। চওড়া কপাল, টানা-টানা চোখ, লম্বা উঁচু নাক—তার উপর গায়ের রং! হীরেলালের গায়ে সাবানজল পড়লে সেও যে মহীতোষের মতো ফর্সা হয়ে উঠতে পারে, এটা বুঝতে কারও বাকী রইল না।

হাকিমটি উপন্যাস লেখেন; অল্প-একটু আকাশ পেলেই তাঁর কল্পনা ডানা মেলে মনের আনন্দে উড়তে শুরু করে। তিনি মহীতোষকে বললেন—"দেখুন, কিছু মনে করবেন না। পৃথিবীতে অনেক ব্যাপার সত্যই ঘটে, যা রূপকথার চাইতে আশ্চর্য! আপনার হারানো নাতির গায়ে কোথাও কোনো চিহ্ন ছিল, যা সাত বছরেও মিলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই?"

হীরেলালের দিকে অপলক চোখে চাইতে চাইতে বৃদ্ধ বললেন—"ছিল, হুজুর!

● দুই ওস্তাদ
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

তার কাঁধের কাছটা একবার ভীষণভাবে পুড়ে গিয়েছিল; সে পোড়া-দাগ জীবনে কখনো মিলিয়ে যাবে, এমন আশা আমরা করি নি।"

হীরেলালের মুখ থেকে একটা চাপা চীৎকার বেরিয়ে এলো হঠাৎ। পোড়া দাগ? কাঁধে?—আছে বৈকি···হীরেলালের আছে!

* * * *

বিরাট জমিদার-বাড়ি। হীরেলাল দেখে শুনে অবাক! এই বাড়িরই ছেলে সে? এত ধনদৌলতের মালিক সেই-ই হবে একদিন? দাদু আর সে···এ-দু'জনের মাঝে আর কেউ নেই। হীরেলালের বাপ-মা ছেলে-হারানোর শোকেই মারা গিয়েছেন।

পকেটমারার মামলা আর বেশীদূর গড়ায়নি। সমস্ত অবস্থাটা বিবেচনা করে দেখে হাকিম হীরেলালকে ছেড়ে দিয়েছেন মহীতোষের জামিনে। মহীতোষ আর একদিনও দেরী করেননি কলকাতায়; হারানিধি বুকে ক'রে নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছেন।

কুসঙ্গে পড়ে ছেলেটা অকাজ-কুকাজ করেছে। তাতে আর কী এমন ক্ষতি হয়েছে? এখন তাকে শুধরে নেওয়া শক্ত হবে না। ভালো ভালো মাস্টার রেখে দেবেন মহীতোষ, তাঁরা শিক্ষা দিয়ে উপদেশ দিয়ে মানুষ ক'রে তুলবেন হীরেলালকে। তাছাড়া গুরুদেব স্বয়ং রয়েছেন···তিন কাল যাঁর নখাগ্রে। তিনি অসাধ্য সাধন করতে পারেন। যাগযজ্ঞ ক'রে ছেলেটার মতিগতি তিনি কি ফেরাতে পারবেন না?

গুরুদেব থাকেন নিজের আশ্রমে, নদীর ধারে। বাড়ি পৌঁছুবার ঘণ্টাখানেক পরেই মহীতোষ নাতিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন—আশ্রমের উদ্দেশে। প্রভুর পায়ে ছেলেটাকে ফেলে দিতে পারলেই তিনি এবার নিশ্চিন্ত! গাঁয়ের লোক এখনও খবর পায়নি যে হারানো নাতি জমিদার ফিরে পেয়েছেন; এমন-কি নায়েব গোমস্তারাও পায়নি হীরেলালের খাঁটি পরিচয়; গুরুদেবের অনুমতি না নিয়ে মহীতোষ কোনো শোরগোল করতে রাজী নন। তাই, বাবুর সঙ্গে অচেনা একটি ছেলেকে দেখে সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো বটে, কিন্তু স্বপ্নেও কেউ ধারণা করতে পারলো না যে একদিন এই অচেনা ছেলেটিই তাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হবে!

সদর উঠোনের মাঝখান দিয়ে ফুলের কেয়ারি-করা সোজা রাস্তা। সেই রাস্তা বেয়ে দেউড়ির দিকে হেঁটে চলেছেন মহীতোষ বাবু। হঠাৎ কাছারি-বাড়ির রোয়াক

থেকে একটা ছেলে লাফিয়ে প'ড়ে তাঁর দিকে ছুটে এলো কাঁদতে কাঁদতে। সেপাই বরকন্দাজ এসে তাকে ধরে ফেলবার আগেই সে জড়িয়ে ধরেছে বাবুর পা। "বাবু গো, আমার বাবাকে ওরা আজ দু' দিন কয়েদ ক'রে রেখেছে। তুমি তাকে ছেড়ে দাও, এ দু' দিন বাবা একটু জলও খেতে পায়নি।"

"কে রে? কে তোর বাবা?"—ধমকে উঠলেন মহীতোষ।

"হারু মণ্ডল।"

"ওঃ, হারু মণ্ডল! এক নম্বর বদমাইশ! গুরুদেবের আশ্রমের লাগোয়া জমিটা কিছুতেই ছেড়ে দিচ্ছে না ব্যাটা। তা বুঝুক এখন! সেরেস্তার পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিক, কেউ তাকে আটকে রাখবে না!"

ততক্ষণে বরকন্দাজেরা এসে ধরে ফেলেছে ছেলেটাকে।

হীরেলাল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো ওকে। তার বয়সীই হবে বোধ হয়। সেদিন মহীতোষের পকেট মারবার সময়ে যে-রকম একটা নীল প্যান্ট হীরেলালের পরনে ছিল, এ-ছেলেটাও সেইরকম একটা নীল প্যান্ট পরেছে। গা অবশ্য তার খালি; পাড়াগাঁয়ের চাষী ছেলেদের বুশ-কোট নেই যে চব্বিশ-ঘণ্টা তাই প'রে বেড়াবে!

ওরা ধরে নিয়ে গেল ছেলেটাকে। মহীতোষ নিজের মনে বিড়বিড় করতে লাগলেন—"ছোটলোকগুলো মাথায় চ'ড়ে বসেছে। গুরুদেব বলেন—"

গুরুদেব কী বলেন, তা আর হীরেলাল শুনতে পেলো না। তবে সহজেই সে আন্দাজ ক'রে নিতে পারলো যে এই সব ছোটলোকদের আস্কারা না-দেবার পরামর্শই হয়তো তিনি দিয়ে থাকেন সাধারণতঃ।

দেখা হলো। টকটকে গৌর বর্ণে ধবধবে পৈতে কী চমৎকার মানিয়েছে! তার উপর কালো কুচকুচে লম্বা দাড়ি! হীরেলালের হঠাৎ মনে হলো—ওস্তাদ কিষেণলালের দাড়ির কথা। সে-দাড়ি এমনি লম্বা, এমনি ঘন আর এমনি কালো হলেও, তাতে এমন চেকনাই নেই! থাকবে কি ক'রে? ফুলেল তেল মাখিয়ে ঘনঘন চিরুনি দিয়ে তো তার দাড়ি কেউ আঁচড়ে দেয় না!

গুরুদেব হাসলেন। মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন হীরেলালকে। "পাপ তাপ দূরে যাক্, পবিত্র হও, রায়চৌধুরী-বংশের যোগ্য বংশধর হও।"

আশীর্বাদ শুনতে শুনতে পাষণ্ড ছেলেটার কিন্তু কেবলই কিষেণলালের সেই কথা মনে পড়তে লাগলো—"তোর হবে! তোর যে-রকম হাতসাফাই, শহরের সব পকেটমার একদিন তোকে ওস্তাদ ব'লে মানবে!"

● দুই ওস্তাদ
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

ঐখানে বসেই উৎসবের একটা খসড়া তৈরি ক'রে নিলেন মহীতোষ। হোম করতে হবে এক মাস ধরে। গোটা দুই বেলগাছ দরকার। হাসিমদ্দির একটা আছে, আর একটা আছে পরেশ মিস্ত্রিরের। পরেশ সেটা সহজে দিতে চাইবে না। গুরুদেব হেসে বললেন—"বীরভোগ্যা বসুন্ধরা হে মহীতোষ! ধর্মার্থে আহরণ করতে যাচ্ছ, এতে কোনো পাপ নেই। লোক পাঠিয়ে রাতারাতি কেটে আনো গাছটা। তারপর, কী সে করবে? ন্যায্য দাম ধ'রে দিয়ো। হাজার ধেনু এক ব্রাহ্মণ চেয়েছিলেন রঘু-রাজার কাছে। রঘু তখন অতিরিক্ত দানে নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন। তিনি বরুণের গোশালা থেকে হাজার ধেনু কেড়ে এনে দান করলেন ব্রাহ্মণকে। ধর্মার্থে আহরণ—ওতে পাপ নেই।"



গুরুদেব আশীর্বাদ করলেন হীরেলালকে—"রায়চৌধুরী-বংশের যোগ্য বংশধর হও।" [পৃঃ ১১৭

হোম ছাড়া আরও অনেক যাগ-যজ্ঞ, অনেক পূজা-অর্চনা, হরেক রকমের আমোদ-আহ্লাদের এক বিরাট লিস্টি তৈরি ক'রে নিয়ে মহীতোষ নাতির হাত ধরে বাড়ি ফিরলেন। এইবারে ঢাক ঢোল সানাই বাজতে শুরু হলো জমিদার-বাড়িতে। গাঁয়ের লোক অবাক হয়ে শুনলো—মহীতোষ যে-ছেলেটির হাত ধরে নিয়ে সকাল বেলা গুরুদেবের আশ্রমে

● দুই ওস্তাদ
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

গিয়েছিলেন, সে-ছেলেটি আর কেউ নয়, তাঁরই নাতি, একমাত্র বংশধর,···সাত বছর আগে গাঁয়ের গাজনের মেলা থেকে যে হারিয়ে যায়।

পরেশ মিত্তিরের বেলগাছ কেটে আনা হলো। রাত্তিরে-রাত্তিরেই কাজ সমাধা হয়েছিল ব'লে পরেশ আগে কিছু জানতে পারেনি; তারপর যখন খবর পেয়ে মহীতোষের কাছে এসে আপত্তি জানালো, তার বরাতে জুটলো দরোয়ানের গলাধাক্কা। বেলগাছ চেরাই হয়ে গেল, হোমের আগুন উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে লাগলো···এক মাস ধ'রে গুরুদেবেরই ব্রহ্মতেজ যেন আগুনের আকারে উজ্জ্বল ক'রে রাখলো মহীতোষের তিনমহলা বাড়িখানা।

মহা ধুমধাম চললো এক মাস ধ'রে। এমন দেবতা নেই পুরাণে, মহীতোষের বাড়িতে যাঁর পূজা হলো না; এমন পোশাক নেই বাজারে, যা হীরেলালের জন্য কেনা হলো না। যাত্রা, থিয়েটার, কবিগানে মুখর হয়ে রইলো সারা গ্রাম।

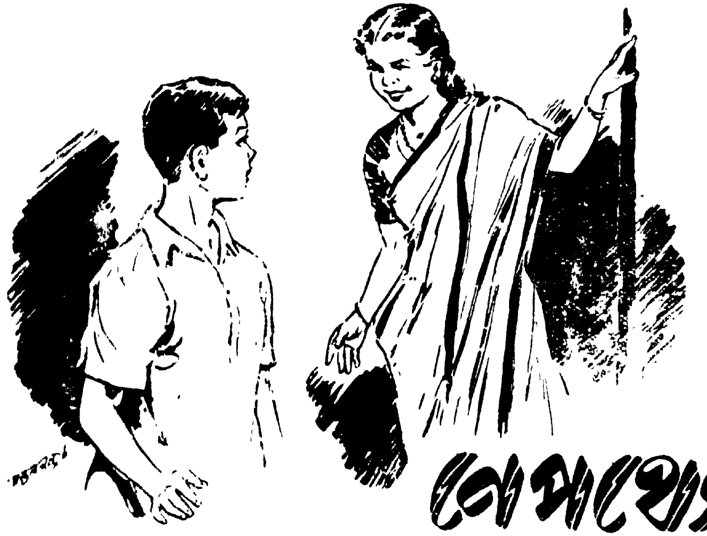
এক মাস যেদিন পূর্ণ হলো, গুরুদেবকে প্রণাম করলেন মহীতোষ একশো মোহর দিয়ে। আর নিবেদন করলেন—"হারু মণ্ডল শেষ পর্যন্ত তার জমিটা লেখাপড়া ক'রে দিয়েছে গুরুদেব। আপনি অনুমতি করুন, আমি ঐ জমিতে মন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে তাতে আপনারই বিগ্রহ স্থাপনা করি।"

গুরুদেবের মুখ প্রসন্ন হাসিতে অপরূপ হয়ে উঠলো।

হীরেলালও দাদুর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু গেড়ে প্রণাম করেছিল গুরুদেবকে। সে এই কথা শুনে দাদুর দিকে তাকিয়ে বললো—"দাদু, আমি বলি—মন্দির একটা না ক'রে দুটো করো।"

"কেন? কেন? দুটো মন্দির কেন ভাই?"—অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন মহীতোষ।

হীরেলাল বললো—"একটাতে প্রতিষ্ঠা হবে গুরুদেবের মূর্তি, আর একটাতে প্রতিষ্ঠা হবে আমার ওস্তাদ কিষেণলালের মূর্তি। আমি এই এক মাস ধ'রে মিলিয়ে দেখলুম, দু'জনেরই শিক্ষা প্রায় একই রকম।"



গোপাখোর

—বনফুল

তিনু সেদিন স্টেশন থেকে খুব উত্তেজিত ভাবে বাড়ি ফিরল। চাপা উত্তেজনা, কারণ কথাটা কাউকে বলা চলবে না। তিনি কাউকে বলতে মানা করেছেন, কিন্তু জনকয়েককে তো বলতেই হবে। বিশেষতঃ মণিকে। একটা মালাও তো গাঁথতে হবে অন্তত, তাদের বাগানেই ফুল আছে। বাজারের কেনা মালা তাঁকে দেওয়া চলবে না। তাছাড়া কাকে কাকে খবরটা বলতে হবে সে-ও একটা সমস্যা। যাকে বাদ দেওয়া হবে সেই চটে' যাবে। কারণ শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবেই। এত বড় ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে চাপা দেওয়া শক্ত। তাছাড়া আর একটা কথা, মেয়েদের কাউকে খবর দেওয়া হবে কি না। তার বোন অঞ্জলি, কিম্বা মণির বোন মুকুলকে অনায়াসেই নিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু ভয়, তাদের পেটে কথা থাকবে কি! অঞ্জলিটা যা বক্তিয়ার খিলিজি। শুধু যে তার পেটে কথা থাকে না তা' নয়, কথা বাড়িয়ে বলে। বেরাল দেখলে বলে বাঘ দেখেছি। মুকুলটাও প্রায় তাই। মণির সঙ্গে পরামর্শ না করলে কিছুই ঠিক করা যাবে না। তাড়াতাড়ি জলখাবার খেয়ে সে

বেরিয়ে পড়ল মণির বাড়ির উদ্দেশ্যে। মণির বাড়িতে গিয়ে দেখল মণি নেই। এই আশঙ্কাই করেছিল সে। মণি ক্লাসের ভালো ছেলে, প্রায় প্রতি বিষয়েই প্রথম স্থান অধিকার করে, তাই মাস্টাররা তাকে ভালোবাসেন সবাই। থার্ড মাস্টার আর ফোর্থ মাস্টার তাকে বিনা পয়সায় পড়ান। তাই সে কোনদিন থার্ড মাস্টার, কোনদিন ফোর্থ মাস্টারের বাড়ি যায়। থার্ড মাস্টার তাকে অঙ্ক পড়ান, ফোর্থ মাস্টার ইংরেজী।

দেখা হ'ল মণির বোন মুকুলের সঙ্গে।

"দাদা তো বাড়িতে নেই। থার্ড মাস্টার মশাইয়ের কাছে গেছে। কেন, এসময় কি দরকার"

মুকুলের বয়স বছর এগারো। একটু ফাজিল গোছের।

"সিনেমার টিকিট যোগাড় করেছ বুঝি"

মুচকি হেসে বলল সে।

এ কথার জবাব না দিয়ে তিনু বলল—"তুই একটা বেলফুলের মালা গেঁথে দিতে পারিস ?"

"কেন ? বেলফুলের মালা নিয়ে কি করবে এখন ? বিয়ে না কি"

"বিয়ে নয়, অন্য দরকার আছে"

"কি দরকার"

"তুই পারবি কি না বল না"

"পারব। কিন্তু মালা নিয়ে কি করবে তা' বলতে হবে"

"আচ্ছা, সে যখন মালা নেব তখন বলব। তুই গেঁথে রাখিস তাহলে, আমি ঘুরে আসছি—"

"কতক্ষণ পরে আসবে"

"ঘণ্টাখানেক পরে। আমি যাচ্ছি এখন মণির কাছে। আমরা দু'জনেই আসব এক ঘণ্টা পরে। মালা গেঁথে রাখিস, বুঝলি—"

"আচ্ছা—"

একটু দূর এগিয়ে গেছে, এমন সময় মুকুলের উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"তিনু দা—শুনে যা-ও"

ডাক শুনে ফিরতে হ'ল তিনুকে !

"কি—"

"তুমি মাকে বলে' যাও, তা না হলে মা আমাকে সন্দের পর গাছ থেকে ফুল তুলতে দেবে না"

"কেন, সন্ধের পর গাছ থেকে ফুল তুললে কি হয়"

"গাছের ঘুম ভেঙে যায়, কষ্ট হয়—"

মুচকি হেসে মুকুল ছুটে চলে' গেল বাড়ির মধ্যে।

একটু বিব্রত হয়ে পড়ল তিনু। দেরি হয়ে যাচ্ছে যে।

মুকুলের মা ভাঁড়ার ঘরে ছিলেন, বাজার-থেকে-আনা জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে তুলে রাখছিলেন। সেইখানে গিয়ে হাজির হ'ল তিনু।

"কাকীমা মুকুলকে বলুন না, বেলফুলের একটা মালা গেঁথে দিক। আপনাদের বাগানে তো প্রচুর বেলফুল"

"এত রাত্রে মালা নিয়ে কি করবে বাবা"

"ভীষণ দরকার"

মুকুলের মা হাসিমুখে চেয়ে রইলেন তিনুর মুখের দিকে। তাঁর মনে হ'ল 'ভীষণ' কথাটার মানেটা বদলে দিয়েছে আজকালকার ছেলেমেয়েরা। মুকুলের মা মূর্খ নন, বেথুন থেকে বি. এ. পাস করেছিলেন। কিন্তু বি. এ. পাস করলে কি হবে। মনটি একেবারে সেকেলে।

"কি এমন ভীষণ দরকার হ'ল এখন ?"

"তা কাল বলব। যার জন্যে মালা দরকার আজ তিনি কথাটা প্রকাশ করতে বারণ করেছেন"

চুপ করে' রইলেন মুকুলের মা।

তারপর বললেন—"কিন্তু রাত্রে যে ফুলগাছে হাত দিতে নেই বাবা। রাত্রে গাছেরা ঘুমোয়—"

"রাত্রে আমরাও ঘুমোই, কিন্তু খুব দরকার হ'লে কি আমাদের আপনি জাগাবেন না ?"

মুকুলের মা হাসিমুখে চেয়ে রইলেন তিনুর মুখের দিকে। মনে মনে বললেন, ছেলেটা বরাবরই জেদী। মহা মুশকিলে ফেললে দেখছি।

এর ঠিক পরেই কিন্তু তিনু যা করলে তাতে কাবু হয়ে পড়তে হ'ল মুকুলের মাকে।

তিনু আবদার-মাখা কণ্ঠে বলে' উঠল, "ওসব কিছু শুনব না কাকীমা। মালা একটা চাইই আজ রাত্রে। না পেলে লজ্জায় অপমানে মাথা কাটা যাবে আমাদের। কাল সব কথা বলব আপনাকে"

"তবে বলে' যা মুকুলকে গেঁথে রাখুক একটা। এত জ্বালাস তোরা"

[২]

থার্ড মাস্টার মশায়ের বাড়ির কাছাকাছি গিয়েই তিন্নু দেখতে পেল থার্ড মাস্টার মশাই মণিকে পড়াচ্ছেন। মণি পেন্সিল হাতে করে' একটা খাতার দিকে চেয়ে ভুরু কচকে বসে' আছে। তিন্নুর মনে হ'ল খুব সম্ভব শক্ত কোনও অঙ্ক দিয়েছেন। থার্ড মাস্টার মশাইও ভুরু কুঁচকে চেয়ে আছেন মণির দিকে। পরিবেশটা খুব অনুকূল মনে হ'ল না তিন্নুর। এ অবস্থায় ও ঘরে ঢোকা আর বাঘের মুখে পড়া একই জিনিস। হয়তো তাকেও দেখলে বসিয়ে দেবেন অঙ্ক কষতে। বলবেন, "মণি এটা পারছে না, দেখ দিকি তুমি পার কিনা।" মণি যে অঙ্ক পারছে না তা সে নিশ্চয়ই পারবে না, মাঝ থেকে সময় নষ্ট হয়ে যাবে খানিকটা। হঠাৎ একটা কথা তার মাথায় খেলে গেল, থার্ড মাস্টার মশাইকেও ব্যাপারটা বললে কেমন হয়। নূতন ইনসপেকটারের ভাইপো সম্প্রতি বি. এ. বি. টি. পাস করেছে, তাকে তিনি বসাতে চান, থার্ড মাস্টারের জায়গায়। তাই আজকাল তিনি নানা রকমে থার্ড মাস্টারের খুঁত ধরছেন। গতবার এসে তিনি তো থার্ড মাস্টারকে অপমানই করে' গেছেন ক্লাসের সামনে। থার্ড মাস্টার মশাই এই অশিষ্ট ব্যবহারের প্রতিবাদ করে' ওপরওলার কাছে চিঠি লিখেছেন কিন্তু কোনও প্রতিকার হচ্ছে না। তাঁর দরখাস্তের জবাব পর্যন্ত আসে নি। সব নাকি মুখ শোকাশুঁকি আছে। ওপরওলারা নাকি সব অবাঙালী, বাঙালীর কোন নালিশই শুনতে চান না। মাস্টার মশাই ওকে যদি সব কথা খুলে বলেন তাহলে হয়তো উনি কিছু ব্যবস্থা করে' দিতে পারেন। তিন্নু তার নিজের বাবার কথাটাও বলবে ভেবেছে। কিছুতেই তাঁকে প্রমোশন দিচ্ছে না। তাঁর নীচের লোকেরা কেউ মিনিস্টারের আত্মীয়, কেউ শিডিউল্ড্ কাস্ট, কেউ বড়বাবুর ভাগনে বলে' প্রমোশন পেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার বাবার চাকরিতে উন্নতি হচ্ছে না। ওঁকে বললে উনি হয়তো কিছু ব্যবস্থা করে' দিতে পারবেন। আর উনি বললে কি না হ'তে পারে।

হঠাৎ থার্ড মাস্টার মশাই চোখ তুলে বারান্দার দিকে চাইলেন।

"কে ওখানে দাঁড়িয়ে"

"আজ্ঞে আমি তিন্নু"

তিন্নু এসে ভিতরে ঢুকল।

"ও তুমি। এমন সময় হঠাৎ কি দরকারে"

"আপনার সঙ্গে একটু প্রাইভেটলি কথা আছে সার"

"আমার সঙ্গে? প্রাইভেটলি? কি কথা—"

চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল তিমু। তার প্রতিমুহূর্তে ভয় হচ্ছিল এইবার বুঝি মাস্টার মশাই ধমক দিয়ে উঠবেন। কিন্তু মাস্টার মশাই তা' করলেন না, খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, "আচ্ছা, বল, শুনি কি তোমার প্রাইভেট কথা।"



"আপনার সঙ্গে একটু প্রাইভেটলি কথা আছে সার" [পৃষ্ঠা ১২৩

সব শুনে থার্ড মাস্টার মশাইও অবাক হয়ে গেলেন। এ যে অবিশ্বাস্য, অথচ একথা বিশ্বাস করবার জন্যে তাঁরও সারা হৃদয় যে উন্মুখ হয়ে আছে।

"তুমি ঠিক দেখেছ?"

"ঠিক দেখেছি সার। আমার একটুও ভুল হয়নি"

"স্টেশনে ওয়েটিং রুমে বসে' আছেন? এখানে নিয়ে এলে না কেন"

"তিনি যে কিছুতেই আসতে চাইলেন না। বললেন খুব জরুরি দরকারে তিনি দিল্লী যাচ্ছেন। রাত্রি দুটোয় তাঁর গাড়ি। আপনি একবার চলুন সার—"

থার্ড মাস্টার মশাই চুপ করে' রইলেন।

● নেপথ্যে

মুকুল

"তিনি কি নিজে মুখে স্বীকার করেছেন যে তিনি—"

তাঁর কথা শেষ করতে দিলে না তিনু।

"না, তিনি স্বীকার করেন নি যদিও, কিন্তু অস্বীকারও করেন নি। মুচকি হেসে চুপ করে' রইলেন। আমার ভুল হয় নি স্যার। তিনি আর একটা কথাও বলেছেন, খুব যেন জানাজানি না হয়—"

থার্ড মাস্টার মশাই ভ্রূকুঞ্চিত করে' রইলেন আরও কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন, "বেশ আর কাউকে বোলো না। তুমি আমি আর মণি স্টেশনে যাব। একটা মালা যোগাড় করে' ফেল—"

"মালা গাঁথতে দিয়েছি স্যার"

"বেশ, একটা নাগাদ বেরুব বাড়ি থেকে। ঠিক সময়ে এসে আমাকে ডেকে নিয়ে যেও"

সোৎসাহে তিনু বাড়ি ফিরে গেল

[৩]

স্টেশনের কাছেই এক মন্দির ছিল। সেই মন্দিরের চূড়ার উপর দপদপ করে' জ্বলছিল একটা বড় নক্ষত্র। অন্ধকারে মনে হচ্ছিল যেন কোনও বিরাট পুরুষ এসে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর গগনস্পর্শী ললাটে যেন পরানো রয়েছে এক রহস্যময় অদৃশ্য মুকুট আর সেই মুকুটের মধ্যমণি যেন ওই নক্ষত্র।

তিনু, মণি আর থার্ড মাস্টার মশাই যখন স্টেশনে এসে পৌঁছল তখন ঠিক একটা বেজেছে। মণির হাতে একটি মালা। মুকুল সত্যিই বেশ চমৎকার করে' গেঁথে দিয়েছিল মালাটি। তিনুর হাতে একটি কাগজ। স্টেশনে কোনও লোক নেই বিশেষ। মফস্বলের স্টেশনে লোক থাকেও না বিশেষ এত রাতে। স্টেশনের বাবুরা শুধু জেগে কাজ করছেন নিজেদের আপিসে। গোটা কয়েক কুলি একধারে শুয়ে ঘুমুচ্ছে।

তিনু, মণি আর মাস্টার মশাই এগিয়ে গেল ওয়েটিং রুমের দিকে। ওয়েটিং রুমেই তাঁর থাকবার কথা। তিনুকে সেই কথাই বলেছিলেন তিনি। তিনু ওয়েটিং রুমে উঁকি দিয়ে দেখল। প্রথমে দেখতে পেল না কাউকে। চেয়ার বেঞ্চি সব খালি। তারপর হঠাৎ দেখতে পেল কোণের দিকে আপাদমস্তক চাদর দিয়ে মুড়ে কে শুয়ে আছে। তিনু আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে তাঁর পায়ে হাত দিতেই তিনি উঠে বসলেন তাড়াতাড়ি। এই যে তিনি। থার্ড মাস্টারও অবাক হয়ে গেলেন। সত্যিই তো।

ভদ্রলোক উঠে বসেছিলেন, তিনি তিমুকে দেখে হাসিমুখে বললেন, "ও, তুমি এসে গেছ বুঝি। বস, বস। তারপর, ওটা কি"

আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে তিমু বললে, "ওটা ফুলের মালা, আপনার জন্যেই এনেছি"

মণির হাত থেকে মালাটি নিয়ে তিমু তাঁকে পরিয়ে দিলে সেটি। তারপর প্রণাম করলে। মণিও করলে। থার্ড মাস্টার মশাইও করলেন। ভদ্রলোক হাসিমুখে প্রতি-নমস্কার করলেন কেবল, আর কিছু বললেন না।

তিমু তখন তার অভিনন্দনপত্রখানা খুলে পড়তে লাগল।

"হে নেতাজী, হে ভারতবরেণ্য বাংলাদেশের সুসন্তান, আজ যে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে আপনার দেখা পাব তা' আমাদের সুদূরতম কল্পনারও অতীত ছিল। আপনি যে এখনও জীবিত আছেন, একথা আমাদের দেশের অনেকে বিশ্বাস করেন, আমরাও করতাম। আজ তার চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়ে কৃতার্থ হলাম।

আজ বাংলাদেশের বড় দুর্দিন। স্বাধীনতা দেবার ছুতোয় ইংরেজ বাংলাদেশকে আবার দ্বিখণ্ডিত করে' চলে' গেছে। অসংখ্য বাঙালী পথে দাঁড়িয়েছে। স্বাস্থ্যহীন, অন্নহীন, গৃহহীন বাঙালীর হাহাকারে চতুর্দিক পরিপূর্ণ, কিন্তু যারা স্বাধীনতার সিংহাসনে আজ সমাসীন তাঁদের কানে এ হাহাকার প্রবেশ করে না। উপরন্তু তাঁদের ব্যবহার দেখে মনে হয় যে বাঙালীরা যেন দেশের কেউ নয়, বাঙালীরা যেন স্বাধীনতার জন্য কিছু করে নি, যা করেছে সব অবাঙালীরা। চাকরির ক্ষেত্রে বাঙালীর স্থান নেই, অন্যায়ভাবে অত্যাচার করে' তাদের সেখান থেকে বিতাড়িত করা হচ্ছে। আমার বাবা কখনও ঘুষ নিতেন না, এই জন্যেই তাঁর প্রোমোশন হয় না। প্রোমোশন হয়েছে মিনিস্টারের এক ভাইপোর। ওপরওলাদের ইচ্ছে কর্মচারীরা সব ঘুষ নিক এবং টাকাটা সবাই মিলে ভাগাভাগি করে' নেওয়া হোক। আমার বাবা তা' করতে রাজী হন নি বলে' তাঁর উপর সবাই চটা। সর্বত্রই এই।

রাষ্ট্রভাষার নামে জোর করে' হিন্দী আমাদের ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে। আমাদের স্কুলে নতুন যে অবাঙালী হেডমাস্টার এসেছেন, তিনি বাড়িতে তাসের আড্ডা বসিয়ে জুয়ো খেলেন, আমাদের থার্ড মাস্টার মশাই সে আড্ডায় যান না বলে' হেডমাস্টার তাঁর উপর অপ্রসন্ন। নানা ছুতোয় ওঁর নামে অভিযোগ করেন ওপরওলার কাছে। বাংলাদেশে যে সব নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে' উঠছে তাতেও বাঙালীরা চাকরি পায় না, সেখানেও অবাঙালীদের প্রতাপ। স্বাধীনতার নামে যে জিনিস দেশে চালু হয়েছে, তা' বাঙালীদের পক্ষে নির্যাতনের নামান্তর। এ সময় আপনি

এমনভাবে আত্মগোপন করে' আছেন কেন? ভাস্বর-দীপ্তিতে আবার আত্মপ্রকাশ করুন, আপনাকে পুরোভাগে রেখে আবার আমরা জয়-যাত্রায় অগ্রসর হই।

যে অখণ্ড অম্লান পক্ষপাতহীন স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে বাঙালীর ছেলেমেয়েরা দলে দলে আত্মাহুতি দিয়েছিল সে স্বাধীনতা আমরা পাই নি। আমাদের ঠকিয়ে, ধাপ্পা দিয়ে একদল চতুর লোক ক্ষমতা হস্তগত করেছে। অপদার্থেরা বাঙালীদের তারা নিষ্পিষ্ট করে' মেরে ফেলতে চায়, এ বিষয়ে তারা ইংরেজদের চেয়েও নিষ্ঠুর। হে নেতাজী, আপনি আবার আত্মপ্রকাশ করুন, আপনি এখুনি আমাদের অনুমতি দিন আমরা দামামা বাজিয়ে প্রচার করি আপনার আবির্ভাবের কথা, আসমুদ্র হিমাচল আবার জেগে উঠুক নব স্বাধীনতার নব আন্দোলনে। হে নেতাজী, আপনি আমাদের অনুমতি দিন—"

তিনুর গলা কাঁপতে লাগল, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ল। সে থেমে গেল। অভিনন্দনপত্রে আর একটু লেখা ছিল, কিন্তু সে আর সেটুকু পড়তে পারল না।

তিনি নিবিষ্টচিত্তে সব শুনলেন। তারপর বললেন, "এটা কি তুমি নিজে লিখেছ?"

"আমি খানিকটা লিখেছিলাম, তারপর মাস্টার মশাই বাকিটা লিখে দিয়েছেন"

থার্ড মাস্টার মশাই বললেন, "গোড়ার দিকটা ওর লেখা, শেষের দিকটা আমার।"

তিনি তিনুর দিকে চেয়ে বললেন, "তুমি যা লিখেছ তা ঠিক। স্বাধীনতার নামে দেশে নানারকম অনাচার অবিচার অত্যাচার চলছে এ কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু তোমরা একদিকটা মাত্র দেখেছ, এর আর একটা দিকও আছে"

"কি সেটা আমাদের বলে' দিন"

"তোমরা নিজেদের দোষের কথা কিছু বল নি। বল নি যে তোমরা দুর্বল বলেই নানারকম মারাত্মক রোগের বীজাণু তোমাদের আক্রমণ করেছে। তোমরা যদি জীবনীশক্তিতে বলীয়ান হ'তে কেউ তোমাদের কিছু করতে পারত না। তোমরা অবিচার অত্যাচারকে মুখ বুজে মেনে নিচ্ছ, প্রতিবাদ করবার সাহস তোমাদের নেই, তোমাদের নৈতিক চরিত্র নেই, একতা নেই, গুণীকে শ্রদ্ধা করবার ইচ্ছে নেই, ক্ষমতা নেই, তোমরা সবাই স্ব স্ব প্রধান থাকতে চাও, একজন নেতাকে মুখ বুজে অনুসরণ করবার মতো ধৈর্যও তোমাদের নেই, মনোবৃত্তিও নেই। শিক্ষার ক্ষেত্রেও তোমরা পিছিয়ে পড়ছ। এরকম অবস্থায় দুর্দশা তো হবেই। তোমরা আগে মানুষের

মতো মানুষ হও, বিদ্যায় চরিত্রে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ কর, তাহলেই তোমাদের দুঃখ ঘুচবে।"

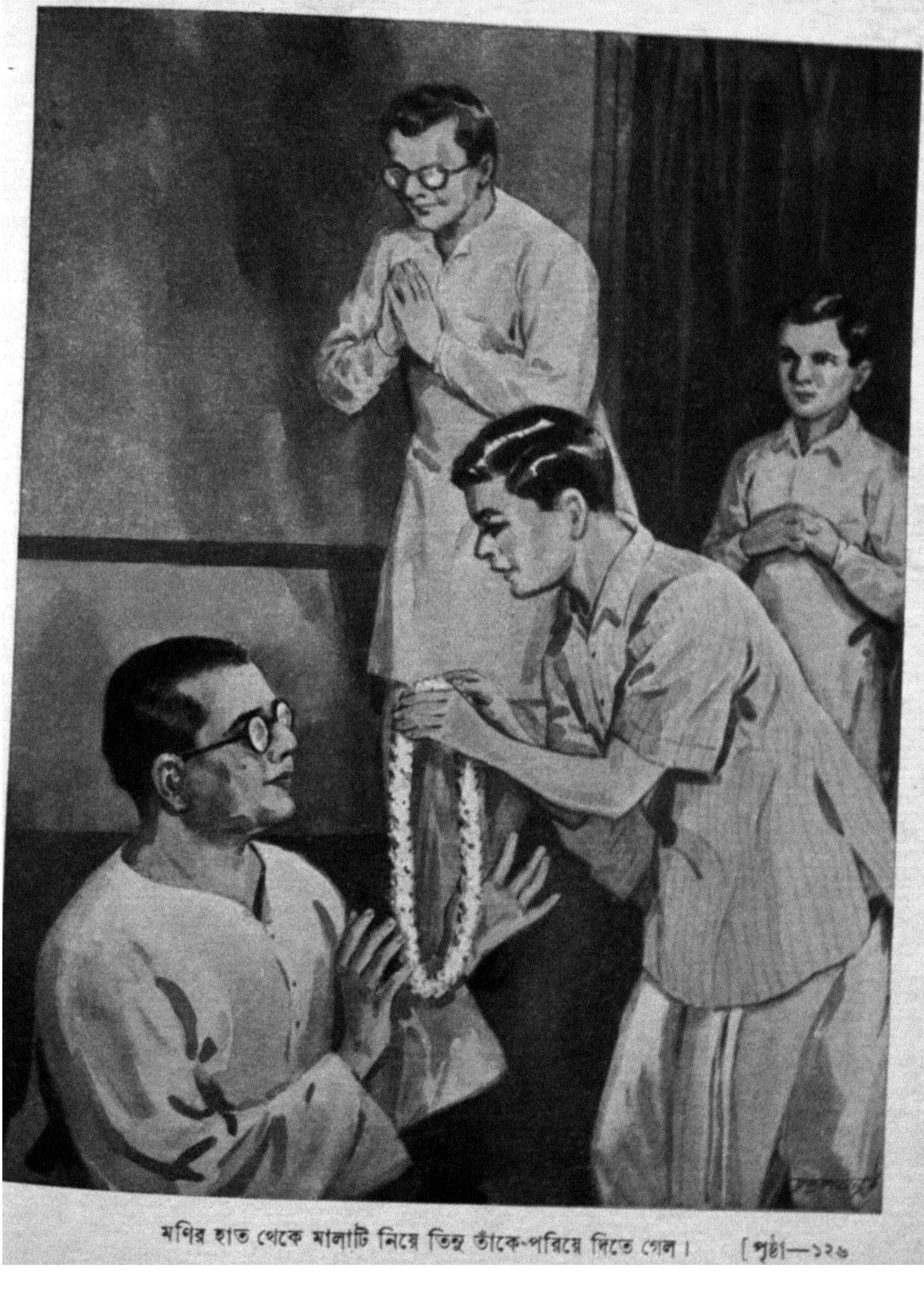


নিজের ছোট পুঁটুলিটি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। [পৃষ্ঠা ১২৯

একটু থেমে বললেন, "আমাকে তোমরা এখন তোমাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে বলছ। যদি আত্মপ্রকাশ করি তাহলে এর একটিমাত্র ফলই হবে, দলাদলি। আমি যখন তোমাদের মধ্যে ছিলাম তখন আমাকে কেন্দ্র করে' যে কি কুৎসিত দলাদলি হয়েছিল তা তোমরা যখন বড় হয়ে দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস পড়বে তখন বুঝতে পারবে। তাই আমি এখন তোমাদের মধ্যে আসতে ইতস্তত করছি, বুঝতে পারছি আমার আদর্শকে রূপ দেবার মতো যথেষ্ট লোক নেই দেশে, তোমরা যেদিন বড় হ'য়ে উপযুক্ত হ'য়ে আমাকে ডাক দেবে, সেই দিনই আমি আসব তোমাদের

● নেপথ্যে

বনফুল



মণির হাত থেকে মালাটি নিয়ে তিনু তাঁকে পরিয়ে দিতে গেল। [পৃষ্ঠা—১২৬

কাছে। তোমরা নিজেদের তৈরি কর। সেইটেই এখন সব চেয়ে বড় কাজ। ট্রেনের আর বেশী সময় নেই। আজ তাহলে তোমরা এস। তোমরা সত্যি সত্যি যেদিন বড় হবে সেদিন তোমাদের মহত্ত্বের আকর্ষণেই আবার আসব তোমাদের কাছে। আমি মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে এইবার একা একটু কথা বলব, তোমরা দু'জন বাইরে যাও"

তিনু আর মণি বাইরে চলে' গেল।

তখন তিনি থার্ড মাস্টার মশাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন, "আমি নেতাজী নই। আমি সামান্য লোক। কিন্তু নেতাজীর সঙ্গে আমার চেহারার অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। অনেকেই আমাকে নেতাজী বলে' ভুল করে। বয়স্ক লোকেরা যখন করে তখন আমি তাদের ভুল সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে দিই। কিন্তু কিশোর ছেলেরা যখন নেতাজী বলে' আমাকে ঘিরে দাঁড়ায় তখন আমি আর তাদের ভুল ভাঙিয়ে দিই না। আপনার ছাত্র দুটিকে যা বললাম তাদের তাই বলি। আপনিও যেন তাদের ভুল ভাঙিয়ে দেবেন না। নেতাজীকে ফিরে পাবার আশায় তারা নিজেদের ভাল করে' গড়ে' তুলুক। আর আপনারা তাদের সে গঠনে সহায়তা করুন"

থার্ড মাস্টার মশাই নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বাইরে ট্রেনের হুইস্‌ল্ শোনা গেল।

"আমার ট্রেন এসে গেল। আমি চলি—"

নিজের ছোট পুঁটুলিটি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। বেরুবার আগে মাথায় একটা টুপি পরলেন আর মুখের নীচের দিকটা চাদর দিয়ে ঢেকে নিলেন যাতে তার মুখটা কেউ না দেখতে পায়।

সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।

—গীতা



মণি ও মুক্তা

যার যা কাজ, তা করতে গিয়ে যদি ত্রুটি হয়, তাহলেও সে-কাজ ত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ, আগুন যেমন গোড়ায় ধূমের দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনি সব কাজের আরম্ভেই দোষ বা ত্রুটি থাকবেই।



গুরুঠাকুরের ভাগবত পাঠ

—কবি জসিমউদ্দিন

গ্রামের জমিদার বাড়িতে কাশী হইতে এক ভাগবত ঠাকুর আসিয়াছেন। তিনি জমিদার বাড়িতে রোজ ভাগবত পাঠ করেন। পাঠ করিতে করিতে তিনি কত সুন্দর সুন্দর পৌরাণিক গল্প বলেন। তাহা শুনিলে কত পুণ্য হয়। কিন্তু গ্রামের সাধারণ লোকদের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। জমিদার তাহাদের নিমন্ত্রণ করেন নাই। কারণ জমিদারের মতে তাহারা ছোট জাত। কিন্তু চাষীরা গ্রামে সংখ্যায় পাঁচশত ঘর। তাহারা বলাবলি করে,—দেখ রে, পাঁচশ' ঘর আমরা। যদি প্রত্যেকে একটাকা করিয়া চাঁদা তুলি তবে পাঁচশ' টাকা ওঠে। আমরা তো ইচ্ছা করিলে একদিন ভাগবত আমাদের বাড়িতেই দিতে পারি।

গ্রামের মোড়ল আরও দু' একজনকে সঙ্গে লইয়া সত্য সত্যই একদিন ভাগবত ঠাকুরের নিকট যাইয়া উপস্থিত।

"ঠাকুর মশায়, প্রণাম হই।"

ঠাকুর মহাশয় স্নান করিয়া আহ্নিকে বসিবেন, এমন সময় চাষীদের দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিগো ব্যাপার কি?"

"আজ্ঞে, আমরা একদিন আপনাকে আমাদের বাড়িতে লইয়া গিয়া ভাগবত শুনিতে চাই।" মোড়ল বলিল।

ঠাকুর মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোরা গরীব মানুষ। তোদের বাড়িতে গেলে আমাকে অনেক টাকা দিতে হইবে।"

গদাই মোড়ল হাত জোড় করিয়া উত্তর দিল, "আজ্ঞে আমরা গ্রামে পাঁচশ' ঘর আছি। প্রত্যেকে একটাকা করিয়া দিলেও পাঁচশ' টাকা ওঠে। দশজনে একসাথে যখন মিলিয়াছি তখন আমরা গরীব কিসের? আপনার ভাগবত পাঠে কত টাকা লাগিবে?"

ঠাকুর মহাশয় জমিদার বাড়িতে ভাগবত পাঠ করিয়া বড় জোর রোজ পাঁচ টাকা পান। কিন্তু যদি বেশী টাকা পাওয়া যায় ছাড়ে কে। তিনি বলিলেন, "আমার ভাগবত তোদের বাড়িতে দিলে পাঁচশত টাকা লাগিবে।"

"আজ্ঞে কর্ত্তা, আমরা গরীব মানুষ। কিছু কম করেন। আট আনার পয়সা দিব না। চারশ' নিরানব্বই টাকা আট আনা, এর বেশী দিতে পারিব না।" উত্তর করিল।

ঠাকুর মহাশয় ভাবিলেন, আট আনাই বা কম লই কেন? তিনি বলিলেন, "না রে তা হবে না।"

গদাই মোড়ল গ্রামের মাতব্বর, দরদস্তর করিয়া ভাগবতের দাম কিছু কম না করিলে তাহার মাতব্বরি থাকে না। সে বলিল, "আচ্ছা না হয় আরও চার আনা আপনাকে ধরিয়া দিলাম। একুনে দাঁড়াইল, চারশ' নিরানব্বই টাকা বার আনা। কর্ত্তা এতেই রাজী হন!"

ভাগবত ঠাকুর মোড়লের দর কষাকষি দেখিয়া এবার রাগিয়া গিয়াছেন। বলিলেন, "দেখ্, তোরা কি ইলিশ মাছের দোকান পাইয়াছিস্?"

মোড়ল একটু হতভম্ব হইয়া পরে কানের মধ্যে গোঁজা একটি আধলা পয়সা বাহির করিয়া বলিল, "ঠাকুর যখন ছাড়িবেনই না, তখন ধরিয়া দিলাম আর এক আধলা। একুনে দাঁড়াইল গিয়া চারশ' নিরানব্বই টাকা বারো আনা আধ পয়সা। এতেই আপনার খুশি থাকিতে হইবে।"

ঠাকুর দেখিলেন, ইহার পরে দর কষাকষি করিলে আর মান সম্ভ্রম থাকিবে না। তিনি বলিলেন, "যা এতেই হইবে। এখানে আর দু'দিন আমাকে ভাগবত পড়িতে হইবে। তারপরেই তোদের ওখানে যাইব। তোরা সব যোগাড় কর গিয়া।"

● গুরুঠাকুরের ভাগবত পাঠ
কবি জসিমউদ্দিন

চাষীরা বাড়ি ফিরিয়া চলিল। পথে যাইবার সময় মোড়ল তার সহচরদের খুব ভালমতই বুঝাইয়া দিল যে, সে না থাকিলে ঠাকুর মশায় পাঁচশত টাকার কমে কিছুতেই রাজী হইত না। সেই তো দর কষাকষি করিয়া পাঁচশত টাকা হইতে তিন আনা সাড়ে তিন পয়সা কমাইল।

বাড়িতে যাইয়া তাহারা পরামর্শ করে, কোথায় ভাগবত দেওয়া যায়। কারও বাড়িতে এমন ঘর নাই যেখানে পাঁচশ' ঘর লোক একত্র বসিতে পারে। তখন স্থির হইল, একজনের ধানের ক্ষেত নষ্ট করিয়া সেখানেই ভাগবত দেওয়া হইবে। কিন্তু কার ক্ষেত কাটা যায়? দুখীরামের ক্ষেত কাটার কথা উঠিলে সে নয়ন পালের ধানের ক্ষেত দেখাইয়া দেয়, নয়ন পাল জগৎরামের ক্ষেত দেখাইয়া দেয়। কার ক্ষেত কাটা যায়? শেষে মোড়ল যুক্তি দিল সকলের ক্ষেতই কাটা হোক। ভাগবত শোনার এমনই নেশা, তখন সকলে মিলিয়া মাঠকে মাঠ কাঁচা ধান কাটিয়া ফেলিল।

জমিদার বাড়িতে ভাগবত পাঠ শোনার সময় ভদ্রলোকেরা তাকিয়া বালিশ হেলান দিয়া বসে। চাষীরা গরীব মানুষ। এসব তাহারা কোথায় পাইবে। খড় আর বিচালীর আঁটি বাঁধিয়া বড় বড় বালিশ তৈরি করা হইল। খড়ের গদি তৈরি করা হইল। ঠিক ভদ্রলোকেরা যে ভাবে ভাগবত শোনে তাহারাও তেমনি আমিরী করিয়া ভাগবত শুনিবে।

কিন্তু জমিদার বাড়ির মতন বড় শামিয়ানা তো তাহাদের নাই। কি করিয়া শামিয়ানা যোগাড় করা যায়? মোড়লের পাকা বুদ্ধি। স্থির হইল যার বাড়িতে যত কাঁথা আছে, লেপ আছে, চাদর আছে সব একত্র সেলাই করিয়া শামিয়ানা তৈরি করিতে হইবে। প্রত্যেক বাড়ি হইতে রঙ-বেরঙের কাঁথা আসিতে লাগিল। কারও কাঁথা ছেঁড়া, কারও লেপের খানিকটা উইএ খাইয়া ফেলিয়াছে।

সমস্ত একত্র করিয়া এক বিচিত্র শামিয়ানা তৈরি হইল। শামিয়ানা সেই ধানের ক্ষেতে পাতিয়া চার কোণে চারটি খুঁটার সাথে তাহার চারি কোণ বাঁধা হইল। তাহার পর প্রকাণ্ড একটা বাঁশের মাথায় নারিকেলের মালা বাঁধিয়া সেই বাঁশ শামিয়ানার মধ্যখানে ঠেকাইয়া সকলে মিলিয়া ঠেলিয়া উপরে উঠাইল। সেই অদ্ভুত শামিয়ানার তলে খড়ের গদি ও খড়ের বালিশ পাতিয়া দেওয়া হইল। মাঝ-খানে এক ভাঙা জলচৌকি পাতা হইল। তাহার চার কোণে সিন্দুর দেওয়া হইল। চৌকির সামনে দুইটি কলসী, কলসীর উপর একটা আমের শাখা। বামপাশে একটা গাড়ু। গাড়ুর উপরে একখানা গামছা রাখিয়া দেওয়া হইল। মোট কথা বড়-

● গুরুঠাকুরের ভাগবতপাঠ
কবি জসিমউদ্দিন

লোকের বাড়িতে ভাগবত সভা যেভাবে সাজান হয় তাহার চাইতে তাহাদের ভাগবত সভা কম করিয়া সাজান হইল না।

সমস্ত স্থির। আজই বৈকাল হইতে ভাগবত পাঠ হইবে। এমন সময় চাষীদের গুরুঠাকুর আসিয়া উপস্থিত। তিনি তো এসব দেখিয়া অবাক— "কি রে ব্যাপার কি?"

গুরুঠাকুরের পায়ের ধূলি মাথায় লইয়া মোড়ল বলিল, "কাশী হইতে জমিদার বাড়িতে এক ভাগবত ঠাকুর আসিয়াছেন। তিনি আজ আমাদের এখানে ভাগবত পাঠ করিবেন।"

গুরুমহাশয় নিজে বাঁচিয়া থাকিতে তাঁহার শিষ্যবাড়িতে অন্য লোক ভাগবত পাঠ করিবে? ঈর্ষায় গুরুমহাশয়ের সকল শরীর জ্বালা করিতে লাগিল।—"তা কাশীর ঠাকুর ভাগবত পাঠ করিবেন। কত টাকা লইবেন?" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন।

মোড়ল খুব গর্বের সঙ্গে বলিল, "আগে তো তিনি পাঁচশ' টাকার কমে ছাড়েন না, তবে অনেক বলিয়া কহিয়া তিন আনা সাড়ে তিন পয়সা কমাইয়াছি।"

"আমার মাথা করিয়াছ?" গুরুঠাকুর রাগ করিয়া বলিলেন, "ভাগবত পাঠ কি আমি জানি না, যে অন্য লোক আসিয়া তোদের বাড়িতে ভাগবত পাঠ করিবে? আর ভাগবত পাঠে কি এত টাকা লাগে রে মূর্খের দল! পাঁচ টাকা দিলে আমি ভাগবত পাঠ করিতে পারি।"

মোড়ল বলিল, "আজ্ঞে গুরুদেব, আপনি যে ভাগবত পাঠ করিতে পারেন, এ তো আমাদের জানা ছিল না। তাই—"

"আরে মূর্খের দল! তোরা তো কিছু বুঝিস না। আমি বেদগানও জানি— রামায়ণ গানও জানি, আবার ভাগবত আমার কণ্ঠস্থ। তবে তোরা গরীব মানুষ, টাকাপয়সা দিতে পারিস না বলিয়া তোদের কাছে এসব বিদ্যা জাহির করি না।"

চাষীরা সকলে ভাবিল, তাইত, আমাদের গুরুঠাকুর নিজেই যখন ভাগবত পাঠ করিতে জানেন তখন আর অন্য লোকের দ্বারে যাই কেন। তাছাড়া গুরু-ঠাকুর মোটে পাঁচটি টাকা চাহিতেছেন। সকলে স্থির করিল, তাই হোক। আমাদের গুরুঠাকুরই ভাগবত পাঠ করুন।

সরল চাষীরা যেমন লেখাপড়া জানে না, তাদের গুরুঠাকুরও তেমনি লেখাপড়া জানেন না। কিন্তু একটু চালাক চতুর বলিয়া নানা কল-কৌশলে তাহাদের মধ্যে নিজের সম্মান বাঁচাইয়া রাখেন। হাজার হোক বামুনের ছেলে— বিদ্যে না থাকুক দুষ্ট বুদ্ধিতে কম যান না।

সন্ধ্যাবেলায় তিনি শহরে যাইয়া অনেকগুলো পুরাতন পঞ্জিকা সংগ্রহ করিয়া

● গুরুঠাকুরের ভাগবতপাঠ
কবি জসীমউদ্দীন

এক কুলির মাথায় দিয়া সভামণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত। শিষ্যেরা ভাবিল, আমাদের গুরুঠাকুর এতবড় বিদ্বান। তাঁহার বিদ্যা মাথায় করিয়া বহিবার জন্য কুলি লাগে। সকলে ধরাধরি করিয়া কুলির মাথা হইতে গুরুঠাকুরের বিদ্যার বোঝা নামাইল, যত্ন করিয়া পা ধোয়াইয়া তাঁহাকে সেই জলচৌকির উপর বসাইল।



গুরুঠাকুর অনেকগুলি পুরাতন পঞ্জিকা এক কুলির মাথায় দিয়া সভামণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত।

প্রকাণ্ড ভুঁড়ি সমেত গুরুঠাকুর ভাঙা জলচৌকির উপর যাইয়া বসিলেন। বসিয়া একে একে সেই বিজ্ঞাপন ও পুরাতন পঞ্জিকাগুলি পড়িবার ভান করিলেন। যেন বেদ ভাগবত কত কঠিন কঠিন বইয়েরই না পাতা উল্টাইতেছেন। আসলে তিনি লেখাপড়া মোটেই জানেন না। ছোটকালে কয়েকদিন মাত্র পাঠশালায় পড়িয়াছিলেন। সেখানে ক খ গ ঘ এই পর্যন্ত তিনি পড়িয়াছিলেন। আর এইটুকুই তাঁহার মনে আছে। যাহোক একখানা পুরাতন পঞ্জিকার পাতা খুলিয়া গুরুঠাকুর নাকে নস্য লইয়া কাসিয়া সেই ক খ গ ঘ অক্ষরগুলিকে একটু সুরের মত করিয়া উচ্চারণ করিয়া পাঠ আরম্ভ করিলেন, "কিয়, ক্ষিয়, ঘিয় শোন বাবা শিষ্যগণ! কিয়, ক্ষিয়, ঘিয়।"

● গুরুঠাকুরের ভাগবতপাঠ
কবি জসিমউদ্দিন

গুরুঠাকুরের সামনে চাষীরা সকলে জোড়হাতে চক্ষু বুজিয়া ভাগবত শুনিতে বসিয়া গিয়াছে। তাহারা গরীব লোক। কত জনের কত রকমের দুঃখ। সেই দুঃখ প্রকাশের এতটুকু সুযোগ পাইলেই তাহারা খানিকটা কাঁদিয়া লয়। মহিম মারা গিয়াছে আজ দশ বৎসর। কিন্তু ভাগবত শোনার সুযোগ লইয়া মহিমের মাতা তাহার মৃত মহিমের জন্য ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। বাবা মহিম রে, তুই কোথায় গেলি? তারিণী ঠাকুরের সঙ্গে মামলায় হারিয়া রাইমোহনকে তাহার বসতবাড়ি বেচিতে হইয়াছে। সে মহিমের মাতার সঙ্গে কান্নায় যোগ দিল। গ্রামের জমিদার সুধারামের পাটক্ষেত জোর করিয়া কাটিয়া লইয়া গিয়াছিল, রামকানাই দশ বৎসর আগে মহাজনের বাড়ি হইতে দশ টাকা কর্জ করিয়াছিল। সুদে ফুলিয়া সেই কর্জের টাকা এখন একশত টাকায় পরিণত হইয়াছে। তাহার জন্য তার মনে সব সময় কান্না জমা হইয়া আছে। আজ ভাগবত শোনার সুযোগ পাইয়া তাহারা সকলেই ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। মোড়ল দেখিল সকলেই কাঁদিতেছে। সে না কাঁদিলে লোকে মনে করিবে কি? তারও মনে বহু দুঃখ ছিল। সেবার সদর থানা হইতে দারোগা আসিয়া তাহাকে খাতির করে নাই। অন্য গ্রামের মোড়লকে খাতির করিয়াছে। সেই কথা ভালমত মনে করিয়া মোড়লও কাঁদিয়া উঠিল। মোড়লের কান্না দেখিয়া গুরুঠাকুর আরও উৎসাহের সঙ্গে পড়িতে লাগিলেন—"কিয় ক্ষিয় ঘিয়।"

এমন মধুর কথা আর কেহ কোনদিন শোনে নাই।

"বল বল ভক্তগণ কিয় ক্ষিয় ঘিয়।"

এইভাবে সারারাত্র জাগিয়া চাষীরা ভাগবত শোনে, আর দিন ভরিয়া ঘুমায়।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় ওপাড়ার এক ভদ্রলোক পথ দিয়া যাইতে দেখিতে পাইলেন, চাষীরা এবাড়ি ওবাড়ি হইতে কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বালাইয়া দলে দলে সেই শামিয়ানার দিকে যাইতেছে। খবর লইয়া জানিলেন চাষীদের গুরুঠাকুর রোজ রাতে এমন ভাগবত পাঠ করেন যে তাহা শুনিয়া সমস্ত গ্রামের লোক কাঁদিয়া বুক ভাসায়। শুনিয়া ভদ্রলোকের মনে কৌতূহল হইল, যাই একবার শুনিয়া আসি, কিরূপ ভাগবত পাঠ হইতেছে। ভদ্রলোক আসিয়া একপাশে বসিলেন। খানিক শুনিয়া ভদ্রলোক তো অবাক। গুরুঠাকুর কেবল অনবরত "কিয়, ক্ষিয়, ঘিয়" এই শব্দ কয়টা উচ্চারণ করিতেছে আর বোকা চাষীরা শেয়ালের মত ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতেছে। কিছুক্ষণ বসিয়া গুরুঠাকুরের এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া ভদ্রলোক উঠিলেন। যাইবার সময় অসতর্কে বলিয়া ফেলিলেন, "ভাগবত না ঘোড়ার ডিম পড়ছে।"

এই কথাটি গুরুঠাকুরের কানে গেল। গুরুঠাকুর সহসা পাঠ বন্ধ করিলেন।

● গুরুঠাকুরের ভাগবতপাঠ
কবি জসিমউদ্দিন

শিষ্যেরা গুরুঠাকুরের মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। গুরুঠাকুর বলিতে আরম্ভ করিলেন, "দেখ শিষ্যগণ, এই যে মধুর ভাগবত—ইহার মর্ম অ-রসিক লোকে কি বুঝিবে। তাইতো শ্রীহরি বলিয়াছেন, কেবলমাত্র ভক্তের কাছে হরিনাম করিও। কিন্তু আমার একটা কথা।"



ভদ্রলোককে ধরিয়া চাষীরা যার যত খুশি কিল চড় মারিতে লাগিল। [পৃঃ ১৩৭

মোড়ল জোড় হাত করিয়া বলিল, "কি কথা গুরুদেব?"

গুরুঠাকুর গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "কথা আর বিশেষ কিছু নয়। এই যে যিনি উঠিয়া গেলেন, এই সব পোশাক-পরা লোকেরা ভাগবত পড়ার মর্মকথা বুঝিতে পারে না। তার জন্য আমার কোন দুঃখ নাই। তবে কিনা তোমরা আমার পাঁচশ' ঘর শিষ্য এখানে উপস্থিত থাকিতে আমার ভাগবত পাঠকে সে বলিয়া গেল ঘোড়ার ডিম!"

মোড়ল গর্জন করিয়া উঠিল, "কি এতবড় কথা! কি করিতে হইবে গুরুদেব?"

গুরুদেব বলিলেন, "কি করিতে হইবে তাহা কি আমাকে বলিয়া দিতে হইবে? তোমরা পাঁচশ' শিষ্য ইহার বিহিত করিতে পার না?"

● গুরুঠাকুরের ভাগবতপাঠ
কবি জসিমউদ্দিন



সাধুবেশধারী ছোটভাই চীৎকার করিয়া উঠিল,
"পাইয়াছি রে পাইয়াছি।"

[পৃষ্ঠা—১৩৮

এই কথা শুনিয়া সকলে ক্ষেপিয়া গেল। ভদ্রলোক তখনও বেশী দূর যান নাই। তাহাকে ধরিয়া আনিয়া চাষীরা যার যত খুশি কিল ঘুষি মারিতে লাগিল।

এত লোকের মার খাইয়া ভদ্রলোক অতিকষ্টে বাড়ি ফিরিয়া গেলেন। গায়ের ব্যথায় তাঁহার খুব জ্বর হইল। পরদিন সকালে ভদ্রলোকের ছোটভাই জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, রাতভর তো তোমার খুব জ্বর দেখিলাম। আর গায়ের ব্যথায় এপাশ ওপাশ করিতে পারিলে না, এরূপ হওয়ার কারণ কি?"

মার খাইয়া কে তাহা স্বীকার করিতে চায়? ভদ্রলোক বলিলেন, "এমনিই আমার জ্বর হইয়াছে। আর জ্বর হইলেই তো গায়ে ব্যথা হয়।"

কিন্তু ছোটভাই নাছোড়বান্দা। সে তবু জিজ্ঞাসা করে—"না দাদা, হঠাৎ তোমার গায়ে ব্যথাই বা হইল কেন আর জ্বরই বা আসিল কেন? নিশ্চয় ইহার কারণ আছে। মার খাইয়া সর্বাঙ্গে কালশিরা পড়িয়াছে, তাহা তো লুকানো যায় না।"

তখন ভদ্রলোক সমস্ত ব্যাপার ছোটভাইকে খুলিয়া বলিলেন। ছোটভাই বলিল, "দাদা, তুমি কোন চিন্তা করিও না। আমি ইহার প্রতিশোধ লইতেছি।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "ওরা সংখ্যায় পাঁচশত। ওদের সঙ্গে লড়াই করিয়া তুমি পারিবে না। আমারই মত মার খাইয়া ফিরিয়া আসিবে।"

ছোটভাই বলিল, "দাদা, তুমি কোন চিন্তা করিও না। আমি কৌশলে ওদের গুরুঠাকুরকে জব্দ করিয়া আসিব।"

সারাদিন বসিয়া ছোটভাই নানারকম ফন্দি-ফিকির করিতে লাগিল। সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় সে একখানা নামাবলী গায়ে জড়াইয়া, কপালে বুকে ফোঁটা-তিলক কাটিয়া দিব্যি এক সাধু সাজিয়া খড়ম পায়ে চটর পটর করিয়া ভাগবত সভার দিকে রওনা হইল।

বহুক্ষণ হয় ভাগবতপাঠ আরম্ভ হইয়াছে। গুরুঠাকুরের মুখে ভাগবত শুনিয়া চাষীরা মাঝে মাঝে সুর করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে, এমন সময় খড়ম পায়ে নামাবলী গায়ে কপালে বুকে ফোঁটা-তিলক পরিয়া ছোটভাই সেই সভামণ্ডপে গুরুঠাকুরের একেবারে সামনে যাইয়া মাটিতে শুইয়া পড়িয়া প্রণাম করিল। তারপর গুরুঠাকুরের পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া বলিল, "গুরুদেব, অধমকে দয়া করেন।" একজন সাধুব্যক্তির এরূপ ভক্তি দেখিয়া গুরুঠাকুরও খুব খুশি হইলেন। তিনি আজ আরও উৎসাহের সঙ্গে পড়িতে লাগিলেন, "মথুরায়াং গত কৃষ্ণ হ্রস্বই দীর্ঘই ইঞ, বল ভক্তগণ সবে—কিয়, ক্ষিয়, খিয়। এমন মধুর নাম আর কখনও শুনিবে না।"

সকলে একযোগে চিৎকার করিয়া উঠিল, "কিয়, ক্ষিয়, খিয়, কিয়, ক্ষিয়, খিয়।"

● গুরুঠাকুরের ভাগবতপাঠ
কবি জসিমউদ্দিন

সাধুবেশধারী ছোটভাই মাটির উপর আর একটি প্রণাম করিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

গুরুঠাকুর আরও উৎসাহের সঙ্গে চিৎকার করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন, "বল বল ভক্তগণ, কিয়, ক্ষিয়, খিয়।" তখন সকলে সমবেতভাবে ডাকিয়া উঠিল, "কিয়, ক্ষিয়, খিয়।"

সাধুবেশধারী ছোটভাই এবার গুরুঠাকুরের একখানা পা টানিয়া লইয়া বলিল, "আহাহা গুরুদেব, কি মধুর কথা শোনাইলেন। আপনার পা'খানি আমার বুকের উপর রাখুন।"

উৎসাহ পাইয়া গুরুঠাকুর আরও জোরে জোরে বলিতে লাগিলেন, "কিয় ক্ষিয় খিয়, কিয় ক্ষিয় খিয়।"

রাত ভরিয়া এইভাবে ভাগবত পাঠ চলিতে লাগিল। সাধুবেশধারী ছোটভাই একবার মাটিতে গড়াগড়ি যায়, আবার গুরুঠাকুরের পায়ের ধুলা লইয়া মাথায় দেয়। আর মাঝে মাঝে গুরুঠাকুরের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চায়।

অনর্গল এইভাবে "কিয় ক্ষিয়, খিয়, কিয় ক্ষিয় খিয়" বলিতে বলিতে গুরুঠাকুর মাঝে মাঝে সামনের গাড়ুর উপর হইতে গামছাখানা লইয়া মুখ মোছেন। হঠাৎ সাধুবেশধারী ছোটভাই গামছাখানার উপর হইতে কি একটা জিনিস পাইয়া ট্যাকে গুঁজিয়া খড়ম পায়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, "পাইয়াছি রে পাইয়াছি।"

সভার সকল লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "আরে কি পাইয়াছেন আপনি ?"

সে খড়ম বগলে করিয়া নাচিতে লাগিল আর বলিতে লাগিল, "যে জিনিস পাইলে পুষ্পকরথে চড়িয়া স্বর্গে যাওয়া যায়, যে জিনিস তাবিজ করিয়া পরিলে কোন অসুখ থাকে না, যে জিনিস সঙ্গে থাকিলে মারামারিতে কেহ হারাইতে পারে না, আমি সেই জিনিস পাইয়াছি।"

চারিদিক হইতে তাহাকে ঘিরিয়া নানা জনে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। মোড়ল তাহাদিগকে থামাইয়া জোড়হাতে বলিল, "আপনি কি জিনিস পাইয়াছেন আমাদিগকে দেখান।"

ছোটভাই তখন তাহার ট্যাক হইতে একগাছা দাড়ি বাহির করিয়া বলিল, "যে মুখ হইতে এমন মধুর ভাগবত বাহির হইতেছে, সেই মুখের একগাছা দাড়ি! ইহা যার সঙ্গে থাকিবে তার চৌদ্দ পুরুষ স্বর্গে যাইবে।"

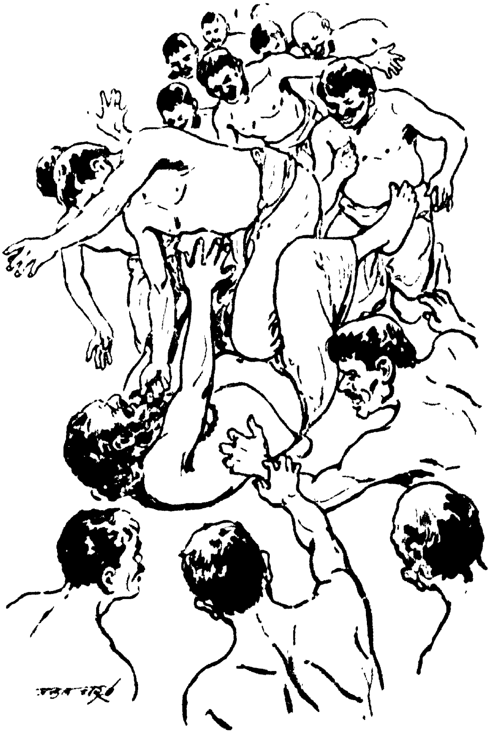
মোড়ল তখন বলিল, "এমন জিনিস আপনি লইয়া যাইতেছেন, তাহা আমরা দিব না। ওটা রাখিয়া যান।"

● গুরুঠাকুরের ভাগবতপাঠ
কবি জসিমউদ্দিন

ছোটভাই বলিল, "আমি তো মাত্র একটা দাড়ির অংশ পাইয়াছি। গুরুঠাকুরের মুখভরা কত দাড়ি আছে। তোমরা টানিয়া লও না কেন ?"

যেমনি বলা অমনি পাঁচশত বোকা চাষী ছুটিয়া আসিল গুরুঠাকুরের দিকে।

গুরুঠাকুর কেবল বলেন, "আরে তোরা করিস কি ? করিস কি ?" কার কথা কে শোনে। চৌকির উপর হইতে গুরুঠাকুরকে ঠ্যাং ধরিয়া টানিয়া আনিয়া মাটিতে ফেলিয়া এক একজন এক একগাছা দাড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিল। দাড়ি ছেঁড়ার ব্যথায় গুরু-ঠাকুর যতই চিৎকার করিয়া কাঁদেন ততই তাহারা অতি উৎসাহে দাড়ি ছিঁড়িতে থাকে। সমস্ত দাড়ি যখন ছিঁড়িয়া শেষ হইল তখন পুণ্যলোভী চাষীরা গুরু-ঠাকুরের মাথার চুলও বাদ দিল না।



গুরুঠাকুরকে মাটিতে ফেলিয়া এক একজন এক একগাছা দাড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিল।

ইত্যবসরে ছোটভাই খড়ম বগলে করিয়া সেখান হইতে পলাইয়াছে। গুরু-দেব মোড়লের পা ধরিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিতেছেন—"বাবা, তুই আমার চৌদ্দ পুরুষের গুরুঠাকুর। এ জন্মে বহু অপরাধ করিয়াছি,—আর নয়—এ যাত্রা তুই আমায় বাঁচা।"



শুধু একটা শেয়ালের গল্প

—দৃষ্টিহীন

[এ গল্পের কোন উদ্দেশ্য নেই, কোন নীতি নেই, শুধু ঘটনা যেমন শুনেছিলাম, তেমনি লিখেছি, শুধু একটু সাজিয়ে গুছিয়ে]

[১]

ডক্টর সেন তাঁর রিসার্চের সুবিধের জন্যে কলকাতার কাছ-বরাবর এক পল্লী-অঞ্চলে জঙ্গল শুদ্ধু একটা প্লট কিনলেন।

খানিকটা জঙ্গল সাফ করে চমৎকার বাংলো প্যাটার্নের একটা ছোট্ট বাড়ি তৈরি করলেন।

বাড়ির পেছন দিকে লোহার জালের দুটো ছোট ছোট ঘর করলেন, তাঁর খরগোশ আর গিনিপিগদের থাকবার জন্যে।

এই সব খরগোশ আর গিনিপিগ তাঁর রিসার্চের জন্যেই দরকার। তিনি

অনেকদিন থেকে চেষ্টা করছেন, টি-বি-র একটা ওষুধ বার করতে। তাই নতুন নতুন ওষুধ তিনি খরগোশ আর গিনিপিগদের ওপর পরীক্ষা করে দেখেন।

এই পরীক্ষার দরুন অনেক খরগোশ আর গিনিপিগ মারা পড়ে···অসুস্থ হয়···তখন ডক্টর সেনের আদেশমত ভুলু চাকর পেছনের জঙ্গলে মাটি খুঁড়ে তাদের সমাধি দেয়।

সেই মরা খরগোশের গন্ধে শেয়াল আসে, মাটি খুঁড়ে তাদের খাদ্য তারা বার করে নিয়ে যায়।

[২]

লোহার তারের এই দুটি ঘর আর তার বাসিন্দারা বিশেষভাবে আকর্ষণ করে অলককে। ডক্টর সেনের একমাত্র ছেলে এই অলক, মাত্র ছ'সাত বছর বয়স। অলকের আগে ডক্টর সেনের আর দুটি সন্তান হয় কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দুটি সন্তানই মারা যায়। তাই অলক বাপ-মায়ের চোখের মণি ছিল।

কিন্তু দুরন্ত ছেলে, সব সময়ই চেষ্টা করতো চোখের পাহারাকে এড়িয়ে নিজের জগতে একা ঘুরে বেড়াতে। বৈজ্ঞানিক বাপের কাছ থেকে পেয়েছিল অসীম কৌতূহল। যা কিছু নতুন দেখতো, তাতেই তার কৌতূহলী মন নেচে উঠতো, পরম বিজ্ঞের মত মা-বাপকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে উদ্‌বাস্ত করে তুলতো।

একদিন তার প্রশ্নে উদ্‌বাস্ত হয়ে মিসেস সেন বলেছিলেন, ভুলুকে জিজ্ঞাসা কর, ভুলু বলে দেবে'

অলক রীতিমত অপমানিত বোধ করে। তার প্রশ্নের উত্তর দেবে, ভুলু!

গম্ভীরভাবে মা-কে বলেছিল, আমি তো তবু তিনখানা বই পড়েছি··· ভুলু অ আ ক খ-ও জানে না···হুঁ···ভুলু কি করে উত্তর দেবে?

মিসেস সেন আর কিছু বলতে পারেন নি।

[৩]

একটা জিনিস অলক লক্ষ্য করতো, খরগোশের ঘরে মাঝে মধ্যে খরগোশ কমে যেতো, আবার দেখতো তাদের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। রোজ তার কাজ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, খরগোশের ঘরে এসে খরগোশ গোনা।

খরগোশ গুনে গম্ভীরভাবে ডক্টর সেনের কাছে গিয়ে বলতো, বাবা, তারের ঘরে আজ দশটা খরগোশ দেখলাম···কাল বারোটা ছিল···দুটো খরগোশ গেল কোথায়?

ডক্টর সেন হয়ত তখন কোন বিলিতী ম্যাগাজিন পড়ছেন, অন্যমনস্কভাবে বলেন, তোমার শুনতে ভুল হয়েছে।

অলকের চোখমুখ রাঙা হয়ে ওঠে। তীব্রভাবে প্রতিবাদ করে, ধ্যেৎ! শুনতে আবার ভুল হয় বুঝি?



অলক প্রতিবাদ করে, ধেৎ! শুনতে আবার ভুল হয় বুঝি?

ম্যাগাজিন থেকে চোখ তুলে ডক্টর সেন তখন বলেন, না, তোমার শুনতে ভুল হয়নি, দুটো খরগোশ কাল রাত্তিরে মারা গিয়েছে!

এই উত্তর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর সেন জানতেন, তিনি বিপদ ডেকে আনছেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়, প্রশ্ন! কেন মরে গেল? কি হয়েছিল? এত শীগ্‌গির শীগ্‌গির মরে যায় কেন?

তখন বাধ্য হয়েই তিনি সত্যি কথা বলেছিলেন। নতুন নতুন ওষুধের পরীক্ষা তাদের ওপর করতে হয়···তার ফলে অনেক সময় তারা মরে যায়।

চোখ বড় বড় করে অলক শোনে। কিছুতেই বুঝতে পারে না, তাদের কেন মরতে হয়।

ডক্টর সেন বুঝিয়ে বলেন, সভ্যতার কল্যাণে যদি দশ বিশটা প্রাণী মারা যায়, তাতে কিছু যায় আসে না।

[৪]

কিন্তু খরগোশের সংখ্যা ক্রমশই কমতে লাগলো। মানুষের কল্যাণে যারা মরছে, তাদের হিসেবের বাইরেও খরগোশের সংখ্যা কমতে থাকে।

● শুধু একটা খেয়ালের গল্প
দৃষ্টিহীন

ডক্টর সেন ভুলু চাকরকে সন্দেহ করেন, চুরি করে হয়ত সে বিক্রি করেছে।

ডেকে চাকরকে ধমক দেন।

চাকর হাতজোড় করে বলে, হুজুর, শেয়াল।

ডক্টর সেন ধমকে ওঠেন, তারের বেড়ার ভেতরে ঢুকে শেয়াল কি করে নিয়ে যায়?

দরজার বাইরে অলক কান খাড়া করে শোনে। সত্যিই তো, তারের ঘর, তার ভেতর থেকে শেয়াল কি করে নিয়ে যাবে?

বুড়ো চাকর বলে, আজ্ঞে, দরকার পড়লে শেয়াল কুকুরদেরও বুদ্ধি খোলে। মাটির তলা থেকে সুড়ঙ্গ কেটে তারের ঘরের তলায় এসে খরগোশ ধরে নিয়ে যায়। বাচ্চাগুলো যখন বড় হয়, তখন এমনি করে খাবার নিয়ে গিয়ে বাচ্চাদের খাওয়ায়।

ডক্টর সেন বলেন, ঠিক আছে, আমি দেখছি, কত বড় তাদের বুদ্ধি।

অলক দরজা থেকে ছুটে পালায়, শেয়ালগুলোর ওপর তার শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। তার শিশুমনে কৌতূহল জেগে ওঠে, দেখতে হবে চাকরটার কথা সত্যি কিনা।

[৫]

সন্ধ্যার মুখে সকলকে ফাঁকি দিয়ে অলক পেছনের জঙ্গলে এক ঝোপের কাছে চুপটি করে বসে থাকে।

শুকনো পাতা মাড়িয়ে চলার খস্ খস্ শব্দ হয়। অলক সচকিত হয়ে ওঠে। একটু মুখ বাড়িয়ে দেখে, চাঁদের আলোয় খরগোশ মুখে করে একটা শেয়াল এগিয়ে আসছে। অলকের শিশুমনে আনন্দ জেগে ওঠে, মনে মনে কল্পনা করে, বনের ভেতর কোথাও বাচ্চারা খিদের জ্বালায় ছটফট করছে, কখন তাদের বাবা তাদের জন্যে খাবার নিয়ে আসবে!

শেয়ালটা সোজা তার ঝোপের সামনে এসে দাঁড়ায়। অলক চোখ বড় করে দেখে।

কি সন্দেহ করে শেয়ালটা একটু থামে, এদিক ওদিক চায়!

এমন সময় দড়াম্ করে একটা গুলির শব্দ হলো···শেয়ালটা ছুটে পালালো··· আবার একটা দড়াম্ করে আওয়াজ হলো···

● শুধু একটা শেয়ালের গল্প
দৃষ্টিহীন

[৬]

বন্দুক হাতে ডক্টর সেন এগিয়ে আসেন।

কোথায় শেয়াল?

ওটা কি পড়ে?

ঝোপের কাছে মাথা নীচু করে ডক্টর সেন দেখেন, অসাড় গুলি-বিদ্ধ দেহে তাঁর অলক পড়ে আছে।

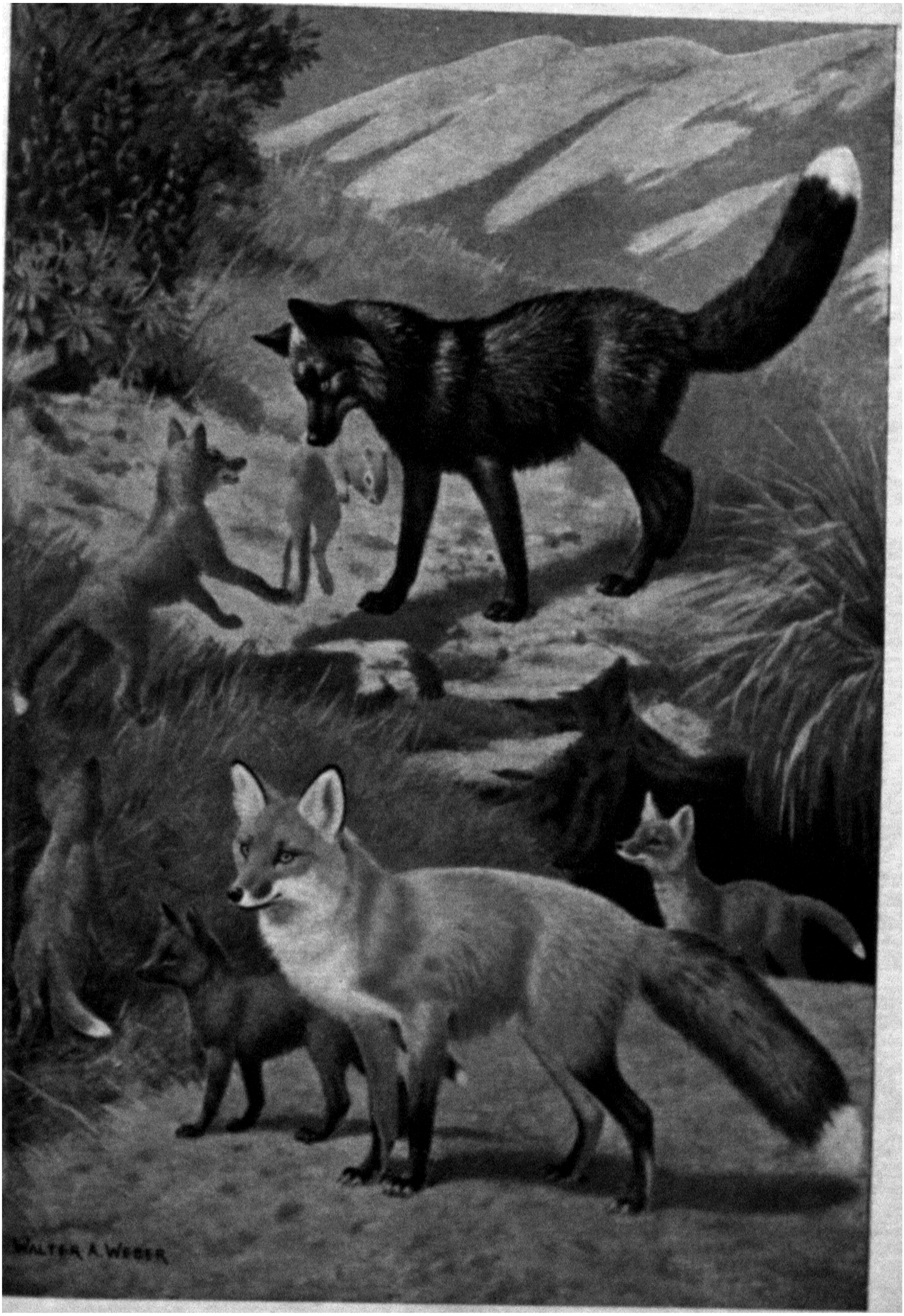
ডক্টর সেনের হাত থেকে বন্দুক পড়ে যায়।

বনের ভেতর শেয়ালরা চীৎকার করে ওঠে—হুক্কা হুয়া!

সোনালী কথা

পিনকৃকিয়ো (চার্লস্ কলোদি)

এই একখানি বই লিখে ইতালীয়ান লেখক কলোদি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে আছেন। জগতে যে তিন চারখানি বই চিরকালের শিশুদের জন্যে লেখা হয়েছে, পিনকৃকিয়ো তাদেরই একটি। পিনকৃকিয়ো কোন রাজার নাম নয়, কোন রাজকুমারের নাম নয়, কোন দুষ্টু ছেলের নাম নয়, পিনকৃকিয়ো হলো একটা কাঠের পুতুলের নাম। মিঃ চেরী নামে এক ছুতোর মিস্ত্রী একদিন এক টুকরো কাঠ নিয়ে যথারীতি কাজ করছিল, হঠাৎ শুনতে পেলো কে যেন ক্ষীণ কণ্ঠে বলছে, বড় লাগছে, তোমার রাঁদা আস্তে চালাও। ভুতুড়ে কাঠ মনে করে চেরী ভীত হয়ে ওঠে, এমন সময় তার বন্ধু গেপেটো এসে জবাব করলো, কাঠটা আমাকে দিয়ে দাও, ঐ কাঠ দিয়ে আমি একটা পুতুল তৈরি করবো, সেই পুতুল নাচিয়ে দিন চালাবো। চেরীর কাছ থেকে সেই কাঠের টুকরো নিয়ে গিয়ে গেপেটো একটা পুতুল তৈরি করলো…তার হাতে তৈরী হ'য়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই বিচিত্র পুতুল মানুষের মতন নাচতে শুরু করে দিলো। গেপেটো সেই অদ্ভুত জীবন্ত পুতুলের নাম রাখলো পিনকৃকিয়ো। কাঠের পুতুল হলে হবে কি, তার বিচিত্র কাণ্ড-কারখানায় গেপেটোর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। কলোদি তাঁর বইতে সেই অদ্ভুত কাঠের পুতুলের বিচিত্র যে সব অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী লিখেছেন, বিশ্বের ছেলেমেয়ে, বুড়ো-বুড়ী, সবাই তা পড়ে মুগ্ধ। বিশ্বসাহিত্যে পিনকৃকিয়োর জোড়া নেই।


WALTER A. WEBER



সিংহগড়ের সিংহবিক্রম

—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

এক

সেদিনের কথা মনে কর যেদিন ছিলেন আওরঙ্গজেব ভারতের সার্বভৌম সম্রাট। ভারতের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সব দিকই তাঁহার পদানত। উড়িতেছে অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি পতাকা—দিকে দিকে দেশে দেশে নগরে-প্রান্তরে পল্লীতে পল্লীতে শোনা যাইতেছে 'আল্লা আল্লাহো আকবর'। তখনও বাদশাহ আওরঙ্গজেবের দৃপ্ত ও অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয় নাই। সমুদয় দাক্ষিণাত্য বিজয় করা ছিল তাঁহার বাসনা। সেজন্য উদ্যোগ আয়োজনের কোন ত্রুটি করেন নাই। আগ্রা দিল্লীর ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য, ধনভাণ্ডার পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন অগণিত সৈন্যবাহিনীসহ দাক্ষিণাত্য প্রদেশে। সর্বদিকে ছিল তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। পদানত করিবেন হিন্দুরাজ্য—এই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য ও পণ।

বাদশাহ্ আলমগীর হিন্দুদের উপর ধার্য করিয়াছিলেন জজিয়া। তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষেরা যখন যে প্রদেশ জয় করিয়াছেন তখন সেখানে প্রজাদের পীড়ন ও হিন্দুদের উচ্ছেদসাধন করিয়া সর্বদিক দিয়াই তাহাদের দমাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই সব অবিচার ও উৎপীড়নের, বিশেষ করিয়া জজিয়া করের বিরুদ্ধে আওরঙ্গজেবের নামে শিবাজী মহারাজ এক পত্র প্রেরণ করেন। সেই পত্রের একস্থানে লিখিয়াছিলেন—

"বাদশাহ, সালাম! যদি আপনি খোদার কেতাব (অর্থাৎ কুরাণ)-এ বিশ্বাস করেন, তবে দেখিবেন সেখানে লেখা আছে যে ঈশ্বর সর্বজনের প্রভু (রব্-উল্-আলমীন্), শুধু মুসলমানের প্রভু (রব্-উল্-মুসলমীন্) নহেন। বস্তুতঃ, ইসলাম ও হিন্দুধর্ম দুইটি পার্থক্যব্যঞ্জক শব্দ মাত্র; যেন দুইটি ভিন্ন রং—যাহা দিয়া স্বর্গবাসী চিত্রকর রং ফলাইয়া মানবজাতির (নানাবর্ণে রঙীন) চিত্রপট পূর্ণ করিয়াছেন।

...মসজিদে তাঁহাকে স্মরণ করিবার জন্যই আজান উচ্চারিত হয়। মন্দিরে মন্দিরে তাঁহার অন্বেষণে হৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রকাশের জন্যই ঘণ্টা বাজান হয়। অতএব নিজের ধর্ম ও ক্রিয়াকাণ্ডের জন্য গোঁড়ামি করা ঈশ্বরের গ্রন্থের কথা বদল করিয়া দেওয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে।...যদি আপনি মনে করেন যে প্রজাদের পীড়ন ও ভয়ে হিন্দুদের দমাইয়া রাখিলে আপনার ধার্মিকতা প্রমাণিত হইবে, তবে প্রথমে হিন্দুদের শীর্ষস্থানীয় মহারানা রাজসিংহের নিকট হইতে জজিয়া আদায় করুন। তাহার পর আমার নিকট আদায় করা তত কঠিন হইবে না। কারণ আমি তো আপনার সেবার জন্য সদাই প্রস্তুত আছি। কিন্তু মাছি ও পিপীলিকাকে পীড়ন করা পৌরুষ নহে।

বুঝিতে পারি না কেন আপনার কর্মচারীরা এমন অদ্ভুত প্রভুভক্ত যে তাহারা আপনাকে দেশের প্রকৃত অবস্থা জানায় না, কিন্তু জ্বলন্ত আগুনকে খড় চাপা দিয়া লুকাইতে চায়।

আপনার রাজসূর্য গৌরবের গগনে দীপ্তি বিকীর্ণ করিতে থাকুক।"*

আলমগীর বাদশাহ, শিবাজীর এই লিপি পাঠ করিয়া আরও ক্রুদ্ধ হইলেন। 'পার্বত্য মূষিক' শিবাজীর পরাক্রম খর্ব করিবার জন্য সম্পূর্ণভাবে পদদলিত করিবার জন্য পাঠাইলেন অগণিত মুঘলবাহিনী দাক্ষিণাত্য প্রদেশে। হিন্দু মুসলমানে আরম্ভ হইল ভীষণ সংঘর্ষ।

* [শিবাজীর লিখিত যে চিঠিখানা হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিলাম, তাহা লণ্ডনের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত হস্তলিপির অনুবাদ। আচার্য যদুনাথ সরকার কর্তৃক সংগৃহীত ও অনূদিত।]

● সিংহগড়ের সিংহবিক্রম
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

দুই

শিবাজী অপূর্ব বীরত্ববলে, অতুল সাহসে, অসামান্য বিক্রমে, বিপুল অধ্যবসায় সহকারে স্বর্গাদপি গরীয়সী পুণ্যময়ী জন্মভূমি রক্ষার জন্য সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া অচল অটল গিরিরাজের ন্যায় দাঁড়াইলেন—বাদশাহ আলমগীরের বিরুদ্ধে। 'হর হর বম্ বম্ জয় মা ভবানী' ধ্বনি দিকে দিকে ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

শিবাজীর বীরত্ব খর্ব করিবার জন্য বিরাট সৈন্যবাহিনী সুদক্ষ সেনাপতির নেতৃত্বে পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন বাদশাহ আলমগীর। ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল দাক্ষিণাত্যের সর্বত্র। দিকে দিকে আগুন জ্বলিতে লাগিল। একবার মুঘলসৈন্য-বাহিনী শিবাজীর অধিকৃত দুর্গ অধিকার করিতেছে, আবার অন্যদিকে শিবাজী অধিকার করিতেছেন মুঘল দুর্গ। একবার মুঘলের জয়, অন্যদিকে শিবাজীর জয়। দক্ষিণাপথ মুঘল ও মাওয়ালী সেনাদের পদভরে কম্পিত, অস্ত্রধ্বনিতে প্রতি-ধ্বনিত। উভয় পক্ষের রণভেরীর নিনাদে, যুদ্ধের ভৈরব গর্জনে দাক্ষিণাত্য-প্রদেশ প্রকম্পিত।

আওরঙ্গজেবের বীর সেনাপতি মহারাজ যশোবন্ত সিংহ, শিবাজীর দুর্ভেদ্য দুর্গ সিংহগড় অধিকার করিয়াছেন। ছত্রপতির প্রাণপ্রিয়তম সিংহগড় দুর্গ, দুর্ভেদ্য সে গিরিদুর্গ। চারিদিকে নীল সমুন্নত পর্বতমালা মেখলার ন্যায় ইহাকে বেড়িয়া আছে। চারিদিক বেড়িয়া অতি দুরারোহ পর্বতশ্রেণী, শৈলকাননকুন্তলা ধরণীর শ্যাম শোভা। "নীলগগন সে মিশে গেছে নীল তনুতে সোহাগ করি"—মেঘ তাহার অঙ্গে অঙ্গে খেলা করে। সিংহগড়ের প্রহরীসদৃশ পর্বতশ্রেণী প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রাচীররূপে দাঁড়াইয়া আছে।

শিবাজীর এই সুরক্ষিত দুর্গ অধিকার করিয়াছেন আলমগীর বাদশাহের সেনাপতি মহারাজা যশোবন্ত সিংহ। এই দুর্গ মুঘলের হস্তগত হওয়ায় শিবাজী মহারাজা পড়িয়াছেন গভীর চিন্তায়। কিভাবে মুঘলবাহিনীকে পরাজিত করিয়া সিংহগড় পুনরায় অধিকার করিবেন—কেমন করিয়া বিপুল বিপক্ষদলকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করিয়া প্রকৃতির প্রাচীর বেষ্টিত সিংহগড় দুর্গ পুনরায় অধিকার করিবেন সেই হইল তাঁহার মনের একান্ত বাসনা—হর হর বম্ বম্ জয় মা ভবানী, তুমি হও আমার সহায় মা জননী। স্থির করিলেন একদিন রাত্রিযোগে আক্রমণ করিবেন সিংহগড় দুর্গ। নব বলে নব উৎসাহে তাঁহার প্রাণ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

● সিংহগড়ের সিংহবিক্রম
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

তিন

মহাবীর শিবাজী ছিলেন পরম মাতৃভক্ত। তাঁহার জননী এবং আরাধ্যা দেবী ভবানীকে তুল্য জ্ঞান করিতেন। যুদ্ধে গমনকালে মাতার চরণতলে ভক্তিপ্রণত হইয়া তরবারি ধারণ করিয়া যুদ্ধে যাইতেন। যুদ্ধকালে শত্রুপক্ষ কর্তৃক ঘোরতরভাবে আক্রান্ত হইলে—সেই ভীষণ বিপদকালে জননীর নাম স্মরণ করিয়া আবার নবীন উৎসাহে বুক বাঁধিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন। মাতৃআশীর্বাদ মনে করিলেই তাঁহার প্রাণে জাগিত অভিনব কর্মশক্তি, প্রাণে আসিত নব উৎসাহ, নব আশা বিজয়ের। মাতৃশক্তি তাঁহার প্রাণে জাগাইয়া দিত শতগুণ উৎসাহ, শতগুণ অধ্যবসায়। আশা ও বিশ্বাসে উজ্জীবিত হইয়া মহাবীর শিবাজী অটল বলে আক্রমণ করিতেন শতগুণ বিপক্ষবাহিনীকে। জয়লাভও করিতেন শিবাজী। মাতৃনাম স্মরণেই তাঁহার হৃদয়ে জাগিত মহাশক্তি।

চার

হেমন্তের সন্ধ্যা। আকাশ কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন। চারিদিকে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। এমন সময়ে শিবাজী তাঁহার প্রিয় অশ্বারোহণে সঙ্গে মাত্র দুইজন মাওয়ালী সেনা লইয়া নিবিড় নির্জন শ্যামল তরুবীথির পথে চিন্তামগ্ন মনে আসিলেন মাতৃদর্শনে। শিবাজী ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন মাতৃভবনে।

জননী জীজাবাই তাঁহার পূজার মন্দিরে বসিয়া তখন পূজা করিতেছিলেন উমা-মহেশ্বরকে। ভক্তিতে তাঁহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল, কণ্ঠে তাঁহার ধ্বনিত হইতেছিল সুমধুর শিবসংগীত—

হর হর শিব শঙ্কর ভোলা,
জাহ্নবী শিরে, বিগলিত নীরে
কণ্ঠে দোদুল হাড়মালা।
ফণিরাজ ভূষণ বিভূতি ছাদন
জটাজুটবিলম্বিত প্রমথ মেলা।
কল কল গঙ্গে নৃত্যতরঙ্গে
শ্মশান ভীষণ অনল জ্বালা।
সংহার! সংহার! শবদ ভীষণ
করধৃত ত্রিশূল প্রলয় জ্বালা!

● সিংহগড়ের সিংহবিক্রম
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সংগীত শেষ হইলে শিবাজী মায়ের চরণে অবনতমস্তকে প্রণাম করিলেন। তারপরে করজোড়ে নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলেন মাতৃসমীপে।

মাতা প্রাণাধিক বীরপুত্রের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : 'শিবা, তোমার কুশল তো ?'

শিবাজী। আপনার শ্রীচরণপ্রসাদে আমার সর্বদাই কুশল, জননী।

জীজাবাই। আজ এমন অসময়ে কেন এলে শিবা ?

শিবাজী। মা, আপনার আশীর্বাদ লাভ করবার জন্য।

জীজাবাই। কোন্ দুর্গ জয় করবে ?

শিবাজী। সিংহগড় দুর্গ জয় করতে চাই মা মুঘলের হাত থেকে।

জীজাবাই। কবে কোন্ তারিখে, বল।

শিবাজী। আমি আজই যাব গভীর রাত্রিকালে।

জীজাবাই। আজই ?

শিবাজী। হাঁা মা জননী। আজই মুঘলবাহিনীকে আক্রমণ করবো সংকল্প করেছি।

জীজাবাই কি যেন ভাবিলেন, তারপর ধীরে মধুর কণ্ঠে কহিলেন—শোন শিবা, আমি দেবাদিদেব মহাদেবের কাছে তোমার রণবিজয় প্রার্থনা করেছিলাম। শিবা, দেব শংকরের আশীর্বাদে তোমার বিজয়লাভ হবে। যাও বৎস! আক্রমণ কর সিংহগড়। তোমার জয় হউক—উমা-মহেশ্বরের এই আশীর্বাদ। গ্রহণ কর এই পুষ্পাঞ্জলি বিল্বপত্র, গ্রহণ কর এই বিজয় তিলক।

মাতা দিলেন শিবার মস্তকে আশীর্বাদী পুষ্পাঞ্জলি। স্নেহবিগলিত নয়নে ললাটে পরাইয়া দিলেন চন্দন তিলক, হাতে দিলেন মাতা ভবানীর চরণস্পৃষ্ট তরবারি।

শিবাজী মাতৃচরণে প্রণাম করিলেন। মাতা পুত্রের মস্তকাঘ্রাণ করিয়া পুত্রকে আশীর্বাদ করিলেন। 'এসো শিবা, বিজয়ী হয়ে এসো বৎস! এই নাও তোমার ভবানী-তরবারি। বিজয়ী হয়ে এসো শিবা। জয় মা ভবানী!'

শিবাজী মাতার আশীর্বাদ লাভ করিয়া হৃদয়ে অমিত বল ও সাহস লাভ করিলেন এবং বজ্রমুষ্টিতে তরবারি ধারণ করিয়া মেঘমন্দ্রকণ্ঠে কহিলেন : 'মা জননী, আপনি আমার আরাধ্যা দেবী। আপনিই আমার আরাধ্যা দেবী ভবানী, আপনি মহাশক্তিময়ী অতুল শ্রীসমন্বিতা দশপ্রহরণধারিণী দেবী ভগবতী। মা, তোমার শুভ আশীর্বাদে নিশ্চয়ই জয়যুক্ত হব।'

● সিংহগড়ের সিংহবিক্রম
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

শিবাজী যেমন আসিয়াছিলেন, তেমনি মাতৃমন্দির হইতে নববলে উদ্দীপ্ত হইয়া নিশীথে নীরবে যাত্রা করিলেন—শত মত্ত মাতঙ্গ দলের ন্যায় অসীম বলে। মহামাতৃভক্ত শিবাজীর মা মা ধ্বনি সন্ধ্যার মৌন আকাশ প্রতিধ্বনিত করিল। মাতৃনাম ধ্বনিত হইল আকাশে-বাতাসে বনে-বনে প্রান্তরে প্রান্তরে।



মাওয়ালী সৈন্যসহ শিবাজী সিংহগড় দুর্গ আক্রমণ করিলেন।

চার

রাত্রি দ্বিপ্রহর। নিস্তব্ধ ধরণী। চারিদিকে গভীর ঘন অন্ধকার। ঘোর কুজ্ঝটিকায় চারিদিক সমাচ্ছন্ন। আকাশে তারারা শুধু জাগিয়া আছে। নীড়ে নীড়ে পাখীদের পক্ষবিধূনন শব্দ শুনা যাইতেছে। এমন সময় নীরবে সাবধানে অতি সতর্কতার সহিত সতর্ক পদবিক্ষেপে রজ্জুবিনির্মিত অধিরোহিণী আশ্রয় করিয়া একে একে দশে দশে সহস্রে সহস্রে অযুতে অযুতে মাওয়ালী সৈন্য অতি সন্তর্পণে দুরারোহ সিংহগড়

● সিংহগড়ের সিংহবিক্রম

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

দুর্গের উপর উঠিতেছিল। যেখানে রজ্জু অধিরোহিণীর সাহায্যে উপরে উঠিতে পারিতেছিল না, সেখানে পর্বত শিলাখণ্ড এবং বৃক্ষলতা অবলম্বন করিয়া উঠিতেছিল মাওয়ালী সৈন্যদল। ক্রমে তাহারা উঠিল পর্বতোপরি দুর্গশিরে। এমন সন্তর্পণে উঠিল যে আওরঙ্গজেবের উক্তি 'পার্বত্য মূষিক' বলিয়া শিবাজীর উপর প্রযুক্ত শব্দ অসংগত হয় নাই।

অন্যদিকে দুর্গশিখরে দুর্গরক্ষী মুঘল-সেনাদল আরামে কম্বলাচ্ছাদনে সুখনিদ্রা ভোগ করিতেছিল। এমন সময় মাওয়ালী সেনার সদম্ভ পদবিক্ষেপে মুঘল দুর্গ-রক্ষীদের সুখনিদ্রা ভাঙিল। তন্দ্রাবিজড়িত চক্ষে তাহারা সবিস্ময়ে শঙ্কিত চিত্তে দেখিল বিপক্ষ সেনার দ্বারা দুর্গ পূর্ণ হইয়াছে। অমনি বাজিল রণভেরী ঘন ঘন, জাগিয়া উঠিল দুর্গের মুঘল প্রহরীগণ, মুঘল সৈন্যাধ্যক্ষ ও সৈন্যগণ। বাজিল রণদামামা ভৈরবরবে। অজ্ঞাতপূর্ব সহসা আক্রমণ—মুঘলসেনা কিছুই যেন বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহারা সব বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। মুঘল সৈন্যাধ্যক্ষগণের সুশৃঙ্খল শিক্ষাগুণে ক্ষণকালের মধ্যেই সকলে সংঘবদ্ধ হইল। আরম্ভ হইল ভীষণ আক্রমণ—মুঘলসেনারা আক্রমণ করিল শিবাজীর সৈন্যদলের উপর।

আরম্ভ হইল হিন্দু-মুসলমানে ঘোরতর যুদ্ধ। উভয় পক্ষের সেনার ঘোর গভীর গর্জন পর্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে হইয়া উঠিল গর্জনমুখর। মুঘলসেনার 'আল্লা আল্লাহো আকবর' ধ্বনি শিবাজীর মাওয়ালী সেনার 'হর হর মহাদেও', 'বম্ বম্ হর হর হর হর ভবানী' ধ্বনি চারিদিকে এক মহাপ্রলয় নিনাদের সৃষ্টি করিল।

উভয় পক্ষের প্রজ্বলিত মশালের দীপ্তিতে চারিদিকের পর্বতশিখর, বনানী করিল সমুজ্জ্বল।

শিবাজীর নির্দেশে মাওয়ালী সেনারা দেখিতে দেখিতে দুর্গরক্ষী মুঘল সৈন্যদিগকে প্রবল বিক্রমে আক্রমণ করিয়া হতবল করিয়া ফেলিল। দৈববলপ্রদীপ্ত মাওয়ালীদিগের প্রচণ্ড আক্রমণে ও অস্ত্রাঘাতে মুঘলবাহিনী ভীষণভাবে পরাজিত হইল এবং শত শত মুঘল সেনানী প্রাণ হারাইল। দুর্গম গিরিশিখর হইতে পলায়ন করিতে গিয়া অনেকে আহত হইয়া পড়িল। বিস্তৃত দুর্গপ্রাঙ্গণে শত শত নিহত মুঘলসেনার, সৈন্যাধ্যক্ষের মৃতদেহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল। পরাজিত হইল মুঘল সৈন্যগণ। যশোবন্ত সিংহ বীর্য বলে একদিন যে সিংহগড় দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন সেই দুর্গ শিবাজীর বিজয়-প্রভাবে আবার তাঁহার হাতে আসিল। বীরহস্তে বিজয় প্রভাতে শিবাজী অশ্বারোহণে দুর্গশিরে দাঁড়াইয়া উড্ডীন করিলেন নবীন বিজয় গৈরিক পতাকা! সেদিন প্রভাতে নবীন তপন নবীন কিরণ বিস্তার করিয়া চারিদিক স্বর্ণ-আলোকে উজ্জ্বল

● সিংহগড়ের সিংহবিক্রম
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

করিতেছিল। শিবাজীর কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া বিধ্বস্ত বিজয়ী মাওয়ালী সৈন্যগণ নবোল্লাসে পর্বত-প্রান্তর ধ্বনিত করিয়া বিজয়ধ্বনি করিল—হর হর বম্ বম্ জয় মা ভবানী মাতাকী জয়—জয় মাতাজী জীজাবাইকী জয়—বম্ বম্ হর হর জয় ছত্রপতি শিবাজী মহারাজকি জয়!

———



সোনালী কথা

ডক্টর জিভাগো (বোরিস প্যাস্টারনাক)

এই নভেলখানি নিয়ে সারা জগতে তুমুল আন্দোলন চলেছে। এই নভেলের লেখক হলেন রুশ সাহিত্যিক বোরিস্ প্যাস্টারনাক। এই নভেলের জন্যে প্যাস্টারনাক এবার সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পান। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তিনি নোবেল প্রাইজ প্রত্যাখ্যান করেছেন, কেউ কেউ বলেন প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়েছেন। একটা আশ্চর্যের ব্যাপার যে, যদিও এই নভেল রুশ ভাষায় লেখা কিন্তু এখনো পর্যন্ত তা সোভিয়েট রাশিয়ায় ছাপা হয় নি।

এই নভেলখানি হলো ইউরি আন্দ্রেয়েভিচ্ জিভাগোর জীবন ও অভিজ্ঞতার কাহিনী। জিভাগো একটি কাল্পনিক চরিত্র এবং এই চরিত্রের ভেতর দিয়ে প্যাস্টারনাক নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আর নিজের কবি-মনকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। জিভাগো আসলে কবি ও দার্শনিক কিন্তু তিনি জীবিকার জন্যে ডাক্তারের বৃত্তি গ্রহণ করেন। নভেলের আরম্ভ হচ্ছে জিভাগোর শৈশব দিনের কাহিনী দিয়ে। জিভাগোর শৈশবের ভেতর দিয়ে লেখক বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার জারের রাশিয়ার পরিচয় দিয়েছেন, তখন সারা দেশের মধ্যে ধীরে ধীরে জার তন্ত্রের অনাচারের বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত ছেলেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। তরুণ জিভাগোও এই বিপ্লব-আন্দোলনে যোগদান করেন। তারপর এলো প্রথম মহাযুদ্ধ ও তার সঙ্গে বোলশেভিক বিপ্লব। জিভাগো তাঁর চোখের সামনে এই বিপ্লবের যে-চেহারা দেখেছেন, তাকে একান্ত বাস্তবভাবে বর্ণনা করেছেন। বিপ্লবের প্রথম স্তরের মূল বিপ্লবীরা যে সব ভুল করেন, যে সব অনাচার করেন, জিভাগোর অন্তর তাতে ক্ষুব্ধ হয় এবং জিভাগো ক্রমশঃ এই বোলশেভিক আন্দোলন থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। এই নভেলের ভেতর জিভাগো তীব্রভাবে কম্যুনিস্ট কর্মনীতির বহু জিনিসের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। ১৯২৯ পর্যন্ত স্টালিনের সোভিয়েট রাশিয়ার বাস্তব ছবি এই নভেলে আছে। সেই বছরেই মস্কো শহরে এই নভেলের নায়ক ডক্টর জিভাগো দেহরক্ষা করেন। এইখানে মূল নভেলের শেষ। কিন্তু লেখক তার পরেও আর একটি অধ্যায়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত ঘটনার ধারাকে নিয়ে আসেন। নভেলের শেষে ডক্টর জিভাগোর লেখা বলে ২৫টা কবিতা আছে। এই কবিতাগুলি প্যাস্টারনাকের কবি-প্রতিভার অপরূপ নিদর্শন। এই নভেলে প্যাস্টারনাক কম্যুনিজমের ধর্মহীনতা এবং হিংসা-নীতির তীব্র প্রতিবাদ করেছেন।



পাষাণী

—সুখলতা রাও

পরিচয়—প্রতিমা—রাজকুমারী। নীলা, মোতি, পান্না, চুনি—সখিগণ।
ভিখারী বালিকা। দেবদূত। প্রহরী, বুড়ী, অন্ধ, ঘোড়া প্রভৃতি।

প্রথম দৃশ্য

(রাজবাড়ির বাগান, নীলা ও মোতি ফুল তুলছে।
দূরে প্রহরী)

মোতি। ছাখ্ ভাই,
আজকে একটা নতুন কিছু চাই।
রাজার মেয়ের মনটা ভার ভার,
পুরোনো খেলা ভাল লাগে না তার;
বলছি ভাই,
আজ একটা নতুন কিছুই চাই।

নীলা। এও বিষম দায়।
নিত্যি নতুন কোথায় পাওয়া যায়?

(নাচতে নাচতে চুনির প্রবেশ। নাচের সাথে
গান ও থাকতে পারে)

চুনি। নিত্যি যেথা নতুন মেলে,
হেসে খেলে
সেই দেশেতে চল্ না যাই মোরা—

মো। মিছে কেন গোল করিস্ লো
তোরা?
টেরটি পাবি
পিটুনি যখন খাবি
রাজকুমারীর হাতে।

(পান্নার প্রবেশ)

পান্না। আহা! ভয় করি না তাতে।
নামটি প্রতিমা,
রূপেও সে যে সত্যি প্রতিমা।

নী। কিন্তু পাথরের।

মো। শক্ত কঠিন ঠাণ্ডা পাথরের।

চু। বল্ বল,
কবে এই পাষাণ হবে জল;
কবে অত্যাচারের হবে শেষ,
শান্তি পাবে সকল দেশ?

(রাজকন্যা প্রতিমার প্রবেশ)

প্র। বলি, নীলা মোতি পান্না চুনি,
এত কিসের গল্প, শুনি?

মো। কি খেলা আজ খেলতে তোমার সাধ?

প্র। ঝগড়াঝাঁটি, বিবাদ-বিসম্বাদ।

মো। কার সাথে?

প্র। তোমার সাথে।

চু। বাঃ বাঃ, বেশ হবে।
আয় পান্না, আয় ত তবে
চিমটি কাটি তোরে। (গালে চিমটি)

পা। উঃ! এত জোরে?
আর ডেকো না মোরে।
...আড়ি আড়ি,তোমার সাথে আড়ি।

চু। ইস্, দেখিস্ যেন, যাস্‌নে চ'লে বাড়ি।

(ঢুকে খোঁড়া ভিখারী বালিকা)

বালিকা। আমি খোঁড়া মেয়ে,
ফিরি, এক মুঠো চাল চেয়ে।
বেলা গেল, কখন যাব ঘরে,
মা যে আমার আছেন জ্বরে প'ড়ে;
ভাইটি বুঝি কেঁদে হ'ল সারা,
সকাল থেকে খায়নি বেচারা।
সারা দিনে পাইনি কিছু হায়—

প্রতিমা। কে রে ওই ভিখ্‌খে মেগে যায়?
ডাক্ না মোতি, মজা করি কিছু।

নী। আহা, লেগো না ওর পিছু;
দুঃখী ও যে, বড়ই অসহায়।

প্র। দুঃখী কে, কি দেখেই চেনা যায়?

(বালিকার প্রবেশ)

ওরে মেয়ে, এদিক পানে আয়।

বালিকা। ডাকছ কি আমায়?

প্র। নিয়ে যা ভিক্ষা।

(গলার সোনার হার দেওয়া)

বা। কেন পরীক্ষা?
রাজকুমারি, আমি হার চাই নাই;
মাত্র দুটি পয়সা পেলে, প্রাণে বেঁচে যাই।

প্র। নিয়ে যা না, বেচে খাবি!

বা। পাছে লোকে চোর বলে,
তাই মনে ভাবি।
আচ্ছা দাও;
বেঁচে থাক, সুখে থাক,
গরীবের পানে সদা চাও।

(প্রস্থানোদ্যত)

প্র। প্রহরী, প্রহরী, চোর, চোর!

(বালিকাকে প্রহরী ধরল)

প্রহরী। কী,—এত আস্পর্ধা তোর?
সাজা পাবি এর জন্যে।

বা। (কাঁদতে কাঁদতে) এ কী কথা রাজকন্যে!
নিজে দিলে। দেবে কি আইনে সাজা?
সাক্ষী আছেন জগতের রাজা।

● পাষাণী
সুখলতা রাও



'নিয়ে যা না, বেচে খাবি !' [পৃষ্ঠা ১৫৪

পায়ে ধরি, ছেড়ে দাও মোরে,
বেলা গেল, যেতে হবে ঘরে।
প্রতিমা। (হাসতে হাসতে) যা চ'লে,
ক্ষমা পেলি, মন মোর খুশী আছে ব'লে।
(হার ফেলে দিয়ে বালিকার প্রস্থান)

প্র। ছ্যাৎ সখী পান্না,
ঠাট্টা বোঝে না এরা, জানে কান্না।
(দেবদূতের প্রবেশ)
দেবদূত। পরে দুঃখ দিয়ে যেবা সুখ পায়,
কেউ তারে কভু নাহি চায়।

● পাষাণী
সুখলতা রাও

পাষাণে হৃদয় গড়া, করুণা না জানে,
ভালবেসে চায় না কারো পানে।
পাষাণ হয়েই থাক তাই চিরদিন।
শোন' প্রাণহীন,
এই শাস্তি, এই শাস্তি দিনু তোরে—
পাথরের মূর্তি হয়ে রবে পথধারে।

সখীরা। না—না। নয় চিরদিন!
(হাঁটু গেড়ে) নয় চিরদিন!

দে। তবে শোন বন্ধু,
তার প্রিয় বন্ধু,
অভিশাপ সে আনল ডেকে নিজে :
পাষাণ ভিজে
ঝরবে যেদিন জল,
দুটি আঁখির জল,
সেদিন হবে ভোর
পাষাণীর, এই রজনী ঘোর।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(পথের ধারে রাজকন্যার পাষাণমূর্তি। তাকে ঘিরে সখীরা। দূরে প্রহরী।)

মোতি। চোখের জল
ঝরুক অবিরল।

নীলা। কিন্তু কেমন ক'রে?
চোখের জল কঠিন পাথর
ভাঙবে কিসের জোরে?

মো। দেবদূতেরি বাণী যখন এই,
একথা তো মিথ্যে হতে নেই।
কাঁদতে হবে ওকে,
মনের দুঃখে, প্রাণের গভীর শোকে।

পান্না। তাহ'লে আর দেরি কেন ভাই?
চল যাই কাঁদাই।

চুনি। এনে ওর সখের জিনিস যত,
প্রিয় জিনিস যত,
ফেলব ভেঙে টুকরো টুকরো ক'রে।

পা। কাপড় জামা, গয়নাগাঁটি আনব
দু'হাত ভ'রে,
ওর সুমুখে ফেলে
দেব আগুন জ্বেলে।

(চুনি ও পান্নার প্রস্থান)

মো। যাও প্রহরি, নিয়ে এসো ডেকে
কানা খোঁড়া অন্ধ আতুর,
পার যেখান থেকে।

নী। পড়ব যত দুখের গাথা,
এইখানে ওর কাছে,
গাইব যত করুণ গান আছে।

মো। খাঁচার দুয়ার ফেলব খুলে,
সাধের ময়না যাবে উড়ে
উধাও হয়ে দূরে ;
ফিরবে না তো আর।
দেখলে পরান কাঁদবে না কি তার?

(বুড়ীর প্রবেশ)

নী। ওই আসছে তুমড়ে-পড়া বুড়ী,
চুলগুলি তার যেন শণের নুড়ি।

বুড়ী। শণের নুড়ি অনেক ভাল
পাথর কুচির চেয়ে।
তুমড়ে-পড়া শরীর নিয়ে,
এনু গঙ্গা নেয়ে।

● পাষাণী
সুখলতা রাও



শাস্তি দিনু তোরে—
পাথরের মূর্তি হয়ে রবে পথপাশে। [পৃষ্ঠা ১৫৬

আর তোমাদের ইনি!
সাধ্য কি যে চিনি।
ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন পথের পাশে;
তাকিয়ে তাকিয়ে পথের লোকে হাসে;
চি-চি প'ড়ে গেছে যে দুর্নাম।
ছি—ছি, ছিঃ, রাম রাম!

● পাষাণী

সুখলতা রাও

(অন্ধের প্রবেশ ও বুড়ীর ঘাড়ে পড়া)

বু। হ্যাঁ গা, কেমন লোক ?
গায়ের উপর পড়ছ এসে,
কোথায় আছে চোখ ?

অ। নেই বাছা; ঘাড়ে পড়ি লোকের
তাইতে ত।
কার নামেতে পড়ল ঢি-ঢি এত ?

বু। এই আমাদের রাজকুমারীর—
রাজকুমারীর গো!

অ। আরে ছোঃ!

(বুড়ী ও অন্ধের প্রস্থান · খোঁড়ার প্রবেশ)

খোঁড়া। মিথ্যে তো কয় না!
এই রাজকন্যা ?
সেদিন তবে ঠিক বললে
কেনারাম ঘোষ—
দেখে এস, খোঁড়া পায়ের
থাকবে না আফসোস।
একটা পা-ই গেছে আমার,
অন্যটাতে চলি,
হাতে খাই, মুখে কথা বলি,
আছে চোখ, নাক, কান,
নেই কোনো রোগ।
আর এঁর ?
একেই লোকে বলে কর্মের ভোগ।
(প্রস্থান)

ঘো। বল বল, বল যত আছে
রূঢ় কথা তোমাদের কাছে।
বাক্য-বাণে দীর্ণ হোক কঠিন হৃদয়,
খুলে যাক অশ্রুউৎস, প্রাণসুধাময়।

তৃতীয় দৃশ্য

(রাজকন্যার পাষাণমূর্তির পাশে নীলা
মোতি পান্না চুনি)

মোতি। সব চেষ্টা বৃথা হল হায়,
নিরাশায় মন ভেঙে যায়।
দয়া হল না তো,
দুঃখ পেল' না তো ?
যে আসে সে টিট্‌কারি দিয়ে বলে
কত কিছু ;
লাজে মাথা হল না তো নীচু!

চুনি। এত আশা হবে কি বিফল ?
এতই দুর্লভ আহা সেই অশ্রুজল ?

পান্না। এস ভাই, এইখানে থেকে যাই তবে ;
হেথা, আমাদের ঘর হবে ;
যাব না কো ফিরে।

নীলা। আমাদের ভালবাসা থাক্ ওকে
ঘিরে।

(গান)

কবে বল হবে ভোর এ দুঃখ রজনী ঘোর,
ও মুখে ফুটিবে বাণী জাগিবে পরাণখানি।
আমাদের ভালবাসা আকুল আকাঙ্ক্ষা আশা,
হবে কি বিফল হায়, দিবে না জীবন আনি!

(ভিখারী বালিকার প্রবেশ। একটি চোখ বাঁধা)

বালিকা। কারা গান গায় ?
কার প্রাণ করে 'হায় হায়' ?
(উঁকি মেরে) দেখে চিনি চিনি মনে হয়,
কিন্তু লাগে ভয়।
ওই মূর্তি কার ?
রাজকন্যা প্রতিমার ?

● পাষাণী
সুখলতা রাও



'…আর তোমাদের ইনি!
সাধ্য কি যে চিনি।…' [পৃষ্ঠা ১৫৭

মোতি। (উঠে এসে হাত ধ'রে)
এস এস, কিন্তু একি ?
এত রোগা কেন দেখি ?
নীলা। চোখে কি হয়েছে, বল।
রা। সব বলি, চল।

(মূর্তিকে ঘিরে সকলের বসা। বালিকা মূর্তির পায়ের কাছে ব'সে, তার মুখের দিকে চেয়ে বলতে লাগল)

যেই দিন 'চোর' ব'লে,
দিলে মোরে লাজ,
সেদিনের কথা কিগো মনে পড়ে আজ ?
দিলে তুমি ত তাড়িয়ে,
প্রহরী দিল ত' ভাগিয়ে।
পথে যেতে এক পাল ছেলে
পিছু নিল, মোরে ইট, কাঠ ঢেলা ফেলে ;

● পাষাণী
সুখলতা রাও

প্রাণ নিয়ে পালালাম ছুটে,
তবু তারা জুটে
'চোর চোর' ব'লে তেড়ে এল ;
একখানা ঢেলা চোখে লেগে গেল।
(মূর্তির চাঞ্চল্য ও একটু নড়া)
রইলাম ঘরে বন্ধ ;
চোখটা যে হল অন্ধ,
কে বা ভিক্ষা নিতে যাবে,
ভাইটিও কিবা বল খাবে ?
ওষুধ ? কেই বা এনে দেবে মাকে !
হারালাম তাঁকে।
(মূর্তির মাথা হেঁট)
ভাইটিরে নিয়ে ফিরি পথে পথে,
আধপেটা খেয়ে বাঁচি কোনো মতে।
দুঃখ পেতে জন্মিয়েছি, দুঃখ পাব
বার বার।
কিন্তু, এত ধন, এত সুখ ছিল যাঁর,
একি দশা তাঁর ? হায় হায়,
দেখে বুক যে মোর ফেটে যায়।

(হাত জুড়ে)
হে দেবতা, আমার এ ছার প্রাণ দিে
আধখানা দৃষ্টির বিনিময়ে
যদি হয় কোনো কাজ—,
সব নাও আজ ;
ফিরে দাও রাজকুমারীর দেহ মন,
আর-সে জীবন।
প্রতিমার মূর্তি। ওগো ক্ষমা কর,
ক্ষমা কর।
(অশ্রুপাত)
চুনি। এই তো কেঁদেছে, কেঁদেছে !
পান্না। বেঁচেছে, বেঁচেছে !
নীলা। সব দুঃখ শেষ হল,
ঘরে ফিরে যাই চল।
মোতি। (বালিকার প্রতি)
আজ হতে তুমি আমাদেরি একজন,
আদরের অতি ছোট বোন।
(বুকে জড়াইয়া ধরিল)

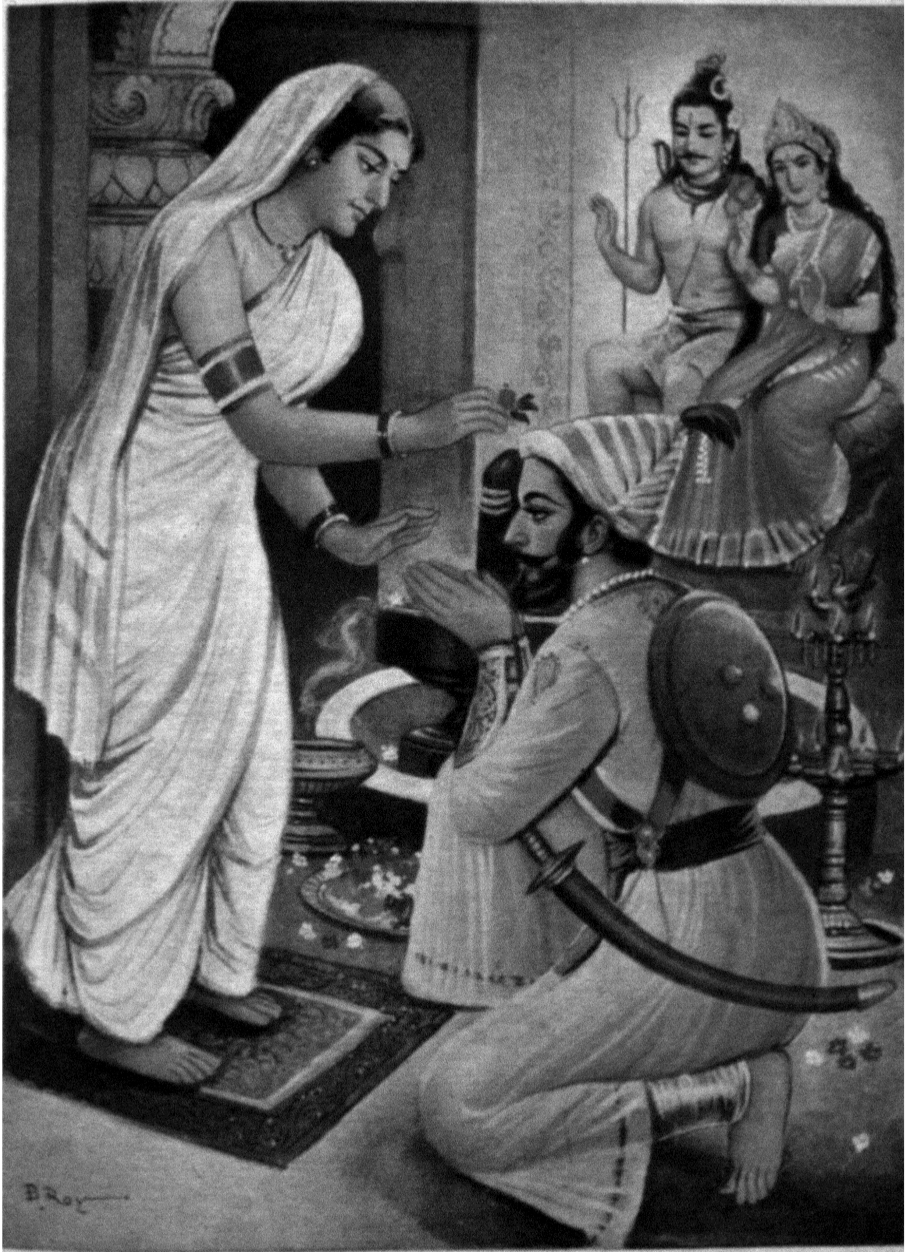
যবনিকা

———

নাস্তি বিদ্যাসমং চক্ষুর্নাস্তি সত্যসমং তপঃ।
নাস্তি রাগসমং দুঃখং নাস্তি ত্যাগসমং সুখম্।
—মহাভারত

মণি ও মুক্তা

বিদ্যার মত চক্ষু আর নেই, সত্যের চেয়ে বড় তপস্যা আর নেই। আসক্তির চেয়ে বড় দুঃখ নেই, ত্যাগের চেয়ে সুখ আর কিছু নেই।



মাতা শিবার মস্তকে আশীর্বাদী পুষ্পাঞ্জলী দিলেন। [পৃষ্ঠা—১৪৯



রং বদল

—আশাপূর্ণা দেবী

"পাজী গুণ্ডা ইয়ার ছোকরা!" গর্জে উঠলেন পিকলুর দাদু, "ফের তুমি ন্যাড়াছাতে উঠে ঘুড়ি ওড়াচ্ছিলে? তোমার ওই ঘুড়ি-লাটাই যদি না আজ আমি গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে আসি তো আমার নাম নেই।"

দিনে দশবার নিজের নামকে 'নেই' করে দেন পিকলুর দাদু। যদিও প্রায় গোটা আস্টেক অক্ষর দিয়ে তৈরি মস্ত একটা নাম তাঁর আছে।

দাদুর নাম ত্রিভুবনরঞ্জন চৌধুরী।

পিকলু সব সময় মনে মনে ভেঙায়—আহা ত্রিভুবনরঞ্জন! মা-বাপ কী নামই রেখেছিলেন! এর চাইতে কানাছেলের নাম পদ্মলোচনও সহ্য হয়! ত্রিভুবনরঞ্জন না হয়ে ওঁর নাম 'ত্রিভুবনতাড়ন' হলেই ভাল হতো! সত্যি কী বদমেজাজী খিটখিটে রাগী লোক! আর যত রাগ যেন ওঁর পিকলুর ওপর! "পাজী গুণ্ডা ইয়ার

ছোকরা"—এই হল তাঁর নাতি সম্বোধণের ভাষা। উঠতে বসতে এই আদরের ভাষাটি প্রয়োগ করেন তিনি পিকলুর প্রতি।

পিকলুর নাকি সব মন্দ।

দাদু নাকি তাঁর আটষট্টি বছর বয়সের মধ্যে এমন ধুরন্ধর ছেলে দেখেননি।

কী করবে, পিকলু নেহাত-ছেলেমানুষ তাই। নিরুপায় হয়েই মুখে চাবি দিয়ে থাকতে হয় তাকে। নইলে তারও বলতে ইচ্ছে করে 'আমারও এই এগারো বছর বয়সে তোমার মতন এমন ধুরন্ধর দাদু আর দেখিনি।'

বলতে পারে না। কিছু না বলেই এত বদনাম, বললে কি আর রক্ষে ছিল। ও খালি মনে মনে নানা কথা ভাবে আর নিশ্বাস ফেলে। নিশ্বাস ফেলবার কারণটা অবশ্য একটু বেশী গোপনীয়, তবে কিনা তোমাদের কাছে বলা যায় চুপি চুপি. তোমরা তো আর বলে দেবে না ত্রিভুবনরঞ্জনকে? না, ছোটরা অত অবিশ্বাসী হয় না. অন্তত: আমি কখনো তাদের অবিশ্বাসের কাজ করতে দেখিনি।

নিশ্বাস ফেলবার কারণটা হচ্ছে এই, আজ পর্যন্ত হিসেব করে দেখেছে পিকলু. জগতে তার বয়সী যত ছেলে আছে তাদের মধ্যে তিনভাগ ছেলেরই বেশ কেমন দাদুর নামের আগে চন্দ্রবিন্দু। বেচারা পিকলু. ভগবানের একটু ইচ্ছে থাকলে তো অনায়াসেই ওই তিনভাগের মধ্যে থাকতে পারতো সে! তা নয় পিকলুকে মাত্র সেই একভাগের দলে পড়ে থাকতে হয়েছে। ওর দাদুর নামের আগে সবসময় গোটা গোটা করে লিখতে হবে 'শ্রীযুক্ত বাবু'।

নাঃ! এক একসময় পিকলুর নিজেরই চন্দ্রবিন্দু হয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

আচ্ছা বেশ হলই না হয় পিকলু ওই একভাগের মধ্যে। কিন্তু আর সকলের দাদু আর পিকলুর দাদু? হুঃ, যেন আকাশ আর পাতাল, যেন সোনা আর সীসে, যেন চাঁদ আর ফাঁদ! আরও অনেকগুলো তুলনা তৈরি করেছিল পিকলু, এখন ভুলে গেছে।

আর সকলের, মানে 'দাদু'ওলা যে যে ছেলের সঙ্গে ভাব আছে পিকলুর, সকলকেই জিগ্যেস করে করে দেখেছে পিকলু, আর তুলনা করে করে হতভম্ব হয়ে গেছে। বাড়ির আর যার কাছে যে রকমই হোন, নাতিদের কাছে তাঁরা কেউ যীশু, কেউ বুদ্ধ, কেউ গান্ধী, আর সকলেই কল্পতরু!

তাদের পয়সাকড়ির ব্যাপার ম্যানেজ করতে দাদু, পড়া ফাঁকি দেওয়ার খবর 'হাপিস' করে ফেলতে দাদু, বাবা মা বকুনি দিতে এলে তাঁদের ধরে বকুনি লাগিয়ে দিতে দাদু, এককথায় দাদু মানেই আশ্রয় আর প্রশ্রয়!

● রং বদল
আশাপূর্ণা দেবী

কিন্তু পিকলুর দাদু ভাগ্যি সব দিকে তেতুলগোলা। নিজে পয়সা দেওয়া তো পরের কথা, পিকলু মাকে জপিয়ে জাপিয়ে যদি দু'চারটে পয়সা নিল তো অমনি ডাক-হাঁক: "পয়সা কোথা পেলি? কে দিলে পয়সা? বৌমা, আবার ছেলের হাতে পয়সা দিয়েছ? ছেলেটাকে উচ্ছন্ন না দিয়ে দেখছি ছাড়বে না তুমি"—এই সব বাক্যবাণ।

আর পড়া ফাঁকি?

বরং ভগবানকে ফাঁকি দেওয়া যায় তো দাদুকে নয়। সকাল সন্ধ্যে দুটি দুটি চারটি ঘণ্টা নিজে পাহারা দিয়ে পিকলুকে পড়ার টেবিলে বসিয়ে রাখবেন তিনি।

হাই তোলবার জো নেই, বই খুলে উদাসমনে চুপচাপ দু'দণ্ড বসে থাকবার জো নেই, এমন কি মশা কামড়ালে একটু পা চুলকোবার জো নেই। শুধু একটানা পড়ে যেতে হবে।

দাদু যখন পিকলুকে পাহারা দিতে তার বিশাল দেহখানি নিয়ে দালানে পায়চারি করতে থাকেন, কালো কম্বলে বুকটার উপর ধবধবে পৈতের গোছাটা দুলতে থাকে, আর ভারী ভারী পায়ের আওয়াজে এ ঘরটা পর্যন্ত গমগম করে, তখন পিকলু হতাশ নিশ্বাস ফেলে।

নাঃ কোন আশা নেই!

পিকলু চন্দ্রবিন্দু হয়ে যাবার পরও দাদু শ্রীযুক্ত থাকবেন নিশ্চিত।

কতদিন ভাবে পিকলু, এবার থেকে আর ভয় করবে না দাদুকে, চোপা করবে দস্তুরমত। আর কোন ছেলেই যখন ভয় করে না, আর চোপা করে, সেই বা নয় কেন? কিন্তু সামনে এলেই কেমন বুক গুর গুর করে।

তবু আজ পিকলু সাহসে বুক বেঁধেছিল, কিন্তু তার ফলে যা হয়ে গেল একেবারে চরম।

ন্যাড়াছাতের কথা তুলতেই পিকলু গোঁ গোঁ করে বলে উঠেছিল, "এত যদি ইয়ে, ছাত ন্যাড়া করে রেখেছ কেন? মনুমেন্টের মতন উঁচু পাঁচিল ঘিরে রাখতে পারনি? নিজেই তো করেছিলে বাড়ি!"

"অ্যাঁ অ্যাঁ! কী বললি?"

দাদুকে যেন বিছে কামড়ালো! "মুখে মুখে কথা? ভেবেছিস কি?"

পিকলু তো আজ মরিয়া! তাই বলে ফেলে, "ভাববো আবার কি? দিনরাত খালি বকুনি আর বকুনি। ন্যাড়াছাত থেকে পড়ে মরে গেলেই বাঁচি আমি।"

"বটে বটে বটে!"

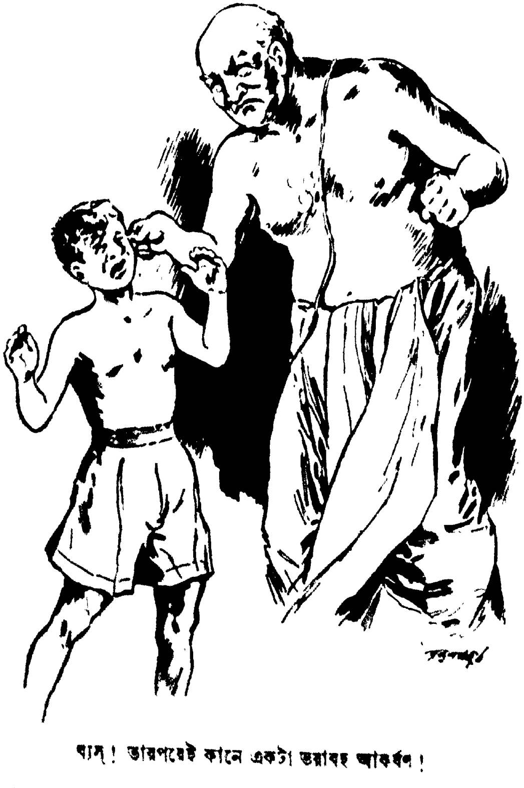
● রং বদল

আশাপূর্ণা দেবী

ব্যস্‌!

তারপরই কানে একটা ভয়াবহ আকর্ষণ!

সে আকর্ষণে পিকলুর কান মাথা হাত পা সব সুদ্ধ যেন কোন সমুদ্রে তলিয়ে গেল। চোখের সামনে রইল শুধু অন্ধকার।



ব্যস্‌! তারপরেই কানে একটা ভয়াবহ আকর্ষণ!

তারপর?

তারপর এবং পিকলুকে ঘুঁটের ঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছে। মানে যে ঘরে অন্ততঃ পঁচিশটা ইঁদুর, একশটা মাকড়সা, বাহান্ন হাজার আরশোলা, আর তেইশ কোটি মশা আছে।

গায়ে মশার জ্বল-বিছুটি, পায়ের কাছে ইঁদুরের সরসর, ওদিকে বিকেল পড়ে অন্ধকার হয়ে আসছে। আত্ম-হত্যার যতরকম নিয়ম-কানুন আছে, সব এক একবার করে ভাবল পিকলু—জল, আগুন, বিষ, দড়ি। কিন্তু কোথায় সে সব? মা ঠিকই বলেন, "দরকারের সময় কিছু যদি হাতের কাছে পাওয়া যায়।"

নিজের কথা ভাবতে ভাবতে কখন একসময় দাদুর কথাই পিকলুর মন জুড়ে বসে! দাদুর কথা মানে আর কি—দাদুর শাস্তির কথা! পিকলুর এই

● রং বদল
আশাপূর্ণা দেবী

এগারো বছর বয়সের মধ্যে যত রকম শাস্তির কথা কানে এসেছে তার—জেল, ফাঁসি, ওপাস্তুর, শূলে চড়ানো, 'কেটে রক্তদর্শন'—সবই একে একে দাদুর জন্যে ব্যবস্থা করলো সে, কিন্তু দূর ছাই শুধু ভেবে আর কি হবে? দাদুকে শাস্তি দিচ্ছে কে?

এক যদি ভগবান···!

('সররর্' করে ইঁদুর চলে গেল একটা পায়ের কাছ দিয়ে। সমস্ত শরীরে আগুনের জ্বালা।)

যদিও ভগবানের ওপর খুব বেশী আস্থা আর নেই পিকলুর, তবুও সে মনে মনে কল্পনা করে ভগবান বলে একজন কেউ আছেন, তিনি পিকলুর দুঃখে বিগলিত হয়ে—

খসখস করে সমস্ত গাটা চুলকোতে চুলকোতে দাঁতে দাঁত চেপে প্রায় উচ্চারণের মত করে ভাবতে থাকে পিকলু, তিনি পিকলুর দুঃখে বিগলিত হয়ে হঠাৎ পৃথিবীর দিকে 'তাক্' করে ছুড়ে মারলেন তাঁর হাতের সেই ধাঁরালো সুদর্শনচক্রখানা।

ব্যস, 'চক্র' তার কাজ করে ফেলল!

কংস আর শিশুপালের মত শ্রীযুক্ত ত্রিভুবনরঞ্জনও (অন্ধকার গাঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফড়ফড় করে আরশোলা উড়তে শুরু করেছে)—হ্যা—দাঁতে দস্তুরমত শব্দ করে ভাবনাটা শেষ করে ফেলে পিকলু, ত্রিভুবনরঞ্জনও এদিকে মুণ্ডু ওদিকে ধড় ফেলে মুহূর্তে ত্রিভুবন ত্যাগ করে ফেলবেন!

একমনে ভাবতে ভাবতে কান খাড়া করে রইল পিকলু—দোতলা থেকে ধপাস করে কোন আওয়াজ আসে কিনা, হৈ-হৈ করে কোন গোলমাল ওঠে কিনা!

কিন্তু কই? সব নিথর নিস্তব্ধ!

অন্যদিন এ সময় দোতলার দালানে বসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়তে হয় পিকলুকে, তবু শব্দ হয়, আজ তো তাও না! শব্দ যা, সে সবই এধরে। মশার শব্দ, আরশোলার শব্দ, ইঁদুরের শব্দ!

না, ভগবান নেই!

কিন্তু ভগবান না থাকলে আর রইলই বা কি?

শুধু মশা? শুধু আরশোলা? শুধু ইঁদুর? আর শুধু দাদু? তাহলে মানুষের ভরসা কোথায়?

হঠাৎ একসময় ফের ভগবানের ভরসাই করতে শুরু করে পিকলু!

● রং বদল

আশাপূর্ণা দেবী

ধরো সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে ফেলে দিলেন ভগবান ত্রিভুবনরঞ্জন চৌধুরীকে। ঠ্যাং ভেঙে গেল তাঁর। কিংবা ভয়ংকর একটা ডাকাত এসে—অথবা খুব জোরালো একটা সাপ এসে—

ভাবতে ভাবতে মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে আসে পিকলুর! আর কিছু ভাবতে পারে না। ক্রমশঃই যেন কোন অন্ধকার অতলে তলিয়ে যেতে থাকে।

সেখানে কোন শব্দ নেই স্পর্শ নেই, মশা নেই ইঁদুর নেই, এমন কি দাদুও নেই।

তারপর!

তারপর কোথা থেকে যেন আলোর বান ডেকেছে, কী মিষ্টি ঠাণ্ডা একখানি হাত, পিকলুর সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে। কারা সব কি বলাবলি করছে। কোথায় এসেছে পিকলু? কি কথা বলছে ওরা?

মার গলা, বাবার গলা, আর আর—বোধ হয় দাদুরও গলা।

কিন্তু ঠিক দাদুর গলা কি? কেমন যেন অন্যরকম।

চোখ খুলতে সাহস হলো না পিকলুর। সমস্ত মন আর কানটা খাড়া করে পড়ে রইল চোখ বুজে।

হ্যাঁ, এবার বুঝতে পারছে পিকলু—মার ঘরে মার বিছানায় শুয়ে রয়েছে সে। মা ওর গায়ে হাত বুলোচ্ছেন। পিকলুর সমস্ত গা-টা উঁচু-নীচু না কি? নইলে মার হাতটা অমন উঁচু-নীচু হয়ে বুলোচ্ছে কেন? ওঃ, এগুলো মশার মহিমা! সেই তেইশ কোটি মশা পিকলুকে 'ঢিপি গোবিন্দ' করে তুলেছে।

তবু কী আরাম! কই মা তো কখনো—

চোখ খুললেই আরামটা মিলিয়ে যাবার ভয়ে চোখ আর খোলে না পিকলু।

"না না, আর আমি মত বদলাবো না—"

বাবার কথাটা এবার স্পষ্ট শুনতে পেল পিকলু, কেমন যেন একটা রাগ রাগ ভাবের স্বর—"স্কুলের বোর্ডিঙেই রেখে দেব ওকে! এসব আর বরদাস্ত করা যায় না।"

কী হলো! বাবাও রাগ করছেন না কি?

বাবার কাছে আবার কি দোষ করলো পিকলু! আস্তে আস্তে চোখের কোণটা একটু ফাঁক করে দেখতে চেষ্টা করে পিকলু। কিন্তু এ কী, বাবা যে দাদুর দিকে তাকিয়ে কথা বলছেন!

আর দাদু! দাদুর এ অবস্থা কেন?

অবাক হতে হতে পিকলু ভুলে ভুলে চোখটা প্রায় আধাআধিই খুলে ফেলে।

● রং বদল
আশাপূর্ণা দেবী

দাদুর মাথাটা নীচু, আর কালো মুখটা ঠিক পোড়া কয়লার মত সাদাটে সাদাটে!

দাদু বলছেন, "আমি তোমাদের কাছে মাপ চাইছি বিনু, আমি আর—"

এবার পিকলুর মা কথা বলেন, লাল লাল মুখ চোখ দিয়ে জল পড়ছে যার, "বুঝলাম দুষ্টু ছেলে, তাই বলে কি মেরে ফেলতে হবে?"

"রাগের মাথায় খেয়াল করিনি বৌমা, ওঘরে অত মশা! ভেবেছিলাম অন্ধকারে ভয় পেয়ে কাঁদবে", দাদুর গলার শব্দটা যেন বসে যাচ্ছে, "তা—হতভাগা ছেলে টুঁ শব্দটিও তো করেনি।"

পিকলুর বাবা বিনু বলে উঠলেন, "টুঁ শব্দ! মারা যে পড়েনি এই ঢের! না না, দয়া করে আপনি আর কিছু বলবেন না বাবা, অনেক সহ্য করেছি, আর নয়। আমি কালই বোর্ডিঙের ব্যবস্থা করে ফেলবো। আপনারা সেই আবহমানকাল থেকে শিখে এসেছেন, ছেলে শাসন করতে হয়, ছেলেকে মেরে আর যন্ত্রণা দিয়ে! আমাকেও আপনি—" বাবার গলায় ব্যঙ্গের সুর ফুটে ওঠে— "হয়তো গা খুললে এখনো আপনার হাতের পাখাপেটার দাগ খুঁজে পাওয়া যাবে।"



"আমি তোমাদের কাছে মাপ চাইছি বিনু…"

দাদুর মুখটা আরও সাদা হয়ে যাচ্ছে যে!

কী অদ্ভুত বেচারী বেচারী দেখাচ্ছে দাদুকে! বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে পিকলুর! উঠে বসবার জন্যে মনটা ছটফট করে।

কিন্তু সমস্ত শরীরটা যেন ব্যথায় আড়ষ্ট!

● রং বদল
আশাপূর্ণা দেবী

হাত পা নাড়তে পারছে না পিকলু। শুধু শুনছে।

সেই বেচারী বেচারী মুখে দাদু বলছেন, "আমি তো স্বীকার করছি বিনু আমার ভুল হয়েছে! কি জানো—ভাবি যে যা দিনকাল পড়েছে, পাঁচটা বদ ছেলের সঙ্গে মিশে ছেলেটা খারাপ হয়ে যাবে! যতটা শাসনে রাখা যায়!"

"শাসনেরও একটা সীমা আছে—" পিকলুর বাবা থমথমে মুখে বলেন, "আর নিষ্ঠুরতারও একটা সীমা আছে বাবা! আপনি কি আর আপনার মেজাজ বদলাতে পারবেন? তার চাইতে ও চোখের আড়ালে থাকাই ভাল।"

ও কী, ও কী!

ধড়মড় করে উঠে বসে পিকলু। দাদুর চোখে জল নাকি?

হ্যাঁ, সত্যিই তো!

কী ভয়ানক দুঃখী দুঃখী দেখাচ্ছে দাদুকে! রাস্তার সেই বুড়ো ভিখিরীটার মতন যে! দাদুর এরকম মুখ! দাদুর চোখে জল! জীবনে এসব আর কখনো দেখেছে পিকলু! আর—আর—জীবনে কখনো জেনেছে দাদুর চোখে জল পড়লে পিকলুরও চোখে জল এসে যায়? বুকটা ভীষণ কেমন এক রকম ব্যথা করে! হঠাৎ মা আর বাবার ওপর ভয়ানক রাগ হয় পিকলুর! খু—ব খুব রাগ!

দাদুকে এত কষ্ট দেবার মানে কী?

ওঃ বলা হচ্ছে আবার—"নিষ্ঠুরতারও একটা সীমা আছে।"

নিজেরা কী তোমরা?

নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর, খুব নিষ্ঠুর!

দাদু শাসন করেছেন পিকলুকেই করেছেন, তোমাদের তো করতে যাননি?

পিকলু উঠে বসতেই মা তাড়াতাড়ি বলেন, "থাক থাক—উঠিস না! শুয়ে থাক আর একটু।"

আর দাদু পিকলুর মুখের দিকে বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে একটু তাকিয়ে নিয়ে বাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে বলেন, "ছেলেকে কোথাও পাঠাতে হবে না বিনু, আমিই ভাবছি দেশে গিয়ে থাকবো।"

ব্যস! ঝরঝর করে একগাদা জল গড়িয়ে পড়ে দাদুর ভিখিরী ভিখিরী চোখ দুটো দিয়ে। আর সেই মুহূর্তে মনে হয় পিকলুর কে যেন দাদুকে ভয়ানক কী একটা শাস্তি দিয়েছে! জেল ফাঁসি দ্বীপান্তরের চেয়ে, শূলে দেওয়ার চেয়ে আর সুদর্শনচক্রে দু' টুকরো করে ফেলার চেয়েও অনেক বেশী কোন শাস্তি!

সঙ্গে সঙ্গে খাট থেকে নেমে পড়ে পিকলু, আর ছুটে গিয়ে দাদুকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলে ওঠে, "আমিও তাহলে তোমার সঙ্গে দেশে চলে যাব দাদু, কক্ষনো এখানে থাকবো না।"



মৃত মূষিক

—কালিদাস রায়

(জাতক কাহিনী)

ব্রহ্মদত্ত করে রাজত্ব যবে বারাণসীধামে
শ্রীবোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠী সেথায় চুল্লচেট্টি নামে।
যত জ্ঞানী তিনি তত ধনী আর ততই হৃদয়বান্,
বারাণসী-অধিপতির পরেই তাঁর মর্যাদামান।

বলিতেন তিনি—"ব্যবসায়ে কভু মূলধন বড় নয়,
অধ্যবসায়ী ব্যবসায়ে লভে জয়।"
একদিন তিনি চলিতেছিলেন আপন শিবিকা চড়ি
দেখিলেন পথে ছোট এক মরা ইঁদুর রয়েছে পড়ি।

বলিলেন—"অই মরা ইঁদুরের দাম নয় এক রতি,
এরে মূলধন ক'রে ব্যবসায় হওয়া যায় কোটিপতি !"

সে কথা শুনিয়া একটি যুবক সেটা নিল হাতে ক'রে
ঝুলাইয়া লেজ ধ'রে।

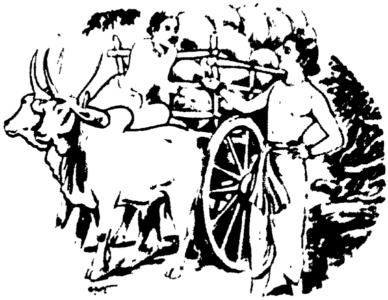


একটি দোকানী যুবারে ডাকিয়া
বলিল দোকান হ'তে—
"দিয়ে যাও ওটা পোষা বিড়ালের
আহার হইবে ওতে।"
একটি পয়সা দিল যুবকের হাতে,
যুবক দোকানে
গুড় কিনে নিল তাতে।
আর নিল সাথে
একটি কলসী জল,
বসিল পথের ধারে যেথা দিয়ে
চলেছে মালীর দল।
যুবা তাহাদের গুড় জল দিয়ে, তার
বিনিময়ে পেল তিন চার মুঠা
তাজা ফুল উপহার।

ফুলের বাজারে গিয়ে
চার পয়সা সে পেল ফুলগুলি দিয়ে।
এক ভাঁড় গুড় কিনে সেই পয়সায়
দাঁড়াইল যুবা এক শ্রেষ্ঠীর বাগানের দরজায়।

● মৃত মূষিক
কালিদাস রায়

ঝড় হয়ে গেছে পূর্ব দিনের রাতে
বহু ডালপালা ভেঙে পড়ে গেছে তাতে।
কেমনে সরাই মালী ভাবে তাই—যুবা বলে, "ডালগুলি
দাও যদি মোরে নিয়ে যেতে পারি তুলি।"
দেখিল যুবক পথের উপরে খেলিতেছে বহু ছেলে,
তাহাদের ডাকি ভাণ্ডের গুড় হাতে হাতে দিল ঢেলে।
বলিল তাদের—"ভাই সব, দেখ আমোদ হইবে বড়,
ডালপালাগুলি এসো পথে করি জড়ো।"
চলেছে কুমোর হাঁড়ি বেচিবার তরে,
এক কুচি কাঠ নেই আজ তার ঘরে।
হাঁড়িগুলি রেখে ডালপালা দিয়ে বোঝাই করিয়া গাড়ি
ফিরিয়া গেল সে বাড়ি।
পেয়ে হাঁড়িকুড়ি
দিয়ে যুবা ডালপালা
বেচিল বাজারে। হাঁড়ির সঙ্গে
ছিল এক বড় জালা।
জালা ভরি জলে
গেল সে মাঠের ধারে,



যেই পথ দিয়ে ঘেসেড়ারা চলে ঘাস নিয়ে ভারে ভারে।
জল খেয়ে খুব খুশি হ'লো ঘেসেড়ারা
এক আঁটি ক'রে ঘাস দিয়ে গেল তারা।
শুনেছিল যুবা বিদেশী ব্যাপারী ঘোড়া বেচিবার তরে
আসিবে নগরে আট-দশ দিন পরে।

● মৃত মূষিক
কালিদাস রায়

জমাতে লাগিল যত ঘাস পেল এই কয় দিন ধ'রে।
আসিল ব্যাপারী, বেশ কিছু লাভ করিল বিক্রি ক'রে,
সে টাকায় নানা ফল ফেরি ক'রে নগরের রাস্তাতে
পাঁচশত টাকা সাত-আট মাসে জমিল তাহার হাতে।

আসে মাঝে মাঝে নৌকাবহর লাগে বন্দর ঘাটে
যুবা শুনেছিল হাটে।
মালের নৌকা যখনই আসিয়া পড়ে
সঙ্গে-সঙ্গে বণিকেরা সবই কিনে লয় চড়া দরে।
যেই পথ দিয়ে মালের নৌকা আসে
সেই পথে নদীকিনারে রহিল যুবা এক পটবাসে।
এক মাস পরে দেখিল আসিছে পাঁচটি মালের তরী,
মাঝ-গঙ্গায় ভেটিল তাদের একটি ডিঙায় চড়ি।
পাঁচশত টাকা আগাম দাদন দিয়ে
সব মাল নিজে রেখে দিল আটকিয়ে।
তাঁবুটি উঠিয়ে এলো বন্দরে। বহর লাগিল ঘাটে
সাড়া পড়ে গেল শহরে বাজারে হাটে।
এলো দলে দলে বণিকেরা ঘাটে মাল-ব্যাপারীর কাছে
শুনিল—সে মাল দাদনে আটক আছে।
যুবার নিকটে ধনী বণিকেরা নিবেদিল বারবার—
যত টাকা চাও ছেড়ে দাও অধিকার।
চলিল তখন নিলামের দর ডাকা,
দখল ছাড়িল যুবা হাতে পেয়ে আঠারো হাজার টাকা

● মৃত মূষিক
কালিদাস রায়

এই টাকা তার হলো মোটা মূলধন
ক্রমে হলো যুবা কারবারী মহাজন।
লক্ষ মুদ্রা সঞ্চিত হ'লে পরে
গেল যুবা সেই চুল্ল শেঠের ঘরে।
হাতে এক থলি স্বর্ণমুদ্রা ঢাকি উত্তরী-বাসে
প্রণাম করিয়া বসিল চরণপাশে।

কহিলেন তিনি—"কে তুমি কেন এ এনেছ স্বর্ণভার ?
কোনদিন তুমি নিয়েছিলে বুঝি ধার ?"
কহিল যুবক, "মনে পড়ে সেই মরা ইঁদুরের কথা ?
প্রভু আপনার মুখের বচনে হয় কভু অন্যথা ?
সে মরা ইঁদুর হতেই আমার ভাগ্য হয়েছে শুরু,
আজি দক্ষিণা এনেছি চরণে, আপনি আমার গুরু।"

চুল্ল শ্রেষ্ঠী কিছুখণ তার মুখ পানে চেয়ে থেকে
বলিলেন কাছে ডেকে—
"বৎস তুমি কি হইয়াছ বিবাহিত ?"
কহিল যুবক—"সময় পাইনি পিতঃ।"
বলিলেন শেঠ—"এসব এনেছ কেন ?
আমার যা কিছু সকলি তোমার জেনো।
একটি অনূঢ়া দুহিতা ভিন্ন নেই মোর সন্তান।
শুভদিন দেখে তোমারি হস্তে তাহারে করিব দান।"



বিখ্যাত জলদস্যু ক্যাপটেন কীড

—শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল, কুয়াশায় ভরে ছিল চারিদিক। খুব কাছের মানুষ ছাড়া দূরের বিশেষ কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু তবুও, ভোরের কনকনে ঠাণ্ডা, কুয়াশা আর বৃষ্টির মধ্যেও কাতারে-কাতারে লোক এসে জড়ো হয়েছিল টেমস্ নদীর তীরে বধ্যভূমিতে। ফাঁসির মঞ্চের কাছে এগিয়ে যেতে চাইছিল সকলেই একসঙ্গে। সেজন্যে ঠেলাঠেলি আর হুড়োহুড়ি হচ্ছিল বেশ খানিকটা। হঠাৎ এই হুড়োহুড়ি আর উত্তেজনার ভেতর থেকেই সমস্বরে একটা চিৎকার উঠল : হয়ে গেল, হয়ে গেল সব—সব শেষ হয়ে গেল!

কী শেষ হয়ে গেল? শেষ হয়ে গেল—বিখ্যাত জলদস্যু ক্যাপটেন কীডের জীবন! দীর্ঘদিন ধরে যাকে নিয়ে সারা শহরে আর গ্রামে গ্রামে উত্তেজনার শেষ ছিল না, যাকে নির্দোষ নিরপরাধ বলেও মনে করত অনেকে তার ফাঁসিতে উত্তেজনা হবে বইকি! মৃত্যুর খবর আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ল সারা ইংলণ্ড আর আমেরিকায়। 'কীডের গল্প' নামে বই ছেপে বিক্রি হতে লাগল হাজারে-হাজারে। নানা রকমের গান বাঁধা হ'ল জলদস্যু কীডের নামে। এবং সেই থেকে আজও জলদস্যুদের ইতিহাসে ক্যাপটেন কীডের নাম অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

বিচারকের মুখ থেকে ফাঁসির আদেশ শোনার পরও ক্যাপটেন কীড বলেছিল : ধর্মাবতার, অত্যন্ত অবিচার করা হ'ল আমার উপর—আমি নিরপরাধ, নির্দোষ। কিন্তু ক্যাপটেন কীড যে নির্দোষ ছিল না, তা তার রোমাঞ্চকর জীবনের ইতিহাস, লুণ্ঠন ও

হত্যা-কাহিনী থেকেই জানা যায়। তাছাড়া তার লুণ্ঠিত গুপ্তধনের সন্ধানে আজও বহু ভাগ্যান্বেষী ঘুরে বেড়ায়, খোঁড়াখুঁড়ি করে দেখে সন্দেহজনক স্থানগুলিতে। অজস্র ধনরত্ন লুণ্ঠন করেছিল কীড সমুদ্রপথে দস্যুগিরি করে। সে সব ধনরত্নের পুরো সন্ধান যদিও আজ পাওয়া যায়নি, তবুও জলপথে তার দস্যুবৃত্তির বহু সত্য কাহিনী প্রমাণসহ বিচারের সময় প্রকাশিত হয়েছিল জনসাধারণের কাছে।

কাপ্টেন কীড সম্বন্ধে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে, একজন নাম-করা ভদ্রলোক, এবং বিশ্বাসী লোক, জলদস্যুদের শায়েস্তা করা ও ইংলণ্ডের বাণিজ্যপোত গুলিকে রক্ষা করার জন্য বেরিয়ে, নিজেই যে কি করে একজন পাকা জলদস্যু হয়ে উঠেছিল, তার হদিস আজও সঠিক কেউ বার করতে পারেনা।

ঘটনাটি ঘটে সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে। ইংলণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের তখন তুমুল যুদ্ধ চলেছে। ইংলণ্ডের রাজা উইলিয়ম দি থার্ড তার দেশের বাণিজ্যপোত গুলিকে জলদস্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ভার দেন তার অন্তরঙ্গ বন্ধু আর্ল অব বেলমন্ট-এর উপর। অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান লোক ছিলেন এই আর্ল অব বেলমন্ট। তিনি উইলিয়মের অনুমতি অনুসারে ইংলণ্ড ও আমেরিকার কয়েকজন ধনী সওদাগরের খরচায় একটি জাহাজের ব্যবস্থা করে কীডকে তার কাপ্টেন নিযুক্ত করেন। আমেরিকার বহুলাংশ তখন ইংলণ্ডের অধীনে এবং কীড ছিল আমেরিকার অধিবাসী। আমেরিকা থেকে ইংলণ্ডে



বিখ্যাত জলদস্যু কাপ্টেন কীড—দূরে একখানা জাহাজ লুটের পর ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে।

● বিখ্যাত জলদস্যু ক্যাপ্টেন কীড
শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

এবং ইংলণ্ড থেকে আমেরিকায় জাহাজে করে মাল সরবরাহ করত কীড। বেলমণ্ট-এর প্রস্তাবে কীড প্রথমটা রাজী হয়নি বটে, কিন্তু পরে মাহিনার উপর জলদস্যুদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া ধনসম্পত্তির কিছুটা অংশ পাওয়ার লোভে শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে যায়।

চৌত্রিশটি কামান বসানো একটি মজবুত জাহাজ ও তার রক্ষণাবেক্ষণের উপযুক্ত লোক-লস্কর নিয়ে অসীম সাহসী ক্যাপটেন কীড একদিন এই অভিযানের আয়োজন সম্পূর্ণ করে যাত্রা করে সমুদ্রপথে, এবং এইখান থেকেই আরম্ভ হয় আমাদের এই বিস্ময়কর কাহিনীর ইতিহাস।

১৬৯৬ সালের এক বসন্তকালে কীড ইংলণ্ড থেকে সমুদ্রের বুকে পাড়ি জমায় এবং অল্পকালের মধ্যেই ফরাসাদের একটি জেলে বোটকে গ্রেপ্তার করে আমেরিকায় গভর্নমেন্টের হাতে সমর্পণ করে। প্রথম অভিযানেই এই ফরাসী বোটটিকে আটক করার ফলে সরকারের কাছে কীডের মর্যাদা বিশেষভাবে বেড়ে যায়। এই যাত্রার প্রথম দিকে কীড আমেরিকায় গিয়ে কয়েকদিন তার নিজের বাড়িতে থেকে যায়, তারপর তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার ভেসে পড়ে সমুদ্রের দিগন্তবিস্তারি পথে। আটলান্টিক সমুদ্রের বুকে ভাসতে ভাসতে আফ্রিকার দিকে, এবং তারপর ক্রমশঃ কেপ অব গুড্ হোপ ঘুরে ভারতবর্ষের দিকে যেতে আরম্ভ করে কীড। এই ভাবে কূলকিনারাহীন সমুদ্রের বুকে দীর্ঘ ন'মাস ঘুরতে ঘুরতে ভারত সমুদ্রের কাছাকাছি এলে দেখা যায় খাবার জিনিসে টান পড়েছে। এর উপর ঐ সময় আরও এক বিপদ দেখা দেয়—নাবিকদের অসুস্থতা। প্রধানতঃ খাবার ফুরিয়ে আসার দরুন এটা-ওটা যা-তা খাওয়ার জন্যে নাবিকদের মধ্যে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং অনেকের দুরারোগ্য কলেরা রোগ দেখা দেয়। বাকি তখনও যারা সুস্থ ছিল, এই অবস্থায় তারাও অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। ক্রমশঃ অবস্থা হয়ে ওঠে অত্যন্ত সঙিন। কিছু না খেয়ে মানুষ যুঝতে পারে কতক্ষণ? তখনই প্রায় আধ-পেটা খেতে আরম্ভ করেছে সকলে, এরপর সব ফুরিয়ে গেলে একেবারেই ভরা-ডুবি!

জাহাজের নাবিকদের নিয়ে এই বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে ক্যাপটেন কীড প্রায় দিশাহারা হয়ে পড়ল। কিন্তু সহজে সে দমবার পাত্র নয়। টেলিস্কোপের পরকলায় চোখ রেখে কীড তখন কেবল দেখতে লাগল, অন্য কোন বাণিজ্যপোত কোথাও দেখা যায় কিনা। সত্যিই অন্য কোন বাণিজ্যপোতের সন্ধান করতে না পারলে তার আর রক্ষে নেই! জাহাজসুদ্ধ লোক-লস্কররাও তাকে তখন অন্য কোন জাহাজ থেকে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে আত্মরক্ষা করার জন্য প্ররোচিত করতে লাগল।

● বিখ্যাত জলদস্যু ক্যাপটেন কীড
শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

কিন্তু কোথায় সেই জাহাজ; কোথায় সেই লক্ষ্যবস্তু? পাল তোলা প্রাচীন অর্ণবপোত বাতাসের বেগে ছুটে চলেছে ভারত মহাসাগরের বুকের উপর দিয়ে। জাহাজ নিয়ে তীরে ভিড়ানোই ছিল তখন ক্যাপটেন কীডের একমাত্র লক্ষ্য। কোন রকমে তীরের মাটি ছুঁতে পারলে, খাবারের একটা-না-একটা কিছু ব্যবস্থা সে করতে পারবেই। হঠাৎ এই সময় দূরবীনের মধ্যে ভেসে উঠল যেন একটি মোচার খোলার মত কি জিনিস। ঢেউয়ের তালে তালে হেলছে-দুলছে সেটি, কিন্তু চলছে বলে মনে হচ্ছে না। চোখে ভুল দেখছে না তো কীড! চোখটা জামার কোণ দিয়ে একবার রগড়ে নিয়ে আবার ভাল করে লক্ষ্য করল ক্যাপটেন টেলিস্কোপের ভেতর দিয়ে। না, এ আর ভুল হবার নয়; পেয়ে গেছে কীড তার বাঁচার রাস্তা।



কোথায় তীর, কোথায় খাদ্য, কোথায় জাহাজ—নাবিকেরা সব মহাসমুদ্রের দিকে চোখ রেখে অপেক্ষা করছে।

দক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূলের কাছে প্রায় অকেজো হয়ে আটকা পড়েছিল একটি ফরাসী জাহাজ। শত্রু-মিত্র যে পক্ষেরই হোক, এ অবস্থায় বাঁচার জন্যে ঐ জাহাজের উপর চড়াও হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এই খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজসুদ্ধ লোকের ধড়ে যেন প্রাণ এলো। অনুকূল বাতাসে দ্রুত পাড়ি জমিয়ে লঙ্গর করা অকেজো জাহাজটির কাছাকাছি গিয়ে উপস্থিত হ'ল তারা। ঐ ফরাসী জাহাজের নাবিকরা তখন ছোট ছোট দু'তিনটি নৌকো ক'রে তীরে নেমে সবে মাত্র তাঁবু খাটাতে আরম্ভ করেছে। এরপর খাবারদাবার ও মূল্যবান জিনিসপত্র নাবাবে তারা। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে, কীড তার জাহাজের ঝোলানো নৌকোগুলিকে জলে ভাসিয়ে দিলে। বলবান সুস্থ নাবিকরা সেই নৌকোয় চড়ে, তীরবেগে গিয়ে, ঐ জাহাজে যা কিছু খাদ্যসামগ্রী ও মূল্যবান মালপত্র ছিল, সবই নিজেদের জাহাজে নিয়ে এসে তুললো। জাহাজের মধ্যে কামান, গুলি-গোলা

ও অস্ত্রশস্ত্রও ছিল বেশ কিছু। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেগুলিকেও দখল ক'রে নিলো কীড।

শত্রুপক্ষের এই জাহাজকে নাগালের মধ্যে পেয়ে, রসদপত্র কেড়ে নেওয়া ব তাকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করার মধ্যে অন্যায় যদিও কিছু ছিল না এবং এটিকে ঠিক দস্যুবৃত্তি যদিও বলা চলে না, কিন্তু এর পর থেকে একে একে যে ঘটনাগুলি ঘটতে লাগল, সেগুলিকে দস্যুগিরি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। ক্রমশঃ সমস্ত নীতি ও আদর্শে জলাঞ্জলি দিয়ে কীড ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল একটির পর একটি জলযানের উপর, এবং নির্বিচারে হত্যা ও লুণ্ঠন আরম্ভ ক'রে দিল মরিয়া হয়ে। কীডের অধীনস্থ জাহাজের অন্যান্য কর্মচারীরা বলত: সেই সময় কীডের উপর যেন শয়তান এসে ভর করে বসেছিল। কিছুদিনের জন্যে একেবারে যেন অমানুষ হয়ে উঠেছিল ক্যাপটেন কীড। সে সময় তাকে কেউ কোন বিষয়ে বাধা দিলে সে সে-বিষয় ভ্রূক্ষেপ তো করতই না, এমন কি তার উপর অমানুষিক অত্যাচার পর্যন্ত করতেও দ্বিধা করত না।



কীড ক্রুদ্ধ হয়ে গোলন্দাজ মুরকে জাহাজের উপরেই হত্যা করলো। [পৃঃ ১৭৯

● বিখ্যাত জলদস্যু ক্যাপটেন কীড
শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

এই সময় লোহিত সাগরের উপকূল অঞ্চলে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একটি পাল তোলা বড় নৌকো থেকে বহু টাকার লঙ্কা, মরিচ ও কফি লুণ্ঠন করতে গেলে, কয়েক জন নাবিক কীডকে বাধা দেয়। এই বাধাদানকারী নাবিকদের দলপতি ছিল গোলন্দাজ উইলিয়ম মূর। কীড এ ব্যাপারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, বিদ্রোহী হিসাবে মূরকে জাহাজের ডেকের উপরেই সকলের সামনে হত্যা করে।

কিন্তু বিচারের সময় ক্যাপটেন কীড এ কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বলে যে, উইলিয়ম মূরের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে। তাছাড়া কীড আরও বলে যে, জাহাজের নাবিকরা তাকে দস্যুবৃত্তির কাজে প্ররোচিত করলেও, সে তাদের প্রত্যাখ্যান করে এবং তারই ফলে নাবিকদের কয়েকজনের সঙ্গে তার সম্বন্ধ বাধে।



আরব জাহাজখানা কাছাকাছি আসতেই কীড ঝাঁপিয়ে পড়লো তার উপর। পৃঃ ১৮০

দেশী ও বিদেশী বহু বাণিজ্য পোত থেকে বহু মূল্যবান সোনা-রুপোর জিনিস ও হীরে-জহরত লুণ্ঠন করেছিল কীড, এবং এই খবরগুলি ছড়িয়ে পড়লে পাছে সে ধরা পড়ে এই ভয়ে, লুণ্ঠিত জাহাজ বা নৌকো-গুলিকে ডুবিয়ে দেওয়া অথবা আগুন ধরিয়ে দেওয়া তার তখন একটা নেশার মধ্যে হয়ে গিয়েছিল।

আরব দেশের লোকেরা সে সময় ছিল ফরাসীদের দিকে। কিন্তু জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য তারা জায়গা বিশেষে জাহাজে নানারকমের পতাকা উড়িয়ে ঘোরাফেরা করত। অর্থাৎ দূরে কোন ফরাসী জাহাজ দেখতে পেলে, মিত্রপক্ষ হিসাবে তারা ফরাসী পতাকাই জাহাজে রেখে দিত; আবার ইংরেজদের জাহাজ দেখলে তাড়াতাড়ি বিপদ এড়াবার জন্য ফরাসী পতাকা নামিয়ে ইংরেজদের পতাকা তুলে দিত জাহাজে।

এইভাবে একবার একখানি আরব জাহাজ কীডকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। দূর থেকে ইংলণ্ড-এর পতাকা উড়িয়ে আসছিল ঐ জাহাজটি, কিন্তু কীড বুঝতে পারে যে ওটি মিত্রপক্ষের জাহাজ নয়। তখন সে নিজে তাড়াতাড়ি ফরাসী পতাকা জাহাজে

উড়িয়ে দেয় এবং দেখে যে, ঐ আরব জাহাজটিও সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের পতাকা নাবিয়ে, ফরাসী পতাকা তুলে, আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে তাদের দিকেই। কীড এই স্বর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে এতটুকুও সময় নষ্ট করেনি। বিপক্ষের জাহাজটি কাছে আসা মাত্রই সে ঐ জাহাজটির উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে সমস্ত মালপত্র বিনা যুদ্ধেই লুণ্ঠন ক'রে নিজের জাহাজে তুলে নেয়, এবং কোন দয়া-ধর্ম না দেখিয়ে, অতল সমুদ্রের বুকে লোকজনসহ বন্দী জাহাজটিকে ডুবিয়ে দেয়।

এই ধরনের একই কৌশলে খোদা ব্যবসায়ীদের আর একটি পোতকেও ঘায়েল করে কীড। সেই পোতটিতে সোনা, রুপো, মসলিন প্রভৃতি বহু মূল্যবান মালপত্র ছিল। খোদাদের ঐ জাহাজটি ছিল খুব মজবুত ও সুন্দর। কীড এই সময় নিজের জীর্ণপ্রায় জাহাজটি পরিত্যাগ ক'রে ঐ জাহাজটি ব্যবহার করতে থাকে।

এই অগাধ ঐশ্বর্য লাভ করার পর ও জাহাজ পরিবর্তন ক'রে কীড পুরোপুরিই জলদস্যুতে পরিণত হয়। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে তখন তার যোগাযোগ প্রায় সম্পূর্ণই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, এবং জলদস্যু হিসাবেও নাম ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। খোদা ব্যবসায়ীদের লুণ্ঠিত ঐশ্বর্য নিয়ে ক্যাপটেন কীড মাডাগাসকারের একটি পোতাশ্রয়ে এসে উপস্থিত হয়। সেখানে বিখ্যাত জলদস্যু ক্যালফোর্ডের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়। বহুপূর্বে কীডের অধীনেই জাহাজে কাজ করত ঐ লোকটি। তারপর কীডকে ত্যাগ ক'রে সমুদ্র পথে দস্যুবৃত্তি করতে আরম্ভ করে। কীড বন্ধুত্বের ভান দেখিয়ে তাকে বন্দী করার চেষ্টা করলে, ক্যালফোর্ড সোজাসুজি কীডকে বলে দেয় যে, তুমি আমাকে বন্দী করার চেষ্টা করলে, এখন আমিই তোমাকে বন্দী করতে পারি বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে। তার চেয়ে যে পথে তোমার নাম ছড়িয়ে পড়েছে, সেই পথ নিয়েই থাকো জলদস্যুদের বন্ধু হিসাবে।

এই কথায় কীডের কোথায় যেন আঘাত লাগে, কিছুটা যেন পরিবর্তন আসে তার মনে। সে তখন সোজাসুজি সেখান থেকে দেশের দিকে ফেরার চেষ্টা করে। জাহাজের অধিকাংশ কর্মচারীকে লুণ্ঠিত ধনরত্নের কিছু কিছু অংশ দিয়ে, বিভিন্ন পোতাশ্রয়ে সে নামিয়ে দিতে থাকে, এবং নিজেও লুণ্ঠিত দ্রব্যগুলি যথাসম্ভব বিক্রি করে, নগদ টাকায় রূপান্তরিত করে ফেলে। কিন্তু তখন ক্যাপটেন কীডের নাম দুর্ধর্ষ জলদস্যু হিসাবে প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে। যেখানেই সে যায়, যেখানেই তার জাহাজ ভেড়ে, সেখানেই লোকেরা তার সঙ্গে কেনা-বেচা করতে রাজী হয় না এবং সম্মান দেওয়া তো দূরের কথা, অত্যন্ত হীন রাজদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক লোক বলে ঘৃণার চোখে দেখতে থাকে।

● বিখ্যাত জলদস্যু ক্যাপটেন কীড
শ্রীমিত মুখোপাধ্যায়

এই অবস্থায় জাহাজের সমস্ত ধনসম্পদ লুকিয়ে ফেলার জন্য ক্যাপটেন কীড গার্ডিনার্স দ্বীপে গিয়ে কয়েকটি লোহার সিন্দুকে ক'রে ঐ লুণ্ঠিত ঐশ্বর্যের সমস্তই মাটির তলায় পুঁতে ফেলে। জন্ গার্ডিনার নামে একজন অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী লোক ছিলেন তখন ঐ দ্বীপের সর্বেসর্বা। ক্যাপটেন কীডের জাহাজ ঐ দ্বীপে গিয়ে প্রথম নঙ্গর ফেললে, গার্ডিনার নিজেই এগিয়ে গিয়ে প্রথম ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। প্রথমটা গার্ডিনার কীডের প্রস্তাবে রাজী না হলেও, শেষ পর্যন্ত তার স্ত্রীর কথায়, তিনি তাঁর দ্বীপে বহুমূল্যের সোনাদানা ও মণিমুক্তা লুকিয়ে রেখে দিতে রাজী হন। কীড সে সময় এই কথাই বলে যে, সে কিছুদিনের মধ্যেই ফিরে এসে ওগুলি আবার নিয়ে যাবে। গার্ডিনারের স্ত্রীকে ঐ সময় কীড অনেক দামী দামী জিনিসপত্র উপহার দেয়।



লোহার সিন্দুকে ক'রে কীড তার সমস্ত ধনসম্পত্তি মাটির নীচে লুকিয়ে ফেলছে।

কীডের বিচারের সময় সাক্ষী হিসাবে গার্ডিনার ঐ গুপ্ত ধনরত্নের কথা উল্লেখ করেন বটে, কিন্তু তা যে ঠিক কোথায় কীড লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল তার কথা গার্ডিনার বলতে পারেননি। অবশ্য ঐ ঐশ্বর্যের জন্য সরকার পক্ষ ও সাধারণ অনুসন্ধানী দলের পক্ষ থেকে অনেক খোঁজাখুঁজি হয়েছিল সন্দেহজনক স্থানগুলিতে, কিন্তু কোন কিছুরই সন্ধান বার করে ওঠা সম্ভব হয়নি।

এ ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত অনেকের ধারণা হয়েছিল যে, গার্ডিনার ও গার্ডিনারের

● বিখ্যাত জলদস্যু ক্যাপটেন কীড
শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

বো দু'জনে ঐ সমস্ত গুপ্তধন কীড ধরা পড়ার পর মাটির তলা থেকে বার করে নিঃশব্দে অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলে।

গার্ডিনার্স দ্বীপ থেকে নঙ্গর তুলে কীড ডেলাওয়ার বে'তে এসে একবার থামে, তারপর তার যাত্রা শুরু হয় নিউইয়র্কের দিকে। কিন্তু নিউইয়র্ক-এ না নেমে নিউইয়র্ক পোতাশ্রয় থেকে বেশ খানিকটা দূরে লঙ-আইল্যাণ্ডের পূব দিকে জাহাজ এনে নঙ্গর করে কীড, এবং তীরে নাবার আগে জাহাজ থেকেই আর্ল অব বেলমন্টকে সংবাদ পাঠাবে বলে স্থির করে। আর্ল অব বেলমন্ট তখন আমেরিকার বোস্টন-এর গভর্নর এবং বোস্টন তখন ইংলণ্ডের শাসনাধীন।

কীডের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা দীর্ঘদিন পরে জাহাজে কীডের সঙ্গে দেখা করতে আসে এবং সেই সঙ্গে একজন উকিল বন্ধুকেও নিয়ে আসে তারা কীডের কাছে। কীড তার সাহায্যেই আর্ল অব বেলমন্ট এর কাছে একটি চিঠি লিখে জানায় যে, তার সম্বন্ধে এযাবৎ যা রটেছে তা সবই মিথ্যে, কাজেই সে নিজে আর্লের কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলতে চায়।

কয়েক দিনের মধ্যেই সেই চিঠির উত্তর আসে। আর্ল বন্ধুভাবেই জানান যে, তিনি তাঁর মন্ত্রণা-পরিষদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছেন, অতএব কীড ইচ্ছা করলে অনায়াসেই এখন এখানে আসতে পারে।

উত্তরে কীড জানায় যে, সে এখুনি যাত্রা করছে।

কিন্তু বোস্টনের মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই কীড বুঝতে পারে যে, তার ভাগ্য প্রতিকূল—আর্ল অব বেলমন্ট তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। হঠাৎ দু'পাশ থেকে দু'জন বলিষ্ঠ লোক কীডকে এসে জড়িয়ে ধরে পেছন থেকে এবং জোর ক'রে হাতকড়া পরিয়ে, একেবারে কারাগারের মধ্যে এনে বন্দী করে। আর্ল নিজেই কীডকে তীরে নামার সঙ্গে সঙ্গে বন্দী করার আদেশ দিয়েছিলেন। বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা ছাড়া আর্ল অব বেলমন্ট-এর অন্য কোন উপায় ছিল না। তাছাড়া ঐভাবে কীডকে স্তোকবাক্য না দিলে সে আবার হয়ত জাহাজ নিয়ে গা-ঢাকা দিত জল-পথে।

কীড যে সত্যিকারের একজন অপরাধী সে সম্বন্ধে বেলমন্ট-এর কোন সন্দেহই ছিল না। তাছাড়া একদিন কীডকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করার ফলে, ইংলণ্ডের বহু সম্ভ্রান্ত লোক তাঁর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে গিয়েছিলেন, এবং তাঁদের ধারণা জন্মেছিল যে, বেলমন্ট কীডকে গ্রেপ্তার না ক'রে হয়ত প্রশ্রয়ই দেবেন। কাজেই এ অবস্থায় নিজের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য বেলমন্ট কীডকে গ্রেপ্তার ক'রে

সকলের কাছে এইটাই প্রমাণ করলেন যে, তিনি অন্যায়ের প্রশ্রয়দাতাও নয় এবং দস্যু কীডের বন্ধুও নয়।

এক মাস, দু'মাস ক'রে দীর্ঘ ছ'মাসের বেশী হাত-পায়ে বেড়ি দিয়ে বোস্টনের জেলে বন্দী ক'রে রাখা হয় কাপ্টেন কীডকে। তারপর সেখান থেকেই বন্দী অবস্থায় জাহাজে ক'রে আনা হয় তাকে ইংলণ্ডে। ইংলণ্ডের কারাগারেও প্রায় এক বছর কেটে যায় কীডের বন্দীদশায়। তারপর আরম্ভ হয় তার চাঞ্চল্যকর বিচার। এই উত্তেজনাপূর্ণ বিচার সারা ইংলণ্ডকে সরগরম ক'রে তোলে। বহু গুণী, জ্ঞানী, নোবেল ও লর্ডরাও এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। প্রথম দিকে যে সামান্য সামান্য কিছু লোক কীডের পক্ষে এবং কিছু বিপক্ষে ছিল, তা ক্রমে ক্রমে বিরাট দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী দলে পরিণত হয়।

বিচারালয়ে বিপক্ষের লোকেরা প্রমাণ করতে চায় যে, মালাবার কোস্টে কীড যে গোদা ব্যবসায়ীদের জাহাজ লুট করেছিল, তাতে কোন ফরাসী পতাকাও ছিল না, অথবা ফরাসীদের কোন মূল্যবান কাগজপত্রও ছিল না।

এর উত্তরে কীড বলে, হ্যাঁ, অনেক মূল্যবান কাগজপত্র ছিল তাতে।

তখন তাকে প্রমাণস্বরূপ সেই সব কাগজপত্র দেখাতে বলা হয়।

কীড উত্তরে বলে যে, সে সমস্ত কাগজপত্র আর্ল অব বেলমন্টকে দিয়ে দিয়েছে।

তখন রাজ-তরফের ভারপ্রাপ্ত কোর্ট অফিসার হাসতে হাসতে বলেন যে, আপনি জানেন, এই মামলা আরম্ভ হবার পূর্বেই বেলমন্ট মারা যান। তাঁর কাছে যদি



বোস্টনের জেলখানায় বন্দী অবস্থায় ক্যাপটেন কীড।

কোন সরকারী কাগজপত্র থাকত, তাহলে তা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে সরকারের হস্তগত হ'ত।

এরপর অন্যতম বিখ্যাত জলদস্যু ক্যালফোর্ড-এর কাছে কীড যা-যা বলেছিল, সে সব কথাও ওঠে বিচারের সময়। তাছাড়া কীডের জাহাজের কয়েকজন নাবিককেও এই ব্যাপারে সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করা হয়। তারা সকলেই একবাক্যে এই কথাই বলে যে, কীড তাদের শেষ পর্যন্ত জলদস্যুবৃত্তি গ্রহণ করতেই প্ররোচিত করে। কিন্তু এসব ছাড়াও সবচেয়ে যা কীডকে অপরাধী সাব্যস্ত করতে সাহায্য করেছিল, তা হচ্ছে : জাহাজের গোলন্দাজ উইলিয়ম মুরকে হত্যা করার ব্যাপারটি।

জুরিরা সকলেই একমত হয়ে হত্যাপরাধে কীডকে দোষী সাব্যস্ত করেন। এছাড়া জলদস্যুবৃত্তির জন্যও বিচারে সে অপরাধী স্বীকৃত হয়। এবং এক সঙ্গে এই দুই অপরাধের জন্য বিচারক তার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন।

এই ফাঁসির আদেশ শোনার পরও কীড সকলের সামনেই বিচারকের উদ্দেশে তার শেষ বক্তব্য পেশ করে ভাঙা ভাঙা গলায়। সে বক্তব্যের কথা গোড়ার দিকেই তোমরা একবার শুনেছ। এই দুর্ধর্ষ মানুষটির চোখ তখন জল-ভারে নত; দীর্ঘ দিন জেলে থাকার ফলে শরীর ভেঙে পড়েছে—উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় প্রাণ ওষ্ঠাগত।

কিন্তু অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বিচারকের উদ্দেশ্যে কথাগুলি বললেও, কীডের ভাগ্যবিধাতা তখন বিরূপ। ন্যায়ের দণ্ড হাতে বিচারপতির সিদ্ধান্তের আর কোন নড়চড় হ'ল না। ১৭০১ সালের ২৩শে মে ইতিহাসের-প্রসিদ্ধ জলদস্যু ক্যাপটেন কীডের জীবনাস্ত হ'ল ফাঁসির মঞ্চে।

গুরু বিন্ মিলে না জ্ঞান, ভাগ্য বিন্ মিলে না সজ্জন
যোগ বিন্ মিলে না রাজ, বল বিন্ হটে না দুর্জন।
—সন্তদাস

মণি ও মুক্তা



গুরু ছাড়া জ্ঞান পাওয়া যায় না, ভাগ্য ছাড়া সজ্জনের সঙ্গ হয় না, কর্মফলের যোগ-যাগ ছাড়া ঐশ্বর্য পাওয়া যায় না, আর দুর্জন যে, বলপ্রয়োগ ছাড়া সে হটে না।



লাবু

—নরেন্দ্র দেব

(রূপকথা)

এক

অনেকদিন আগের কথা।

এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তিনি খুব জনপ্রিয়। প্রজারা সবাই তাঁকে ভারি ভালবাসতো। তিনি প্রায়ই ছদ্মবেশ পরে প্রাসাদ থেকে লুকিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। রাজধানী ছাড়িয়ে আশেপাশের গ্রামে এসে ঘুরে বেড়াতেন। নিজের চোখে দেখে আসতেন প্রজারা কেমন আছে। শুনতেন তারা নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করছে। তাদের অভাব অভিযোগ কি জানবার চেষ্টা করতেন। রাজকর্মচারীগণ কেউ তাদের উপর কোনো অন্যায় অত্যাচার করছে কিনা তার খবর নিতেন।

একদিন হয়েছে কি, এমনি ছদ্মবেশে ঘুরতে ঘুরতে রাজা এক গ্রামে গিয়ে পড়লেন।

সেখানে বেশিরভাগই দীন-দুঃখীদের বাস। তখন অনেক বেলা হয়ে গিয়েছিল। রোদের তাপ বেড়ে উঠেছে খুব। পথে হাঁটতে রাজা বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ঘোড়াটিকে বেঁধে রেখে এসেছিলেন গ্রামের বাইরে এক গাছতলায়। রাজার খুব তৃষ্ণা পেয়েছিল। গলা শুকিয়ে উঠেছে দেখলেন কাছেই বেশ পরিচ্ছন্ন একটি ছোট্ট কুটীর। রাজা ধীরে ধীরে সেই কুটীরের দ্বারে গিয়ে ডাক দিলেন—বাড়িতে কে আছেন?

দরজা খুলে একটি মধ্যবয়স্কা মহিলা বেরিয়ে এলেন। ছদ্মবেশী রাজাকে দেখেই বুঝতে পারলেন ইনি একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। সবিনয়ে জানতে চাইলেন আপনি কাকে খুঁজছেন?

মহিলাটিকে দেখে রাজার মনে হ'ল ইনি দরিদ্র হলেও নিশ্চয় কোনো বড় ঘরের মেয়ে। তাই সসম্মানে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, আমার বড় পিপাসা পেয়েছে। একটু যদি ঠাণ্ডা জল দিতে পারেন মা বড় উপকৃত হবো।

মহিলাটি তাঁকে তাড়াতাড়ি একখানি আসন এনে বসতে বলে, তখনি চলে গেলেন কুয়ো থেকে ঠাণ্ডা জল তুলে আনতে।

পথশ্রান্ত রাজা আসনে এসে বসলেন। এই কুটীরটি রাজার খুব চেনা। তিনি বহুদিন এপথে যেতে যেতে এই ফুলের বাগান-ঘেরা ঝরঝরে সুপরিচ্ছন্ন কুঁড়েঘরখানি দেখেন আর ভাবেন এ দরিদ্র পল্লীতে এমন সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে কারা এই পর্ণকুটীরে থাকেন? মাঝে মাঝে তাঁর চোখে পড়ে একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে হয়ত কখনো স্নান করে উঠে এলোচুলে শুভ্র শাড়ি পরে একটি সাজি হাতে ফুল তুলছে, অথবা কোনোদিন ঝকমকে নিকানো মাটির দাওয়ায় লক্ষ্মীপুজার আলপনা দিচ্ছে। কখনও বা এক ধারে বসে একমনে পুঁথি নিয়ে নিবিষ্টমনে পড়ছে। কখনও বা দেখেন মেয়েটি বসে ছবি আঁকছে। আবার কখনও বা দেখেন নিপুণ হাতে কুলোয় করে ধান চাল ঝাড়াবাছা করছে। নয়তো কুয়ো থেকে জল তুলছে। মেয়েটিকে দেখে রাজার মনে কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল।

রাজা দাওয়ায় বসে ভাবছিলেন সেই মেয়েটিকে আজ দেখতে পাচ্ছি না কেন? সে আজ কি করছে? সে কি বাড়িতে নেই? দরজার ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখেন মেয়েটি আজ ঘরের ভিতর বসে ছুঁচসুতা নিয়ে একমনে কি যেন একটা সেলাইয়ের কাজ করছে। ইতিমধ্যে মহিলাটি একটি রুপোর মতো মাজাঘষা ঝকঝকে কাঁসার সুদৃশ্য ঘটিতে রাজাকে পরিস্রুত ঠাণ্ডা জল এনে দিলেন।

রাজা জলপান করে পরম পরিতৃপ্ত হলেন। মহিলাটিকে জিজ্ঞাসা করলেন ঘরের মধ্যে ওই যে মেয়েটিকে দেখতে পাচ্ছি ওটি কি আপনারই মেয়ে? মেয়েটির নাম কি মা?

রাজার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মহিলাটির দুই চোখ জলে ভরে উঠলো। বাষ্পরুদ্ধ-

● লাহ্
নরেন্দ্র দেব

কষ্টে বললেন, হ্যাঁ বাবা, অভাগিনী আমারই মেয়ে। ওর বাবা সুন্দরী মেয়ে হয়েছে দেখে আদর করে ওর নাম রেখেছিলেন—লাবণ্যপ্রভা। আমরা ওকে 'লাবু' বলেই ডাকি। অল্পবয়সেই বেচারা পিতৃহীন হয়েছে। আমার স্বামী পুষ্পপুরের ধনী জমিদার ছিলেন। অকস্মাৎ তাঁর অকালে মৃত্যু হওয়ায় জ্ঞাতিরা আমাদের অসহায় দেখে সমস্ত বিষয়সম্পত্তি ফাঁকি দিয়ে কেড়ে নিয়ে আমাকে পথে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। আমার হাতে যা সামান্য টাকাকড়ি ছিল, আর আমার যে সব মূল্যবান অলংকার ছিল তাই বিক্রি করে এই গ্রামে সামান্য একটু জমি নিয়ে এই কুঁড়েঘরখানি তুলে বসবাস করছি। মেয়ে বড় হয়ে উঠেছে, অর্থের অভাবে বিয়ে দিতে পাচ্ছি না। কী যে হবে, কী যে করবো, আমি কিছু ভেবে পাচ্ছি না। ভগবানের দয়ার উপর নির্ভর করে আছি। তিনি যা করবেন তাই হবে।

রাজা সমস্ত কাহিনী শুনে খুবই দুঃখিত হলেন। মহিলাটিকে তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি জানিয়ে বললেন, আপনি কিছু ভাববেন না মা, আমি আবার কোনদিন এদিকে আসবো। আপনার মেয়েটির জন্য একটি ভাল পাত্র দেখেশুনে ঠিক করে আসবো। ওর বিয়ের টাকার জন্য কোনও চিন্তা নেই। যা খরচ লাগবে আমিই তা আপনাকে যোগাড় করে এনে দেব।

মহিলাটি তাঁকে কিছু বলবার আগেই রাজা উঠে চলে গেলেন। মহিলাটি অবাক হয়ে এই অপরিচিত দয়ালু লোকটির দিকে চেয়ে রইলেন। বার বার তাঁর মনে হতে লাগলো ইনি কি ঈশ্বরের প্রেরিত কোনও দেবদূত? আমার লাবুর জন্য সৎপাত্র ঠিক করে দেবেন বলে গেলেন। শুধু তাই নয়, মেয়ের বিয়েতে যা কিছু খরচপত্র দরকার হবে, সে টাকাও উনি যোগাড় করে দেবেন বললেন। এ ভগবানের দয়া ছাড়া হতে পারে না। নিশ্চয় উনি কোনও দানশীল ধনী মহাজন। চেহারা দেখলে সত্যিই ভক্তি হয়। জগতের কল্যাণের জন্যই এঁরা পৃথিবীতে আসেন

দুই

দেখতে দেখতে এক সপ্তাহ কেটে গেল। সেদিনের সেই যে অপরিচিত অতিথি মানুষটি আবার আসবো বলে গিয়েছিলেন তিনি তো কই আর এলেন না! হয়ত ভুলেই গেছেন। গরীব দুঃখীর কথা কি ধনী মহাজনদের মনে থাকে?

লাবু মাকে এইরকম চিন্তান্বিত ও উৎকণ্ঠিত দেখে কাতর হয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করলো, মা, তোমার কি হয়েছে আমায় বলো! তোমাকে বলতেই হবে, নইলে আমি ছাড়বো না!

মেয়ের সনির্বন্ধ অনুরোধে স্নেহময়ী জননী মেয়েকে একদিন সব কথা খুলে বললেন। লাবু শুনে অভিমান করে বললে আমায় তুমি তাড়িয়ে দিতে চাও মা! স্বীকার করি বটে মেয়ে বড় হলে তার

● লাবু
নরেন্দ্র দেব

বিবাহ হয় এবং সে স্বামীর ঘরে চলে যায়। কিন্তু, তোমার যে কেউ নেই! আমি চলে গেলে তোমায় কে দেখবে মা?

মা বুকের মধ্যে মেয়েকে টেনে নিয়ে আদর করে বললেন, ওরে! যাদের কেউ নেই তাদের ভগবান আছেন। তুই চলে গেলে তিনিই আমাকে দেখবেন। আমি স্বার্থপরের মতো তোর জীবনটা আমার এ দুর্ভাগা জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ব্যর্থ হতে দেবো না। যদি ভাল ছেলের সন্ধান পাই তোর বিবাহ দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হবো লাবু। নইলে যে মরেও আমি শান্তি পাব না।

লাবু মাথা হেঁট করে ম্লান মুখে বসে রইল।

এমন সময় বাইরে সেই অতিথির কণ্ঠ শোনা গেল, কইগো মা! কোথা গেলেন? আসুন, আসুন, সব ঠিক করে ফেলেছি।



আপাততঃ এই পাঁচ হাজার স্বর্ণমুদ্রা রেখে দিন মা!

আঁচলে চোখ মুছে লাবুর মা ছুটে বেরিয়ে এলেন। অতিথিকে সসম্মানে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে বসতে বললেন

ছদ্মবেশী রাজা বললেন, আমার আজ বসবার সময় নেই মা। আপনার মেয়ে কুমারী লাবণ্যপ্রভার জন্যে আমি একটি সুযোগ্য পাত্র ঠিক করে ফেলেছি তাঁরা মেয়েটিকে দেখে আশীর্বাদ করতে চান। আমি মেয়েটিকে নিতে এসেছি। আপনার যদি কোনও আপত্তি না থাকে, ওকে এখনি আমার সঙ্গে দিন। এই নিন, আপনার মেয়ের বিয়ের খরচপত্রের জন্য আপাততঃ পাঁচ হাজার স্বর্ণমুদ্রা রেখে দিন। হীরে মুক্তোর গহনা যা লাগবে আমি গড়াতে দিয়েছি। বেনারসী শাড়ি, মাদ্রাজ চেলী ইত্যাদি কনের কাপড়-চোপড়ও কেনা হয়ে গেছে। কোথায়? মেয়ে কই? ডাকুন তাকে।

মহিলার আনন্দ আর ধরে না। ছুটে ঘরের ভিতর গেলেন লাবুকে খুঁজতে। মাঝে ফিরে বিয়ের পালা শেষ হতে রাজা লাবুকে নিয়ে চলে গেলেন। বর এসে কুটিরদ্বারেই অপেক্ষা করছিল।

মহিলাটি এবারও অবাক হয়ে এই দয়ালু মহাশয় পরোপকারী ভদ্রলোকের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। ভাবতে লাগলেন, তাই তো! চিনি না, জানি না, সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ভদ্রলোক আমার সোনার প্রতিমা মেয়েকে নিয়ে চলে গেলেন! পারলি কেন? কি করে? কোথায় গেছে? কোনও পরিচয়ই তো দিলেন না উনি। বিয়ের খরচের জন্য পাঁচ হাজার স্বর্ণমুদ্রা আমায় দিয়ে গেলেন। গয়নাগাঁটি, শাড়ি কাপড়ও সব কেনা হয়ে গেছে বললেন। তারপর মেয়েকে যদি বরপক্ষের পছন্দ না হয় তখন কি হবে? অবশ্য লাবু আমার অপছন্দ হবার মতো মেয়ে নয়। যে দেখবে তারই ভাল লাগবে। কিন্তু, যিনি লাবুর জন্য এত করছেন, তাঁর পরিচয়টা আজও জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেলুম। লোকটি জোচ্চোর নয়ত? পাঁচ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে আমার মেয়েকে কিনে নিয়ে পালালো না তো? লাবুর মা মনে মনে শিউরে উঠলেন। না না, লোকটি ভাল। ভালমন্দ মানুষ তাদের আচরণ থেকেই বোঝা যায়। দূর ছোক ছাই! আর ভাবতে পারিনি। ভগবানের মনে যা আছে তাই হবে।


লাবু বললে, চলুন না দাদা, আজ একটু বেড়িয়ে আসা যাক! [পৃষ্ঠা ১১০

তিন

তারপর হ'ল কি, রাজার ছিল চার-চারটি ছেলে। কিন্তু মেয়ে ছিল না একটিও। রাজপ্রাসাদে একটি রাজকন্যা না থাকায় রানীর মনে কোনও সুখ ছিল

● লাবু
নরেন্দ্র দেব

না। কিন্তু রাজার রথ যখন রাজপুরীতে এসে থামলো এবং রাজা যখন লাবণ্যপ্রভার হাতখানি সস্নেহে ধরে রানীর কাছে নিয়ে এলেন, লাবণ্যপ্রভার রূপলাবণ্য দেখে রানী একেবারে মুগ্ধ। সমাদরে লাবুকে নিজের মহলে তুলে নিয়ে গেলেন রানী। বললেন 'লাবু' আমারই মেয়ে।

সেদিন থেকে রাজবাড়িতে লাবু রাজকন্যার মতোই বিশেষ সম্মানজনক স্থান অধিকার করে বসলো। রানী তাকে রাজকুমারীর উপযুক্ত আদরেই প্রতিপালন করতে লাগলেন। চার চারজন রাজকুমারও এতদিন পরে একটি বোন পেয়ে ভারি খুশী। বোনটিকে কে বেশি ভালবাসে এই নিয়ে চার ভাইয়ের মধ্যে রীতিমতো প্রতিযোগিতা লেগে গেল। লাবুর যখন যা দরকার তখনই চার ভাই ছুটে গিয়ে তাই এনে হাজির করতো। কিন্তু, লাবুর সবচেয়ে বেশি ভাব হ'য়ে গেল ছোট রাজকুমারের সঙ্গে। বড়দা, মেজদা, সেজদা লাবুর চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো কিন্তু ছোট রাজকুমারকে লাবুর প্রায় সমবয়সী বললেই হয়। মাত্র দু' তিন বছরের বড়। তাই ছোটোর সঙ্গেই খেলাধুলো ও মেলামেশা করতে লাবুর একটুও কুণ্ঠা বা সংকোচ বোধ হ'ত না।

রাজকুমারেরা লাবুকে রাজকুমারী বলেই জানতো। কিন্তু লাবণ্য যে রাজকন্যা নয়, সে যে রানীমার পালিতা মেয়ে, রাজপুত্রেরা কেউ তা না-জানলেও, রাজবাড়ির চাকর-দাসীরা সবাই এটা জানতো। মহারাজ যে তাকে দরিদ্রের কুটীর থেকে নিয়ে এসেছেন সারথির কাছে এ খবর তারা আগেই শুনেছিল।

এদিকে লাবণ্যপ্রভা রাজপ্রাসাদে রাজকন্যার মতোই আদরযত্নে ও রাজকীয় মর্যাদার সঙ্গেই প্রতিপালিত হচ্ছিল। তার চেহারায় আর আচার-আচরণে কেউ বুঝতেই পারতো না যে সে রাজবংশের মেয়ে নয়। তাকে দেখলে মনে হতো যেন সে এই রাজপ্রাসাদেই জন্মেছে। দরিদ্রের কুটীরে যেন সে কোনও দিনই প্রতিপালিত হয়নি। এমনিই আভিজাত্যপূর্ণ ছিল তার চালচলন।

একদিন ছোট রাজপুত্রকে লাবু বললে, চলুন না দাদা, আজ এমন রমণীয় অপরাহ্ণে একটু নদীর ধারে আরামে বেড়িয়ে আসা যাক্। সারথিকে রথ আনতে বলুন। কিন্তু, শুধু আমরা দুজন যাবো। আর কেউ নয়!

ছোট রাজকুমার খুশী হয়ে তখনি ছুটলেন নিজের সারথিকে রথ আনবার কথা বলতে রাজপ্রাসাদের স্যন্দনশালায়। বললেন, সারথি! অবিলম্বে তুমি রাজকুমারীর মহলে রথ নিয়ে হাজির হও। রাজকন্যা নদীর ধারে বেড়াতে যাবেন। একটুও যেন দেরি কোর না।

সারথি ছোট রাজকুমারের কথায় ধরনে বিরক্ত হয়ে বললে, ইস্! তবু যদি উনি সত্যিই রাজকন্যা হতেন! তাহলে তো দেখছি আপনি আমাদের হাতে মাথা কাটতেন!

● লাবু
নরেন্দ্র দেব

ছোট রাজকুমার লাবণ্যকে ভয়ানক ভালবাসেন। সারথির এই রকম অসংলগ্ন কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে ব্যাপার কি সব জানতে চাইলেন। সারথি তখন এই মেয়েটির সমস্ত ইতিহাস তাঁকে খুলে বললে। ছোট রাজকুমার তখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে দাদাদের কাছে ছুটে গিয়ে খবরটা জানিয়ে দিয়ে বললেন, লাবণ্য যখন সত্যিই আমাদের বোন নয় তখন আমরা যে কেউ তাকে বিয়ে করতে পারি তো! কি বলো?

বড় ভাই শুনে খুশী হয়ে বললেন, নিশ্চয় পারি। এই রকম একটি রূপসী, সুন্দরী মেয়েই আমি খুঁজছিলুম। আমিই ওকে বিয়ে করবো।

মেজ রাজকুমার বললেন, বাঃ রে! ও যখন আমাদের বোন নয় তখন আমিই বা ওকে বিয়ে করবো না কেন?

সেজ রাজকুমারও সেই কথা বললেন।

ছোট রাজকুমার তখন কাতরকণ্ঠে বললে, লাবণ্য যে আমাদের বোন নয় এই খবরটা নিয়ে আমি যে তোমাদের কাছে ওকে বিয়ে করবার অনুমতি নিতেই এসেছিলুম। আমি যে ওকে তোমাদের সকলের চেয়ে বেশী ভালবাসি।

লাবণ্যকে নিয়ে তখন চার ভাইয়ের মধ্যে শুম্ভ-নিশুম্ভের দ্বন্দ্ব বেধে গেল।

রাজার কানে খবরটা পৌঁছতে তিনি তৎক্ষণাৎ রাজকুমারদের ডেকে পাঠিয়ে বললেন, তোমরা চার ভাই পৃথিবীর চারদিকে বেরিয়ে পড়ো। তোমাদের মধ্যে যে লাবণ্যপ্রভার জন্য দেশ-বিদেশ থেকে সবচেয়ে আশ্চর্য আর অমূল্য জিনিস সংগ্রহ করে এনে লাবণ্যকে উপহার দিতে পারবে তার সঙ্গেই লাবণ্যের বিয়ে দেব আমি।

রাজার আদেশ শোনবামাত্র চার ভাই সেইদিনই হুড়মুড় করে পৃথিবীর চারদিকে ছুটলো সবচেয়ে আশ্চর্য আর অমূল্য জিনিস খুঁজে আনতে। যাবার সময় রাজা তাদের বলে দিলেন, ঠিক তিরিশটি দিন সময় পাবে। তোমাদের মধ্যে যে যা সংগ্রহ করে আনতে পারবে তার ভিতর সবচেয়ে আশ্চর্য ও অমূল্য জিনিস হবে যার, সে এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হবে। ফিরতে যদি কারুর একত্রিশ দিন হয়ে যায়, সে যত ভাল জিনিসই আনুক, বাতিল হয়ে যাবে।

চার

রাজার হুকুমে চারজন রাজকুমার পৃথিবীর চারদিকে বেরিয়ে পড়লেন আশ্চর্য ও অমূল্য জিনিস খুঁজে আনতে। বড় রাজকুমার চললেন উত্তর দিকে। মেজ রাজকুমার দক্ষিণ দিকে। সেজ রাজকুমার

● লাব

নরেন্দ্র দেব

পশ্চিম দিকে। আর ছোট রাজকুমার পূর্বদিকে। উত্তরে অনেক দূর যাবার পর বড় রাজকুমার দেখলে একটি বৃদ্ধ কারিগর একটি রাজহাঁসের মতো ডানা মেলা সুন্দর রথ তৈরি করছে। বড় রাজকুমারে দেখে ভারি পছন্দ হল। তিনি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি রথখানি বেচবে? বুড়ে বললে, দাম পেলেই বেচবো। রাজকুমার জানতে চাইলেন, কত দাম? বুড়ো বললে, একল স্বর্ণমুদ্রা! রাজকুমার চমকে উঠে বললেন, তোমার বেচবার ইচ্ছা নেই বোধহয়! নইলে এই সামা একখানা হাঁসগাড়ির এত দাম চাইবে কেন? বুড়ো হেসে বললে, তুমি এর গুণ জান না তা দাম বেশি মনে করছো। এটা হাঁসগাড়ি নয়। এর নাম 'পুষ্পকরথ'। এই রথে চড়ে যখ যেখানে যেতে চাইবে একমুহূর্তে আকাশপথে উড়ে এ রথ তোমাকে সেইখানে নিয়ে যাবে! বড় রাজকুমার একথা শুনে তো ভারি খুশী। মনে মনে ভাবলেন এমনি আশ্চর্য মূল্যবান জিনিসই তে আমি কিনে নিয়ে যেতে এসেছি। আর কোনও কথা না বলে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বড় রাজকুমার 'পুষ্পকরথ'খানি কিনে ফেললেন।

এদিকে মেজ রাজকুমার দক্ষিণে অনেকদূর যাবার পর দেখতে পেলেন এক বৃদ্ধ কারিগর বসে বসে একমনে একখানি সুন্দর আয়না তৈরি করে কারুকার্যকরা হাতীর দাঁতের ফ্রেমে বাঁধাচ্ছে। মেজ রাজকুমারের আয়নাখানি দেখে ভারি পছন্দ হল। জিজ্ঞাসা করলেন, কারিগর, তুমি কি আয়নাখানি বেচবে? বুড়ো বললে, দাম পেলে নিশ্চয় বেচবো। মেজ রাজকুমার দাম কত জানতে চাইলেন। বুড়ো বললে, এর দাম দেড় লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা! মেজ রাজকুমার আয়নার দাম শুনে হেসে উঠলেন। বললেন, কারিগর! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? সামান্য একখানা আয়নার এত দাম চাইছো? ও আয়না কি হীরে, মতি, পান্না দিয়ে গড়া? বুড়ো বললে, এ সাধারণ আয়না নয়। এর নাম 'মায়াদর্পণ'। তোমার আপন জন যে যেখানে যত দূরেই থাকনা কেন, তাকে যদি দেখবার জন্য তোমার মনপ্রাণ আকুল হয়ে ওঠে, এই আয়নার দিকে চাইলেই দেখতে পাবে সে কি অবস্থায় কোথায় আছে। মেজ রাজকুমার আয়নার গুণ শুনে তৎক্ষণাৎ দেড়লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে আয়নাখানি কিনে ফেললেন।

এদিকে সেজ রাজকুমার পশ্চিম দিকে যতদূর যান, কিছুই আশ্চর্য বা মূল্যবান জিনিস দেখতে পান না যে কিনে আনবেন। প্রায় যখন পশ্চিম দিকের পথ শেষ হয়ে আসছে এমন সময় সেজ রাজকুমার দেখতে পেলেন একজন বুড়ো কারিগর বসে একটি ছোট্ট রূপোর কৌটো তৈরি করছে। কৌটোটি এত সুন্দর যে সেজ রাজকুমারের সেটি কেনবার ইচ্ছা হল। তিনি কারিগরকে জিজ্ঞাসা করলেন, কৌটোটি কি তুমি বেচবে? কারিগর বললে, বেচবো না কেন, কিন্তু তুমি কি এর দাম দিতে পারবে? এ কৌটোর দাম দু'লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা। কারণ এর নাম 'মা-লক্ষ্মীর অক্ষয়



ছোট রাজকুমার লাবণ্যপ্রভাকে একটু একটু করে আমটি খাইয়ে দিলেন।

[পৃষ্ঠা—১৯৪

[illegible]। এর মধ্যে টাকা রাখলে সে টাকা কখনো ফুরোবে না। [illegible] আড়াই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে সেই 'মা-লক্ষ্মীর অক্ষয় ঝাঁপি' কিনে [illegible]।

এদিকে সমস্ত পুব দিক চষে ফেলেও ছোট রাজকুমার [illegible] পেলেন না। তিনি যখন হতাশ হয়ে বাড়ি [illegible] একটি পাকা আম তৈরি করছে। [illegible] এমন চমৎকার যে দেখলেই [illegible] ইচ্ছে করে। মাটির আম বলে [illegible] যায় না। সবচে [illegible] ফলটি [illegible] মধুর সৌরভ বিকীর্ণ হচ্ছিল। [illegible] রাজকুমার ফলটি কিনতে [illegible]। বৃদ্ধ শিল্পী বললে, তুমি কি এর দাম দিতে পারবে? আড়াই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিলে এটি তোমায় দিতে [illegible]।

ছোট রাজকুমার তার কথা শুনে একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে বললেন, 'শিল্পী! তুমি কি আমাকে এতই নির্বোধ ভেবেছো। একটা সামান্য মাটির আম, স্বীকার করি খুব ভালই তৈরি করেছো, কিন্তু অত চাইছো কি বলে?

শিল্পী হেসে বললে, সত্যিই তুমি নির্বোধ। দাম শুনে বুঝতে পারছো না যে এটি সামান্য জিনিস নয়। এ অমূল্য ধন। এর নাম 'অমৃত ফল'। এ যে খাবে সে আর মরবে না।



শিল্পী হেসে বললে, দাম শুনে বুঝতে পারছো না যে এটি সামান্য জিনিস নয়।

ছোট রাজকুমার তখন আড়াই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে সেই অমৃত ফলটি কিনে বাড়ির পথে পা বাড়ালেন। কারণ, তিরিশ দিন পূর্ণ হতে আর বেশী দেরি নেই।

● ক্রমশ

নরেন্দ্র দেব

পাঁচ

ফেরার পথে এক সরাইখানায় চার ভাইয়ের পরস্পরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সবাই সবাইকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি কিনেছো? তুমি কি কিনেছো? কিন্তু কেউ কাউকে বলতে চায় না। ছোট রাজকুমার বললেন, চলো ভাই বাড়ি যাই। লাবণ্যর জন্য আমার বড়ই মন কেমন করছে। প্রায় এক মাস হতে চললো তাকে দেখিনি। আমার তাকে বড্ড দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে!

মেজ রাজকুমার বললেন, ভাবিসনি। তোকে আমি এখনি দেখিয়ে দিচ্ছি। তিনি তাঁর ঝুলির ভিতর থেকে সেই 'মায়াদর্পণ'খানি বার করলেন। বললেন, চেয়ে দেখ, এর মধ্যে লাবণ্যকে এখনি দেখতে পাবি। লাবণ্যকে দেখবার ইচ্ছে সবারই মনে ছিল। তাই সবাই ঝুঁকে পড়লে আয়নার মধ্যে তাকে দেখতে। দেখে কিন্তু সবার মুখ শুকিয়ে গেল। লাবু কঠিন রোগে মৃত্যুশয্যায় বাঁচবার কোনও আশা নেই। প্রাসাদে ফিরতে আর মুহূর্ত বিলম্ব করলে লাবণ্যর সঙ্গে শেষ দেখা হবে না! কী হবে? কেমন করে যাবে তারা? রাজধানী এখনও অনেকদূর।

তখন বড় রাজকুমার বললেন, ভয় নেই কিছু, আমি এক আশ্চর্য 'পুষ্পক রথ' কিনেছি তাইতে চড়ে এই মুহূর্তে আমরা রাজপ্রাসাদে গিয়ে হাজির হবো। শোনবামাত্র চার ভাই পুষ্পকরথে চড়ে রওনা হতে যাবে এমন সময় সরাইখানার মালিক এসে বললে, আমার পাওনা টাকাটা মিটিয়ে না দিলে আমি কাউকে যেতে দেব না এখান থেকে। সব জিনিসপত্র কেড়ে নিয়ে বাজেয়াপ্ত করবো। চার ভাই অর্থকোষ খুলে দেখে কারুর কাছে এক কপর্দকও নেই! কী হবে? কেমন করে সরাইখানার পাওনা মিটিয়ে তারা বাড়ি যাবে? তখন সেজ কুমার বললেন, কিছু ভয় নেই, আমার কাছে আছে 'মা-লক্ষ্মীর অক্ষয় ঝাঁপি'। যত টাকা চাই দিতে পারবো। শুনে সবাই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো! তখন সেই ছোট্ট রূপোর কৌটো খুলে সরাইওয়ালার পাওনা মিটিয়ে পুষ্পক রথে চড়ে চার ভাই একমুহূর্তে হুস্ করে রাজপ্রাসাদে উড়ে এল।

ছয়

এসে দেখে লাবণ্যপ্রভার অসুখ সেদিন খুবই বেড়েছে। রাজবৈদ্য বলে গেছেন জীবনের কোনো আশা নেই। আর অল্পক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু সুনিশ্চিত। এ রোগের কোনও ওষুধ নেই রাজা রানী বিষণ্ণ ও চিন্তিত। ছোট রাজকুমার তখন এগিয়ে এসে বললেন, আমার অনুমতি করুন পিতা, আমি লাবণ্যপ্রভাকে এখনি আরোগ্য করে দিচ্ছি। বলেই, ছোট রাজকুমার তাঁর থলির ভিতর থেকে সেই আমটি বার করে লাবণ্যপ্রভাকে একটু একটু করে খাইয়ে দিলেন। লাবণ্যপ্রভা এতদিন

কিছু খাচ্ছিল না। ছোট রাজকুমার এসে তাকে 'খাও' বলতে সে রাজকুমারের দিকে চেয়ে একটু ম্লান হেসে নীরবে আমটি খেলে।

দেখতে দেখতে মরণোন্মুখ লাবণ্যপ্রভা আবার সুস্থ সবল ও সজীব হয়ে উঠলো। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে তাকে ফিরে আসতে দেখে সবার মুখে আনন্দের হাসি ফুটলো। রাজপ্রাসাদের সবাই যেন এতদিনে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

লাবণ্যপ্রভা সম্পূর্ণ সেরে উঠে ঠিক আগের মতো আবার হাসিমুখে ফুল তুলে খেলা করবার জন্যে ছুটে বেড়াচ্ছে দেখে রাজা খুশীমনে একদিন চার রাজকুমারকেই কাছে ডেকে আদরে বললেন, তোমরা চার জনেই আশ্চর্য ও বহুমূল্য জিনিস সংগ্রহ করে এনেছ, যার সাহায্যে লাবণ্য মৃত্যুর মুখ থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে। কিন্তু, আমার বিবেচনায় ছোট রাজকুমারের সঙ্গে তার বিবাহ হওয়া উচিত। কারণ, তার ঐ আমটি না থাকলে লাবণ্য বাঁচতো না।

বড় রাজকুমার সবিনয়ে বললেন, বুঝলুম। কিন্তু আমার 'পুষ্পক রথ' না থাকলে, আমি কি ঠিক সময়ে এসে পৌঁছাতো? মেজ রাজকুমার বললেন, আমার 'মায়াদর্পণ' না থাকলে লাবণ্যের অসুখের খবরই তো কেউ জানতে পারতো না! সেজ রাজকুমার বললেন, আমরা তো সব কপর্দকশূন্য হয়ে পড়েছিলুম। আমার কাছে 'মা-লক্ষ্মীর অক্ষয় ঝাঁপি' না থাকলে, সবাইকে তো আজও টাকার দায়ে সরাইখানাওয়ালার হাতে বন্দী হয়ে থাকতে হ'ত।

রাজা তখন ধীর ভাবে ছেলেদের বুঝিয়ে বললেন, মেজকুমারের 'মায়াদর্পণে' লাবণ্যের আসন্ন মৃত্যুর খবর পেয়েছো তোমরা একথা ঠিক, বড়কুমারের 'পুষ্পক রথ' না থাকলে এত শীঘ্র কেউ রাজ-প্রাসাদে এসে পৌঁছতে পারতে না, একথাও ঠিক, আর সেজকুমারের 'লক্ষ্মীর ঝাঁপি' না থাকলে সরাই-খানার মালিক তোমাদের আটকে রাখতো, একথাও ঠিক, কিন্তু একবার ভাল করে ভেবে দেখ—ছোট-কুমার 'অমৃত ফল' নিয়ে তোমাদের সঙ্গে না এলে, শুধু তোমরা এসে কি লাবণ্যকে প্রাণে বাঁচাতে পারতে? আর একটা কথা—বড়র 'পুষ্পক রথ' বজায় আছে, মেজর 'মায়াদর্পণ' অক্ষত আছে, সেজর 'লক্ষ্মীর ঝাঁপি' অক্ষয় হয়েই রয়েছে কিন্তু ছোট রাজকুমারের 'অমৃত ফল' তো সে রাখেনি একটুও, সব দিয়েছে লাবণ্যকে খাইয়ে। সুতরাং ছোট রাজকুমারই লাবণ্যকে বিবাহ করবার অধিকারী। কারণ প্রকৃতপক্ষে ছোটোই লাবণ্যের প্রাণদান করেছে।

তখন তিন ভাই হাসিমুখে এগিয়ে এসে ছোট ভাইয়ের হাতেই লাবণ্যকে সঁপে দিলে।



ভিনসেন্ট ভ্যানগগ আর পল গগ্যাঁ

—শ্রীপ্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ থেকে একশ বছরেরও আগেকার কথা। ভিনসেণ্ট ভ্যানগগ ভূমিষ্ঠ হলেন হল্যাণ্ডে—১৮৩৫ সনে।

ছেলে বটে একখানা! পাগলাটে ভাব, কোন কিছুর ধার ধারে না। এইটুকু জীবনে সে কী করেনি বল? দোকানে চাকরি নিল মাল বিক্রির কাজে, চলল কিছুদিন এইভাবে। তারপরই দেখা গেল সে দস্তুরমত গুরুগম্ভীর চালে স্কুলমাস্টার হয়ে বেত হাতে করে ছেলে পড়াচ্ছে। শেষে তাও গেল। এরপর?—এবার হয়ে গেল মিশনারী। আলখাল্লা পরে' বাইবেল হাতে নিয়ে খ্রীস্টধর্ম প্রচার করে বেড়ায়। মোট কথা, কোন কিছুরই স্থিরতা নেই, যাকে বলে "জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ" কিছুই আর করতে বাকি নেই। শেষে হঠাৎ একবার খেয়াল হল—এসব নয়, তাকে চিত্রশিল্পী হতে হবে। মাথায় কিছু একটা ঢুকলে তো আর রক্ষে নেই! অমনি শুরু হয়ে গেল মন দিয়ে শিল্পসাধনা।

বয়স তখন তার সাতাশ বছর।

রং নিয়ে ভ্যানগগ শুরু করলেন এক নতুন ধরনের খেলা। তাঁর খামখেয়ালী বাঁধনছাড়া মনের তীব্র অনুভূতি ফুটিয়ে তুলতে লাগলেন রংয়ের রেখায় রেখায়।

হল্যাণ্ডে তখন নতুন ভাবের বন্যা এসেছে—নব্য শিল্পীদের দল দাপট। আন্টন মভ, জেমস্ মরিস, জোসেফ্ ইজ্রায়েল প্রভৃতি শিল্পীরা চারদিকে চালে আসর জাঁকিয়ে জমিয়ে বসেছেন। এই নব্যতন্ত্রীরা যে সব ছবি আঁকতেন তাতে থাকত কাউবার্টের বাস্তবতার ভেতর কোরট আর মিলেটের কল্পনাবিলাসের আধিক্য অনুমেয়। ভ্যানগগের ছবিতে তখন মিলেটের আকার অনুকরণে কতকটা ছাপ এসে পড়েছে। স্নিগ্ধ রংয়ের মোলায়েম সমাবেশের ভেতর দিয়ে বাস্তবতার আত্মপ্রকাশ যেন পরিস্ফুট। ঠিক এমনি সময়ে নতুন যুগের বার্তা নিয়ে এলেন থিয়োডোর।

থিয়োডোর ভ্যানগগের ভাই। তিনি প্যারীর গৌপিল গ্যালারীতে চাকরি করেন। নিত্য নতুনের মেলাই বল, আর শিল্প সাহিত্যের কথাই বল, এর রঙ্গভূমি এই প্যারী নগরী। এঁরই কাছে ভ্যানগগ প্রথম শুনলেন—"ইম্প্রেসোনিজিম্"এর কথা। চোখে যা দেখি সেইটেই তার আসল রূপ নয়, তার বাস্তব রূপ আর ভঙ্গি শিল্পীর মনে যে ভাবের ইঙ্গিত করে সেইটেই তার সত্যিকারের স্বরূপ—এইটেই থিয়োডোর ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন ভ্যানগগকে। ফ্রান্সের চিত্রকলাজগতে বিচিত্র বিপ্লবের কথা শুনে ভ্যানগগের চিরচঞ্চল অশান্ত মন উন্মত্ত হয়ে উঠল। চলে এলেন তিনি ভাইয়ের সঙ্গে প্যারী নগরীতে।

প্যারীতে এসে ভ্যানগগ, ক্যামেলী পিসারো আর সিউরেটের দলবলের সঙ্গে জুড়ে গেলেন। এই সময়ে ফ্রান্সে পিসারো আর সিউরেট ছিলেন শিল্পীদের মধ্যমণি। দেশশুদ্ধ লোক তাঁদের শ্রদ্ধা করত, বিশেষতঃ সিউরেটের তো কথাই নেই। এঁদের কাছেই নতুন করে হাতেখড়ি হল ভ্যানগগের। এই সময়কার ভ্যানগগের আঁকা যত ছবি সবগুলোই প্রায় বিশ্ববিখ্যাত হয়ে আছে আজ।

যাই হোক, সিউরেটের প্রভাব ভ্যানগগের ছবিতে কিছুটা এসে পড়লেও তার একটা নিজস্ব ধারাও গড়ে উঠল। অতি তীব্র রংয়ের সমাবেশ, তার মধ্যে নেই কোনরকম মিশ্রিত রংয়ের বালাই, অথচ আছে একটা চাঞ্চল্যের জীবন্ত প্রদীপ্তি। শিল্পীর মনের জোরের প্রত্যক্ষ ছাপ! তারই ফলে সৃষ্টি হল বিশ্ববিখ্যাত ছবি "সানফ্লাওয়ার" প্রভৃতি আরও অনেক ছবি। আজকের এই সব বিশ্ববিখ্যাত ছবির সেদিন কিন্তু কোন দামই ছিল না। ছবি আঁকেন ভ্যানগগ, বড় আশা করে প্রদর্শনীতে দেন সেগুলো—কিন্তু ভাগ্যদোষে কদর হয় না ছবিগুলোর। ব্যর্থতার অভিশাপে ভেঙে পড়ে শিল্পীর মন। সে এক দিন বটে!

● ভিনসেন্ট ভ্যানগগ আর পল গগ্যাঁ

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ঠিক এমনি সময়ে আর একটি লোক দলে এসে জুটলেন উল্কার মত। নাম তাঁর পল গগ্যাঁ। ইনিও আর একটি উৎকট খেয়ালী মানুষ! দু'জনার মধ্যে ভারি ভাবও হয়ে গেল দেখতে দেখতে। ইনিও পিসারোর ছাত্র। প্রতি রবিবারে পিসারো গগ্যাঁকে নিয়ে দৃশ্য আঁকতে বেরুতেন। কিন্তু কিছুদিন পরে গগ্যাঁ ছবি আঁকার পদ্ধতি নিয়ে সকলের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে বেড়াতে লাগলেন। নতুন মত প্রচার করলেন গগ্যাঁ, বললেন, সহজ জিনিসকে অনর্থক এরা জটিল করে রংয়ের চাতুরী ফলিয়ে। আদিম ভাবই হবে ছবির প্রাণবস্তু। রংও হবে এমন, যা ছিল আদিম মানুষের পরিচিত একান্ত আপনার বস্তুটি। বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন গগ্যাঁ অতি আধুনিক চিন্তাবাদের বিরুদ্ধে। (Neo-Impressionism) সহজ আর সরল হওয়া কী যায় না? যায় না লোকদেখানো সভ্যতার বাঁধাধরা আইনকানুনের গণ্ডি ডিঙিয়ে মুক্ত মানুষ হয়ে যেতে? যেখানে থাকবে না সামাজিক আইন, সভ্যতার বন্ধন, ভদ্রতার মুখোশ! এসো, রং ও রেখায় ফুটিয়ে তুলি—প্রাণ যা চায় তাই।

এ কথা একমাত্র গগ্যাঁর মুখেই সাজে। চোদ্দ বছরের ছেলে তখন গগ্যাঁ। ঘর পালিয়ে নিরুদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছে সাগরের বুকে একটা জাহাজ ধরে। ঘুরে বেড়াচ্ছে গোটা পৃথিবীটা, দেখে বেড়াচ্ছে বিচিত্র মানুষ, সঞ্চয় হচ্ছে অভিনব অভিজ্ঞতা। মিশেছে তাহেতি দ্বীপের আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে প্রাণ খুলে। দেশে ফিরে এসে আবার ঢুকে গেলেন শেয়ার মার্কেটে, করলেন কিছুকাল দালালি। বেপরোয়া বলতে একনম্বরের বেপরোয়া মানুষটি। এহেন গগ্যাঁ এসে জুটলেন ভ্যানগগের সঙ্গে। এ যেন হ'ল মণিকাঞ্চনের সংযোগ!

গগ্যাঁ নিজের খেয়ালমত নতুন ধরনের ছবি আঁকতে শুরু করলেন। অনেকখানি জায়গা জুড়ে এক-একটা রংয়ের প্রলেপ, তাতে ফুটে উঠল কত সহজে ছবির বিষয়বস্তুকে রূপ দেওয়া যায় তারই একটা প্রচেষ্টা। ফ্রান্সের ললিতকলার ইতিহাসে যে ম্যানেট নব্যতন্ত্রের আমদানি করেছিলেন রংয়ের মাধুর্য আর ভাবের সীমাহীনতার সংস্পর্শে, তাঁর বিরুদ্ধে যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন গগ্যাঁ। মোটা মোটা রেখার বন্ধনী দিয়ে আঁকা সে সব ছবিতে ফুটে উঠল অসংস্কৃত মনের অদ্ভুত খামখেয়ালীর আবেশ, যেন তার সর্বাঙ্গে বুনো গন্ধ মিশিয়ে আছে। এ ছবি কার ভাল লাগবে আর কার ভাল লাগবে না—সে পরোয়া নেই গগ্যাঁর।

ভ্যানগগ আর গগ্যাঁর মতবাদ বিভিন্ন—এ নিয়ে দু'জনার মধ্যে বিলক্ষণ তর্ক বেধে যায়, তবুও দু'জন দু'জনকে দু'দণ্ড ছেড়ে থাকতে পারে না। যে চোখ রাগে

রাঙা হয়ে ওঠে ক্ষণিকের জন্যে, সেই চোখ দু'টিই আবার প্রীতির স্পর্শে জলভরা হয়ে ওঠে পরস্পরের সহানুভূতিতে।

ভ্যানগগের অতিকষ্টে দিন চলে। সব সময় ছবি বিক্রি হয় না। আবার কালেভদ্রে যদি বা বিক্রি হয়, দু'এক পাউণ্ডের বেশী দাম দেয় না কেউ। গগ্যারও তথৈবচ। তবুও ভ্যানগগের ভাই থিয়োডোর প্রতিমাসে যথাসাধ্য সাহায্য করেন এই যা রক্ষে। এর ওপর থেকে থেকে ভ্যানগগের মাথারও গোলমাল দেখা দেয়—দুর্ভাগ্য তো আর একা আসে না?

ওদিকে গগ্যা বিয়ে করে সংসার পেতেছেন। যার মতিস্থির নেই, তার আবার সংসার করা। খেয়াল হ'ল, সংসার ফেলে গগ্যা আবার সমুদ্র পাড়ি দিয়ে, কোন এক দ্বীপে গিয়ে বুনোদের মধ্যে কাটিয়ে এলেন কিছুকাল। প্যারীতে ফিরে এসেই ভ্যানগগকে ধরে বসলেন—যেতে হবে আর্লেসে। রৌদ্র-ঝলমল আর্লেস। শীত কম, ভারি আরামের জায়গা। সেখানে গিয়ে ছবি আঁকবেন দু'জনে—প্রাণের বাসনা। প্রথম বারের মাথা খারাপের পর তখন একটু সুস্থ অবস্থা—রাজী হয়ে গেলেন ভ্যানগগ।

আর্লেসে এসে মনের আনন্দে দু'জনে ছবি এঁকে বেড়ান, আলাপও হয়েছে দু'চারজনের সঙ্গে। এই পরিচিতদের মধ্যে একটি মেয়েও ছিলেন। তখন সেটা শীতকাল। সামনেই বড়দিন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে ভ্যানগগ মেয়েটিকে দুঃখ করে বলছিলেন, "আমার তো আর পয়সা নেই যে বড়দিনের সময় তোমাকে কিছু উপহার দিই···" বড় দুঃখের সঙ্গেই বললেন ভ্যানগগ। মেয়েটি ভারি রসিকা। ঠাট্টা করে ভ্যানগগকে বললেন, "কেন? পয়সা নাই বা থাকলো, তোমার এত বড় বড় দুটো কান, একটা না হয় উপহারই দিলে বড়দিনের সময় আমাকে···।"

এ একটা কথার কথা মাত্র; কিন্তু ভ্যানগগ ভুললেন না সে কথা। বড়দিন এসে গেল। একদিন মেয়েটির কাছে একটা প্যাকেট এসে হাজির। মেয়েটি প্যাকেট খুলে দেখে তার মধ্যে সদ্য-রক্তমাখা একটা মানুষের কাটা কান। কান দেখে তো তার চক্ষু চড়কগাছ,—শিউরে উঠল ভয়ে তার সর্বাঙ্গ। বুঝতে বাকি রইল না এ কার কাজ।

ওদিকে ভ্যানগগ নিজের হাতে ক্ষুর দিয়ে নিজের কানটি কেটে মেয়েটির বাড়িতে রেখে এসে নিজেই ব্যাণ্ডেজ বেঁধেছে কাটা-কানে। তারপর বসে গেছে রং তুলি নিয়ে নিজের ছবি আঁকতে আয়নায় দেখে দেখে।

● ভিনসেন্ট ভ্যানগগ আর পল গগ্যাঁ
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যাপার দেখে গগ্যার মত অসংসারী লোকও ভড়কে গেল। সাত তাড়াতাড়ি থিয়োডোরকে চিঠি লিখে দিলেন প্যারীতে। খবর পেয়ে থিয়োডোর নিয়ে গেলেন ভ্যানগগকে প্যারীতে,—ভর্তি করে দেওয়া হল হাসপাতালে। নিজের যে ছবিটি কানকাটা অবস্থায় ভ্যানগগ আঁকলেন তার নাম দিলেন "L Romme a´ Loreille" অর্থাৎ "কানকাটা মানুষ"। পৃথিবীতে যত বিখ্যাত আর



কাটা কান দেখে তো মেয়েটির চক্ষু চড়কগাছ! [পৃষ্ঠা: ১৯৯



কানকাটা ব্যাণ্ডেজ বাধা অবস্থায় ভ্যানগগ!

বহুমূল্য ছবি আছে তার মধ্যে আজ এটিও একটি।

আবার ভ্যানগগের মাথার গোলমাল দেখা দিল। যেদিন একটু ভাল থাকতেন সেদিন বসতেন ছবি আঁকতে। এমনি অবস্থা যখন, সেই সময় একদিন তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠল নিজের

● ভিনসেণ্ট্ ভ্যানগগ আর পল গগ্যা
শ্রীপ্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনের ছবিগুলো,—মনে হ'ল, এক সমাজ-পরিত্যক্ত উন্মাদ।—জীবন দুঃখ আর দৈন্যের কশাঘাতে ব্যর্থ। চোখের সামনে ভবিষ্যতের ছবিও ফুটে উঠেছে—সেখানে আনন্দ নেই, নেই কোন ভরসা,—নিভে গেছে আশাকুহকিনীর মায়াময়ী আলোক দীপ্তি। সহ্য হল না আর ভ্যানগগের এই মহাবিরক্তি তার উৎকট উপহাস। আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে তুলে নিলেন পিস্তল—শেষ করে দিলেন নিজের জীবনস্পন্দন নিজ হাতে। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই ফ্রান্স হারিয়ে ফেলল তার রত্নভাণ্ডারের মহারত্নটি।



আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে তুলে নিলেন পিস্তল।

ভ্যানগগের মৃত্যুর দশ বছর পরে, তার আঁকা ছবিগুলো প্রদর্শনীতে দেওয়ার পর সুধী-সমাজ স্বীকার করে নিলেন শিল্প-নৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠতা। ঘুমন্ত জাতটার যেন হঠাৎ ঘুম ভাঙল। মুখে মুখে ভ্যানগগের নাম ছড়িয়ে পড়ল দেশবিদেশে—তারপর সমগ্র পৃথিবীতে। এই তো সেদিন ভ্যানগগ প্যারীর মন্টমাত্রের ফুটপাতে ছবি সাজিয়ে বিক্রির আশায় দিনের পর দিন রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে দাঁড়িয়ে থাকতেন! বড় আশা,—কেউ যদি দয়া করে একখানা ছবি কিনে ধন্য করে দেয়। কেউ তো ফিরেও চায়নি সেদিন।

ভ্যানগগের ছন্নছাড়া জীবনের শেষ অধ্যায়ে তাঁর প্রিয় বন্ধু গগ্যাঁর কথা না বললে কিছু বাকি থেকে যায়। ভ্যানগগের এইরকম শোচনীয় মৃত্যুতে গগ্যাঁ একেবারে ভেঙে পড়লেন। প্যারী আর ভাল লাগে না তাঁর। আবার স্ত্রীপুত্র ফেলে চলে গেলেন তাহেতি দ্বীপে। বন্ধুদের চিঠি লিখলেন—"তোমাদের সভ্য জগৎ থেকে

পালিয়ে এসে খুব ভাল আছি। অত বাঁধাধরা সভ্য সমাজ—যার কোনটাই সত্য নয়—আমার আদৌ পোষাবে না।" কিন্তু কিছুদিন পরে গগ্যাঁ আবার প্যারীতে এসে হাজির, হাতের পয়সা বোধহয় ফুরিয়েছে। প্যারীর ডুরাণ্ড রুয়ে গ্যালারিতে প্রদর্শিত হল গগ্যাঁর আঁকা ছবি, কিন্তু বিক্রির দিক দিয়ে কিছুই তেমন সুবিধে হল না। শেষে বীতশ্রদ্ধ হয়ে জীবনের মত ইউরোপ ত্যাগ করে তিনি প্রশান্ত মহাসাগরের কোন এক দ্বীপে যাত্রা করলেন। সেখানেই দারিদ্র্যে আর রোগে ভুগে তাঁর জীবন-প্রদীপ নিভে গেল আস্তে আস্তে। সভ্য সমাজ সে খবর রাখেনি সেদিন। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম কে কবে বুঝেছে ?

আজ ভ্যানগগ আর গগ্যাঁ নেই—কিন্তু তাঁদের আঁকা ছবিগুলো অমর হয়ে রয়ে গিয়েছে। সে সব ছবির দাম এখন লক্ষ লক্ষ টাকা। এমন সব প্রতিষ্ঠান আর ধনকুবের আছেন যাঁরা অমূল্য রত্নভাণ্ডারের বিনিময়ে এঁদের একখানা ছবি পেলে নিজেকে ধন্য মনে করেন আজ।

সোনালী কথা

মৌগ্‌লী (জাংগ্‌ল্ টেলস্)—রাডিয়ার্ড কিপলিঙ্

বাঘের রাজা, শের খাঁ মানুষের এক বাচ্চাকে শিশু অবস্থায় সাবাড় করে ফেলতে চেয়েছিল কিন্তু আগুনের ভয়ে শিশুকে ফেলে সে পালায়। অসহায় মানুষের শিশুকে শের খাঁর মুখ থেকে উদ্ধার করে, নেকড়েদের মধ্যে যে ছিল দলপতি, সেই রক্ষক নেকড়ে। নেকড়ে গৃহিণী নিজের বাচ্চাদের সঙ্গে সেই মানুষের বাচ্চাকেও মানুষ করে। নেকড়ে মার দুধ খেয়ে সেই মানুষের বাচ্চা নেকড়েদের মধ্যেই থেকে যায়। নেকড়ে মার মানুষ করা এই মানুষের বাচ্চার নাম মৌগ্‌লী। ইংলণ্ডের নোবেল-লরিয়েট কিপলিঙ্ এই অদ্ভুত চরিত্রটির স্রষ্টা। মৌগ্‌লীকে কেন্দ্র করে কিপলিঙ্ অনেকগুলি ছোট গল্প লিখেছেন, যে জাতের ছোট গল্পের আর জোড়া নেই। কিপলিঙের গল্পগুলির সাধারণ নাম হচ্ছে, Jungle stories—জঙ্গলের গল্প। এই জঙ্গলের গল্পের নায়ক হচ্ছে, বাঘ, সিংহী, নেকড়ে, শেয়াল, বাঁদর ইত্যাদি অরণ্যবাসী সব জন্তু। আর তাদের মাঝখানে এক মানুষের বাচ্চা মৌগলী, নিজেকে জঙ্গলেরই একজন মনে করে এবং পালক নেকড়ে মা-বাপকে নিজের মা-বাপের মতই দেখে। এই সব অপরূপ জঙ্গলের কাহিনীর ভেতর কিপলিঙ্ অরণ্যবাসী জন্তুদের প্রতিদিনের জীবনের ভেতর থেকে যে অপূর্ব রস-সৃষ্টি করেছেন, জগতের সাহিত্যে তা অতুলনীয়। অরণ্যবাসী জন্তুদের কাছে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ শত্রু, সেই মানুষের বাচ্চা তাদের ভেতরে থেকে অরণ্যের নিত্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার জীবনে নিয়ে এলো নতুন নাটকীয়তা।



সাধুসঙ্গ

—শ্রীনবগোপাল সিংহ

ভক্ত তুলসীদাস,
রাম গুণ গানে রাম রূপ ধ্যানে
আনন্দে করে বাস।

একদা গভীর রাতে
ভক্ত তুলসী গান গেয়ে ফিরে
কভু বনপথে কভু নদীতীরে
খঞ্জনি ল'য়ে হাতে,

দেব দেউল

সহসা বিজনে দেখা হ'য়ে গেলো
ডাকাত দলের সাথে।



ডাকাতেরা ভাবে, এ কোনো গুপ্ত-চর
এসেছে এ নির্জনে,
জেনে যেতে চায় আস্তানা কোথা
কোথায় বা বাড়ি ঘর
আমাদের এই বনে।
ডাকাতেরা মনে ভাবে
এ দুশমনেরে জিজ্ঞাসা করা যাবে—
আমাদের সাথে রহিবে সে·কিনা
ছাড়িয়া যাবেনা অনুমতি বিনা,
এ দলে মিলিতে যদি সে না চায়
তবে,
হত্যা করিতে হবে।

উদাসীন হলো রাজী,
কহিল রহিব তোমাদেরি সাথে
করিব যে কোনো কাজই।
চলিব নিয়ম মেনে
সেথায় যাইব যেথায় আমারে
লইয়া যাইবে টেনে।

● সাধুসঙ্গ
শ্রীনবগোপাল সিংহ

ডাকাতেরা দেখে লোক তো মন্দ নয়।
সহজেই রাজী হয়।
তস্কর সনে ভক্ত তুলসীদাস
পথ চলে খুশী হ'য়ে,
অন্তরে রঘুনাথের চিন্তা লয়ে।

নগরের এক ধনীর প্রাসাদে আসি
ডাকাতেরা গেলো অন্তঃপুরে—
নতুন সাথীরে দিয়ে গেলো এক বাঁশি।
কহিল তাহারে, তুমি তো জানো না
ডাকাতির কৌশল!
ক্রমশঃ তোমারে শিখাইব সে সকল।
আপাততঃ তুমি রহ বাহিরেতে
দৃষ্টি রাখিও চতুর্দিকেতে
যদি বোঝো কেহ দেখিছে মোদের কাজ
তখুনি ক'রো আওয়াজ।

তুলসী কহেন হাসি
কেহ তোমাদের দেখিছে দেখিলে
তখুনি বাজাবো বাঁশি।
ডাকাতেরা নির্ভয়ে
প্রাসাদের মাঝে প্রবেশ করিল
সম্পদ সংগ্রহে।

সহসা বংশীধ্বনি।
তস্কর সবে বাহিরে আসিল বিষম বিপদ গনি।
ভক্ত তুলসীদাসে
ডাকাতেরা আসি ত্রস্ত কণ্ঠে সাগ্রহে জিজ্ঞাসে,
কেহ কি মোদেরে দেখিয়া ফেলেচে?



কোথায় সে কোন্ জন?
নতুবা এ বাঁশি বাজাইলে কি কারণ?
ঊর্ধ্বে তুলিয়া হাত
কহে নবাগত, আমি দেখিতেছি
তোমাদের 'পরে তাঁহারি দৃষ্টিপাত।
বিশ্বস্রষ্টা, সর্বদ্রষ্টা যিনি
আমি তো তাঁহারে চিনি!
তাই তোমাদেরে ক'রে দিনু সাবধান
তোমাদের চুরি দেখিছেন ভগবান।

ডাকাতেরা স্তম্ভিত
এ কাহারে তারা ধরিয়া এনেচে,
সকলেই চিন্তিত।
অস্ত্র ত্যজিয়া নতজানু হ'য়ে সবে
জোড় করে কহে, মোদেরে ক্ষমিতে হবে।
বল তুমি কোন্ জন?
আমরা করিনু তোমার চরণে আত্মসমর্পণ।

সন্ত তুলসীদাস—
রত্নাকরেরই মত অবিরাম
জপিতে কহিল শুধু রাম নাম,
পুরাইল অভিলাষ।

সাধুসঙ্গের এই তো মহিমা
বিস্ময়কর জাদু,—
মুহূর্তেকের একটি কথায় তস্কর হলো সাধু।

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম
দেবহিতং যদায়ুঃ।

—অথর্ববেদ

মণি ও মুক্তা

হে দেবতা, আমরা যেন কান দিয়ে যা মঙ্গল তাই শুনি; এই চোখ দিয়ে যা সুন্দর তাই যেন দেখি; সবল ও সুস্থ দেহে তোমাদের জয়গান ক'রে এই জীবন যেন দেবকর্মে নিয়োজিত করতে পারি।



বোকা

—নীহাররঞ্জন গুপ্ত

॥ ১ ॥

বয়স পনেরর থেকে ষোলই হবে।

রোগা ডিগ্‌ডিগে। পরনে একটা ময়লা ছিটের হাফ্‌ প্যান্ট, গায়ে একটা ছেঁড়া ফুলহাতা শার্ট।

শার্টের ঝুলটা প্রায় প্যান্ট পর্যন্ত ঢেকে দিয়েছে।

খালি পা।

মুখটা গোল। নাকটা ভোঁতা। দুই চোখের পিঙ্গল তারার দৃষ্টিতেও একটা বোকা বোকা ভাব।

এক মাথা ঝাঁকড়া চুল ঈষৎ কটা। গায়ের রঙটা বেশ ফর্সাই, ধুলোবালিতে ও অযত্নেও সেটার সবটা ঢাকা পড়েনি।

কথা বড় একটা বলে না তবে কারণে-অকারণে হাসে।

সব কিছু মিলিয়ে একটা বোকাটে ভাব।

নাম হয়ত একটা ছিল কিন্তু লোকে সেটা ভুলে গিয়েছে সবাই ওকে খোকা বলেই।

খোকা।

স্থানীয় স্টেশনটার আশেপাশে বা স্টেশনের দক্ষিণ দিক দিয়ে যে রেস্তোরা ও নানা ধরনের দোকানপাট সেইখানেই দেখা যায় সময় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

কখনো কখনো স্টেশনে ও প্লাটফরমেও দেখতে পাওয়া যায়।

স্টেশনের ধারে যে হোটেলটা—গোবর্ধন ও ভাইয়ের হোটেল, সেখানেই ... খেতে দেবার জন্য গোবর্ধন দু বেলা দু মুঠো খেতে দেয় ওকে

সেও হোটেলের ফরমাস-পড়াতি খাটে। কিন্তু তাতেই খুশি

দিনমানে রাস্তায়-রাস্তায় বা স্টেশনে প্লাটফরমে ঘোরে, রাতে স্টেশনের ... বেঞ্চির উপরে একপাশে শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দেয়।

মাঝে মধ্যে দেখা যায় ছোট একটা বাঁশের বাঁশি নিয়ে ... আপন মনে বাজিয়ে চলেছে।

স্টেশনের আশেপাশে যে সব রেলওয়ে কোয়ার্টার্স, তারা মধ্যরাত্রে মধ্যে মধ্যে হঠাৎ কখনো ঘুম ভেঙে গেলে শুনতে পায় একটা বাঁশির সুর

অদ্ভুত সুর।

যেন কাঁদছে কেউ নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে কোথায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে

কোথা থেকে কবে যে এলো ছেলেটা কেউ হয়ত জানে না। অবশ্য মাথাও কেউ কখনো ঘামায়নি সে জন্য।

যেখান থেকেই আসুক না কেন, এসেছে। তাতে মাথা ঘামাবারই বা কি আছে

কত বেওয়ারিশই তো ছন্নছাড়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, তার জন্য কারই বা মাথাব্যথা।

রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে, তারপর একদিন হয়ত রাস্তাতেই মরে পড়ে থাকে।

পথ চলতি লোকের দৃষ্টি পড়লে বলে, সেই ভিখিরীটা না?

হুঁ। তাই তো!

কেউ কখনো বলে না, আহা মরে গেল!

ওদের বেঁচে থাকার জন্যও যেমন কারো কোন বিস্ময় নেই তেমনি মৃত্যুতেও ওদের কারো কোন বিস্ময় নেই।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অত্যন্ত একটা স্বাভাবিক ঘটনা।

● খোকা
নীহাররঞ্জন গুপ্ত

বোকার সম্পর্কেও তাই বুঝি কারো কোন কৌতূহলই ছিল না। অনেকে ওর বোকা নাম জানলেও অনেকেই কিন্তু আবার জানত না।

স্টেশনটা কলকাতা থেকে খুব বেশী দূরে না হলেও বড় স্টেশন। সব মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনই ওখানে ধরে। সে দিক দিয়ে স্টেশনটার একটা গুরুত্ব ছিল।

সর্বদাই যাত্রীর ভিড়।

স্টেশন অফিস ও টিকিটঘরের বাবুদের এটা ওটা ফুট-ফরমাশ খাটতো বলে বোকার স্টেশনে টিকিটঘরে মায় স্টেশন মাস্টারের ঘরেও একটা অবাধ গতিবিধি ছিল।

কিন্তু হঠাৎ একদিন পুরাতন স্টেশন মাস্টার রসময় বাবুর বদলী এলো এক মাঝবয়েসী অ্যাংলো স্টেশন মাস্টার।

ডেভিড সাহেব।

লম্বা—অত্যন্ত ঢ্যাঙা—রুক্ষ কর্কশ চেহারা।

কুচকুচে কালো রং।

ঘন নিগ্রোদের মত মাথার চুল। নিখুঁতভাবে দাড়ি গোঁফ কামান।

মুখে ইংরেজী বুলি ছাড়া অন্য বুলি নেই।

ডিউটির ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন। নিয়ম ও আইনকানুনের ব্যাপারে অত্যন্ত কড়া।

সবক্ষণই টিপ্ টপ্ ড্রেস।

দু'দিনেই কর্মচারীদের হাজারো রকমের খুঁত ধরে ধরে তাদের একেবারে নাজেহাল করে তোলে ডেভিড্ সাহেব।

রসময়ের আমলে যে গয়ংগচ্ছ ভাবটা ছিল সকলের দু'দিনেই সেটা লোপ পায়।

ডিউটি, ডিউটি আর ডিউটি।

শুধু কি কর্মচারীরাই—ঝাড়ুদাররা পর্যন্ত তটস্থ হয়ে ওঠে।

হঠাৎ ডেভিড্ সাহেবের নজরে সেদিন দুপুরের দিকে পড়ে গেল বোকা। মালবাবুর পান আর সিগারেট নিয়ে গুদামঘরে ঢুকছিল।

ডেভিড্ সাহেবের মুখোমুখি পড়তেই ডেভিড্ সাহেব খিঁচিয়ে ওঠে, হু আর ইউ!

চলতি দুচারটে ইংরেজী শব্দ লোকের মুখে মুখে শুনে বোকার রপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

সে তাড়াতাড়ি বলে, আই বোকা।

বোকা! ওয়াটস্ দ্যাট্!...

অতঃপর বোকা চুপ। কারণ তার ইংরেজী শব্দের স্টক্ তখন বুঝি খতম।

● বোকা
নীহাররঞ্জন গুপ্ত

ঐ সময় অ্যাসিসটেন্ট্ স্টেশন মাস্টার রঞ্জনবাবু ঐ পথ দিয়ে টিকিটঘরের দিকে যাচ্ছিলেন, তাকে দেখতে পেয়ে ডেভিড্ সাহেব এবারে প্রশ্নটা তাকেই করে, হু ইজ দিস বয় মিঃ বোস?

রঞ্জন বোস বলে, ও এই আশেপাশেই থাকে, কেউ নেই শুনেছি। সবাই বোকা বলে ডাকে।

বাট্ দিস্ বেগারস্—দে আর থিভস্।

বাবু—চোট্টা—

না, না—ছেলেটা সে রকম কিছু নয়। রাদার আন্ ইডিয়ট টাইপ—নাথিং টু বি ওরিড্—

নো। ডোণ্ট্ অ্যালাও দিস পিপল ইনসাইড দি স্টেশন এরিয়া। এই ছোকরা—গেট্ আউট্—

বোকাকে তখুনি তাড়িয়ে দেয় ডেভিড্ সাহেব।



ডেভিড্ সাহেব খিঁচিয়ে ওঠে—"হু আর ইউ!"

[পৃষ্ঠা ২১০

অতঃপর বোকাকে আর স্টেশন চত্বরে দেখা যায় না। চত্বরের বাইরেই সে ঘোরে।

অবিশ্যি দিনের বেলাতেই।

রাত্রির অন্ধকারে বোকা কিন্তু ওভারব্রিজটার উপরে চলে যায়। সেখানেই সে বরাবর সে ঘুমায়।

ডেভিড্ সাহেব ব্যাপারটা জানতে পারে না।

কিন্তু জানতে না পারলেও পর পর দুই রাত্রে প্রায় বারটা সাড়ে বারটা নাগাদ স্থানীয়

ইওরোপীয়ান ক্লাব থেকে আকণ্ঠ নেশা করে কোয়ার্টারে ফিরবার পথে ওভারব্রীজের তলা দিয়ে, কারণ কোয়ার্টারে যাওয়ার ঐটাই শর্টকাট, বোকার বাঁশি শুনে পরদিন বোসকে শুধাল, হ্যালো বোস, তোমাদের ঐ ওভারব্রিজে নিশ্চয়ই কোন ঘোস্ট্—প্রেতাত্মা আছে।

বোস বিস্ময়ে বলে, কে বললে তোমাকে?

ইয়েস আই হার্ড সামওয়ান প্লেয়িং ফ্লুট—অদ্ভুত বাজনা, প্রেতাত্মারা শুনেছি রাত্রে ওরকম বাজায়।

ব্যাপারটা বুঝতে রঞ্জনের দেরি হয় না।

কিন্তু কথাটা সে প্রকাশ করে না, শুনলেই হয়ত লোকটা বোকাকে ব্রীজের ঐ আস্তানা থেকেই তাড়িয়ে ছাড়বে।

বলে, তা হবে। শুনেছিলাম বটে ঐ ওভারব্রিজের উপর থেকে একটা লোক লাফিয়ে পড়ে সুইসাইড্ করেছিল।

যাক্ অবিশ্যি ভালই হলো! ডেভিড্ সাহেব অতঃপর ঐ শর্টকাট ছেড়ে অন্য পথ ধরে যাতায়াত করতে লাগলো।

বোকাও নিশ্চিন্ত রইলো।

॥ ২ ॥

ডেভিড্ সাহেব একা মানুষ। শোনা যায় আট দশ বছর আগে নাকি তার স্ত্রী মারা গিয়েছে তার পর আর বিয়ে-থা করেনি।

সঙ্গে আছে লোকটার জোন বলে এক ক্রিশ্চান সাঁওতাল প্রৌঢ়। সেই ডেভিড্ সাহেবের একাধারে বেয়ারা ও বাবুর্চি।

ডেভিড্ তার কাজকর্ম নিয়েই থাকে। সন্ধ্যার পরে একমাত্র স্টেশনের অনতিদূরে যে ইওরোপীয়ান ক্লাবটা আছে সেখানে প্রত্যহ একবার করে নেশা করতে যাওয়া ভিন্ন সে বড় একটা কোথায়ও যায়ই না।

ঐ জায়গাটার গোটা দুই জুট মিল থাকায় সেই মিলেরই ইওরোপীয়ান কর্মচারীদের চেষ্টায় ক্লাবটি গড়ে উঠেছিল এক সময়।

ডেভিড্ সাহেব ওখানে স্টেশন মাস্টার হয়ে আসার মাস দুই কেটে যাবার পর একদিন দ্বিপ্রহরে রঞ্জন বোস যখন তার স্টেশনের নিজস্ব অফিসঘরে বসে কাজকর্ম করছে এমন সময় মিহি

● বোকা
নীহাররঞ্জন গুপ্ত

সুরে নারীকণ্ঠে ইংরেজীতে প্রশ্ন শুনে বোস চোখ তুলতেই এক শ্বেতাঙ্গিনী মহিলার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল।

বাবু, এখানকার এস. এম. কি মিঃ ডেভিড্ জেমস!

হ্যাঁ—আপনি?

আমি! ভদ্রমহিলা যেন মুহূর্তকাল কি ভাবলেন তারপর বললেন, তার সঙ্গে আমি একবার দেখা করতে চাই। দেখা হতে পারে কি?

ভদ্রমহিলার বয়স বোধকরি পঁয়ত্রিশের বেশী হবে না। বেশ মোটা, কিন্তু [illegible] সারা দেহে একটা স্বাস্থ্যের জেলুস আছে।

হাতে একটা কালো এয়ার ট্রাভেলের ব্যাগ।

বোস বললে, বসুন, ক্লাবের পরে এখানে ডেভিড্ সাহেব এসেছিলেন, কোয়ার্টারে ফিরেছেন। তবে আপনি যদি তাঁর কোয়ার্টারে যেতে চান তো ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

কোয়ার্টারটা কোথায়?

উনি তো রেলওয়ে কোয়ার্টারে থাকেন না। সিংহাম রোডের বাঁদিকে একটা পুরানো চার্চ আছে, সেখানেই একটা বাড়ি নিয়ে থাকেন। তা সেখানে কি যাবেন?

হ্যাঁ—যদি কাইনড্লি একজন গাইড দেন?

বোস বোধহয় গাইডের জন্যই টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। ঠিক সেই সময় এক কাগজে মুড়িয়ে চারটি পান ও এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে বোকা এসে ঘরে ঢোকে।

এই বোকা, ওটা ঐ টেবিলে রেখে পানী পাঁড়েকে একবার ডেকে দে তো।

বোকা ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই ভদ্রমহিলা ওর দিকে তাকিয়ে ছিলেন এবং দৃষ্টি তাঁর আর সরে না।

একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন। এবং সে শুধু দৃষ্টিই নয় যেন গিলছেন তিনি চোখের দৃষ্টি দিয়ে বোকাকে। বোকাও চেয়ে ছিল আগন্তুক মহিলার চোখের দিকে।

তারপরই বোকা সহসা মাথা নীচু করে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। এবং সে ঘর থেকে বের হয়ে যেতেই শ্বেতাঙ্গিনী শুধালেন—হু, হু ইজ হি?—কে ও?

উত্তেজনায় গলার স্বর তখন তাঁর কাঁপছে।

একটু যেন বিস্মিত হয়েই বোস মহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, কার কথা বলছেন?

ঐ—ঐ যে এঘরে এসেছিল!

ও তো বোকা।

● বোকা
নীহাররঞ্জন গুপ্ত

খোকা! কোথায় বাড়ি ওর, কোথায় থাকে?

বাড়ি ঘর দোর যতদূর জানি কিছুই ওর নেই! এখানেই রাস্তায় রাস্তায় থাকে।

রাস্তায় রাস্তায় থাকে। বাট্—

বাইরে ঐ সময় জুতোর মচ্ মচ্ শব্দ পাওয়া গেল। ডেভিড্ সাহেবের জুতোর আওয়াজ। বোস চিনতে পারে। তাই বলে—ডেভিড্ সাহেব বোধহয় আসচেন—

সত্যিই তাই।

ডেভিড্ গোমেশই এসে ঘরে ঢুকলো, এবং ঢুকেই শ্বেতাঙ্গিনী মহিলাকে দেখে বলে ওঠে—মারথা, কতক্ষণ?

ডেভিড্। এই আসছি—

এসো, এসো—আমার অফিস ঘরে এসো। ডেভিড্ যেন একপ্রকার ভদ্রমহিলাকে টেনে নিয়ে গিয়ে তার অফিস ঘরে ঢুকলেন।

একটু পরেই খোকা এসে বলে পানী পাড়েকে কোথাও পাওয়া গেল না।

বোস খোকাকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দেয়—এই শিগ্গির যা—সাহেব এসে গিয়েছে।

খোকা চলে গেল।

পাশের ঘরটিই স্টেশন মাস্টারের ঘর।

বাইরে দিয়ে একটি দরজা থাকলেও বোসের অফিসঘর ও এস. এম.-এর অফিসঘরের মধ্যবর্তী একটা দরজা আছে, যদিচ সাধারণতঃ বন্ধই থাকে। বোস গিয়ে সেই মধ্যবর্তী দরজার বন্ধ কপাটের গায়ে কৌতূহলে কান পেতে দাঁড়াল। খোকাকে দেখে মেমসাহেবের চমকে ওঠা, তারপরই তার প্রশ্নগুলো এবং ডেভিড্ সাহেবের মেমসাহেব মারথাকে দেখে বিব্রত বোধ করা ইত্যাদি ব্যাপার-গুলোই রঞ্জন বোসকে কৌতূহলী করে তুলেছিল। বেশ উচ্চকণ্ঠেই পাশের ঘর থেকে কথাবার্তা শোনা যায়।

নো, নো—তুমি মিথ্যা কথা বলছো, তুমি মিথ্যুক! এখনো বলো ও কে। মারথার গলা।

তুমি বিশ্বাস করো মারথা! ও রাস্তার একটা ভিক্ষুক! স্রেফ তোমার চোখের ভুল। ডেভিড্ বলে।

ও কে—ওকে ডাকো।

তুমি কি ক্ষেপে গেলে? একটা রাস্তার ভিক্ষুক—এখন তোমার কাজ কারবার কেমন চলেছে বল?

● খোকা
নীহাররঞ্জন গুপ্ত

তবে সোনি মরেনি। তুমি আগাগোড়াই আমাকে ধাপ্পা দিয়েছো ডেভিড — মারথা আবার বলে ওঠে ডেভিডের পূর্বের প্রশ্নে কান না দিয়েই।

কি পাগলের মত এখনো বকছো বলত মারথা? সোনি [illegible] মধ্যে গিয়েছে।

বেশ। তুমি বোকাকে তাকে ডাকো, আমি ওর সঙ্গে কথা বলবো।

না। অসম্ভব—ডেভিডের গলার স্বর তীক্ষ্ণ ও কঠোর।

॥ ৩ ॥

রঞ্জন বোস অবাক হয়ে যায়। ব্যাপারটা কেমন রহস্যঘন মনে হয়, কান পেতেই থাকে রঞ্জন বোস। ওদিকে পাশের ঘরে ডেভিড্ সাহেবের তীক্ষ্ণ ও কঠোর কণ্ঠস্বরে মারথা এতটুকুও যে বিচলিত হয়নি বোঝা যায়। কারণ সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় মারথার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, তোমার ঐ গলা শুনে ভয় পাবো আমি তুমি যদি ভেবে থাকো ডেভিড্ তো ভুল করেছো। হ্যাঁ, এখুনি গিয়ে থানায় সব কথা জানাবো।

জোঁকের মুখে যেন নুন পড়ল! ডেভিড্ সাহেবের গলার স্বরটা সঙ্গে সঙ্গে খাদে নেমে এলো—সে তুমি ইচ্ছা করলে রিপোর্ট করতে পারো কিন্তু জেনো তাতে করে তুমিও মুক্তি পাবে না। তাছাড়া আরো একটা কথা ভেবে দেখো, [illegible] চার বছর আগে সোনির মৃত্যু হয়েছে, তুমি নিজেও সেই ডেড্ বডি যে সনাক্ত করে এসেছিলে পুলিসের খাতায় তার প্রমাণও আছে। আজ আবার যদি গিয়ে তুমি উল্টো বল তো তোমাকেও তারা চার্জ করবে।

ডেভিডের শেষের কথায় এবারে যেন মনে হলো মারথা হঠাৎ চুপ করে গেল। আর তার গলা শোনা গেল না।

তারপর দুজনাই কিছুক্ষণ চুপচাপ।

এবং আরো কিছুক্ষণ পরে ডেভিড্ আর মারথা দুজনেই ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

রঞ্জন বোসের মনে কেমন একটা যেন সন্দেহ জাগে। স্টেশনের পানী পাড়েকে ডেকে বোকাকে খুঁজে আনবার জন্য বলে।

কিন্তু ঘণ্টাখানেক বাদে পানী পাড়ে এসে বলে, বোকাকে কোথাও সে পেল না।

● বোকা
নীহাররঞ্জন গুপ্ত

এদিকে ঘণ্টাখানেক আগে সেই যে মারথাকে নিয়ে ডেভিড্ সাহেব স্টেশন থেকে চলে গিয়েছিল তারও আর দেখা নেই।

এবং বিকেল চারটে পর্যন্তও ডেভিড্ সাহেব ফিরল না।

তারপর রঞ্জন নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, দ্বিপ্রহরের ব্যাপারটাও তেমন আর মনে ছিল না। সন্ধ্যা নাগাদ ফিরে এলো স্টেশনে ডেভিড্ সাহেব একা।

সন্ধ্যা সাতটার পর ছুটি অফ্ রঞ্জনের। সে বাড়ি অর্থাৎ কোয়ার্টারে ফিরছিল। লাইনের ধার দিয়ে যে সরু পায়ে চলার পথটা, সেই পথ ধরেই আসছিল রঞ্জন। রাস্তার ধারে একটা বড় চাঁপা গাছ ছিল তারই কাছাকাছি এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল রঞ্জন বোস।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে চাঁপা গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে মারথা আর বোকা মুখোমুখি। রঞ্জন চমকে ওঠে।

বোকা বলছে, আমি তো তোমাকে বলছি বার বার আমি বোকা, তোমার সোনি নয়।

স্পষ্ট ইংরেজীতে কথা বলছে বোকা। রঞ্জন বোকার মুখে ইংরেজী শুনেই চমকে উঠেছিল।

মারথা বলে, তুই আমাকে ক্ষমা কর সোনি। আমি তোকে তখন দেখেই চিনেছিলাম আর তখনি বুঝতে পেরেছিলাম সব ঐ শয়তান ডেভিডের ষড়যন্ত্র।

ষড়যন্ত্র একা ডেভিডের না তোমারও। হঠাৎ বোকা বলে।

বিশ্বাস কর কিছুই আমি জানতাম না।

জানতে না। ঐ কথা তোমার আমাকে বিশ্বাস করতে বল!

সোনি—শোন—

না, তোমারও ষড়যন্ত্র ছিল নইলে এতদিন তুমি আমার খোঁজ করনি। ভুলিয়ে ক্যালভার্টের উপর নিয়ে গিয়ে আমাকে অন্ধকারে ধাক্কা মেরে নীচের খালে ফেলে দিয়েছিল ডেভিড্ সে কার পরামর্শে? নিশ্চয়ই তুমিই পরামর্শ দিয়েছিলে। তারপর সেই রাত্রেই ট্রেন ডিরেলড্‌মেন্টের পর অন্যান্য মৃতদেহদের সঙ্গে আমিও চাপা পড়েছিলাম ভেবে তোমরা নিশ্চিন্ত ছিলে।

সোনি, লক্ষ্মী ভাই, শোন আমার কথা! মারথার কণ্ঠে অশ্রুর আভাস।

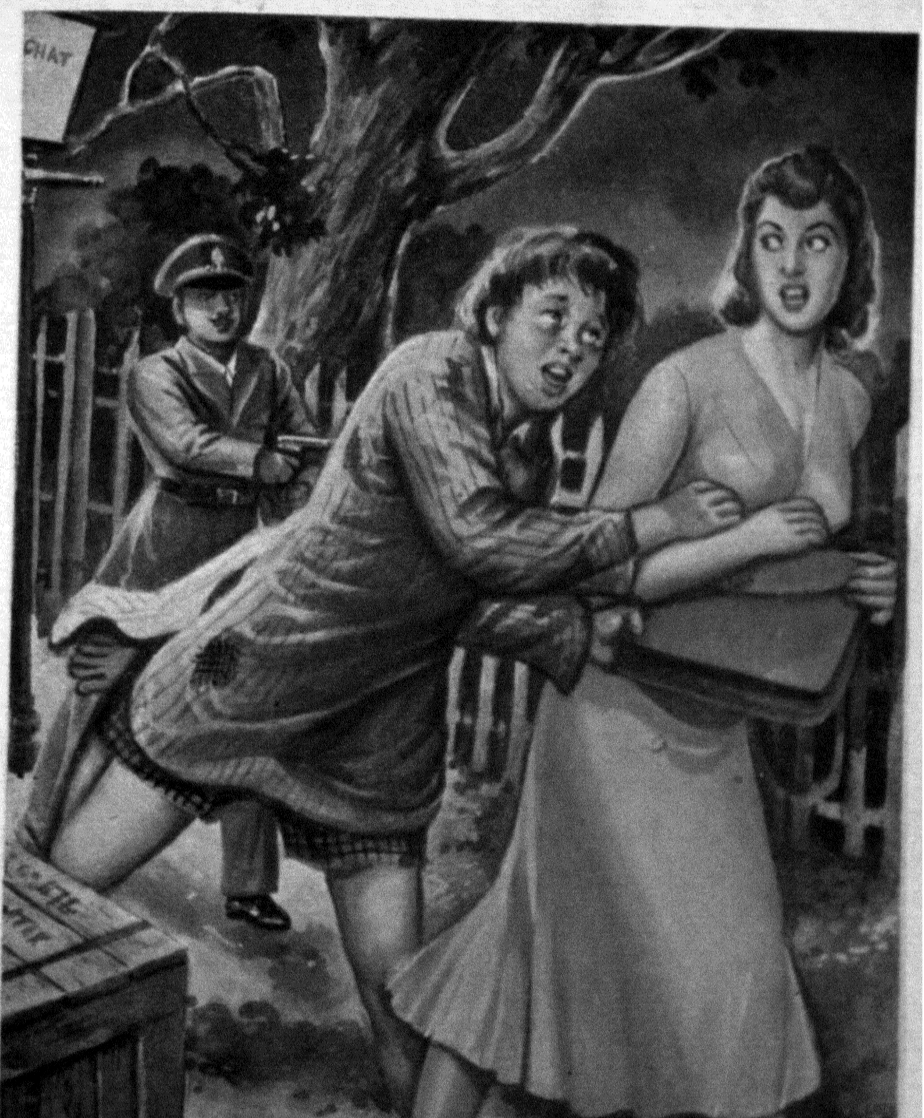
না, না—তুমি আমার দিদি নও, কেউ নও।

সোনি, শোন আমার কথা! বিশ্বাস কর। কেন তোকে আমি মারবো?

তার কারণ তোমাদের দুজনার গোপন ব্যবসায় সব খবর আমি জেনে ফেলেছিলাম আর ডেভিড্‌কে আমি বলেছিলাম পুলিসে সব আমি জানাবো, সেই ভয়ে—

সোনি! যেন আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে মারথা।

● বোকা
নীহাররঞ্জন গুপ্ত


GHAT
B. Roy

হাঁ, হাঁ—জানি। সব আমি জানি [illegible] দিদি—তুমি [illegible] ভাইঝি—তুমি চোরাকারবারী। [illegible] ডেভিডের সঙ্গে তুমি চোরাকারবার চালাচ্ছ। এর [illegible]

সোনি, ভাই—

কে তোমার ভাই। সোনি তোমার কেউ নয় [illegible] —কোন সম্পর্ক তোমার সঙ্গে আমার নেই—

কথাগুলো বলে সোনি আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না, অন্ধকারে ছুটে রেললাইনের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল

পরের ঘটনাটি ঘটল সেই রাত্রেই

রাত তখন দশটা হবে।

১১নং আপ ট্রেনটার একটা প্রথম শ্রেণীর কামরায় মারথা বসে আছে, জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ডেভিড সাহেব।

ট্রেনটা ছাড়তে তখনও মিনিট চারেক দেরি।

হঠাৎ সি. আই. পি.র জনা চারেক অফিসার এসে কামরার মধ্যে উঠে সোজা মারথাকে বললে, তোমাকে নেমে আসতে হবে মারথা গোমেশ।

কেন?

ইউ আর আনডার অ্যারেস্ট।

অ্যারেস্ট?

হাঁ—চল—

ডেভিড সাহেব ততক্ষণে কামরায় উঠে এসেছে। সে প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু প্রধান অফিসার তার প্রতিবাদে কান দেয় না।



"তোমাকে নেমে আসতে হবে মারথা গোমেশ, ইউ আর আনডার অ্যারেস্ট"

● ধোঁকা

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

রীতিমত একটা বচসা বেধে যায়।

সেই ফাঁকে চট্ করে মারথা হাতে একটা অ্যাটাচী কেস নিয়ে কামরার অন্য দ্বার পথে প্ল্যাটফরমে নেমে ছুটতে থাকে।

পালাল, পালাল, একজন অফিসার চিৎকার করে ওঠে।

অন্ধের মত প্ল্যাটফরমের উপর দিয়ে দৌড়তে দৌড়াতে হঠাৎ বোকার মুখোমুখি হতেই সে বলে, দাও—ঐ অ্যাটাচী কেসটা আমার হাতে দাও দিদি শিগ্‌গির।

কিন্তু ততক্ষণে পলাতকাকে অনুসরণ করে একজন অফিসার পিস্তল ফায়ার করে।

একটা আর্ত চিৎকার করে বোকা প্ল্যাটফরমের উপর গড়িয়ে পড়ে স্যুটকেসটা হাতের মুঠোর মধ্যে ধরেই।

মারথার হাত থেকে ইতিমধ্যেই বোকা অ্যাটাচী কেসটা ছিনিয়ে নিয়েছিল।

গুরুতর আহত অবস্থাতেই বোকা হাসপাতালে পুলিসের কাছে জবানবন্দী দিল—নাম তার সোনি, সেই আফিং স্মাগল করে বেড়াতো। মারথা বা ডেভিডের কোন অপরাধ নেই। পুলিস বার বার সোনিকে সত্য কথা বলবার জন্য অনুরোধ করতে লাগল কিন্তু সোনির সেই একই কথা।

সেই দোষী। মারথা ও ডেভিড্ সম্পূর্ণ নির্দোষ।

মৃত্যুপথযাত্রী মায়ের পেটের ভাইয়ের মাথাটা বুকের মধ্যে জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে মারথা, এ তুই কি করলি।

ডেভিড্‌কে তুমি ভালবাস আমি জানি দিদি। আমার জন্য দুঃখ করো না, একটা কথা শুধু মনে রেখো—পাদ্রী—ধার্মিক জনসনের ভাইঝি তুমি! সৎপথে চলো, বিদায়—কথাটা বলতে বলতে বার দুই হেঁচকি তুলে স্থির হয়ে গেল সোনি।

পাশেই ডেভিড্ দাঁড়িয়েছিল, তারও চোখে জল।

রঞ্জন বোস সব জেনেও কোন কথা বলেনি সেদিন।

মারথাকে আর দেখা যায়নি ওখানে পরের দিন সকালে। শেষ রাত্রের দিকে সেই যে মারথা রেলওয়ে হাসপাতাল থেকে বের হয়ে এসেছিল আর তার কোন সন্ধান কেউ পায়নি।

দিন দশেক বাদে ডেভিড্ গোমেশও চাকরি ছেড়ে দিয়ে কোথায় চলে গেল।

রঞ্জন তারপরও বছর দুই ঐ স্টেশনে ছিল! আর সেই দুই বৎসর প্রতি রাত্রে ওভারব্রিজের ওধার থেকে শুনতে পেয়েছে সে সেই অদ্ভুত বাঁশির সুর।

বাঁশি তো নয় যেন কার কান্না।

কাঁদছে যেন কে!



যজ্ঞিবাড়ীর ব্যাপার

—স্বপনবুড়ো

এক মাস আগে থেকে সোরগোল উঠেছে বাড়িতে। হলুদপোড়া গাঁয়ের জমিদারের একমাত্র কন্যা কল্যাণীয়া কুতূহলীর বিয়ে।

তা একটু সাড়া জাগবে বৈকি।

যে পুকুরে কোনো দিন ঢেউ ওঠে না—সেখানেও যদি কোনো দুষ্টু ছেলে ঢিল ছোঁড়ে তবে একটা বৃত্তের তরঙ্গ জাগে। আর এই নিস্তরঙ্গ হলুদপোড়া গাঁয়ের জমিদারের মেয়ের বিয়েতে যদি কোলাহলই না উঠল, ছুটোছুটি করে কাজ দেখাতে গিয়ে যদি দশ-বিশটা মানুষ আছাড়ই না খেল, তবে আর বিয়ে বাড়ি কী?

জমিদার বাড়ির দুই কর্মকর্তা—ছত্রধারণ আর গর্তখোঁড়নবাবু। ছত্রধারণ হচ্ছেন রোজকারের বাজার সরকার। কিন্তু বাড়িতে বৃহৎ কর্ম হলে গর্তখোঁড়নবাবুর ডাক পড়ে! সঙ্গে সঙ্গে ছত্রধারণবাবুর মুখখানি হাঁড়িপানা হয়ে ওঠে। সারা বছর ধরে তিনি বাজার সরকারি করবেন, আর যজ্ঞিবাড়ির ব্যাপার হলেই গর্তখোঁড়নবাবু এসে তাঁর পাওনা-গণ্ডায় ভাগ বসাবেন—এই বা কেমন কথা?

তবু ছত্রধারণবাবু মুখ ফুটে জমিদারবাবুর কাছে আপত্তি জানাতে পারেন না, কারণ গর্ভগৌড়নবাবুর সঙ্গে জমিদার গিন্নীর লতায়-পাতায় কি একটা সম্পর্ক যেন রয়েছে। সামান্য প্রতিবাদ করতে গিয়ে কি এ-বাড়ি থেকে চাঁটি-বাটি তুলতে হবে? তার চাইতে ভাগাভাগি করে খাওয়াই ভালো।

একমাস আগে থেকে কেবলি ফর্দ করা হচ্ছে, আর ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। কর্মকর্তাদের মতের মতো হচ্ছে না কিছুতেই।

ছত্রধারণবাবু ইতিমধ্যেই একদল উড়ে বামুনকে হাত করে ফেলেছেন। তাদের নিয়ে গুজু-গুজু ফুসু-ফুসু চলছেই দিন রাত। মসলাপাতির যে ফর্দ শেষ পর্যন্ত তৈরী হল—তাতে ছত্রধারণবাবুর বেশ মোটা মুনাফা থাকবে। অবশ্য উড়ে বামুনদেরও বেশ কিছুটা খুশী রাখতে হল। নৈলে তারা ফর্দটা মনোমত বাড়িয়ে পেশ করবে কেন?

গর্ভগৌড়নবাবু কাজেই তাড়াতাড়ি আসরে নেমে পড়েছেন। তিনি মেতে উঠেছেন দৈ আর মিষ্টির হিসেব নিয়ে। স্বয়ং জমিদার গিন্নীর আত্মীয় হয়েও যদি এই বিয়েতে কিছু গুছিয়ে নিতে না পারেন, তবে তাঁর জীবন ধারণের কি প্রয়োজন? বাড়ির লোকজনও যে তখন তাঁর গায়ে থুথু দেবে।

অতি সহজেই গয়লাদের হাত করে ফেললেন গর্ভগৌড়নবাবু। তিনি দলের মোড়লকে ডেকে বললেন, দেখ হে ঘোষের পো, জমিদারবাবুর সামনে আমি তোমায় খাসা-দৈয়ের বায়না দেবো। কিন্তু আসলে বলা রইল—তুমি দুর্গা দৈ—মানে জলো দৈ দিয়ে হিসেব বুঝিয়ে দেবে। অবশ্য প্রত্যেক হাঁড়ির ওপরটা যেন বেশ জমাটি থাকে। ভেতরে তুমি যে কায়দাই করো না কেন কেউ ত' আর ডুব দিয়ে দেখতে আসছে না! আর একটা ব্যাপারে খুব সাবধান করে দিচ্ছি। ওই ছত্রধারণবাবু যেন কিচ্ছুটি জানতে না পারে! হাজার হোক্—ও হচ্ছে বাজার সরকার, আর আমি জমিদার গিন্নীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। যাকে বলে—একেবারে রক্তের সম্বন্ধ।

গর্ভগৌড়নবাবুর সব কথা শুনে ঘোষের পোর সবগুলি দাঁত একসঙ্গে বেরিয়ে গেল।

সে জবাব দিলে, বাবু, আপনি পায়ের ওপর পা রেখে আরাম করুন গে। এসব কাজে আমাদের হাত-যশ আছে। তিন পুরুষ ধরে আমরা এই কাজ করে আসছি। বললে বিশ্বেস করবেন না বাবু, আমার ঠাকুর্দা (বুড়ো মারা গেছে, তাই হাত তুলে গয়লার পো প্রণাম জানালে) হাতে ধরে শিখিয়ে গেছে—কি করে ওপরটা খাসা, আর তলাটা জলো দৈ করা যায়।

এইবার গর্ভগৌড়নবাবু অনেকটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। ছত্রধারণ-

বার কিছু কিছু সরাবে। তা সরাক। এসব যজ্ঞিবাড়ির ব্যাপার। একটু-আধটু এদিক ওদিক আলগা না করলে চলে ?

ক্রমশঃ দিন এগিয়ে আসতে লাগলো। ছত্রধারণবাবু যাঁদ গহনা তৈরীর ব্যাপারে স্যাকরার বাড়ি আনাগোনা শুরু করেন, তবে গর্ভগৌড়নবাবু ছাড়াবাড়ি জমিদার গিন্নীর অনুমতি নিয়ে সরাসরি কলকাতায় চলে যান—বর কনের ধুতি, জামা, জুতো, শাড়ি-ব্লাউজ ইত্যাদি পছন্দ করে আনবার জন্যে।

এইভাবে বাজার করার একটা প্রতিযোগিতা যেন জমে ওঠে

আর কেনাকাটার হাঙ্গামাই কি কম ?

একদিকে ঘি-ময়দা, চাল ডাল থেকে শুরু করে মশলাপাতি পর্যন্ত, অন্য দিকে দৈ-মিষ্টি, ক্ষীর, ছানা থেকে আরম্ভ করে মাছ মাংসের ব্যবস্থা করা চাই।

মাছের জন্যে অবশ্যি ভাবনা নেই। জমিদার বাড়িতে দুটো পুকুর

একটা সদরের দীঘি, আর একটা খিড়কি পুকুর। দুটোতেই প্রচুর মাছ কিলবিল করছে। জাল নিয়ে জেলেরা নেমে পড়লেই হল। মাংসের ব্যবস্থা করেছেন ছত্রধারণবাবু। দু' মাস আগে থেকে এক পাল পাঁঠা জমিদার বাড়ির বাইরের ময়দানে ঘাস খাচ্ছে আর গায়ে-গতরে পুরুষ্টু হয়ে উঠছে। গাঁয়ের বৃদ্ধ লোক তাদের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকায় আর আপনমনে জিভ চাটে। গাঁয়ের শিরোমণি মশাই ত' একদিন আনন্দের আতিশয্যে ছড়াই কেটে বসলেন :

কচি পাঁঠা

বৃদ্ধ মেষ—

দধির অগ্র

ঘোলের শেষ—

এই ব্যবস্থা থাকলেই বলব, প্রকৃত ভূরিভোজনের আয়োজন করা হয়েছে।

গর্ভগৌড়নবাবু পানের ছোপ-লাগানো দাঁতগুলি বের করে হো-হো করে হেসে ওঠেন। বলেন, সব হবে শিরোমণি মশাই, আয়োজনের কোনো ত্রুটি থাকবে না ! নইলে এ শর্মা রয়েছে কি করতে ?

ছত্রধারণবাবু দেখলেন, এ সময়ে তার কিছু না বললে ভালো দেখায় না। তাই তিনি আগু বাড়িয়ে চোখ দুটো বড় বড় করে বললেন, পোলাওয়ের জন্যে যে চাল আনা হয়েছে—হাত দিয়ে বুঝবেন, যেন মুক্তোর দানা।

—আবার পোলাওয়ের ব্যবস্থাও করেছ নাকি হে ? বৃদ্ধ হরগোবিন্দ ঘোষের চোখ দু'টি অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। ডানহাতের আঙুলটা আকড়ে ধরে তার নাতনী

পুঁটি দাঁড়িয়ে ছিল। সে জিজ্ঞেস করলো, দাদু, পোলাও কি? হরগোবিন্দ পুলকিত হয়ে একেবারে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ফেললেন। পুঁটির নাকটা নেড়ে দিয়ে বললেন, খাবি রে, খাবি। সে একেবারে ঘি-চপ্‌চপ্‌ ব্যাপার। পোলাও হচ্ছে—হালুয়ার ঠাকুর্দা।—বুঝলি?

পুঁটি কি বুঝল সেই জানে। তবে ঘন ঘন তার ছোট্ট মাথাটি দোলাতে লাগলো।



ধমক খেয়ে দাসীর আঁচল থেকে মাছের বড় বড় টুকরোগুলো ছড়িয়ে পড়লো। [পৃষ্ঠা ২২৩

অবশেষে বিয়ের দিন এসে উপস্থিত হল। দু'টি পুকুরেই জাল ফেলেছে জেলের দল।

বড়-ছোটো, মাঝারি—নানা জাতের মাছ উঠছে। যেগুলো নেহাতই ছোট সেগুলোকে আবার পুকুরে ফেলে দেয়া হচ্ছে। ছত্রধারণবাবু ও গর্তখোঁড়নবাবুর আর ছুটোছুটির অন্ত নেই।

এ যদি একটা মাছ সরান ত' অপরজন তিনটি মাছ বাড়ির বাইরে পাচার করে দেন।

মাতঙ্গী ঝি—সব মাছ কোটাকুটির পর খালুইতে পুরে পুকুরে গিয়েছিল সেই মাছগুলি ধুতে।

পুরোনো ভাঙা ইট বাঁধানো ঘাট। তারই ফোকরে ফোকরে কাটল ধরেছে। মাতঙ্গী বহুদিনের ঝি। কাজেই তার কাজকর্মগুলিও পরিষ্কার। সেই ফাটলগুলির ভেতর বড় বড় মাছের টুকরোগুলি পুরে

রেখে, মাছ ধোয়ার কাজ শেষ করে, পান চিবুতে চিবুতে অন্দরে এসে হাজির হল।

খানিক বাদেই মাতঙ্গীর ছোট মেয়ে দাসী—আগের থেকে শেখানো মত—বাঁধা ঘাটের ফাটল থেকে মাছের টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিয়ে কাপড়ের তলায় লুকিয়ে রওনা হয়েছে—একেবারে পড়বি তো পড় ছত্রধারণবাবুর সামনে।

ছত্রধারণবাবু হুংকার দিয়ে বললেন, এই দাসী তোর আঁচলের তলায় ওগুলো কি রে?

দাসী কাঁদো কাঁদো হয়ে জবাব দিলে, আজ্ঞে ও কিছু নয়। ঘাট থেকে কাপড় ধুয়ে চলেছি কিনা—

—হুঁ! কাপড় ধুয়ে চলেছিস! বের কর ওর ভেতর কি আছে—

ধমক খেয়ে দাসী আঁচলটা ছেড়ে দিতেই বড় বড় মাছের টুকরোগুলো ওর পায়ের কাছে ছড়িয়ে পড়ল।

ছত্রধারণবাবুর হম্বি-তম্বি তখন দেখে কে—এদিকে না দেখলে—একেবারে পুকুরচুরি হয়ে যাবে! ভাগ্যিস আমি এ সময়টা এসে পড়েছিলাম।

সেদিন ছত্রধারণবাবুর মুখের সামনে দাঁড়ায় সাধ্যি কার?

গর্তগোঁড়নবাবু দেখলেন, সবকিছু বাহবা একা ছত্রধারণবাবুই পেয়ে যাচ্ছেন; তিনি একটা কিছু না করলে আর মান-মর্যাদা থাকে না। তাই তিনি তক্কে তক্কে রইলেন।

হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল, উড়ে বামুনরা গাড়ু নিয়ে ক্রমাগত পায়খানার দিকে ছুটছে। সবাইকারই পেট খারাপ হল নাকি একদিনে? নাঃ, এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো রহস্য আছে।

ঘাপটি মেরে রইলেন একটা ঝোপের আড়ালে। যেই আর একটা উড়ে বামুন গাড়ু নিয়ে ছুটেছে দেখতে পেলেন, অমনি বাঘের মতো পেছন থেকে লাফিয়ে পড়লেন গর্তগোঁড়নবাবু।

উড়ে বামুনটিও এই অতর্কিত আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। বাবু—বাবু করে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—কি আছে তোর ওই গাড়ুর ভেতর দেখি?

বামুনটা কিছুতেই গাড়ুটা হাত-ছাড়া করতে চায় না। তখন হঠাৎ এগিয়ে এসে ওর হাত থেকে গাড়ুটা হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে নিতেই দেখা গেল—গাড়ু ভর্তি খাঁটি গাওয়া ঘি। খানিকটা ঘি ছলকে পড়েছে মাটির ওপর। দিব্যি ভুরভুরে গন্ধ!

—হুঁ! এইভাবে ঘি পাচার করছ বাইরে? আমি দেখে নেবো সব ব্যাটাকে, কাউকে ছাড়বো না। দারোগাবাবু আসবেন নেমন্তন্ন খেতে। সবাইকে হাতকড়া লাগিয়ে থানায় চালান যদি না দিয়েছি ত' আমার গর্তখোঁড়ন নামটা গঙ্গার জলে বিসর্জন দেবো।



'হুঁ! দশ আনা-ছয় আনা বখরা—দেখা'চ্ছি মজাটা।'

হাউমাউ করে তখন বামুন ঠাকুর গর্তখোঁড়নবাবুর পায়ে পড়তে পথ পায় না।

বললে, আমায় প্রাণে মারবেন না বাবু। আমার কোনো দোষ নেই। ওই চক্রধারণবাবুই ত' আমাদের সব শিখিয়ে দিলেন। তিন চারটে গাড়ু ও নিজে ভাড়ার ঘর থেকে বের করে দিলেন। নইলে কি আমরা সাহস পাই? বললেন, দশ আনা ছয় আনা বখরা।

গর্তখোঁড়নবাবু উত্তেজিত হয়ে উত্তর করলেন,—হুঁ! দশ আনা-ছয় আনা বখরা!

—আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, আমি মিছে কথা কইচি না! ওঁর দশ আনা আর আমাদের ছ' আনা।

—হুঁ! দেখাচ্ছি মজাটা!

চোখ দু'টিকে একবার নাচিয়ে নিয়ে চটিজুতো ফট্‌ফট্ করতে করতে গর্তখোঁড়ন চলে গেলেন আর এক দিকে!

একটু বেশী লগ্নে বিয়ে।

তাই গ্রামস্থ লোককে আগে খাইয়ে দেয়া হচ্ছে। বরযাত্রীর দল বায়না ধরেছে—বিয়ে না দেখে কেউ পাতে বসবে না।

● যজ্ঞিবাড়ির ব্যাপার
স্বপনবুড়ো

আচ্ছা, তাই হবে! বরযাত্রী নয় ত'—এক একটি ক্ষুদে দিল্লীর বাদশা। মুখের কথা খসাতে-না-খসাতে সব জিনিস এনে হাজির করতে হয়।

চায়ের পরেই ঘোলের সরবত? আচ্ছা, তাই সই।

কাজেই সন্ধ্যের পর বরযাত্রীদের একটা মোটা রকম জলখাবারের বন্দোবস্ত করতে হবে।

গাঁয়ের ছেলেরা সকল রকম পরিবেশনের ভার নিয়েছে।

হঠাৎ দেখা গেল,—একটা বড় পেতলের বালতি ভর্তি লেডিকেনি নিয়ে একটি ছেলে খিড়কির পথ দিয়ে চলে যাচ্ছে। ছত্রধারণবাবু অমনি খপ্ করে তার হাত ধরে ফেলেছেন!

চোরেরাই চুরির ব্যাপারের হদিস রাখে বেশী।

ছত্রধারণবাবু চোখ গরম করে জিজ্ঞেস করলেন, এত বড় পেতলের বালতিটা নিয়ে কোথায় যাওয়া হচ্ছিল শুনি?

ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে ভ্যা করে কেঁদে ফেললে। বললে, আমার কোনো দোষ নেই ছত্রদা। কাল শিরোমণি ঠাকুরের বাপের বার্ষিকী। আমায় হাতে ধরে বললেন, তিলু, তোরাই ত' বাবা বরযাত্রীদের পরিবেশন করবি। এক ফাঁকে এক বালতি লেডিকেনি আমার বাড়িতে ফেলে দিয়ে যাস—কাক-পক্ষীতেও জানতে পারবে না।

ফোঁস্ করে উঠলেন ছত্রধারণবাবু। ত'! কাক-পক্ষীতেও জানতে পারবে না! কিন্তু এদিকে যে শিকারী বাজপাখি বসে আছে—শিরোমণি মশাই বুঝি তার সন্ধান রাখেন না? এতগুলো লেডিকেনি, আর সেই সঙ্গে পেতলের বালতিটা অবধি হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল! কী সর্বনেশে ঠাকুর রে বাবা! চুরির মিষ্টি দিয়ে বাপের বার্ষিকী! বাপের জন্মে কখনো এমন কথা শুনিনি!

এইবার বরযাত্রীদের খাওয়ানোর পালা। একটি বড় হলঘরে ভালো আসন পেতে জায়গা করে দেওয়া হয়েছে। জমিদার বাড়িতে কার্পেটের আসনের অভাব নেই। নানারকম নক্সা-করা সুন্দর সুন্দর আসন, আর সেই সঙ্গে নতুন ঝকঝকে থালা-গেলাস-বাটি। তার ওপর ঝাড়-লণ্ঠনের আলো এসে পড়েছে। ঝিকমিক্ করছে নয়া বাসনগুলি।

প্রথমে গরম পোলাও পরিবেশন করা হয়েছে।

প্রস্তাব ছিল—প্রতিটি পাতের সামনে একটি করে রুইমাছের মুড়ো দেওয়া হবে।

থালায় হাত দিয়েই বরযাত্রীর দল এদিক-ওদিক তাকায়। সব কিছু পাতের সামনে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে—কিন্তু সেই বহুআকাঙ্ক্ষিত মাছের মুড়ো কোথায়?

হঠাৎ একজন তরুণ বরযাত্রী বলে উঠল, মাছের মুড়োগুলো কি আবার পুকুরের জলে পালিয়ে গেল ছত্রধারণবাবু?

সঙ্গে সঙ্গে গুঞ্জন উঠল—এপাশে-ওপাশে।

একজন গোঁফওয়ালা বয়স্ক ব্যক্তি চিৎকার করে উঠলেন, উঠে পড় হে সবাই মাছের মুড়ো যখন পুকুরে পালিয়ে গেছে তখন পোলাওয়ের পিণ্ডও আঁস্তাকুড়ে। যাক্।

হাঁ—হাঁ করে এগিয়ে এলেন গর্তখোঁড়নবাবু। বললেন, আপনারা উঠবেন না—উঠবেন না। যে গামলাতে মাছের মুড়োগুলো আলাদা করে রাখা ছিল সেটিকে আজ দুপুর থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তাই এই বিপত্তি। আসছে কাল বর ভোজনের সময় আমরা এ ত্রুটি সংশোধন করবো।

কিন্তু তখন কার কথা কে শোনে! জলের গেলাস উল্টে, পাতা মাড়িয়ে, পোলাও ছিটিয়ে বরযাত্রীর দল দক্ষযজ্ঞ শুরু করে দিলে।

বরকর্তা এগিয়ে এসে বললেন, আমি আমার ছেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো—

তখন বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীর মধ্যে যে কোলাহল শুরু হল তাতে কান পাতে কার সাধ্যি!

শিরোমণি মশায় একটিপ নস্যি নিয়ে বললেন, বৃহৎ কর্মে এরকম হয়েই থাকে হে ভায়া! একি তোমার-আমার বাড়ির বিয়ে! যজ্ঞিবাড়ির ব্যাপারই আলাদা!

ক্ষুধা হি সর্বরোগাণাং ব্যাধিঃ শ্রেষ্ঠতমঃ স্মৃতঃ।
স চান্নৌষধ লেপেন নশ্যতীহ ন সংশয়ঃ।

—শৈব-সংহিতা

মণি ও মুক্তা



পৃথিবীতে যত ব্যাধি আছে, তার মধ্যে ক্ষুধাই হলো সবচেয়ে বড় ব্যাধি। এবং এই ব্যাধির একমাত্র ঔষধ হলো, অন্ন। অর্থাৎ ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যেই খাবে, ক্ষুধাহীন অবস্থায় খাবে না।

পুরানো বন্ধু



—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

সিপাহী বিদ্রোহের যুগ। ব্যারাকপুরে যে আগুন জ্বলেছিল, তারই স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ভারতে। নির্মম হস্তে বিদ্রোহ দমন করতে করতে ইংরাজরা এসে পড়লো মধ্যভারতে। ইংরাজ বাহিনী ঝাঁসী আক্রমণ করলো। ঝাঁসীর উপর লোভ ছিল তাদের অনেকদিনের, এখন অজুহাত পাওয়া গেল—বললো—ঝাঁসীর রানী বিদ্রোহী সিপাহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।

রানী লক্ষ্মীবাঈ দুর্গ রক্ষার জন্য তৈরি হলেন, বললেন, মেরী ঝাঁসী দুংগা নেহি!

ইংরাজ বাহিনী বার বার দুর্গ আক্রমণ করলো, কিন্তু প্রতিবারেই ব্যর্থ হয়ে তাদের হটে আসতে হলো। ঝাঁসীর দুর্ভেদ্য দুর্গ ইংরাজদের সমস্ত যুদ্ধ-কৌশল ব্যর্থ করে দিল। ইংরাজরা এবার অন্য সুযোগের সন্ধান করতে লাগলো। বিশ্বাসঘাতক চাই। অর্থের লোভে যে দুর্গের দ্বার খুলে দেবে। পলাশীর যুদ্ধের সময় থেকে ইংরাজ অনেক ব্যাপারে এই ধরনের বিশ্বাসঘাতক সংগ্রহ করেছে এবং কার্যোদ্ধারও করেছে। এবারও তাই চাই! দিকে দিকে ইংরাজের চর ঘুরছে বিশ্বাসঘাতকের সন্ধানে।

এদিকে দিন যায়। মধ্যভারতের গ্রীষ্মকাল দুঃসহ। রাতেও অনেক সময়

এমন থমথমে হয়ে থাকে যে ঘুমোনো যায় না। ক্যাপটেন জনসন সময় সময় তাঁবুর বাইরে এসে ক্যাম্পচেয়ারে বসে রাত কাটিয়ে দেন। এখানকার লড়াইটা তাড়াতাড়ি শেষ হলে হয়। এতো দূর দেশে এতো কষ্ট করে আর তিনি চাকরি করতে পারছেন না। ইস্তফা দিয়ে চলে যাবেন। নেহাত লেখাপড়া শিখতে পারলেন না বলে, ঝোঁকের মুখে এত দূর দেশে চাকরি নিয়ে চলে এলেন, কিন্তু এখানকার আবহাওয়া সহ্য করা সহজ নয়। তিনি চলে যাবেন।

তাঁবুর বাইরে জনসন ক্যাম্পচেয়ারে বসে ছিলেন, চোখ বুঁজেই বসে ছিলেন। চোখে ঘুম নেই, তবু রাতের অন্ধকারে চোখ চেয়ে বসে থাকতে ভাল লাগে না। সহসা প্রহরীর হাঁক শুনে তিনি চোখ মেললেন।

—হুকুমদার!

—হাবিলদার পিয়ারেলাল!

চাঁদের আলোয় দেখা গেল মাঠের উপর দিয়ে দু'টি মানুষের ছায়া এগিয়ে আসছে। জনসন একটু নড়েচড়ে সজাগ হয়ে বসলেন।

লোক দু'টি বরাবর তাঁরই সামনে এসে দাঁড়ালো।

—সেলাম সা'ব!

—কে, পিয়ারেলাল? কি খবর?



দয়ালরাম শান্তকণ্ঠে বললো—কিল্লার দরোয়াজা খুলে দেবো। [পৃষ্ঠা ২২৯

—জরুরী খবর সা'ব। এঁকে সঙ্গে এনেছি। ইনি রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের

● পুরাণো বন্ধু
শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

পূজারী দয়ালরাম। দশ হাজার রূপেয়া 'ইনাম' পেলে ইনি 'কাম' কত্তে করতে পারেন।

—দশ হাজার!

জনসন পিয়ারেলালের সঙ্গীর আপাদমস্তক একবার দেখে নিলেন। চাঁদের আলোয় যেটুকু দেখা যায় তাতে মানুষটি জোয়ান ও বলিষ্ঠ বলেই মনে হয়। কোন ভূমিকা না করেই জনসন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি টুমি করবে?

দয়ালরাম শান্ত কণ্ঠে বললো—কিল্লার দরোয়াজা খুলে দেবো।

—টারপর?

—তারপর যা করতে হয়, আপনারা করবেন।

—টাকা কখন দিটে হবে?

—টাকা আগে চাই।

—এ ব্যাপারে আগে টাকা দেবো কেন? টাকা নিয়ে পালিয়ে গেলে কি করবো?

—কাজ শেষ হবার পরে যদি আপনারা টাকা না দেন, তো আমি কি করবো?

—কাজ না হলে টো টাকা লুকসান হইয়ে যাইবে।

—তাই যদি মনে কর সাহেব, টাকা দিও না, কাজ হবে না।

—টাকা দেবো, কাজও চাই। টুমি পাঁচ হাজার টাকা আগে নাও পরে পাঁচ হাজার নেবে।

—পরে তুমি আমাকে চিনতে পারবে না সাহেব।

—হামি চিনি আর না চিনি টাটে কি হইবে, আমি টোমাকে ডলিল লিখে দেবে। কোম্পানির যে আপিসে যাবে, ডলিল দেখাবে, টাকা পাবে। পিয়ারেলাল জামিন রইল। মরদ কি বাট্ হাটি কি দাঁট। হামি না চিনবে কিন্তু পিয়ারেলাল টো চিনবে!

পিয়ারেলাল মধ্যস্থ হলো, জনসন ও দয়ালরামের সঙ্গে নিম্নস্বরে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হলো। তারপর জনসন দয়ালরামকে বিদায় দিল, বললো—কাল সন্ধ্যের পরে এসে পাঁচ হাজার রূপেয়া নিয়ে যেও।

পরদিন ইংরাজ বাহিনী পূর্ণোদ্যমে ঝাঁসী দুর্গের উপর চড়াও হলো। তুমুল সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। তার উপর চললো দু'পক্ষের অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণ। তৃতীয় দিন রাত্রে ব্রিটিশ বাহিনী কেল্লার উপর চড়াও হলো। অত্যধিক গোলমাল হৈ-চৈয়ের

মধ্যে কোন এক সময় দয়ালরাম কেল্লার দরজা খুলে দিল। কি করে কি হলো ঠিক বোঝা গেল না, জলস্রোতের মত তেলেঙ্গা সেনা এসে ঢুকলো কেল্লার মধ্যে। হাতাহাতি লড়াই শুরু হয়ে গেল। তুমুল বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। রানী দেখলেন কেল্লা আর রক্ষা করা যাবে না। নিরুপায় হয়ে রানী পোষ্যপুত্র দামোদরকে পিঠে বেঁধে নিলেন, তারপর উত্তর দিকের প্রাচীর ডিঙিয়ে বিশ্বস্ত পাঠান সেনাদের সাহায্যে ঝাঁসী দুর্গ ছেড়ে চলে গেলেন। ঝাঁসীর বাসিন্দাদের কাছে সে এক মহাদুর্যোগের রাত্রি। নগরের পথে পথে লড়াই হলো, প্রতিটি গৃহের প্রতিটি বাসিন্দা, শিশু ও বৃদ্ধ খুন হলো, প্রতিটি গৃহ লুণ্ঠিত হলো, প্রতিটি গৃহে আগুন লাগানো হলো। ঝাঁসীর আকাশ সেদিন আগুনে আগুনে লাল হয়ে গেল।

দয়ালরাম ইংরাজ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল। প্রত্যূষে জনসনের কাছে এসে বললো—আমার যাবার একটু ব্যবস্থা করে দাও, আমি যাই।

জনসন জিজ্ঞাসা করলেন—বাকি পাঁচ হাজার নেবে না?

—তোমাদের হাত-চিঠি সঙ্গে নিলাম সাহেব, পরে তোমাদের কোন কুঠি থেকে টাকাটা নিয়ে নেবো।

—বেশ, চল, আমিই তোমাকে তোরণ অবধি এগিয়ে দিয়ে আসছি।

—তুমি নিজে কেন যাবে সাহেব, একজন সিপাহীকে হুকুম দাও—

—ঠিক আছে, চল।

জনসন নিজেই দয়ালরামের সঙ্গে অগ্রসর হলেন।

নগরে তখন লুঠতরাজ ও হৈ হৈ হচ্ছে। নগরী পিছনে রেখে জনসন দয়ালরামকে তোরণ পার করে দিলেন। ঢালু টিলা থেকে নেমেই সামনে উন্মুক্ত প্রান্তর—ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাওয়া শুধু। সাহেব বললেন—টুমি কোন্ দিকে যাবে?

—বেনারস।

—সে টো অনেক পট। এটো টাকা সঙ্গে নিয়ে টুমি একা বেনারস যেটে পারবে?

—এ পথ আমার জানা, সাহেব, তুমি ভেবো না।

—টোমার কটা আমি ভাবছি না, আমি ভাবছি টাকার কটা।

—আমি থাকলে আমার টাকাও থাকবে।

—টুমি টাকাগুলো আমার কাছে রেখে যাও, পরে আমি পাঠিয়ে দেবো। নাহলে টোমার বিপদ হবে।

—ঠিক আছে সাহেব।

—না না, টোমাকে বিপদের মাঝে আমি ছেড়ে দিটে পারি না। টাকাগুলো টুমি রেখে যাও।

—সে কি সাহেব ?

—সেই কটা বলটেই আমি টোমার সঙ্গে এটো দূর এসেছি।

—না সাহেব না, টাকা আমি কারও কাছে রাখবো না।

—আমি ভাল কটা বলছি।

—না সাহেব, না।

—সব না রাখো, অর্ধেক রেখে যাও।

—না, না সাহেব !

দয়ালরাম আর দাঁড়ালো না, তীরের মত ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

জনসনও প্রস্তুত ছিলেন, কোমর থেকে রিভলভার টেনে নিয়ে দুম্ করে এক গুলি করে বসলেন। অব্যর্থ লক্ষ্য। ঘোড়ার পিঠ থেকে দয়ালরাম ঘুরে পড়ে গেল। সাহেব এগিয়ে এসে ঘোড়ার জিনের নীচে থেকে একটা থলি বের করে নিলেন। থলিটা মোহরে ভরা ছিল। দয়ালরামের পাগড়ির ভিতর থেকে পাঁচ হাজার টাকার হাত-চিঠিটাও জনসন বের করে নিলেন। তারপর সাহেব ফিরে এলেন তাঁবুতে।



জনসন রিভলভার টেনে নিয়ে দুম্ করে এক গুলি করে বসলেন।

লড়াই শেষ হলো। নগর লুণ্ঠন শেষ হলো। ব্যাপক হত্যাকাণ্ড শেষ হলো। মধ্যভারতের সমৃদ্ধ নগরী ঝাঁসী শ্মশান হয়ে গেল। ব্রিটিশ বাহিনী লাখ লাখ টাকা লুঠ করে বিজয়ীর আত্মপ্রসাদে কয়েকদিন বিশ্রাম করলো। ইতিমধ্যে সংবাদ এলো পলাতক রানী লক্ষ্মীবাঈ তাঁতিয়া টোপি ও নানাসাহেবের সঙ্গে

● পুরাণো বন্ধু
শ্রীবীরেন্দ্রলাল ধর

মিলেছেন। তাঁরা গোয়ালিয়র দুর্গ দখল করে বসেছেন। গোয়ালিয়রের রাজা পালিয়ে গেছেন। ব্রিটিশ বাহিনী ছুটলো গোয়ালিয়রের পথে। ক্যাপটেন জনসনের উপর ঝাঁসী দুর্গের ভার রইল। জনসন নিজের কৃতিত্বে তখন মশগুল। এবার ভাগ্যদেবী তাঁর উপর প্রসন্ন হয়েছেন। দয়ালরামের নগদ দশ হাজার টাকা তাঁর হাতে এসেছে, আর তারই সঙ্গে পেয়েছেন রানীর একটি কণ্ঠহার। এক তেলেঙ্গা কোথা হতে কণ্ঠহারটি সংগ্রহ করেছিল, জনসন দেখতে পেয়ে কেড়ে নিয়েছেন, সাতটি হীরে বসানো আছে সেই কণ্ঠহারে। এগুলো নিয়ে এখন কোনরকমে বিলাতে ফিরে যেতে পারলে হয়। জনসনের মন বেশ প্রফুল্ল।

সেদিন তুমুল বৃষ্টি হয়ে গেল। সন্ধ্যার পর খবর এলো কেল্লার অদূরে টিলার মাথায় যে কামানটি আছে, সেটা বসে গেছে, হেলে পড়েছে। ওই কামানটিই এদিকের ভরসা। জনসন তখনই বেরিয়ে পড়লেন কামানটি সম্পর্কে তদারক করতে।

কামানটি ঠিক জায়গায় সরিয়ে এনে ঠিকমত বসাতে দু'ঘণ্টা সময় গেল। তখনও ঝিম্‌ঝিম্ করে বৃষ্টি পড়ছে। টিলা থেকে যখন জনসন নেমে এলেন, তখন তাঁর সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। জনসন তাড়াতাড়ি কেল্লার দিকে পা চালালেন।

তোরণের সামনে এসে জনসন থমকে দাঁড়ালেন। কে একজন পথের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলেন—কে ?

জবাব হলো—পুরাণো বন্ধু !

—পুরাণো বন্‌ডো ! কে বন্‌ডো ?

—বন্ধু দয়ালরাম।

—ডয়ালরাম !

—ঝাঁসীর কেল্লার দয়ালরাম।

জনসন চমকে উঠলেন, বললেন—ডয়ালরাম তো মরে গেছে।

—তুমি তাকে গুলি করে মেরেছ। আমি সেই দয়ালরাম।

মরা মানুষ আবার ফিরে আসে নাকি ? সাহেব তো থ'! তখনই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন—কি চাই তোমার ?

—আমার টাকাগুলো ফেরত চাই।

—তুমি তো মরে গেছ, টাকা নিয়ে তুমি এখন কি করবে ?

—যাই করি, আমার টাকা ফেরত দাও।

জনসন মনে করলেন, এ কোন দুষ্ট লোকের চালাকি। তাই তিনি বললেন—

● পুরাণো বন্ধু
শ্রীবীরেন্দ্রলাল ধর



রয়াল রাম বল্‌লে—আমার টাকাগুলো ফেরত চাই।

[পৃষ্ঠা—২০২

টাকা কি আমি সঙ্গে নিয়ে ঘুরছি যে চাইবে আর দিয়ে দেবো ? আমার বাড়িতে এসো, দেবো।

—বেশ, তাই যাবো।

চকিতে মানুষটা বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশে গেল যেন। জনসন সামনে আর কাউকে দেখতে পেলেন না। তবে তিনি এতক্ষণ কথা বললেন কার সঙ্গে ? বেরুবার আগে জনসন কিছু দেশী মদ খেয়ে বেরিয়েছিলেন, মদের নেশাটা কি তাহলে এখন জমে উঠলো নাকি ? এটা কি তাহলে সেই নেশার আমেজ ? কিন্তু এমন হবার তো কথা নয়, মদ তো তিনি আজ নতুন করে খাচ্ছেন না। কিন্তু এরকম ঘটনা তো কখনও ঘটেনি। চোখের সামনে মানুষ কথা বলে আবার মিলিয়ে গেল !

জনসন ভালো করে চারপাশে তাকালেন। প্রশস্ত পথ কেল্লার ফটক অবধি চলে গেছে। একপাশে কেল্লার প্রাচীর আর-এক পাশে ঢালু পাহাড় নেমে গেছে, এখানে কারও তো লুকিয়ে থাকার স্থান নেই। তার উপর আবার মৃত দয়ালরাম এলো কোথা থেকে ? মরা মানুষ কি আবার ফিরে আসে নাকি ? ব্যাপারটা কি রকম হলো ? জনসন চিন্তিত মুখে এসে ঢুকলেন কেল্লার মধ্যে।

কেল্লার উত্তর দিকের শেষপ্রান্তে প্রাচীরের পাশেই একখানি ঘর। কয়েকটি সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে তবে এই ঘরখানি। সিঁড়ির দরজাতেই একজন রক্ষী পাহারা দিচ্ছিল, জনসনকে দেখেই সেলাম দিল।

জনসন ত্বরিতপদে সিঁড়িগুলি অতিক্রম করে ঘরে এসে ঢুকলেন। ঢুকেই চমকে উঠলেন। ঘরের মধ্যে একখানি কুর্সির উপর কে বসে আছে ?

—সেলাম সাহেব।

—কে ?

—চিনতে পারছেন না সাহেব, আমি আপনার পুরাণো বন্ধু দয়ালরাম।

—দয়ালরাম !—জনসন ভালো করে সামনের পানে তাকালেন, লণ্ঠনের আলোয় দেখতে পেলেন সত্যই একজন মানুষ কুর্সির উপর বসে আছে। তবু সাহস করে জনসন বললেন—দয়ালরাম তো মরে গেছে !

—মরে গেছে ! হ্যাঁ—মরে গিয়েও শান্তি নাই, টাকা দাও চলে যাই।

দয়ালরাম হাতখানি বাড়িয়ে দেয় জনসনের দিকে। জনসন সেই হাতের পানে তাকিয়ে চমকে ওঠেন। হাতের কোথাও এতটুকু মাংস নেই, একখানি কঙ্কাল। জনসন তাড়াতাড়ি পিছিয়ে আসেন।

জনসন যত পিছিয়ে যান, হাতখানি ততো এগিয়ে আসে।

● পুরাণো বন্ধু
শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

দেখতে দেখতে জনসন ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। এসে দাঁড়ালেন একেবারে সিঁড়ির কিনারায়। হাতখানি তখনও এগিয়ে আসছে। এবার জনসন আর এক পা পিছু হটতে গিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেলেন সিঁড়ির নীচে। আর উঠলেন না।

সান্ত্রী ছুটে এলো—কি হলো।

সান্ত্রীর সাড়া পেয়ে ছুটে এলো আরো কয়েকজন।

কেল্লার সিঁড়ির পাশে কোন রেলিং নেই, দশ-বারোটা সিঁড়ি টপ্‌কে জনসন একেবারে নীচে এসে পড়েছিলেন। মাথাটা থেঁতলে গিয়েছিল।

সকালে জনসনের দেহকে কবর দেওয়া হলো।

সেই থেকে প্রতিরাত্রেই কেল্লার সেই ঘরটায় কিসের যেন একটা গোলমাল শোনা যেত। বাইরে যে সান্ত্রী পাহারা দিত, তারা উঁকি মেরে দেখেছে, কিন্তু কিছুই দেখতে পায়নি। এই ঘরখানি সম্পর্কে সিপাহীদের মধ্যে কানাঘুষো শুরু হলো। ঘরখানি খালি পড়ে রইল অনেকদিন। শেষে সেটি বারুদখানা করে দেওয়া হলো।



সোনালী কথা

জেন্ আয়ার (সার্লটী ব্রোন্‌টী)

সার্লটী ব্রোন্‌টী এই একখানি নভেলের জন্যে ইংরেজী সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। জেন্ আয়ার জগতের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নভেলদের মধ্যে একটি। এই নভেলের নায়িকা জেন্ আয়ারের নাম থেকে এই বই-এর নামকরণ হয়েছে। ভাগ্য-পরিত্যক্ত জেন্ আয়ারকে শিশুকাল থেকেই অযত্নে অনাদরে পরের দয়ায় মানুষ হতে হয়েছে। তাই জীবনে সে সাহস করে কিছুই চাইতে পারে না। যখন বয়স্থা হলো তখন জেন্ নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবার জন্যে এক বড়লোকের বাড়ি একটি ছোট মেয়ের তত্ত্বাবধানের ভার নিলো। সেই বাড়িতে এসে তার মনে হলো সে ভুতুড়ে বাড়িতে এসেছে। ছাদের ওপর থেকে নানারকমের বিচিত্র আওয়াজ সে শুনতো। সেই আওয়াজের উৎস সন্ধানের জন্যে চেষ্টাও করে, কিন্তু বাড়ির মেট্রন কড়াভাবে জানিয়ে দেন, বাড়ির কর্তার হুকুমে ছাদের ওপর যাবার কারুর অধিকার নেই, শুধু একটা পাগলা ঝি সেইখানে থাকে। কিন্তু কালক্রমে আয়ার যেদিন জানতে পারলো সেই ছাদের রহস্য, তার আগেই বাড়ির কর্তার সঙ্গে তার বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়ে গিয়েছে। সেই পরম আনন্দের মুহূর্তে আয়ার জানলো, ছাদে সত্যিসত্যিই একজন থাকে, সে হলো বাড়ির কর্তার বিবাহিত স্ত্রী, একেবারে উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। সে খবর জানার সঙ্গে সঙ্গে আয়ার সেই বাড়ি থেকে চলে যায়। কিন্তু ভাগ্য আবার তাকে ফিরিয়ে আনে সেই বাড়িতে এবং বাড়ির কর্তার সঙ্গে অবশেষে তার বিবাহ হয়।



'বীরাঙ্গনা, পরাক্রমে ভীমা-সমা'

—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

এক

রণরঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতুকে .—
উথলিল চারিদিকে দুন্দুভির ধ্বনি ,
বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি,
উলঙ্গিয়া অসিরাশি, কার্মুক টংকারি,
আস্ফালি ফলকপুঞ্জে।

—মাইকেল মধুসূদন

দেশে দেশে রণরঙ্গিণী রমণীর কাহিনী শোনা যায়,—কেবল কল্পিত গল্পে নয়, সত্যিকার ইতিহাসেও। চলতি কথায় এমন মেয়েকে বলা হয় 'রায়বাঘিনী'।

ভারতের রানী লক্ষ্মীবাই, রানী দুর্গাবতী, চাঁদ সুলতানা, ইংলণ্ডের বোডিসিয়া ও ফ্রান্সের জোয়ান অব্ আর্ক প্রভৃতি রণরঙ্গিণী বীরনারীর কথা কে না শুনেছে ?

কথিত হয়, সেকালের কাপ্পাডোসিয়ায় বীরাঙ্গনারা বাস করত নারীরাজ্যে—যেখানে পুরুষের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ! পুরুষদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে কোনদিনই তারা পিছপাও হয়নি। আধুনিক নিউগিনিতেও এমন দেশের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। মাঝে মাঝে তারা আবার বাইরে হানা

দিয়ে পুরুষ দেখলেই বন্দী ক'রে নিয়ে যায়! একালের স্পেন, রুসিয়া ও চীন প্রভৃতি দেশে হাজার হাজার নারী-যোদ্ধার দেখা পাওয়া যায়। এবং এই অতি-আধুনিক যুগেও তিব্বতে শ্রীমতী রিপিয়েডোর্জেস্ প্রায় এক হাজার রণমুখো নারী-যোদ্ধা নিয়ে কমিউনিস্ট চীনের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্রমে যুদ্ধে নিযুক্ত আছেন।

কিন্তু আর এক শ্রেণীর বীরনারীদের কথা নিয়ে বড় বড় ঐতিহাসিকরা মাথা ঘামান না এবং তার কারণ বোধ হয় তাঁরা হচ্ছেন কালো আফ্রিকার কাজলা মেয়ে!

এঁদের প্রধানার নাম নান্সিকা। আজ এঁরই রক্তাক্ত কাহিনী বর্ণনা করব। কিন্তু তার আগে গুটিকয় গোড়ার কথা বলতে হবে।

প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে জনৈক পাশ্চাত্য লেখক The Rising Tide of Colour-নামক পুস্তকে সভয়ে এই মর্মে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন: 'শ্বেতাঙ্গরা এখনো আন্দাজ করতে পারছে না, অশ্বেত জাতিরা (পীত, তাম্র ও কৃষ্ণ বর্ণের) ক্রমেই অধিকতর শক্তিশালী হয়ে শ্বেতাঙ্গদের নাগালের বাইরে চ'লে যাবে। অবিলম্বে তাঁদের সাবধান না হলে চলবে না।'

তারপর গত এক যুগের মধ্যেই তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে—গৌরাঙ্গরা সাবধান হয়েও পীতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি।

প্রায় সমগ্র এসিয়া থেকেই তাম্র ও পীত বর্ণের প্রভাবে শ্বেতবর্ণ বিলুপ্তপ্রায় হয়েছে এবং তারপর বেঁকে দাঁড়িয়েছে এতকালের পশ্চাদপদ আফ্রিকাও। একে একে শ্বেতাঙ্গদের বেড়ি ভেঙে স্বাধীন হয়েছে মিশর, সুদান, মরক্কো ও ঘানা এবং আরো কোন কোন দেশ প্রস্তুত হয়ে আছে স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে কিংবা ইতিমধ্যেই স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করেছে।

যেমন সদ্য-স্বাধীন ঘানার প্রতিবেশী ডাহোমি। পশ্চিম আফ্রিকার টোগোল্যাণ্ড ও নাইজিরিয়ার মধ্যবর্তী আটলান্টিক সাগর-বিধৌত তটপ্রদেশে আটত্রিশ হাজার বর্গমাইল জায়গা জুড়ে ডাহোমির অবস্থান। তার লোকসংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ। গত শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসী দস্যুরা হানা দিয়ে ডাহোমির স্বাধীনতা হরণ করেছিল, কিন্তু সম্প্রতি কর্তার চেয়ার ছেড়ে আবার তাদের দর্শকের গ্যালারিতে সরে দাঁড়াতে হয়েছে।

দুই

স্বাধীন ডাহোমির সব চেয়ে বড় বিশেষত্ব ছিল, সেখানে দেশরক্ষা করত পুরুষরা নয়, নারীরা! সাধারণভাবে বলা যায়, ডাহোমির রাজাদের ফৌজে সৈনিকের ব্রত পালন করত সশস্ত্র নারীরা।

আগেই বলা হয়েছে, নারী-ফৌজ কিছু নূতন ব্যাপার নয়। এই শ্রেণীর রণচণ্ডী

● 'বীরাঙ্গনা, পরাক্রমে ভীমা-সমা'
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

নারীদের নাম দেওয়া হয়েছে 'অ্যাম্যাজন'। স্প্যানিয়ার্ডরা দক্ষিণ আমেরিকা আক্রমণ করতে গিয়ে বিভিন্ন নারী-বাহিনীর কাছে বারংবার বাধা পেয়েছিল। তাই তারা সেই দেশের ও সেখানকার প্রধান নদীর নাম দিয়েছিল যথাক্রমে 'অ্যামাজোনিয়া' এবং 'অ্যামাজন'। পৃথিবীতে অ্যামাজন আজও বিখ্যাত নদীদের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার ক'রে আছে—তার দৈর্ঘ্য চার হাজার পাঁচশো এক মাইল।

তবে অন্যান্য দেশে পুরুষদের সঙ্গেই নারীরা যুদ্ধে যোগদান করেছে, কিন্তু ডাহোমির প্রধান যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুষের ছায়াও দেখা যায়নি, সেখানে শত্রুদের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষা করেছে কেবল রণরঙ্গিণীরা। সেখানে অ্যাম্যাজনদের নাম হচ্ছে 'আহোসি'। সব পশ্চিম আফ্রিকায় সকলেই আহোসিদের ভয় করে সত্যসত্যই রায়বাঘিনীর মত।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতে যখন মোগল সাম্রাজ্যের গৌরবের যুগ, তখনই ডাহোমির নারী সেনাদল গঠিত হয়। প্রথমে রাজা আগাদগা বিদ্রোহীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সৈন্যসংখ্যা বাড়াবার জন্যে ফৌজে পুরুষদের সঙ্গে নারীদেরও সাহায্য গ্রহণ করেন। দেখা যায়, বীরত্বে ও রণনিপুণতায় নারীরা হচ্ছেন অসামান্য। তখন আইন হ'ল, ডাহোমির প্রত্যেক আইবুড়ো মেয়েকে পনেরো বছর বয়স হলেই ফৌজে যোগ দিতে হবে। বরাবর চলে আসছে সেই নিয়মই।

আন্দাজ ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা গেজো সিংহাসন পেয়ে সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর কাল রাজ্য-চালনা করেন। তাঁর আগেও ডাহোমির মেয়ে-সেপাইরা অস্ত্র ধ'রে শক্তিপ্রদর্শন করত বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা ছিল না। রাজা গেজোই সর্বপ্রথমে নারীবাহিনীকে সুনিয়ন্ত্রিত ও অধিকতর শক্তিশালী ক'রে তোলেন এবং তার সাহায্যে পার্শ্ববর্তী দেশের পর দেশ জয় ক'রে নিজের পতাকার তলায় আনেন।

সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করবার পর কুমারীদের কঠোর শিক্ষাদীক্ষার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হ'তে হ'ত—একটু এদিক-ওদিক হলেই ছিল প্রাণদণ্ডের আশঙ্কা। কিছুকাল সৈনিকজীবন যাপন করবার পরই তারা কেবল তরবারি, তীর-ধনুক, বল্লম, বন্দুক ও বেয়নেট চালনাতেই সুপটু হয়ে উঠত না, উপরন্তু নিয়মিত ব্যায়ামে তাদের দেহও হয়ে উঠত দস্তুরমত বলিষ্ঠ ও পেশীবদ্ধ। একবার এই রণরঙ্গিণীদের ত্রিশজন অরণ্যে গিয়ে এক মিনিটের মধ্যে বধ করেছিল সাত সাতটা হাতী! সেই থেকে নারী-বাহিনীর একটা বিশেষ দল 'মাতঙ্গমর্দিনীর দল' নামে বিখ্যাত হয়ে আছে।

● 'বীরাঙ্গনা, পরাক্রমে ভীমা-সমা'
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

তিন

ব্যাপারটা একবার ভালো ক'রে তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করুন।

একটিমাত্র ক্রুদ্ধ হাতীর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে ভয় পায় দলে-ভারী পুরুষ-শিকারীরাও। কিন্তু বনচর হাতীর পালের সামনে গিয়ে 'যুদ্ধং দেহি' ব'লে আস্ফালন করতে গেলে যে কতখানি বুকের পাটার দরকার সেটা অনুমান করতে গেলেও হৃৎকম্প হয়!



মিনিটখানেকের মধ্যে সাত সাতটা হাতীকে ধরাশায়ী করল।

পাশ্চাত্য শিকারীদের হাতে থাকে অধিকতর শক্তিশালী আধুনিক বন্দুক এবং যার খোলনলচের ভিতরে থাকে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত হাতী-মারা বুলেট। কিন্তু দলবল নিয়ে তার সাহায্যেও হাতী মারতে গিয়ে কতবার কত লোককে যে মরণদশায় পড়তে হয়েছে গুনে তা বলা যায় না।

মেয়ে-সেপাইরা তেমন বন্দুক চোখেও দেখেনি, এবং সেই বিশজনের প্রত্যেকেরই হাতে যে বন্দুক—অর্থাৎ খেলো বন্দুক ছিল, তাও নয়; অনেকের হাতে ছিল খালি সেকেলে তীর-ধনুক ও বল্লম-তরবারি। হাতীর পালে কত হাতী ছিল তা প্রকাশ পায়নি, তবে বিশজন মেয়ে যখন মিনিটখানেকের মধ্যে সাত-সাতটা হাতী মেরে ধরাশায়ী করতে পেরেছিল তখন হস্তিযূথ যে মস্তবড় ছিল সেটুকু বুঝতে দেরি হয় না।

কিন্তু এখানে সপ্তহস্তীবধের চেয়ে আজব কথা হচ্ছে সেই দুর্ধর্ষ বীরাঙ্গনাদের প্রচণ্ড সাহসের কথা। এমন কাহিনী আর কোনদিন শোনা যায়নি।

ডাহোমির রাজা বিপুল বিস্ময়ে বীরাঙ্গনাদের সাদর অভ্যর্থনা ক'রে বললেন, "আজ থেকে তোমাদের উপাধি হবে 'মাতঙ্গমর্দিনী'!"

● 'বীরাঙ্গনা, পরাক্রমে ভীমা-সমা'
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

তারপর সেই বিশজন মাতঙ্গমর্দিনী নিয়ে গড়া দলে ভর্তি করা হ'তে লাগল নারী-বাহিনীর সেরা সেরা বীরাঙ্গনাকে। যুদ্ধের সময়ে খুব ভেবেচিন্তে কখনো-সখনো ব্যবহার করা হ'ত সেই বাহুবলিনীর দলকে,—কারণ তাদের প্রাণকে মনে করা হ'ত মহামূল্যবান।

কিন্তু তাদের উপরেও নারী-বাহিনীর আর একটা দল ছিল। বন্দুক ছোঁড়ায় সব চেয়ে দক্ষ মেয়ে-সেপাইদের নিয়ে সেই দল গঠিত হ'ত। তাদের প্রত্যেকের আকার হ'ত বলিষ্ঠ ও লম্বাচওড়া এবং কষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। তাদের প্রধান অস্ত্র বন্দুক বা কিরিচ। তাদের পরনে থাকত নীল ও সাদা রঙের জমির ডোরাকাটা আর হাতকাটা জামা এবং হাঁটু পর্যন্ত ঝুলে পড়া ঘাগ্‌রা।

ঐ প্রথম ও দ্বিতীয় দলের অর্থাৎ কিরিচধারিণী ও মাতঙ্গমর্দিনীদের পরেও মেয়ে-ফৌজে ছিল আরো দুই দলের পদাতিক সেপাই।

এক, বন্দুকধারিণীর দল। এদের গড়নপিটন পাতলা ও দেহ ছিপছিপে। খণ্ডযুদ্ধের সময়ে যখন এই দলকে লেলিয়ে দেওয়া হ'ত, তখন দলের অনেকেই মারা পড়লেও কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামাতো না।

আর এক, ধনুকধারিণীর দল। এই দলের মেয়েরা ছিল ফৌজের মধ্যে সব চেয়ে অল্পবয়সী ও দেখতে রূপসী। হাতাহাতি লড়বার জন্যে তারা ছোরা সঙ্গে রাখত।

এই শেষোক্ত দুই দলের সৈনিকরা অন্যান্য জামা-কাপড়ের বদলে কোমরে পরত কেবল কৌপীন এবং অন্যান্য অলংকারের বদলে বাম হাতে রাখত খালি হাতীর দাঁতের বালা।

আড়াই শত বৎসরের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে মেয়ে-সেপাইরা রণকৌশলের চাতুর্য বিশেষ ভাবেই রপ্ত ক'রে ফেলেছিল। তাদের প্রধান একটি ফিকির ছিল, অতর্কিতে শত্রুদের আক্রমণ।

মেয়ে-ফৌজে সৈন্যসংখ্যা ছিল আট হাজার। এবং এই নারী-বাহিনীর পরিচালিকা ছিল, নাম্বিকা।

কবি মাইকেল মধুসূদনের ভাষায় নাম্বিকা হচ্ছে—

"বীরাঙ্গনা, পরাক্রমে ভীমা-সমা!"

হ্যাঁ, যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন অপূর্ব তার গুণপনা, তেমনি ভয়াল তার বীরপনা। প্রকাশ, তার সঙ্গে হাতাহাতি সংঘর্ষে প্রাণদান করতে হয়েছে পাঁচশত শত্রু-যোদ্ধাকে! অমোঘ তার অস্ত্রধারণের শক্তি! এবং অভ্রান্ত তার সৈন্যচালনার দক্ষতা!

যে পুরুষ-কবি সর্বপ্রথমে নারীকে অবলা বলে বর্ণনা করেছিলেন, নাম্বিকাকে স্বচক্ষে দেখলে

● 'বীরাঙ্গনা, পরাক্রমে ভীমা-সমা'
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

তিনি সভয়ে মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হতেন। প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গে নান্সিকার দেহতটে যখন উচ্ছ্বসিত হতে থাকত বলিষ্ঠ যৌবনের ভরাট জোয়ার, তখন তার দুই চক্ষে ঠিকরে উঠে বীর্যবত্তার তীব্র বিদ্যুৎ শত্রুর চিত্তে জাগিয়ে তুলত আসন্ন অশনিপাতের আশঙ্কা!

এই নান্সিকার সঙ্গে য়ুরোপ থেকে আগত ফরাসী দস্যুদের ভীষণ শত্রুতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।

কারণটা খুলে বলা দরকার।

বরাবরই দেখা গিয়েছে য়ুরোপীয় দস্যুরা সওদাগরের বা পরিব্রাজকের বা ধর্মপ্রচারকের ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে এসিয়া ও আফ্রিকার দেশে দেশে গিয়ে অতি নিরীহের মত ধরনা দিয়েছে, তারপর সময় বুঝে ধীরে ধীরে নানা অছিলায় গোপনে শক্তিসঞ্চয় ক'রে হঠাৎ একদিন নিজমূর্তি ধরে রক্তধারায় মাটি ভাসিয়ে এবং দিকে দিকে মৃত্যু ছড়িয়ে সর্বগ্রাস ক'রে বসেছে।

শ্বেতাম্বররা এইভাবে ভারতবর্ষে এসে শিকড় গেড়ে বসেছিল। আফ্রিকাতেও তারা গোড়ার দিকে সেই চালই চালে এবং অন্ধিসন্ধি বুঝে নেয়। কিন্তু ভারতের তুলনায় আফ্রিকা ছিল প্রায় অরক্ষিত, কারণ আগ্নেয়াস্ত্রকে কতক্ষণ ও কতটুকু বাধা দিতে পারে তরবারি, বল্লম ও তীরধনু? দেখতে দেখতে নানাদেশী শ্বেতাম্বররা আফ্রিকার উপরে ক্ষুধিত রাক্ষসের মত ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তার নানা অংশ ছিনিয়ে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি ক'রে নিলে।

পশ্চিম আফ্রিকার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল ফরাসী দস্যুরা। ছলে-বলে-কৌশলে অনেকখানি জায়গা দখল ক'রে নিয়ে অবশেষে তাদের শনির দৃষ্টি নিক্ষেপ করল ডাহোমির উপরে।

ডাহোমি তখনও স্বাধীন। তার সিংহাসনে আসীন রাজা গেলেল।

বেয়ল হচ্ছেন ফরাসীদের এক পদস্থ কর্মচারী। একদিন তিনি এলেন রাজা গেলেলের কাছে—মুখে তাঁর শান্তিদূতের মুখোশ।

রাজা তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন হাসিমুখে। বলা বাহুল্য, বেয়লের মুখে মিষ্ট মিষ্ট বুলির অভাব হ'ল না। সরল রাজা ভুলে গেলেন কথার ছলে।

নান্সিকা ছিল নারী-বাহিনীর অন্যতম পরিচালিকা। অতিশয় বুদ্ধিমতী বলে তার সুনাম ছিল যথেষ্ট। সে আধখানি হাসি বেয়লের মিষ্ট কথায় তুষ্ট হ'ল না—ফন্দিবাজ ফরাসীদের স্বরূপ চিনে ফেলেছিল তার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। বেয়লের ফন্দি ব্যর্থ করবার জন্যে নান্সিকা নানা ভাবে চেষ্টা করতে লাগল।

কিন্তু সে কিছুই করতে পারলে না—ক্রমে ক্রমে রাজা হয়ে পড়লেন বেয়লের হাতের কলের পুতুলের মত। বেয়ল যা বলেন, রাজা তাইতেই সায় দেন।

● 'বীরাঙ্গনা, পরাক্রমে ভীমা-সমা'
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

নাস্কিকা তখন দেশের শত্রুকে বধ করবার জন্যে গোপনে চক্রান্তে প্রবৃত্ত হ'ল

খবরটা রাজার কানে উঠল। খাপ্পা হয়ে বললেন, "আমার বন্ধুর বিরুদ্ধে চক্রান্ত! বন্দী কর নাস্কিকাকে! লাগাও পিঠে সপাসপ্ কোড়ার বাড়ি! বেয়ল যতদিন আমার রাজধানীতে থাকবেন, ততদিন তাকে কারাগার থেকে মুক্তি দিও না।"

তাই হ'ল। বেত্রদণ্ডের পরে নাস্কিকা হ'ল বন্দিনী।

তারপরেই কিন্তু নাস্কিকা রাজার মনে যে সন্দেহের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে গেল, ক্রমে তা হ'ল নির্জলা সত্যে পরিণত। একটু একটু ক'রে রাজার চোখ ফুটতে লাগল বটে, কিন্তু তিনি কোন কিছু করবার আগেই নিজের কাজ ফতে ক'রে বেয়ল বিদায় নিয়ে ফিরে গেলেন

নাস্কিকা আবার কারাগারের বাইরে এসে দাঁড়ালো।

তারপর কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ একদিন হৃৎপীড়ায় আক্রান্ত হয়ে রাজা পড়লেন মৃত্যুমুখে।

প্রজারা হাহাকার করতে লাগল—হায়, হায়, এ যে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত!

নাস্কিকা সুযোগ বুঝে দিকে দিকে রটিয়ে দিলে—"এ হচ্ছে দেশের শত্রু ফরাসীদের কারসাজি! এমন ভাবে মানুষ মারা পড়ে না। দুষ্ট বেয়লের বশীকরণ-মন্ত্রে বশ হয়েই রাজা মারা পড়েছেন—কুহকী ফরাসীদের দেশ থেকে এখনি তাড়াও!"

অরণ্যরাজ্য ডাহোমির নিরক্ষর সব প্রজা—রাজনীতি, কূটনীতি প্রভৃতি অতশত কিছুই বোঝে না, নাস্কিকার কথাই তারা ধ্রুবসত্য ব'লে মেনে নিলে। ফরাসীদের উপরে সকলে খড়্গহস্ত হয়ে উঠল।

নূতন রাজা হয়ে ডাহোমির সিংহাসনে বসলেন বেহান্‌জিন্। নাস্কিকা ছিল তাঁর প্রিয়পাত্রী। তিনি বললেন, "নাস্কিকা! আজ থেকে তুমি হ'লে আমার সমস্ত নারী-বাহিনীর অধিনায়িকা। যাও, শত্রুজয় করে ফিরে এস!"

চার

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ।

কোটোনৌ হচ্ছে ফরাসীদের দ্বারা অধিকৃত একটি দুর্গ-নগর। সেই নগরে থানা দিয়ে বসেছেন ডাহোমির শাসনকর্তারূপে নির্বাচিত জিন বেয়ল।

ডাহোমির নূতন অধিপতি বেহান্‌জিন্ ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, "আমাদের স্বর্গীয় রাজাকে—

আমার পূর্বপুরুষকে ফরাসী কুকুর বেয়ল কুহকমন্ত্রে বধ করেছে! প্রতিশোধ, প্রতিশোধ—আমি প্রতিশোধ চাই!"

রায়ে রায় দিয়ে নাস্তিকা তীব্রস্বরে বললে, "আজ্ঞে হাঁ্যা মহারাজ, প্রতিশোধ! প্রতিশোধ নিতে গেলে প্রথমেই করতে হবে বেয়লের মুণ্ডপাত! তারপর আমাদের স্বদেশ থেকে দূর ক'রে খেদিয়ে দিতে হবে ফরাসী দস্যুদের!"

রাজা বললেন, "উত্তম! যা ভালো বোঝো তাই কর। তোমার সুবুদ্ধির উপরে আমার বিশ্বাস আছে।"

হাতজোড় ক'রে নাস্তিকা বললে, "প্রভু, যদি আমার উপরে ভূতপূর্ব মহারাজের এই বিশ্বাস থাকত, তাহ'লে ব্যাপারটা আজ এতদূর পর্যন্ত গড়াত না।"

রাজা বললেন, "ও কথা এখন যেতে দাও নাস্তিকা! অতীতের ভুল আর শোধরাবার উপায় নেই। বর্তমান সমস্যার সমাধান কর। তোমার অধীনে তো নারী-সেনাদল প্রস্তুত হয়ে আছে—'মাতঙ্গিনীযূথ যথা মত্ত মধু-কালে'! সেই আহোসিদের নিয়ে বেরিয়ে পড় গৌরবপূর্ণ জয়যাত্রায়!"

নাস্তিকা বললে, "যথা আজ্ঞা মহারাজ! এই আমি আপনার আদেশ পালন করতে চললুম।"

সেই অসিকার্মুকধারিণী বলিষ্ঠযৌবনা বীরাঙ্গনা বীরদর্পে পৃথিবীর উপরে সজোরে পদক্ষেপ করতে করতে মনে মনে বললে, "কেবল দেশের জন্যে নয় মহারাজ, কেবল আপনার জন্যেও নয়—সেই সঙ্গে নিজের জন্যেও আজ আমি প্রতিহিংসাব্রত উদ্‌যাপন করতে যাব! সেদিনকার অপমান কি আমি জীবনে ভুলতে পারব? আমি ডাহোমির সেনানায়িকা নাস্তিকা, সকলের সামনে আমার হাতে বেড়ি, পায়ে বেড়ি আর পিঠে কোড়ার বাড়ির পর কোড়ার বাড়ি! শয়তান বেয়ল আর দেশের শত্রু ফরাসী দস্যুরা, ওরাই দায়ী এর জন্যে! ওদের যমালয়ে পাঠাতে না পারলে জীবন থাকতে আমার শান্তি নেই!"

ডিমি-ডিমি-ডিমি-ডিমি বাজতে লাগল কাড়া-নাকাড়া, আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে উড়তে লাগল বর্ণরঞ্জিত পতাকার পর পতাকা, দিকে দিকে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল নাগরিকদের হুংকৃত কণ্ঠের ঘন ঘন জয়োল্লাস এবং নারী-সেনাদের তালে তালে দর্পিত পাদপ্রহারে থর-থর-কম্পিত পৃথিবী যেন আর্তনাদ করতে লাগল সশব্দে!

ফৌজের পুরোভাগে থেকে মাথার উপরে শূন্যে শাণিত বিদ্যুৎচিকন তরবারি আস্ফালন করতে করতে নাস্তিকা উচ্চ, দৃপ্ত স্বরে বার বার ব'লে চলল—"আগে চল্, আগে চল্, আগে চল্!

● 'বীরাঙ্গনা, পরাক্রমে ভীমা-সমা।'

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

শত্রুসংহার করতে হবে, শত্রুসংহার! তোমার শত্রু, আমার শত্রু, রাজার শত্রু, দেশের শত্রু! হয় মারব, নয় মরব, হার স্বীকার করব না! আগে চল্, শত্রুসংহার কর—মার আর মর।”

লামা জলাভূমি—হঠাৎ দেখলে মনে হয় দূরবিস্তৃত বিশাল হ্রদ, বুকে তার নীলিমা মাখিয়ে দেয় আকাশের প্রতিচ্ছায়া!

তারই পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে নাস্তিকার রক্তলোচনা বিভীষণা সঙ্গিনীরা বন্দী ক'রে আনলে একদল ফরাসীকে।

রাজা বেহান্জিনের উৎসাহের সীমা রইল না। লামা হ্রদের তটে দাঁড়িয়েই তিনি প্রকাশ্য-ভাবে পররাজ্যলোভী ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করলেন।

য়ুরোপে যখন এই খবর গিয়ে পৌঁছলো তখন সকলের ওষ্ঠাধরে ফুটে উঠল বাঙ্গহাসির রেখা। কোথায় কোটি কোটি মানুষের বৃহৎ বাসভূমি, সভ্যতায় শীর্ষস্থানীয় ও শক্তিসামর্থ্যের জন্যে সুপ্রসিদ্ধ ফ্রান্স, আর কোথায় অসভ্য কৃষ্ণাঙ্গের জন্মভূমি আফ্রিকার অজানা এক প্রান্তে অবস্থিত মাত্র দশ লক্ষ প্রায়নগ্ন বর্বর মনুষ্যের বন্য স্বদেশ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ডাহোমি! পর্বতের পদতলে নগণ্য নুড়ি, মত্তহস্তীর চলনপথে তুচ্ছ উই, বনস্পতির ছায়ার তলায় ক্ষুদ্র তৃণ। তাঁরা হাসতে হাসতে বলে 'কল—'তারকার মুখে আমি দিয়ে আসি ছাই!' শ্বেতাঙ্গ সেনাপতির একটিমাত্র ইঙ্গিতে লক্ষ লক্ষ সৈনিক ঝড়ের বেগে ছুটে গিয়ে কেবল পায়ের বুটজুতোর চাপেই ডাহোমিকে এখনি সমতল পৃথিবীর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে আসতে পারে!

সুতরাং ফ্রান্সের টনক নড়ল না।

কিন্তু নাস্তিকার যুক্তি হচ্ছে, ছোট্ট বিছাকে ঘাঁটালে সেও পাগলা হাতীকে কামড়ে দিতে ইতস্ততঃ করে না এবং ধুমসো হাতী তখন বিষের জ্বালায় ছটফটিয়ে দৌড় মারতে বাধ্য হয়! অতএব—আগে চল্, আগে চল্! হয় শত্রুবধ, নয় মৃত্যু! অতএব—থামল না ডিমি-ডিমি দামামা-ধ্বনি, আনত হ'ল না দর্পিত ধ্বজপতাকা, স্তব্ধ হ'ল না ক্ষুদ্র ডাহোমির রুদ্র জয়নাদ!

শূন্যে ঝকঝকে তরবারি তুলে, মাথার উপরে শাণিত বল্লম উঁচিয়ে, শরাসনে তীক্ষ্ণমুখ বাণ-যোজন ক'রে সেই মূর্তিমতী চামুণ্ডাবাহিনী বনে বনে খুঁজে বেড়াতে লাগল কোথায় আত্মগোপন ক'রে আছে ফরাসী দস্যুদল!

বনে-মাঠে যখন-তখন যেখানে-সেখানে খণ্ডযুদ্ধের পর খণ্ডযুদ্ধ! ফরাসী পুরুষপুঙ্গবরা অবলা নারীদের দেখে প্রথমে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতে চায় না, কিন্তু তারপরেই মারাত্মক অস্ত্রাঘাতে এক-মুহূর্তের অবহেলার ফলে চিরনিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়ে!

তারপর ডেন্হাম হ্রদের ধারে সাদায়-কালোয়—সাদা-চামড়া পুরুষ এবং কালো-চামড়া মেয়ের—

● 'বীরাঙ্গনা, পরাক্রমে ভীমা-সমা'
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

মধ্যে হাতাহাতি হানাহানি হ'ল বার বার! বন্দুকগর্জন, কোদণ্ডটংকার, তরবারির ঝঞ্ঝনানি, নরনারীর মিলিত কণ্ঠের ভৈরব তর্জন, আহতদের করুণ কাতরানি এবং মরণোন্মুখের অন্তিম চীৎকার কান্তার-প্রান্তর ও আকাশ-বাতাসকে যেন সচকিত ক'রে তুললে!

ফরাসীদের সেনাধ্যক্ষরা স্তম্ভিত! গ্রীক পুরাণ-কাহিনীতে তাঁরা পড়েছেন কি শুনেছেন যে, স্মরণাতীত কাল পূর্বে কোন্ এক সময়ে নাকি রণরঙ্গিণী নারী-বাহিনীর সঙ্গে গ্রীক বীরপুরুষদের তুমুল সংগ্রাম করতে হয়েছিল এবং গ্রীসের পার্থেনন দেবমন্দিরের শিলাপটের উপরে সেই পৌরাণিক যুদ্ধে নিযুক্ত নর-নারীর উৎকীর্ণ মূর্তিচিত্র অনেকে স্বচক্ষে দর্শনও করেছেন।

সে তো কবির কাল্পনিক কাহিনী মাত্র, আর সেই রণরঙ্গিণী নারীরাও শ্বেতাঙ্গিনী!

কিন্তু এই আসন্ন বিংশ শতাব্দীর মুখে বর্বর আফ্রিকায়,—যেখানে কালো কালো ভূতের মত পুরুষগুলো শ্বেতাঙ্গদের দূরে দেখলেও ভেড়ার পালের মত ভয়ে ছুটে পালায় কিংবা কাছে এলে গোলামের মত জুতোর তলায় লুটিয়ে পড়ে, সেখানকার অর্ধোলঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গিনীরা কিনা শ্বেতপুরুষের মুণ্ডচ্ছেদ করবার জন্যে দূর থেকে হুংকার তুলে খাঁড়া নিয়ে ধেয়ে আসে!

এই কল্পনাতীত দৃশ্যের কথা ভেবে শ্বেতাঙ্গ যোদ্ধারা বিপুল বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁদের চাঙ্গা ক'রে তুলে অদূরে জাগে শত শত কামিনীকণ্ঠে খলখল অট্টহাস্যরোল এবং তারও উপরে গলা তুলে উদ্দীপিত স্বরে সচীৎকারে কে বলে ওঠে—"আগে চল্, আগে চল্! শত্রু মার্, শত্রু মার্!" তারপর চোখের পলক পড়তে না পড়তে জঙ্গলের অন্তরাল থেকে সহসা বেরিয়ে হন্নে হয়ে অস্ত্র আস্ফালন করতে করতে ছুটে আসে সারি সারি বীরনারীর দল! পর মুহূর্তেই ধুন্ধুমার, চন্দ্রংকার, ধনুষ্টংকার ও তরবারি ঝনংকার!

কুসুমকোমলা বলে কথিত রমণীদের এমন সংহার-মূর্তি ফরাসীরা আর কখনো দেখেনি!

কিন্তু ফরাসীরা মার খেয়ে মার হজম করতে বাধ্য হ'ল তখনকার মত।

সেই দুর্দমনীয়-নারী-বাহিনী পিছু হটতে জানে না, বীরবিক্রমে এগিয়ে আসে আর এগিয়ে আসে!

বীরাঙ্গনারা মারতে মারতে ছুটে চলে, মরতে মরতে মারণ-অস্ত্র চালায়! মৃত্যুভয় ভুলে যারা রক্তস্নান করে এবং হাসতে হাসতে প্রাণ-কাড়াকাড়ি খেলায় মাতে, কে লড়াই করবে তাদের সঙ্গে?

এই অদ্ভুত সংবাদ সাগর পার হয়ে পৌঁছলো গিয়ে ফ্রান্সের বড় কর্তার কাছে। তাঁরাও প্রথমটা হতবাক হয়ে গেলেন মহাবিস্ময়ে!

সকলে দারুণ মর্মপীড়ায় কাহিল হয়ে পড়লেন। একদল অরণ্যচারিণী নগণ্য কৃষ্ণাঙ্গীর প্রতাপে

কীর্তিমান ফ্রান্সের শ্বেত পুরুষত্ব নস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে, এ কথা শুনলে য়ুরোপের অন্যান্য দেশ টিটকারী দিতে ও হাসাহাসি করতে বাকি রাখবে না!

অবিলম্বে এর একটা বিহিত করা চাই।

উপরওয়ালাদের হুকুমে তখনি তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। তার কয়েক মাস পরে যথাসময়ে ডাহোমির দিকে পাঠানো হ'ল দলে দলে নতুন সৈন্য, বড় বড় কামান এবং ভারে ভারে বারুদ।

প্রধান সেনাপতি হয়ে গেলেন জেনারেল সিবাস্টিয়ান টেরিলন। তিনি আড্ডা গেড়ে বসলেন দুর্গ-নগরী কোটোনোয়ের উপকণ্ঠে।

পাঁচ

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ। দুর্গ-নগরী কোটোনো।

তার চতুর্দিকে ধূ-ধূ-ধূ তেপান্তর। এবং তেপান্তরের পর দুর্গম কান্তার—বাইরে থেকে তার ভিতরে প্রবেশ করা এবং ভিতর থেকে তার বাইরে বেরিয়ে আসা দুইই সমান কষ্টসাধ্য।

কিন্তু বনচর জীবরা বনের গোপন পথ জানে। রণরঙ্গিণী অ্যামাজনরা হচ্ছে বনরাজ্যের অন্তঃপুরচারিণী—অবহেলায় এড়িয়ে চলতে জানে যে কোন অরণ্য বাধাবন্ধ।

দুর্গের অদূরেই মাঠের উপরে পড়েছে সৈনিকদের ছাউনি। সেখানে এক তাঁবুর ভিতরে বসে ফরাসীদের দ্বারা প্রেরিত শাসনকর্তা আমাদের পূর্বপরিচিত বেয়ল, জেনারেল টেরিলন ও আরো দুইজন পদস্থ সেনানী মদ্যপান করতে করতে আলোচনায় নিযুক্ত ছিলেন।

টেরিলনের চেহারা যেন তালপাতার সেপাই! মেজাজ তাঁর এমন কঠিন যে ভাঙলেও মচকাতে চায় না। ফৌজের সৈনিকদের কাছে তিনি ছিলেন চোখের বালির মত দুঃসহ। তিনি তাচ্ছিল্যভরা কণ্ঠে বলছিলেন, "আরে ছোঃ! অস্ত্র ধরলে কি হবে, ওরা তো স্ত্রীলোক—তুচ্ছ স্ত্রীলোক ছাড়া আর কিছুই নয়!"

বেয়ল নারী-যোদ্ধাদের কেরামত হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন,—বললেন, "কিন্তু তারা বলিষ্ঠদেহা, সাংঘাতিক!"

—"তাহ'লে আমার সঙ্গে আরো দ্বিগুণ সৈন্য পাঠানো হ'ল না কেন?"

এইবারে আলোচনায় যোগ দিলেন কাপ্তেন আউডার্ড, এতক্ষণ তিনি একমনে বসে বসে চুমুকের পর চুমুকে খালি করছিলেন মদের গেলাসের পর গেলাস। অধার্মিক ও কর্কশ প্রকৃতির লোক। খুনোখুনির সুযোগ পেলেই খুশি! লম্বাচওড়া রোমশ দৈত্যের মত চেহারা। তিনি

লড়াই ক'রে বললেন, "জেনারেল, কি হবে আরো সৈন্যে? স্ত্রীলোকগুলোকে শিক্ষা দেবার জন্যে আমি প্রস্তুত! আর যাইই হোক্, পুরুষের মত তারাও তো মরতে বাধ্য?"

চেয়ারের পিছনদিকে হেলে প'ড়ে বেয়ল বিরক্তিভরে ঘোঁত-ঘোঁত ক'রে উঠলেন। বললেন, "আউডার্ড, তুমি সাহসী বটে। কিন্তু তুমি তো কখনো রায়বাঘিনীদের সঙ্গে লড়াই করনি! দেখো, কালই তুমি তাদের হাতে পঞ্চত্বলাভ করবে। জেনারেল, তোমাকেও তারা মারবে। আর মুসেট, তুমিও বাঁচবে না!"

শেষোক্ত ব্যক্তি হচ্ছেন লেফটেনান্ট চার্লস্ মুসেট। তিনি হাঁ না, কিছুই না বলে ব্রাণ্ডির গেলাসে চুমুক দিতে লাগলেন মৌনমুখে। বোধ হয় এসব কথা তাঁর মনে হচ্ছিল বাজে বক্‌বকানি!

নিজের শেষ গেলাসটা খালি ক'রে উঠে দাঁড়ালেন জেনারেল। তারপর টলতে টলতে তাঁবুর এককোণে গিয়ে বিছানার উপরে ধপাস্ ক'রে লম্বা হয়ে শুয়ে প'ড়ে বললেন, "এখন থো কর এ-সব কথা। রাত হয়েছে, আমি শ্রান্ত।"

কিন্তু বেয়লের মুখে বন্ধ হ'ল না কথার তোড়। তিনি বললেন, "ঘুমনো হচ্ছে বোকামি। আহোমিরা আক্রমণ করবে দুপুর রাত থেকে সূর্যোদয়ের মধ্যেই।"

আউডার্ড ব্যঙ্গভরে বললে, "কিন্তু তাদের আদর করবার জন্যে আমরা তো তৈরী হয়েই আছি! কি বল হে মুসেট, তাই কিনা?" বলেই তাঁকে এক গুঁতো মারলেন।

কিন্তু গুঁতো খেয়েও মুসেটের মুখে রা ফুটল না। নেশাটা বোধ করি বড়ই জমে উঠেছিল!

উত্তেজিত কণ্ঠে ক্ষিপ্তের মত বেয়ল বললেন, "শোনো, শোনো, তোমরা বুঝতে পারছ না কেন? রায়বাঘিনীরা দিনের খট্‌খটে আলোয় লড়াই করে না। সূর্যোদয়ের পূর্ব-মুহূর্তেই তারা করে আক্রমণ!"

কেবা শোনে কার কথা! "নির্বোধ! মূর্খ!" বলে বেয়ল হতাশ হয়ে গজরাতে গজরাতে ফিরে গেলেন নিজের তাঁবুতে।

কিন্তু তখনো পর্যন্ত তিনিও জানতেন না যে, ডাহোমির রাজা বেহান্‌জিন সেই দিনই—অর্থাৎ মার্চ মাসের চার তারিখেই—ফরাসীদের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধের পর কোটোনৌ দুর্গ-নগরী অধিকার বা অবরোধ করবার আদেশ দিয়েছেন!

ছয়

নিজের বস্ত্রাবাসে প্রবেশ ক'রে বেয়ল ক্রুদ্ধস্বরে আবার বললেন, "নির্বোধ মূর্খের দল!"

খানিকক্ষণ বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ ক'রেও ঘুম এল না। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, রাত সাড়ে চারটা।

শয্যায় উঠে বসে নিজের দুটো রিভলভারের কলকব্জা ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা ক'রে দেখলেন। চোখ তুলে লক্ষ্য করলেন দেওয়ালে যথাস্থানেই ঝুলছে 'ম্যানলিকার' বন্দুকটা—আর আটটা টোটায় ভরা।

নিজের মনে-মনেই বললেন, "হয়তো আউডার্ডের মত লোক নয়—প্রস্তুত হয়ে থাকো। আহোসিদের কাছে আসতে দাও, তারপর বন্দুক ছুঁড়ে ভূমিসাৎ কর। একমাত্র আশার কথা এই যে বেশীর ভাগ রায়বাঘিনীর হাতেই বন্দুক নেই! ধনুক, বর্শা, তরবারি,—বন্দুকের সামনে ও-সব তো খোকাখুকীর খেলনা ছাড়া আর কিছুই নয়! তবে মুশকিলের কথাও আছে! রায়বাঘিনীরা দলে ভারী!"

গুম্, গুম্, গুম্, গুম্! আচম্বিতে বন্দুকের পর বন্দুকের গর্জ্জন!

একলাফে শয্যা ছেড়ে বেয়ল বলে উঠলেন, "তারা আসছে, তারা আসছে, তারা আসছে!"

তাড়াতাড়ি পটমণ্ডপের বাইরে বেরিয়ে প'ড়ে বেয়ল মুখ তুলে দেখলেন, পূর্ব-নাট্যশালায় মহিমময়ী উষার শ্বেতপদ্মের মত শুভ্র আলোর পাপড়ি ফুটে উঠছে ধীরে ধীরে।

বেয়ল বললেন, "জানি, আমি জানি! এই তো আহোসিদের আক্রমণের মাহেন্দ্রক্ষণ!"

বন্দুকের গুড়ুম্-গুড়ুম্ শব্দে জেনারেল টেরিলনেরও ঘুম ভেঙে গেল সচমকে। তিনি তাড়াতাড়ি উঠে একটা বাঁশিতে জোরে ফুঁ দিয়ে করলেন উচ্চ সংকেতধ্বনি!



মাটির উপর পড়ে গেলেন জেনারেল টেরিলন, তীর বাণে বিদ্ধ হয়েছে তাঁর উরুদেশ। [পৃষ্ঠা ৩০০

তৎক্ষণাৎ কোথা থেকে বেজে উঠল রণতূর্য। সঙ্গে সঙ্গে কামানগুলোর মুখে মুখে জাগল আরক্ত আলোকচমক ও গুরু গুরু বাজের ধমক! আউডার্ড ও দুসেট ছুটে যথাস্থানে গিয়ে দাঁড়ালেন—অন্যান্য সৈনিকরাও শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দখল করলে নিজের নিজের জায়গা।

● 'বীরাঙ্গনা, পরাক্রমে ভীমা-সমা'
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

খ্যাক্ খ্যাক্ করে ক্রুদ্ধ স্বরে টেরিলন বলে উঠলেন, "পাজী জানোয়ারের দল! আমাকে জুতো পরবারও সময় দিলে না!"

অধিকাংশ রণরঙ্গিনীরই সম্বল বল্লম ও তীরধনু বটে, তবে অনেকের হাতে বন্দুকও ছিল। ঝাঁকে ঝাঁকে বাণের সঙ্গে গরমাগরম বুলেটও ছুটোছুটি করতে লাগল ঘৃণিত য়ুরোপীয়দের শ্বেত অঙ্গ ছিদ্রময় করবার জন্যে।

কাটা গাছের গুঁড়ি ও বালিভরা থলের আড়ালে আত্মগোপন ক'রে বেয়লও বন্দুক তুলে বুলেট-বৃষ্টি করতে লাগলেন।

এক জায়গায় সুযোগ পেয়ে একদল রায়বাঘিনী ফরাসী ফৌজের মাঝখানে ঢুকে পড়বার চেষ্টা করলে, ফরাসীদের প্রচণ্ড অগ্নিবৃষ্টিকে তারা একটুও আমলে আনলে না।

ব্যাপার ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠল। বার্তাবহ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসে নতুন বিপদের খবর জানালে।

টেরিলন চীৎকার ক'রে বললেন, "হা ভগবান! আভোসিরা আমাদের একটা কামান কেড়ে নিয়েছে! আমাদের একজন সৈনিকেরও মাথা কাটা গিয়েছে!"

বেয়ল বললেন, "নিশ্চয় ঘুমোচ্ছিল। যেমন কর্ম তেমনি ফল!"

তেড়ে এল একঝাঁক চোখা চোখা বাণ, চটপট সেখান থেকে চম্পট দিলেন টেরিলন! বেয়ল যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলেন।

রায়বাঘিনীদের আর একটা দল ধেয়ে এল—ফরাসীদের কামানগুলো করলে প্রচণ্ড অগ্নিবৃষ্টি।

হতাহত হয়ে একটা দল ভেঙে যায়—কিন্তু তুরন্ত তেড়ে আসে নতুন আর একটা দলের শত শত বীরাঙ্গনা! তাদের মরণভয় নেই—তারা মরতে মরতেও মারতে চাইবে!

দৌড়োতে দৌড়োতে মুসেট ডাকলেন, "গভর্নর বেয়ল! গভর্নর—" কথা আর শেষ হ'ল না—শোনা গেল ধনুকের টংকার শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে তরুণ মুসেটের দেহ পপাত ধরণীতলে! একটা বাণ তাঁর কণ্ঠে এবং আর একটা বাণ বিদ্ধ হয়েছে তাঁর চক্ষে!

জন ছয় নারী-যোদ্ধা খন্‌খনে গলায় চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে বল্লম উঁচিয়ে ফরাসী ব্যূহের ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়ল মরিয়ার মত।

বেয়ল বন্দুকের কুঁদোর চোটে একজনের মাথা চুরমার ক'রে দিলেন, গুলি ক'রে মেরে ফেললেন আর একজনকে এবং তৃতীয় তরুণীকে ধরাশায়ী করলেন বেওনেটের খোঁচায়। চতুর্থ ও পঞ্চম জন মারা পড়ল অন্যান্য সৈনিকের কবলে। ষষ্ঠজনও পালিয়ে যেতে যেতে মরণাহত হ'য়ে মাটির উপরে আছড়ে পড়ল।

● 'বীরাঙ্গনা, পরাক্রমে ভীমা-সমা'
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

আপাতত এই পর্যন্ত।

বেহান্‌জিনের দ্বারা প্রেরিত প্রথম দলের আক্রমণ ব্যর্থ।

বেয়ল বললেন, "হে ভগবান, আবার যদি আক্রমণ হয় তাহ'লে আমাদের আর রক্ষা নেই!" মাথার ঘাম মুছতে মুছতে ভীরু চোখ বুলোতে লাগলেন এদিকে ওদিকে। শিবিরের উপরে বারুদের ধোঁয়া জমে আছে মেঘের মত।

একটা সিগারেট ধরিয়ে বেয়ল চারদিকে আর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। মাঠ ছেয়ে আছে নারী-সৈনিকদের শতশত আড়ষ্ট মৃতদেহে। ফরাসী সৈনিকদের দেহও দেখা যাচ্ছে এখানে ওখানে। সেই মর্মন্তুদ রক্তরঞ্জিত দৃশ্যের উপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে তিনি মনে মনে বললেন,—আহোসিরা যে খেলাঘরের সেপাই নয়, আশা করি টেরিলন এতক্ষণে তা দস্তুরমত সমঝে নিয়েছে!



একটা অব্যর্থ বাণ এসে কাপ্তেন আউডার্ড-এর মুখ ফোঁড় করে দিলে। [পৃষ্ঠা ২৫:

হ্যাঁ, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। যে কামানটা আহোসিরা কেড়ে নিয়েছিল, সেটা আবার দখল করবার জন্যে টেরিলন পাঠিয়েছিলেন চল্লিশজন ফরাসী সৈনিক। কামানটা পুনরধিকার ক'রে তারা ফিরে এসেছে বটে, কিন্তু পিছনে মাঠের উপরে রেখে এসেছে আঠারো জন সঙ্গীর মৃতদেহ।

টেরিলন ও আউডার্ড এতক্ষণ পরে বেয়লের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

বেয়ল বললেন, "এইবারে সমগ্র নারী-বাহিনী আমাদের আক্রমণ করতে আসবে। এই দ্বিতীয় আক্রমণ ঠেকাতে না পারলেই সর্বনাশ!"

টেরিলন বললেন, "আমাদের কামানগুলো প্রস্তুত হয়েই আছে। দ্বিতীয় দলের সৈন্যসংখ্যা কত হতে পারে?"

—"অন্তত তিন হাজার।"

—"কিন্তু কামানের বিরুদ্ধে ধনুকের তীর কি করতে পারে?"

● 'বীরাঙ্গনা, পরাক্রমে ভীমা-সমা'
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

বেয়ল বললেন, "ও প্রশ্নের উত্তরে মুসেট কি বলে শোনো না!"

টেরিলন বললেন, "মুসেটের মৃত্যু নিয়ে কি তুমি কৌতুক করতে চাও?"

বেয়ল জবাব দেবার সময় পেলেন না। কারণ দূর থেকে রক্ষীর উচ্চকণ্ঠে ভয়াল ধ্বনি জাগল—"আহোসিয়া আসছে! আহোসিয়া আসছে!"

সাত

বেয়ল বললেন, "এবারে ওরা সহজে ছাড়বে না, মরণ-কামড় দেবার চেষ্টা করবে!"

আবার শুরু হয়ে গেল কামান-বন্দুকের বজ্র-হুংকার! কিন্তু নারী-ফৌজের অগ্রগতি বন্ধ হ'ল না—সারির পর সারি বন্যা-তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত আছড়ে আছড়ে পড়তে লাগল ফরাসী-ব্যূহের উপরে। ফরাসীদের অগ্নিবৃষ্টির তোড়ে হতাহত শত্রুরা যেখানে যেখানে পঙ্‌ক্তির মধ্যে ফাঁক সৃষ্টি করে, সেইখানেই নূতন নূতন রণরঙ্গিণী আবির্ভূত হয়ে ফাঁক ভরিয়ে তোলে। নিক্ষিপ্ত বল্লম ও তীরের আঘাতেও ফরাসী সৈনিকরা রক্তাক্ত পৃথিবীর উপরে লুটিয়ে পড়ে। শত শত সঙ্গিনীর মৃত্যুও আহোসিদের সেই ভয়াবহ অগ্রগতি রুদ্ধ করতে পারলে না—তাদের কাছে মৃত্যু যেন ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য নয়! যত লোক মরে, তত যেন বাড়ে বীরবালাদের মরণানন্দ!

বেয়ল হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "ওরা উন্মাদিনী, ওরা হার মানতে জানে না!"

আচম্বিতে জেনারেল টেরিলন মাটির উপরে আছাড় খেয়ে পড়লেন, তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ হয়েছে তাঁর উরুদেশ! একহাতে বাণটাকে ক্ষতস্থান থেকে টেনে বার করতে করতে নিজের ধূমায়িত রিভলভার তুলে তিনি সমানে গুলি চালাতে লাগলেন।

সামনেকার অংশের খানিকটা বিচ্ছিন্ন করতে পেরে বীরাঙ্গনারা ব্যূহের গভীরতম অংশে ঢুকে পড়বার জন্যে আক্রমণের পর আক্রমণ চালাতে লাগল। যত আক্রমণ ব্যর্থ হয়, তত তাদের জেদ বেড়ে ওঠে—যেন হাজার জন প্রাণ দিলেও তারা আক্রমণ করতে ছাড়বে না! কিন্তু অসম্ভব সম্ভব হ'ল না, ফরাসী কামানগুলো অজস্র অগ্নিময় গোলা নিক্ষেপ ক'রে তাদের ঠেকিয়ে রাখলে শেষ পর্যন্ত। অসংখ্য নারী-সৈনিকের মৃতদেহ স্তূপীকৃত হয়ে উঠল রণক্ষেত্রে।

তারপর আচম্বিতে! দূর থেকে রাজা বেহান্‌জিনের রণশিঙা বেজে উঠে আজকের মত যুদ্ধে সমাপ্তিঘোষণা করলে! এক মুহূর্তে, একসঙ্গে প্রত্যেক নারী-সৈনিক ফিরে দাঁড়িয়ে রণক্ষেত্র থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল দুঃস্বপ্নের মত!

রাজার আদেশ অমোঘ!

বেয়ল বললেন, "রাজার হুকুম না পেলে ওরা এখনো আমাদের ছাড়ত না।"

'বীরাঙ্গনা, রণক্ষেত্রে লীলা-সখা'

তীরটা উপড়ে ফেলে ক্ষতস্থানে 'ব্যাণ্ডেজ' বাঁধতে বাঁধতে টেরিলন বললেন, "তবু ওরা আমাদের কখনোই হারাতে পারত না!"

বেয়ল মুখে মত জাহির করলেন না, কিন্তু মনে মনে বললেন, উদ্ধত! নির্বুদ্ধির ঢেঁকি!

রক্তগঙ্গা বয়ে-যাওয়া মৃত্যুভীষণ রণক্ষেত্রের দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করলেন। আন্দাজী হিসাবে তাঁর মনে হ'ল, ওখানে প'ড়ে আছে অন্তত একহাজার বীরাঙ্গনার শবদেহ।

তিনি পা চালাতে চালাতে বললেন, "টেরিলন, খানিকটা মদ না হ'লে আমার আর চলবে না। আমি নিজের তাঁবুতে যাচ্ছি।"

টেরিলন বললেন, "আমিও শীঘ্রই তোমার কাছে গিয়ে বিজয়োৎসবে যোগদান করব।"

আট

নিজের পটগৃহে বসে বেয়ল লোকমুখে ফরাসীপক্ষের হতাহতের খবরাখবর নিলেন।

ফরাসীদের পঁচাত্তর জন সৈনিক মৃত্যুমুখে পড়েছে। আহতদের সংখ্যা আরো অনেক বেশী। মৃতদের মধ্যে ছিলেন বাক্যবাগীশ কাপ্তেন আউডার্ডও। প্রত্যাবর্তনের সময়ে বীরাঙ্গনাদের একটা অব্যর্থ বাণ এজীবনের মত তাঁর মুখর মুখ মৌন ক'রে দিয়ে গেছে!

আচম্‌কা তাঁবুর একটা ছায়াময় প্রান্ত থেকে গর্জিতকণ্ঠস্বরে শোনা গেল—"ওরে ফরাসী শূকর, আজ আর আমার হাত থেকে তোর নিস্তার নেই।"

সবিস্ময়ে বেয়ল কয়েক পদ পিছিয়ে গেলেন। তাঁর দৃষ্টির সামনে এসে দাঁড়াল ক্রোধভীষণা, দীপ্তনয়না নাজিকা স্বয়ং! ধনুকে যোজন করেছে সে এক শাণিত তীর! একান্ত অভাবিত দৃশ্য!

বেয়ল লাফ মেরে একটা রিভলভার হস্তগত করলেন, কিন্তু সেটা ব্যবহার করবার আগেই নাজিকার নিক্ষিপ্ত তীর এসে তাঁর স্কন্ধদেশ বিদীর্ণ করলে, মাটির উপরে প'ড়ে গেল রিভলভারটা।

হিংস্র জন্তুর মত ঝাঁপিয়ে প'ড়ে নাজিকা ক্ষিপ্রহস্তে চকচকে ছোরা তুলে তাঁকে আঘাত করতে গেল, কিন্তু বিদ্যুৎবেগে পাশ কাটিয়ে বেয়ল সে চোট সামলে নিয়ে একলাফে গিয়ে পড়লেন নাজিকার উপরে—ধাক্কার চোটে তার হাত থেকে ছোরাখানা মাটির উপরে প'ড়ে গেল ঝন্‌-ঝন্‌ শব্দে! পরমুহূর্তে গৃহতলে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন দু'জনেই—নীচে বেয়ল, উপরে নাজিকা।

হাঁটু দিয়ে নাজিকা এত জোরে বেয়লের তলপেটে আঘাত করলে যে তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়তে পড়তে কোনরকমে নিজেকে সামলে নিলেন।

তারপর চোখের নিমেষে মাটির উপর থেকে একরাশ ধুলো তুলে নিয়ে তিনি ছুঁড়ে মারলেন নাগ্নিকার চোখে। মুহূর্তেকের জন্যে নাগ্নিকা অন্ধ!

সেই অবসরে শত্রুর হাত ছাড়িয়ে বেয়ল টপ্ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের তরবারিখানা টেনে নিলেন, কিন্তু ততক্ষণে নাগ্নিকাও চকিতে আবার তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তরবারিশুদ্ধ হাত সজোরে চেপে ধরলে। এবং কি আশ্চর্য শক্তির অধিকারিণী এই বীরনারী, তার প্রবল হাতের চাপে বেয়লের শিথিল মুষ্টি থেকে খ'সে পড়ল তরবারিখানা!



বেয়লের রিভলভার গর্জন করে উঠল একবার, দু'বার!

নাগ্নিকা যেই হেঁট হয়ে তরবারি কুড়িয়ে নিতে গেল, বেয়ল দিলেন তাকে এক প্রচণ্ড ঠেলা। পরমুহূর্তেই নিজের কোমরবন্ধ থেকে বার ক'রে ফেললেন দ্বিতীয় একটা রিভলভার।

চরম আঘাত হানবার জন্যে নাগ্নিকা তরবারি তুলে তেড়ে এল তীরবেগে।

বেয়লের রিভলভার গর্জন করলে একবার, দু'বার!

নাগ্নিকার দেহ হ'ল ভূতলশায়ী।

বাহির থেকে ফরাসী সৈনিকরা তীর-বেগে তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করল—সকলের পিছনে পিছনে টেরিলন।

হাঁপাতে হাঁপাতে ম্লান হাসি হেসে বেয়ল বললেন, "আজ আমি মূর্তিমতী মৃত্যুর কবলে গিয়ে পড়েছিলুম!" তারপর বিবশ হয়ে বসে পড়লেন।

অবশিষ্ট

রণাঙ্গনে বীরাঙ্গনাদের সেইই হচ্ছে শেষ রণরঙ্গ।

তার সাত সপ্তাহ পরে রাজা বেহানজিন নারী-সেনাদের ভাঙা দল আর পুরুষ সৈনিকদের নিয়ে

● 'বীরাঙ্গনা, পরাক্রমে ভীমা-সমা'
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

আর একবার বাধা দিতে অগ্রসর হন, কিন্তু শোচনীয়রূপে হেরে যান। তারপর কিছুকাল বনে-বাদাড়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়ে অবশেষে বিনা শর্ত্তে আত্মসমর্পণ করলেন। এবং ফৌজ ও অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে মেয়েরাও আবার অন্তঃপুরে ফিরে গিয়ে হেঁসেলে ঢুকে হাতা-খুন্তি নাড়তে লেগে গেল!

*   *   *   *   *

আজ কিন্তু চাকা আবার ঘুরে গিয়েছে।

আটান্ন বৎসর আগে, ডাহোমির স্বাধীনতা রক্ষা করতে গিয়ে দেশের শত্রুর হাতে প্রাণ দিয়েছিল বীরবালিকা নান্সিকা।

কিন্তু আজ আর ডাহোমি পরাধীন নয়। যুগধর্মের গতি বুঝে ফরাসীরা আজ প্রভুর উচ্চাসন ছেড়ে নেমে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে। ডাহোমির বাসিন্দারা আজ স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী।

শান্তিলাভ করেছে নান্সিকার আত্মা।

সোনালী কথা

এ ডল্‌স্ হাউস্ (ইব্‌সেন)

রাজনীতির ইতিহাসে যেমন দেখা যায়, হঠাৎ একজন অদ্ভুতকর্মা বিপ্লবী এসে শতাব্দীর ব্যবস্থাকে উলটে পালটে সম্পূর্ণ নতুন ব্যবস্থার সৃষ্টি করে যান, তেমনি সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায়, হঠাৎ একখানা বই এসে মানুষের শতাব্দীর চিন্তাধারাকে ভেঙে চুরমার করে একটা নতুন চিন্তাধারার প্রবর্ত্তন করলো। নরওয়ের জগৎখ্যাত সাহিত্যিক ইব্‌সেনের লেখা, এ ডল্‌স্ হাউস্ (পুতুল ঘর) নাটকখানি সেইরকম একখানি যুগান্তকারী বই। এই নাটক থেকে সৃষ্টি হয় আজকের আধুনিক নারী, যে নারী সকল ব্যাপারে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাবি করে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য। পৃথিবীর প্রগতিশীল প্রত্যেক সাহিত্যের চিন্তাধারায় ইব্‌সেনের এই নাটক প্রত্যক্ষভাবে তীব্র প্রভাব বিস্তার করে এবং এই নাটকের প্রভাবে পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্যদেশে মানুষ, পুরুষ ও নারীর সম্পর্ককে নতুন করে দেখতে প্রেরণা পায়। এই নাটকের নায়িকা নোরা আজকের স্বাধীনতা-কামী আধুনিকা নারীর পথ-প্রদর্শিকা। নোরা শিক্ষিতা মেয়ে, তাঁর স্বামী হেল্‌মার সম্ভ্রান্ত সমাজের একজন। সামান্য ছোটখাটো ঘটনা থেকে স্বামী স্ত্রীর মতান্তর হতে থাকে এবং স্বামী নিজের কর্তৃত্বের দাবিতে সব জিনিস চাপা দিতে চান। নোরা সাধারণ মেয়ের মতন স্বামীর সঙ্গে কুৎসিত ঝগড়া করেন না, তিনি স্বামীকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, স্ত্রী-হিসাবে তাঁর একটা স্থান আছে, তাকে স্বামী হিসাবে তাঁকে সম্মান করতে হবে। কিন্তু স্বামীর ভুল বোঝার ফলে একদিন নোরার আত্ম-সম্মান-বোধে তীব্র আঘাত লাগে এবং তিনি স্বামীর আশ্রয় ছেড়ে চলে যাবার সংকল্প করেন। সেই সময় স্বামী তাঁর ভুল বুঝতে পারেন কিন্তু নোরা আর ফেরেন না। যে-সম্বন্ধ ভেতর থেকে ভেঙে গিয়েছে, বাইরের জোড়াতাড়া দিয়ে তার বোঝা বয়ে চলা জীবনের মস্ত ভুল, তাই সে-পুতুল-ঘর ফেলে নোরা বেরিয়ে পড়েন বিপুল বিশ্বে।



মা

—শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

তোমাদের মধ্যে যারা কিছুটা বড় হয়েছ, নিশ্চয়ই শরৎচন্দ্রের 'অরক্ষণীয়া' পড়েছ। মনে আছে নিশ্চয়, অতুল শ্মশানঘাট থেকে নিয়ে এল জ্ঞানদাকে এবং অতুলের-দেওয়া অকিঞ্চিৎকর অথচ মহামূল্য ভাঙা কাচের চুড়ির টুকরোগুলোকেও। তার থেকে তোমাদের মনে এই ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক যে, এর পরে অতুল রূপহীনা কিন্তু অশেষ গুণবতী জ্ঞানদাকে বিয়ে করলে।

চুপি চুপি বলি, জ্ঞানদাকে আমি জানতাম। সে আমাদের পাড়ারই মেয়ে। আমরা তাকে জ্ঞানোদিদি বলতাম। অতুলবাবুকে মনে পড়ে না। আমরা তখন ছোট। সেজন্যেও বটে, আবার অতুলবাবু আমাদের গ্রামে আসতেনও কম। কিন্তু এটা জানি, অতুলবাবু শেষ পর্যন্ত জ্ঞানোদিদিকে বিয়ে করেননি।

এখন ভাবতে পারি, অতুলবাবু সেই জাতের লোক, উচ্ছ্বাসের মুখে যাঁরা মস্ত বড় প্রতিজ্ঞা করে বসেন, কিন্তু কাজের সময় পিছিয়ে যান। জ্ঞানোদিদির বাপের মৃত্যুকালেও তিনি আশা দিয়েছিলেন, রাখেননি। জ্ঞানোদিদির মায়ের চিতাভস্মের সামনেও কথা দিয়ে রাখেননি।

লজ্জায়, ঘৃণায় জ্ঞানোদিদি যখন মর-মর তখন কে তাকে বিয়ে করল জানো? নগেন চাটুয্যে। তার নাম তোমাদের শোনবার কথা নয়। কিন্তু আমাদের অঞ্চলের অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। চুরি-ডাকাতি থেকে আরম্ভ করে হেন দুষ্কার্য নেই যা তার অসাধ্য ছিল।



লক্ষ্মী ঠানদি বললে, ওর কথা আর বলিসনি ভাই।...... [পৃষ্ঠা ২৫

সেকালে এরকম ব্যক্তিরও বিবাহে অসুবিধা ছিল না। কত মেয়ের বাপ এই কুলীন-সন্তানকে মেয়ে দেবার জন্যে উন্মুখ ছিল। সেই লোক যখন সমস্ত লাভজনক বিবাহ-প্রস্তাব বাঁ হাত দিয়ে ঠেলে ফেলে জ্ঞানোদিদিকে বিবাহ করার সংকল্প ঘোষণা করল, তখন সবাই অবাক হয়ে গেল। জ্ঞানী লোকেরা মাথা নেড়ে বললেন, ওরকম বোম্বেটে বদমাইশের অসাধ্য কোনো কাজ নেই।

এবং হিতৈষীদের হিতবাক্য, জ্ঞানী লোকের সুপরামর্শ কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ না করে সত্যই একদিন সে জ্ঞানোদিদিকে বিবাহ করে ঘরে নিয়ে এল। এমন কি, ওরই মধ্যে সাধ্যমত ধুমধামের আয়োজনও করেছিল।

নিতান্ত শিশু তো ছিলাম না। চাঁদনাতলায় জ্ঞানোদিদির

● বা

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

বসাটা বেশ মনে পড়ে। তখন তার বসবার ক্ষমতা নেই, এমন দুর্বল। রোগে-শোকে কালো রংটা যেন আরও কিরকম হয়ে গিয়েছিল। মাথায় চুল নেই বললেই চলে। তার সেই 'পোড়া কাঠ' মামীই তাকে সম্প্রদান করে।

তা নগেন চাটুয্যে কখনও জ্ঞানোদিদিকে কষ্ট দেয়নি। মোটামুটি সুখে-দুঃখে জ্ঞানোদিদির দিন কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু ভদ্রলোক বাঁচলো না বেশীদিন।

একমাত্র সন্তান পটল। যখন সে উচ্চ প্রাথমিক পড়ছে, তখন একদিন দুপুরে নগেন চাটুয্যে মাথায় ভয়ানক যন্ত্রণা হচ্ছে বলে বিছানা নিলে, সন্ধ্যায় সব শেষ হয়ে গেল।

জ্ঞানোদিদির আবার দুঃখের দিন আরম্ভ হল।

কিন্তু এ দুঃখ আর অরক্ষণীয়া কন্যাকালের দুঃখ এক নয়।

তখন এম. এস্‌সি. পাস করে আমি রসায়নে গবেষণা করছিলাম। সেই সময় একটি কেমিকাল ওয়ার্ক্‌সে সহকারী রাসায়নিকের চাকরি পেয়ে গেলাম। এর কিছু পরে বাড়ি যেতে জ্ঞানোদিদি এসে উপস্থিত।

—কি ব্যাপার জ্ঞানোদিদি! কেমন আছ?

জ্ঞানোদিদি চিরদিনকার শান্ত অথচ শক্ত মেয়ে। আমার প্রশ্নের উত্তরে শুধু একটু হাসলে।

লক্ষ্মী ঠানদি বললেন, ওর কথা আর বলিসনি ভাই। চিরটা কাল ওর দুঃখেই গেল।

তিনিই জানালেন, ক'মাস হল পটলা নিরুদ্দেশ।

পটলা জ্ঞানোদিদির একমাত্র সন্তান। বয়স বছর দশেক। এই বয়সে সে নিরুদ্দেশ হল? কী হয়েছিল?

হয়নি কিছুই; নিরুদ্দেশও ঠিক নয়। মাস দুই থেকে দশটা করে টাকাও পাঠাচ্ছে মনিঅর্ডারে।

জিজ্ঞাসা করলাম, তাতে ঠিকানা নেই?

—আছে। কিন্তু সেটা একটা বাজে ঠিকানা। সেখানে খোঁজ নিয়ে ওর সন্ধান পাওয়া যায়নি।

জ্ঞানোদিদি মনিঅর্ডারের কুপনগুলো নিয়ে এসে দেখালে। তাতে সে মাকে প্রণাম দিয়ে তার সম্বন্ধে ভাবতে নিষেধ করেছে। লিখেছে সামান্য একটা চাকরি করছে। কোথায়, কি বৃত্তান্ত, কোনো উল্লেখ নেই।

● মা

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

বললাম, তাহলে চিন্তার আর কি আছে। অপেক্ষা কর। একদিন এসে পড়বে।

লক্ষ্মী ঠানদি বললেন, হ্যাঁরে, মায়ের প্রাণ! ছেলে একদিন ফিরবে বলে কি অপেক্ষা করতে পারে?

বললাম, তা ছাড়া আর উপায় কি বল?

এবারে জ্ঞানোদিদি কথা বললে: মনিঅর্ডার কলকাতা থেকে আসে। সুতরাং কলকাতাতেই থাকে। তুই ভাই একটু খোঁজ নিবি?

আমি মনে মনে হাসলাম। ওদের ধারণা কলকাতা বুঝি আমাদের এই গাঁয়ের মতো! ঘরের মধ্যে লুকিয়ে না থাকলে পথে-ঘাটে একদিন দেখা হয়ে যাবে।

কিন্তু সেকথা আর ওদের জানালাম না। মুখে বললাম, নিশ্চয় খোঁজ করব। পেলেই সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে আসব।

জ্ঞানোদিদি বরাবরই স্বল্পভাষিণী। আমার শূন্যগর্ভ আশ্বাসে তার চোখের কোণ যেন একটু সজল হয়ে এল। কিন্তু মুখে কিছুই বললে না। বললেন লক্ষ্মী ঠানদি। নানারকম বড় বড় আশীর্বাদ করতে করতে তিনি জ্ঞানোদিদির পিছু পিছু চলে গেলেন।

কলকাতায় ফিরে মনে রইল পটলের কথা। কিন্তু খুঁজব কোথায়? চেনা-জানা অনেককে তার চেহারার বর্ণনা দিয়ে সন্ধানে থাকতে বললাম। তার বেশি আর কী করতে পারি?



......ছেলেটা আমাকে দেখে মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালো। [পৃষ্ঠা ২৫৮

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

● মা

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

ট্রামে-বাসে কিংবা ফুটপাথে নয়।

একদিন বিকেলে অফিস থেকে ফেরবার পথে একটা চায়ের দোকানে ঢুকে চা-টোস্টের ফরমাশ করলাম।

অপেক্ষা করছি এমন সময় একটি মলিন গেঞ্জি-পরা ছেলে ততোধিক ময়লা একটা তোয়ালে-কাঁধে চা নিয়ে বেরিয়ে আসতে গিয়ে আমাকে দেখে মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল তারপর চট্ করে ভেতরে সরে গেল।

মুহূর্তমাত্র তাকে দেখতে পেয়েছিলাম। মনে হল পটল। যদিচ ঠিক সুনিশ্চিত হতে পারলাম না। সেইদিকে তাকিয়ে রইলাম। সে কিন্তু আর বাইরে এল না। আমার চা নিয়ে এল অন্য একটি ছোকরা।

কী ব্যাপার!

ছেলেটা হঠাৎ অমন করে গা-ঢাকা দিলে কেন? পটলই হবে নিশ্চয়। বামুনের ছেলে চায়ের দোকানে ছত্রিশ জাতের এঁটো কাপ-প্লেট মাজছে, সেই লজ্জাতেই অমন করলে বোধ হয়।

চা-পান শেষ করে আমি রেস্তোরাঁর মালিককে পটলের ইতিহাস এবং আমার সন্দেহের কথা জানিয়ে ছেলেটিকে ডাকতে বললাম। সে আসবে না। তার সঙ্গীরা একরকম জোর করে তাকে নিয়ে এল।

ঠিক পটল!

রেস্তোরাঁর মালিককে অনুরোধ করতে ভদ্রলোক সানন্দে পটলকে আমার সঙ্গে ঘণ্টাখানেকের জন্য ছেড়ে দিলেন। তাকে নিয়ে একটা পার্কে এসে বসলাম।

—কি ব্যাপার পটল! হঠাৎ নিরুদ্দেশ হলি। অথচ বাড়িতে টাকা পাঠাচ্ছিস। কিন্তু চিঠিপত্র দিস না।

পটল কেঁদে ফেললে।

অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে তারপরে যা বললে তার ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, মায়ের দুঃখ সে আর সইতে পারছিল না। দুঃখ-ধান্দা করে যেটুকু আহার মা সংগ্রহ করতে পারত তার সবটুকুই ছেলের মুখে তুলে দিয়ে নিজে প্রায়ই উপবাস করত।

তাই দেখে পটল স্থির করে ফেললে, যেমন করেই হোক, মায়ের খাওয়া-পরার দুঃখ দূর করতেই হবে। কিন্তু কি করে? কতই বা তার বয়স, আর এই বয়সে কীই বা সে করতে পারে!

এমন সময় একদিন পাশের গ্রামের একটি ছেলের সঙ্গে তার পরিচয় হল।

ছেলেটি কলকাতায় একটা চায়ের দোকানে কাজ করে। তারই সঙ্গ ধরে সে কলকাতায় আসে। এবং সেই ছেলেটাই তার এই দোকানে কাজ যোগাড় করে দেয়।

তার পরের কথা জানি। মাস মাস দশ টাকা করে মাকে পাঠিয়ে আসছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, তা মাকে চিঠি দিস না কেন?

পটল মুখ নামিয়ে বললে, লজ্জায়। বামুনের ছেলে, চায়ের দোকানে কাজ করি।

—হুঁ।

তাকে নিয়ে ফের ফিরে এলাম চায়ের দোকানে। মালিককে বলতে তিনি সেই দিন পর্যন্ত ওর মাইনে মিটিয়ে ওকে ছেড়ে দিলেন। ওকে নিয়ে এলাম আমার বাসায়। এবং কয়েক দিনের মধ্যেই আমাদের কোম্পানিতেই ওর একটা বেয়ারার চাকরি ব্যবস্থা করে দিলাম।

চাকরিটা বেয়ারার হলেও আসলে কিন্তু ওকে আমি কাজ শেখাতে লাগলাম। উচ্চ প্রাথমিক পাস করেছিল। রাত্রে আমি ওকে ইংরেজী পড়াই, আর দিনে কারখানায় কাজ শেখাই।

অসম্ভব বুদ্ধিমান ছেলে।

যেমন দ্রুতবেগে সে ওষুধ তৈরির কাজ শিখতে লাগল, তেমনি দ্রুতবেগে এগুতে লাগল তার পড়াশুনা। পড়াশুনাটা কিন্তু স্কুলের ধাঁচে নয়। বাংলাতে বিজ্ঞান আর ইংরেজী ভাষা। অন্য কিছু নয়। স্কুলের ধাঁচে পড়ালে সময় যত যেত, লাভ সে অনুপাতে অল্পই হত। কারখানায় ওষুধ তৈরির কাজে যে-বিদ্যা ওর কাজে লাগবে, তাই শুধু পড়াতে লাগলাম।

পটলের পড়ায় নিষ্ঠা আছে। পরিশ্রম করার শক্তি আছে। আর আছে মায়ের উপর ভক্তি। দুঃখিনী মায়ের চোখের জল মুছিয়ে মুখে হাসি ফোটাতেই হবে, এই তার পণ।

এবং এই যে-ছেলের পণ, তাকে কে রুখতে পারে? সমুদ্র দু'ফাঁক হয়ে তার জন্যে পথ করে দেয়! পাহাড় মাথা নিচু করে।

অমানুষিক পরিশ্রম করে ছেলেটা। এক প্রস্থ কারখানায়, আর এক প্রস্থ বাসায়। ফাঁকি দেবার চেষ্টা নেই।

কাজ, শুধু কাজ। কাজের পর্বতপ্রমাণ স্তূপ। আর সেই অভ্রভেদী স্তূপের উপর তার দুঃখিনী মায়ের মূর্তি।

কয়েক বৎসরের মধ্যে দেখা গেল, তার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ-মারা উচ্চতর বেতনের কর্মীদের সর্বাঙ্গীণ জ্ঞান যত বেশীই হোক, যে বিশেষ কাজে তারা সবাই লিপ্ত সেই বিশেষ কাজে তার জ্ঞান এবং সৃজনীবুদ্ধি তাদের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়।

অথচ বিনয়ী। অহংকারের ছায়ামাত্র নেই। সকল সময় সকলের সে শিষ্য। জিজ্ঞাসু। জানতে চায়, শিখতে চায়। তাই সকলেই তাকে স্নেহ করে। তার উন্নতিতে কেউ হিংসা করে না। বরং সকলেই খুশী।

মাইনে যখন তার একশো হল, বললাম, পটল, এইবার তোর মাকে নিয়ে আয়।

পটলও যেন সেই কথাই ভাবছিল। যেন আমার মুখ থেকে প্রস্তাবটা না বার হওয়া পর্যন্ত সে সাহস করে বলতে পারছিল না।

দিন কয়েকের মধ্যে একটা ছোট বাসা দেখে মাকে গ্রাম থেকে নিয়ে এল। জ্ঞানোদিদি বাঁচল। ছেলেকে ছেড়ে সে থাকতে পারছিল না। মাঝে মাঝে অবশ্য পটল বাড়ি যেত। কিন্তু সে কতটুকু ক্ষণের জন্যে! মায়ের প্রাণ তাইতে বাঁচে? শনিবার রাত্রে পায়, আবার রবিবার রাত্রে ছেড়ে দিতে হয়।

কোথায়?

কলকাতায়। কে জানে সে কেমন জায়গা! সেখানে অসংখ্য মানুষ নাকি পিঁপড়ের মতো পিলপিল করে ঘুরে বেড়ায়। আর কেউ কাউকে চেনে না! জ্ঞানো-দিদি ভেবে পায় না, মানুষ সেখানে থাকে কি করে?

কলকাতায় এসে কিন্তু জ্ঞানোদিদি খুব খুশী হয়ে গেল। সেটা অবশ্য কলকাতার জন্যে নয়। তার কলকাতা তো একফালি বারান্দার উপর একটুখানি রান্নাঘর, কলতলা, আর শোবার-ঘর। এর বাইরে যদি কোথাও যায় তো আমার বাসায়। তাও কালে-ভদ্রে।

বললে হাসে। বলে, সময় কই রে!

আমি বলি, বল কি জ্ঞানোদিদি! তোমাদের মা-ব্যাটার তো রান্না। এক বেলা রেঁধে দু'বেলা খাও। বিধবা মানুষ, তোমার কষ্ট হবে বলে পটল রাত্রে তোমাকে রান্নাঘরে যেতে দেয় না।

● মা

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

একগাল পরিতৃপ্তির হাসি হেসে জ্ঞানোদিদি বলে, তাও শুনেছিস্।

—শুনব না? তাহলে তোমার কাজটা কি শুনি।

জ্ঞানোদিদি উত্তর দিতে পারে না। বলে, কি জানি ভাই। খানিকটা রাত থাকতেই ঘুম ভাঙে। সেই থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কি করে যে কখন কেটে যায়, টের পাই না।

আমি কিন্তু টের পাই। ওর চোখ থেকে, মুখের হাসি থেকে, ওর আনন্দ-চঞ্চল চলাফেরা থেকে। কিন্তু সেকথা আর বলি না।

জিজ্ঞাসা করি, সিনেমা দেখলে?

—না ভাই।

—কাল রবিবার আছে, চল না। তোমাদের বৌও বলছিল।

তাড়াতাড়ি জ্ঞানোদিদি বলে, না ভাই। আমার সময় হবে না। তুই বৌকে নিয়েই যা।

—ঠাকুর-দেবতার বই জ্ঞানোদিদি। ভালো বই।

—ঠাকুর-দেবতা মাথায় থাকুন ভাই, আমার সুবিধা হবে না।

—কালীঘাট দেখেছ?

—না ভাই।

—তা কাল সকালে সেইখানেই চল। আদিগঙ্গায় চান করে মা-কালীকে দর্শন করে আসবে।

জ্ঞানোদিদি অস্থির হয়ে ওঠে: সে আর একদিন হবে ভাই। কাল সময় হবে না।

—কেন, কাল কী আছে?

—আছে অনেক কাজ। দাঁড়া তোর চা করে নিয়ে আসি।

বলে যেতে গিয়েই কিন্তু থমকে দাঁড়ায়।

—কি হল? আবার দাঁড়ালে কেন?

জ্ঞানোদিদি লজ্জিতভাবে হেসে ফেলে: চা, চিনি, গরম জল, দুধ নিয়ে এলে তুই করে নিতে পারবি?

—কেন, তোমার কি হল?

জ্ঞানোদিদি আবার তেমনি করে হাসে: চা'টা আমার ঠিক আসে না। সাতজন্মে করা তো অভ্যেস নেই।

—কেন, পটল তাই বলে বুঝি?

● মা

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

—মুখে বলে না বটে, কিন্তু ওর মুখ দেখে বোঝা যায়।

হঠাৎ খুব ঘনিষ্ঠভাবে আমার কাছে সরে এসে বলে, অনেক চেষ্টা করলাম, কিছুতেই হল না। শেষে কি করলাম জানিস ?

—কি ?

—পটল জানে না, ওঘরে আরেকটি বৌ আছে তাকে দিয়ে ক'দিন থেকে করিয়ে নিচ্ছি। তা সে গেছে বেড়াতে। নইলে তোর চা'ও তাকে দিয়েই করিয়ে নিতাম। তুই ভাবতিস,

বাধা দিয়ে বলি, আমি কিছুই ভাবতাম না। শোন, এইবার পটলের একটি বৌ নিয়ে এস। তাহলে আর চায়ের অসুবিধা থাকবে না।

জ্ঞানোদিদি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল : সেই কথাই ক'দিন থেকে ভাবছি। একটি ভালো মেয়ে দেখে দে না ভাই।

—কি রকম ভালো ?

একটু কুণ্ঠিতভাবে জ্ঞানোদিদি বললে, আমার ছেলে কালো। বৌ কিন্তু আমি সোন্দর চাই। আর দেনা পাওনা,

—বল।

—ছেলে তো খারাপ নয়, দেবে নাই বা কেন ? বল।

আমার বলার কিছু ছিল না। ছেলে কালো, অবশ্য মায়ের মতো মিশ্‌কালো নয়, তবু কালোই। সুতরাং সুন্দরী পাত্রী চাই। এবং ছেলে যখন ভালো মাইনে পায় তখন দেওয়া থোয়াও ভালো হতে বাধ্য।

কিন্তু আমি অন্য কথা ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, মা যখন মৃত্যু-শয্যায় তখন ষাট বছরের এক বুড়োর পায়ে নিজেকে সঁপে দেবার জন্যে অন্ধকারে নিজে-নিজেই জ্ঞানোদিদি কী অপূর্ব প্রসাধনই না করেছিল ! সে সজ্জা চোখে না দেখলেও কল্পনা তো করতে পারি। একমাত্র সন্তানের দিকে চেয়ে না হয় জ্ঞানোদিদির পৃথিবী গেছে মুছে। পটলই তার পৃথিবী। কিন্তু সেই সঙ্গে তার নিজের অতীতও কি মুছে গেছে !

———

"মুরকাট্টা বাবা"

—গজেন্দ্রকুমার মিত্র

যে সময়ের কথা বলছি সে সময় দেশে বন-জঙ্গলের অভাব ছিল না—ঘটা ক'রে গাছ পুঁতে বন-মহোৎসব করতে হত না। জঙ্গলের জ্বালায় মানুষ অস্থির হয়ে উঠত।

একশ বছরেরও সামান্য একটু আগের কথা। ১৮৫৭ সালের গ্রীষ্মকাল। এখন যেটাকে উত্তর প্রদেশ বলা হয়—তারই একাংশকে তখন বলা হত অযোধ্যা প্রদেশ, ঘটনাটা ঘটেছিল সেইখানকারই এক অঞ্চলে।

ইতিহাসে নেই এ কাহিনী। এমন কত কাহিনীই তো ইতিহাসে নেই। জনশ্রুতিতে বেঁচে আছে এসব। হয়ত মুখে মুখে কত ঘটনার বিবরণ বদলে গেছে,—কত রঙ চড়েছে। হয়ত কিছু সত্য আছে—হয়ত তাও নেই। এ গল্পও লোকের মুখে শোনা। কাশীতে থাকতে মুখুয্যেমশাইয়ের কাছে শুনেছিলুম। তাঁর সেজ ঠাকুর্দা, অর্থাৎ বাবার সেজকাকা—বলেছিলেন এ গল্প। তিনিও তখন ঐ প্রদেশেই ছিলেন। লক্ষ্ণৌতে আটকে পড়েছিলেন, বেঁচে ফিরবেন এ আশা ছিল না—বার বার গুজব রটেছিল তিনি মরেই গিয়েছেন। একবার নাকি তাঁর শ্রাদ্ধশান্তিরও আয়োজন করা হয়েছিল।

বিচিত্র কাহিনী।

সীতাপুরের লোকও কেউ কেউ এ কাহিনী জানে। এখনও বুড়োবুড়ো লোকের মুখে শুনতে পাওয়া যায়, লেস্‌লী সাহেবের মেম আর তাঁর বাচ্চাকে এক হাজার সিপাহীর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল এক কন্ধকাটা ভূত—ওদের ভাষায় যার নাম 'মুরকাট্টা বাবা'।

কিন্তু তার চেয়ে বেশী কিছু জানে না ওরা, ঘটনার পূর্ণ বিবরণও দিতে পারে না। সবটা বলেছিলেন আমাকে মুখুয্যেমশাই। সেই গল্পই বলছি।

লেস্‌লী সাহেব থাকতেন সীতাপুরে কিন্তু এই ঘটনা ঘটবার কিছুদিন আগেই তাঁকে উনাও চলে

যেতে হয়। জরুরী কাজে যাওয়া—স্ত্রী-কন্যা নিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু অন্য সময়ের মত নিশ্চিন্ত হয়ে রেখে যেতেও পারলেন না, কারণ তখনই কিছু কিছু গোলমাল শুরু হয়ে গেছে—বাতাসে বড় রকম একটা দুর্যোগের পূর্বাভাস। অবশ্য এতটা যে হবে তা তখনও লেসলী সাহেব স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। তবু সাবধানের বিনাশ নেই, এই হিসাবেই জমাদার গঙ্গানন্দন তেওয়ারীকে ডেকে পাঠালেন। তেওয়ারী এলে তাঁর হাত ধরে বললেন, 'গঙ্গানন্দন, তোমাকে আমি কোনদিন তাঁবেদার বলে ভাবিনি—বন্ধুর মতই দেখেছি। আজ সেই দাবিতেই তোমার ওপর আমি আমার স্ত্রী আর মেয়ের ভার দিয়ে যাচ্ছি। যদি কোন গণ্ডগোল বাধে ওদের তুমি দেখো—'

'বড় শক্ত কাজের ভার দিচ্ছেন সাহেব। যে রকম শুনছি যদি সে রকম এখানেও কিছু হয়—পারব কি বাঁচাতে!'

'তোমার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে বলো—তাতেই আমি খুশী। তোমার ওপর সে বিশ্বাস আমার আছে।'

তবু গঙ্গানন্দন চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকেন। মুখ শুকিয়ে উঠেছে তাঁর, কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে।

লেসলী সাহেব উঠে ওঁর হাতটা চেপে ধরলেন, তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি তেওয়ারী! নতজানু হয়ে ভিক্ষা চাইছি!'

'ছিঃ সাহেব! আমাকে অপরাধী করবেন না। আমার যতটা সাধ্য ততটা করব—তবে সে সাধ্য কতটুকু তা বলতে পারি না!'

'তুমি কথা দিচ্ছ—যথাসাধ্য করবে?'

'কথা দিচ্ছি—প্রাণপণে করব। জান কবুল। ব্রাহ্মণ আমি—ব্রাহ্মণের কথার খেলাপ হয় না।'

লেসলী সাহেব নিশ্চিন্ত মনে উনাও যাত্রা করলেন।

তার অল্প কয়েকদিন পরেই বলতে গেলে আগুন জ্বলে উঠল—চারিদিক বেড়ে, দাবানলের মত। গঙ্গানন্দন বুঝলেন যে এখানে থাকলে মেমসাহেবদের তিনি বাঁচাতে পারবেন না—তাঁর সাধ্যের বাইরে চলে যাবে অবস্থাটা। কোনমতে ওদের সরিয়ে দেওয়া দরকার—নিরাপদ কোন জায়গায়।

কিন্তু সে জায়গা কোথায়? পাঠাবেনই বা কী করে?

সাহেব তো সাহেব—এদেশী লোকের ফরসা চামড়া দেখলেই কেটে ফেলছে।

অনেক ভাবলেন গঙ্গানন্দন। সিপাহীদের সামনে 'আংরেজ'দের প্রাণভরে গালাগাল দিতে শুরু করলেন। তাতে ওঁর সম্বন্ধে তাদের সংশয় ঘুচল। ওঁর সামনেই খোলাখুলি সব কথা আলোচনা

● "ধুরন্ধাটী বাবা"
গজেন্দ্রকুমার মিত্র

করতে লাগল। তার ফলে অনেক খবরই সংগ্রহ করলেন গঙ্গানন্দন। ভাবলেন, কোনমতে মামুদাবাদের সীমানা পেরিয়ে যদি উত্তর-পূর্ব দিকে যেতে পারে তো অতটা ভয় নেই—উত্তর বিহার এখনও শান্ত আছে, আর বাংলায় পড়লে তো কথাই নেই। বাঙ্গালী মনে-প্রাণে ইংরেজের দাস।

কিন্তু মামুদাবাদ পর্যন্ত রাস্তাও কম নয়। এদিকে সিপাইদের ঘাঁটিও বিস্তর, তাছাড়া এ অঞ্চলের বেশীর ভাগ জায়গীরদারই ইংরেজের ওপর চটা। ডালহাউসীর জুলুমে অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাছাড়া লক্ষ্ণৌয়ের নবাবকে অমনভাবে গদিচ্যুত করাতে ভয়ও ধরে গেছে তাদের।

সুতরাং?

অনেক ভেবেচিন্তে গঙ্গানন্দন দেখলেন লোকালয় ছেড়ে জঙ্গলের রাস্তা ধরাই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। জঙ্গলের অভাব নেই এ অঞ্চলে, বরাবর বনের পথ দিয়ে যেতে পারলে হয়ত শেষ পর্যন্ত গন্তব্য স্থানে পৌছনো একেবারে অসম্ভব হবে না।

তবু যতটা পারলেন সতর্ক হলেন গঙ্গানন্দন।

অনেক কষ্টে, অনেক টাকা নগদ দিয়ে, আরও অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে এক মুসলমান গাড়িওলাকে ঠিক করলেন। সে মেমসাহেবদের নিয়ে যেতে রাজী হল কিন্তু একটি শর্তে—ওঁদেরও বোরখা পরে যেতে হবে। মুসলমানের সঙ্গে বোরখা পরা মেয়েছেলে দেখলে তারই আত্মীয়া ভাববে—অত সন্দেহ করবে না। তাছাড়া পর্দানশীন মেয়েরাই বোরখা পরে, সুতরাং চট্ ক'রে কেউ মুখ দেখতে চাইবে না। কথাও বলতে হবে না। ধরা পড়বার ভয় কম। গঙ্গানন্দন তাইতেই রাজী হলেন।

বোরখাও দুটো যোগাড় হ'ল। তারপর একদিন সন্ধ্যাবেলায় আঁধারের সুযোগ নিয়ে গাড়ি ছাড়লে আল্লাবক্স। গাড়ি অর্থাৎ 'বয়েল' গাড়ি, যাকে এদেশে গো-গাড়ি বলে। তার ওপর শুকনো ঘাস বিছিয়ে মেমসাহেবদের বসবার জায়গা করা হ'ল। চামড়ার মশকে ক'রে জল এবং নুন-লঙ্কা-মাখানো মোটা মোটা রুটি ক'খানা দিয়ে দেওয়া হ'ল—পথের সম্বল। জঙ্গলের পথ—খাদ্য-খাবার নিয়ে কে বসে থাকবে? এই প্রচণ্ড গরমে জলও খুব সুলভ নয়। খাবার কিনতে বা জলের খোঁজ করতে লোকালয়ে যাওয়ার কথা তো ভাবাই যায় না।

আল্লাবক্স গাড়ি ছাড়বার প্রহরখানেক পরে গঙ্গানন্দন আর তাঁর ছেলে শিউনারায়ণও রওনা হলেন দুটো ঘোড়ায় চেপে। সঙ্গে যাওয়া কোন পক্ষেই নিরাপদ নয়—অথচ একেবারে আল্লাবক্সের ওপর ভরসা করে ছেড়ে দেওয়াও যায় না এই বিপদের মধ্যে। গঙ্গানন্দন স্থির করলেন তাঁরা দূর থেকে ওঁদের পিছু পিছু থাকবেন, যদি তেমন প্রয়োজন হয় তো সামনে এগিয়ে যাবেন—নইলে ওঁরা ভালয় ভালয় কোন নিরাপদ এলাকায় পৌছে গেলে দূর থেকেই বিদায় নেবেন।

● "মুণ্ডকাটা বাবা"
গজেন্দ্রকুমার মিত্র

গঙ্গানন্দন কথা দিয়েছেন লেস্লী সাহেবকে—তাঁর যথাসাধ্য করবেন ওঁদের বাঁচাবার জন্য—জান কবুল!

ভয় ছিল খয়রাবাদ পর্যন্ত। কারণ ঐ অবধি লোকালয়। তারপরই গাড়ি ঢুকবে ঘন জঙ্গলে। নেহাত বয়েল গাড়ি বলেই হয়ত যেতে পারবে, তাও হয়ত দু একটা গাছপালা কেটে নিতে হবে মধ্যে মধ্যে—সেজন্যে আল্লাবক্স কুড়ুলও নিয়েছে একটা। এ জঙ্গলে জনবসতি নেই—থাকার মধ্যে থাকত নাকি গোণ্ডদের ডাকাতরা—তবে তারা, এই চারদিকে এত লুঠতরাজের হল্লোড়ে, বনে লুকিয়ে বসে থাকবে না নিশ্চয়—এতদিনে শহরে-বাজারে গিয়ে উঠেছে সবাই।

তবু খয়রাবাদ পর্যন্ত নিরাপদেই কাটল। ওখানকার কাটরায় পড়তে একদল সিপাহী গাড়ি আটক করেছিল—জেরাও করেছিল বিস্তর—কিন্তু আল্লাবক্স এমন বেমালুম সে জেরা কাটিয়ে উঠল, এমন অনর্গল মিছে কথা বলে গেল যে কেউ সন্দেহ পর্যন্ত করতে পারলে না যে গাড়ির মধ্যে বোরখা-পরা মহিলারা ওর আত্মীয়া নয়। বরং সে বিশ্বাস এমনই দৃঢ়তর হ'ল—আল্লাবক্সের সঙ্গে কথা কয়ে এতই খুশী হ'ল সিপাহীরা যে, ওদের মধ্যে একজন পথে খাবার জন্যে গোটাকতক পাকা আমই উপহার দিয়ে বসল!

খয়রাবাদ ছাড়াবার পর আল্লাবক্স নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল—গঙ্গানন্দনও খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেন।

কিন্তু সেই নিশ্চিন্ত হওয়াটাই কাল হ'ল।

মেমসাহেবদের দিনরাত টানা-পাখার নিচে কাটানো অভ্যাস ছিল, দিনে রাতে পালা ক'রে পাঙ্খা-বরদাররা পাখা টানত—তাঁদের পক্ষে এই দুঃসহ গরমে বোরখা পরে কাটানো যম-যন্ত্রণারই সামিল! তাই বনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে একটা আধ-শুকনো তালাও-এর তলায় সামান্য একটু জল দেখে আর স্থির থাকতে পারলেন না—আল্লাবক্সকে কাকুতিমিনতি ক'রে গাড়ি থামালেন। কোনমতে ছুটে গিয়ে একটা ডুব দিয়ে এসেই আবার গাড়িতে চড়বেন। তিন চার দিন স্নান হয়নি, তার ওপর এই গরমে বোরখা পরে থাকা—একটা ডুব না দিতে পারলে পাগল হয়ে যাবেন যে!

আল্লাবক্স বোঝাতে চেষ্টা করল, 'ও যা দেখছেন ওতে জলের চেয়ে পাকই বেশী'—কিন্তু তাঁরা বললেন, শুধু পাক হলেও আপত্তি নেই তাঁদের। অগত্যা সে বলদ দুটোকে জল খাইয়ে নিয়ে নিজে একটু আড়ালে গেল, মেমসাহেবরা স্নান করতে নামলেন।

অদৃষ্ট বিরূপ। ঠিক সেই সময়ই একটি ডোমের মেয়ে খরগোস মারতে জঙ্গলে ঢুকেছিল।

● "বুককাটা বাবা"
গজেন্দ্রকুমার মিত্র

সন্ধ্যারাত্রে ফাঁদ পেতে রেখে যায় ওরা, দুপুরবেলা এসে খোলে। দূর থেকে এই পথে বয়েল গাড়ি আসতে দেখেই তার কৌতূহল হয়—সে একটা বড় গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। তারপর ওঁরা জলে নামতেই ব্যাপারটা বুঝতে পারলে। লোভে ওর চোখ জ্বলে উঠল। এই নির্জন বনে মাথা মুখ ঢেকে স্নান করার দরকার হবে—অতটা বুঝতে পারেননি মেমসাহেবরা। তার ফলে ওঁদের মুখের লাল রঙ এবং মাথার সোনালী চুল দেখেই আর কিছু বুঝতে বাকি রইল না মেয়েটির।

নিশ্চয়ই কোন বড়সাহেবের ঘরওয়ালী মেম—সিপাহীদের হাত থেকে পালাচ্ছে। এদের ধরিয়ে দিতে পারলেই মোটা বকশিশ মিলবে। সাহেব-মেমদের ধরিয়ে দিয়ে লোকে মোটা মোটা টাকা কামাচ্ছে—একথা নানীর মুখে কদিন ধরেই শুনছে সে। সে আর দাঁড়াল না, গাছের আড়ালে আড়ালে নিজেকে গোপন ক'রে পিছিয়ে গেল খানিকটা, তারপর ঊর্দ্ধ-শ্বাসে ছুটল সিপাহীদের খবর দিতে। এই জঙ্গলটার ওধারে আজ কদিন হ'ল বড় একটা সিপাহীর দল ছাউনি ফেলেছে—তা নিজের চোখেই দেখেছে সে, কোনমতে এখন সেইখানে গিয়ে খবরটা পৌছে দেওয়া। তারপর বাছাধনরা যাবে কোথায়?



গাছের পেছন থেকে ওঁদের লাল মুখ আর সোনালী চুল দেখে ব্যাপার ব্ঝতে আর কিছু বাকি রইল না মেয়েটির।

আল্লাবক্স বেচারী এসব কিছুই জানতে পারল না। সে কতকটা নিশ্চিন্ত—আর দুটো দিন ভালয় ভালয় কাটলেই পীরের দরগায় শিন্নি চড়িয়ে বাঁচে সে। এ পর্যন্ত নিরাপদে এসে তার সাহসও বেড়ে গেছে। মনে ভরসা এসেছে—নির্বিবাদেই পৌছতে পারবে।

কিন্তু সন্ধ্যার ঠিক আগে—বনের প্রান্তে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন মাটি ফুঁড়ে গজিয়ে উঠল তিনশ' সিপাহী—চোখের নিমেষে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরল—পালাবার কি পিছু হটবার কোথাও আর কোন উপায় রইল না।

পৈশাচিক উল্লাসে চিৎকার ক'রে উঠল সবাই—'ইয়া! এবার যাবে কোথায়! জান না—যম আছে পিছে!'

● "মুণ্ডকাট্টা বাবা"
গজেন্দ্রকুমার মিত্র

প্রথমেই শাস্তি হ'ল বিশ্বাসঘাতকের। প্রথম চোট পড়ল বেচারী আল্লাবক্সের ওপর। 'দেশের ও জাতের দুশমনকে ঘুষ খেয়ে বাঁচাবার চেষ্টা করছ!'

দশ বারোজন মিলে হৈ হৈ ক'রে টেনে নামাল ওকে গাড়ি থেকে, তারপর কোন বাধা দেবার কি কোন কৈফিয়ত দেবার চেষ্টামাত্র করবার আগেই একজন কচ্ ক'রে ওর মাথাটা কেটে ফেলল। তারপর বসল মন্ত্রণা-সভা—মেমসাহেবদের নিয়ে কী করা হবে? মেরে ফেলা হবে—না বন্দী ক'রে নিয়ে গিয়ে নানাসাহেবের দরবারে পৌছে দেওয়া হবে? কোন্‌টায় বেশী সুবিধা? নানাসাহেবের কাছে নিয়ে গেলে কিছু নগদ বকশিশ মিলবে কি?

কিন্তু সে আলোচনা শেষ হবার কি রাত্রি পোহাবার আগেই এক অঘটন ঘটল।



। বারোজন মিলে হৈ হৈ ক'রে টেনে নামাল আল্লাবক্সকে গাড়ি থেকে।

প্রায় তিনশ লোকের সেই সোল্লাস চিৎকার বহুদূর পিছনেও গঙ্গানন্দনের কানে পৌছল।

তিনি শিউরে উঠলেন—নিজের অজ্ঞাতসারেই। এখানে এই জঙ্গলের ধারে এত লোকের হল্লা কোথা থেকে আসছে? নিশ্চয়ই কোন বড় সিপাহীর দল। তবে কি—তবে কি আল্লাবক্সই ধরা পড়ল!

চোখের নিমেষে ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিলেন তিনি—শব্দ লক্ষ্য ক'রে এগিয়ে চললেন সেই দিকে। তারপর হল্লার শব্দটা স্পষ্টতর হয়ে উঠতে একটা গাছের ডালে ঘোড়া দুটো বেঁধে রেখে পিতা-পুত্রে যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে এগিয়ে চললেন সেই দিকে।...

কাছে গিয়ে গাছের আড়াল থেকে যা দেখলেন তাতে আর কিছু

● "মুণ্ডকাট্টা বাবা"
গজেন্দ্রকুমার মিত্র

বুঝতে বাকী রইল না। যা ভয় করেছিলেন তাই হয়েছে। অসংখ্য মশালের আলো চারিদিকে, আল্লাবক্সের শবদেহটা এইখান থেকেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তার কাছেই নতমস্তকে বসে আছেন লেসলীর স্ত্রী ও কন্যা। আর এঁদের ঘিরে চলেছে এক বিরাট জটলা। প্রধান যারা তারা এক জায়গায় গোল হয়ে বসেছে। এঁদেরই ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

খানিকটা দেখে এবং শুনে আবার নিঃশব্দে পিছিয়ে এলেন গঙ্গানন্দন। দু'জন মাত্র লোক তাঁরা—তিনশ সশস্ত্র সিপাহীর সামনে কীই বা করতে পারেন? ঝড়ের মুখে কুটোর মতই উড়ে যাবেন।

অথচ এইমাত্র যা শুনলেন তাতে স্পষ্টই বোঝা গেল যে, মহিলা দু'টিকে মেরে ফেলবারই মতলব হচ্ছে ওদের, মিছিমিছি এই ঝামেলা কানপুর কি লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে বিশেষ কেউই রাজী নয়।

অনেকক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইলেন গঙ্গানন্দন। শিউনারায়ণ ছেলেমানুষ—সে অনেক অসম্ভব অসম্ভব প্রস্তাব করতে লাগল—একবার বললে, 'এখন ছুটে গিয়ে খয়রাবাদ থেকে কতকগুলো লোক ডেকে আনা যাক্—টাকার লোভ দেখালে কি আর আসবে না?' আবার বললে, 'আমরা হঠাৎ বোঁ বোঁ ক'রে তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে যদি গিয়ে পড়ে ছোঁ মেরে ওদের ঘোড়ায় তুলে নিয়ে সরে পড়ি তো কি হয়? ব্যাপারটা কী ঘটল বোঝবার আগেই কাম ফতে ক'রে চলে যাব আমরা?'—কিন্তু গঙ্গানন্দন একটু ক'রে হেসে বা ইঙ্গিতে তর্জনী তুলে তাকে থামিয়ে দিলেন প্রতিবারই। কমসে কম তিনশ সাড়ে তিনশ জঙ্গী লোক—পয়সার লোভ দেখিয়ে দু' দশ জন গাঁওয়ার ধরে এনে কিংবা তলোয়ার ঘুরিয়ে কাবু করা যাবে না ওদের।

অগত্যা শিউনারায়ণকে চুপ ক'রে থাকতে হ'ল।

তা'র মনে হ'ল অসম্ভবই যখন, তখন আর চিন্তা ক'রে লাভ কি—বাড়ি ফিরে যাওয়াই তো ভাল।

কিন্তু গঙ্গানন্দন ভাবছেন অন্য কথা। তিনি ব্রাহ্মণ, তিনি কথা দিয়েছেন—যথাসাধ্য করবেন তিনি—জান কবুল। সাধ্য কি সত্যিই শেষ হয়েছে তাঁর?

অনেক ভাবলেন, তারপর অকস্মাৎ উঠে দাঁড়ালেন একেবারে।

'শিউনারায়ণ, তোমার বাবা ফৌজে লড়াই করে, তার আগে তোমার পিতামহ প্রপিতামহও এই কাজ করেছেন,—আশা করি প্রাণ দিতে বা নিতে তোমার বুক কাঁপবে না।'

গঙ্গানন্দনের গলার আওয়াজে ও কথা বলার ভঙ্গিতে কিন্তু শিউনারায়ণের বুক কেঁপে উঠল। তবু সে প্রাণপণে চেষ্টা করে বললে, 'না বাবা। তা কাঁপবে না।'

'শোন। আমি তোমার বাবা। আমি লেসলী সাহেবের কাছে সত্যবদ্ধ হয়েছি জান দিয়েও

● "মুণ্ডকাটা বাবা"
গজেন্দ্রকুমার মিত্র

ওদের বাঁচাবার চেষ্টা করব। সে সত্যপালনে আমাকে সাহায্য করা তোমার কর্তব্য। বল—কথা দাও করবে? নির্বিচারে? বিনা দ্বিধায়?'

আরও দমে গেল শিউনারায়ণ। তবু ক্ষীণকণ্ঠে বললে, 'করব।'

'তবে যা বলি মন দিয়ে শোন। ঘোড়ায় ওঠো। ঘোড়া খুলে তৈরী হয়ে থাক ছুটে যাবার জন্যে।...না ওখানে নয়, পথের ওপর নয়, পথের বাঁ পাশে দাঁড়াও।...তলোয়ারখানা খুলে নাও তোমার—হাত তুলে শক্ত ক'রে ধরে দাঁড়াও তলোয়ার। খুব হুঁশিয়ার কিন্তু, হাত এর চেয়ে একটুও না নামে কিংবা আলগা হয়ে না যায়। যত জোর আছে তোমার কব্জিতে তত জোরেই চেপে ধরো—হাঁ, এমনি—ইয়া! ঠিক এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে, যে-ই আসুক, যা-ই ছাখো না কেন—কোনমতে নড়বে না কি হাত নামাবে না—যতক্ষণ না আমি তোমাকে পেরিয়ে ওদের মধ্যে গিয়ে পড়ি। ইয়াদ থাকবে? কথা দাও আমাকে—যা বলছি তার এক চুলও এদিক ওদিক হবে না।'

'কথা দিচ্ছি বাবা।' বিহ্বলভাবে বলে শিউনারায়ণ। ব্যাপারটা কি তা সে কিছুই বুঝতে পারছে না—কেবল অজ্ঞাত একটা আশঙ্কায় বুক কাঁপছে তার।

কিন্তু গঙ্গানন্দন খুব খুশী হয়ে উঠলেন। এতক্ষণে তিনি আঁধারে পথ দেখতে পেয়েছেন।

তিনিও ঘোড়ায় উঠলেন। ঘোড়ায় চড়েই ছেলের পাশে এসে দাঁড়ালেন। সস্নেহে ওর কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, 'তুমি আমার ছেলে—আমার সত্যরক্ষা করাতে পারলে অক্ষয় পুণ্য হবে তোমার—পিতৃঋণ শোধ হবে। বাবা আমরা ব্রাহ্মণ, আমরা ভদ্রসন্তান—আমাদের জবানের ঠিক না থাকলে পিতৃপুরুষ স্বর্গে বসে লজ্জায় মাথা হেঁট করেন।...যদি আর কখনও তোমার সঙ্গে আমার দেখা না হয়—কথাগুলো স্মরণ কোর। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি—সৎপথে চলে সত্যরক্ষা ক'রে পিতৃপুরুষের মুখ যেন উজ্জ্বল করতে পার তুমি।'

কেঁপে উঠল শিউনারায়ণ, 'কেন বাবা, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? এ আমাকে কী আদেশে জড়াচ্ছেন—'

'চুপ! আমাকে জবান দিয়েছ—ইয়াদ রেখ।...আরও শোন—মন দিয়ে শোন, আর মোটে সময় নেই। আমি যখন ঘোড়া ছুটিয়ে ওদের মধ্যে গিয়ে পড়ব তখন তুমিও আর দাঁড়াবে না। এক থেকে তিনশ পর্যন্ত গুনতে যতটা সময় লাগে ততটাই শুধু অপেক্ষা করবে, তারপর তুমিও ছুটে গিয়ে পড়বে ওখানে—কেউ তোমাকে বাধা দেবে না, বাধা দেবার কথা ভাবতেও পারবে না—তুমি ওদের দু'জনকে টেনে ঐ সিপাহীদেরই কারও একটা ঘোড়ায় তুলে নিয়ে বেরিয়ে যাবে। যাবে সোজা পুব-উত্তর মুখে। খুব ছুটে যদি যেতে পার—দুপুরের মধ্যেই বিসোয়াঁ পৌঁছে যাবে। ওখানটায় হাঙ্গামা কম—ওখানে এখনও শুনেছি কিছু কিছু সাহেব আছে, তাদের কারুর

● "মুণ্ডকাট্টা বাবা"
গজেন্দ্রকুমার মিত্র

কাছে সেপ্‌লী মেমদের জিম্মা ক'রে দিলেই তোমার ছুটি। তারপর ওদের ভাবনা ওরা ভাববে—তুমি যেমনভাবে পারো দেশে ফিরে যেও। কেমন?'

'আর আপনি?' যেন আর্তনাদের মত শোনায় শিউনারায়ণের প্রশ্নটা।

'আমি!' বিচিত্র হাসলেন গজানন্দন! বললেন, 'খুব হুঁশিয়ার—হাতে জোর দিয়ে তলোয়ারখানা ধরে রাখ, আমার হুকুম। একটু না হাত কাঁপে, আরও যা বললুম—মনে থাকে যেন!'

তিনি ঘোড়ার মুখ উল্টো দিকে ঘুরিয়ে মিশে গেলেন অন্ধকারে।...

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো শিউনারায়ণ। কী ব্যাপার, কী ঘটছে কিছুই বুঝতে পারছে না। বাবার মতিগতি তার বুদ্ধির অগম্য।

তবু তাঁর আদেশ পালন করতেই হবে তাকে।

একটু পরেই বনের দিক থেকে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল। পাগলের মত ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে কেউ!

কে আসছে—দুশমন নয় তো?

আরও ভয় হল শিউনারায়ণের।

তবু—যাই হোক আর যে-ই আসুক না কেন—তাকে দাঁড়িয়ে থাকতেই হবে।

তবে এটা বোঝা গেল—যে আসছে সে একক। একজন ঘোড়সওয়ারই আসছে তীরের বেগে। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ ঝড়ের শব্দের মতই মনে হচ্ছে। বহুদূর পর্যন্ত প্রতিধ্বনি জাগাচ্ছে।

একটু পরেই দেখা গেল সওয়ারকে। একজনই আসছে। সন্ধ্যার আঁধারে মানুষটাকে চেনা গেল না—শুধু এইটুকু দেখা গেল, যে আসছে সে সোজা স্থির হয়ে বসে আছে ঘোড়ার ওপর—ঐ প্রচণ্ড গতিবেগেও তাকে বিচলিত করতে পারেনি। শিক্ষিত ঘোড়া কোন পরিচিত ইঙ্গিতেই বোধ করি অমন ভাবে ছুটেছে—কিন্তু তার ওপর সওয়ার স্থির নিশ্চল হয়ে বসে আছে, মাথা উঁচু ক'রে! আশ্চর্য শিক্ষা!

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে ঘোড়া সামনে এসে পড়ল।...আরে, লোকটা সোজা যে তার সামনের রাস্তাতেই এসে পড়ছে। ওর খোলা তলোয়ারের ওপরই—

নামাবে নাকি হাত!

মনে পড়ল বাবার কথা—'যে-ই আসুক, যাই ঘটুক না কেন—কোনমতে নড়বে না কি হাত নামাবে না!'

যা বলেছেন তিনি ভেবেই বলেছেন নিশ্চয়!

● "মুরকাট্টা বাবা"
গজেন্দ্রকুমার মিত্র

কিন্তু এসব চিন্তাই চোখের পলকে খেলে গেল মনের মধ্য দিয়ে। তার চেয়ে বেশী সময় ছিল না। কারণ সে সওয়ার তারই মধ্যে—বলতে গেলে তীরবেগে এসে পড়ল—

আর—সত্যিই চোখের পলক ফেলবার আগেই নক্ষত্রবেগে সে বেরিয়ে চলে গেল শিউনারায়ণকে অতিক্রম ক'রে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই চিনতে পারল শিউনারায়ণ সে অশ্বারোহীকে। বুককাটা চীৎকার করে উঠল সে—'বাবা!'

নির্ভুল হিসাব! ছেলের তলোয়ার ঠিক বাবার গলার মাঝখান দিয়েই চলে গেছে—

কিন্তু—এক থেকে তিনশ গুনতে যেটুকু সময় লাগে—তার চেয়ে বিলম্ব করার উপায় নেই শিউনারায়ণের—অধিকার নেই! বাপের জন্য শোক করবার কি পিতৃহত্যার জন্য অনুতাপ করার তো নয়ই।

সে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ এই সিপাহীরাও পেয়েছিল বৈকি···

ঠিক হয়ে গিয়েছিল—মেম ছুটোকে এখানেই ফাঁসিতে লটকে রেখে চলে যাওয়া হবে। তারই তোড়জোড় চলছিল তখন।

ঘোড়ার আওয়াজ পেয়ে সবাই হাতের কাজ ফেলে তাকাল বনের দিকে।

কে ছুটে আসছে অমন ক'রে? দোস্ত্ না দুশমন?

যে ফাঁসির দড়ি বাঁধছিল পাশের আমগাছটায়, সে দড়িটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখেই চেয়ে রইল।

এমন কিছু তাড়া তো নেই—এ শিকার আর হাতের বাইরে যেতে পারবে না কোনমতেই—

কিন্তু ও কি? ও কে?

ঘোড়া পায়ে চলা সংকীর্ণ বনপথ দিয়ে সোজা ছুটে এসে পড়ল ফাঁকা জায়গায়—ওদের মধ্যে। তা আসুক—কিন্তু ওর ওপর সওয়ার—ওটা কী?

সোজা স্থির হয়ে বসে আছে একটা দেহ। কিন্তু ও যে কবন্ধ। ওর মুণ্ডটা কোথায়? মুণ্ডটার জায়গায় শুধু ফিনকি দিয়ে ফোয়ারার মত রক্ত ছুটছে—সেই রক্তে ওর সমস্ত দেহ আর ঘোড়াটা সুদ্ধ লাল হয়ে উঠেছে। মশালের কাঁপন-লাগা আলোর সেই কিম্ভূতকিমাকার মূর্তিটা দেখে ভয়ার্ত সিপাহীদের মনে হ'ল এক রক্তবর্ণ পিশাচ কি কোন দানোই ছুটে আসছে—প্রতিহিংসা নিতে। কারণ সে কবন্ধের হাতে তখনও খোলা তলোয়ার বজ্রমুষ্টিতে ধরা আছে, বাঁ হাতের মুঠোয় তখনও ঘোড়ার রাশ মুষ্টিবদ্ধ!.

গঙ্গানন্দন এ বিজ্ঞানটা জানতেন। বহু যুদ্ধে যাওয়ার ফলে এ অভিজ্ঞতা ওঁর প্রত্যক্ষ! হঠাৎ

● "বুককাটা বাবা"
গজেন্দ্রকুমার মিত্র

মাথা কাটা গেলে দেহটা শিথিল হতে কিছু সময় লাগে। সেই স্বল্প সময়ের হিসাব নিয়েই এই চরম দুঃসাহসের খেলায় নেমেছিলেন তিনি। ঘোড়ার ওপর সব পেশী টান্ ক'রে স্থির হয়ে বসে থাকার অভ্যাসও তাঁর বহুদিনের।…

এরা আর ভাববারও সময় পেল না, ভাল করে দেখবারও না।

তার আগেই আর একটা অশ্বপদশব্দ জাগল বনের মধ্যে। আরও কেউ আসছে—তেমনি তীব্র বেগেই।

কিন্তু কে আসছে বা কী আসছে তা দেখবার জন্য আর অপেক্ষা করতে সাহসে কুলোল না কারুর—

বিকট চিৎকার করতে করতে দৌড় দিল সবাই—যে যেদিকে পারল, পরস্পরকে ফেলে মাড়িয়ে ডিঙিয়ে—প্রাণভয়ে পাগলের মত ছুটতে লাগল চারিদিকে। দেখতে দেখতে ফাঁকা হয়ে গেল মাঠ। রইল শুধু কটা হাতিয়ার, কয়েকটা ঘোড়া, মশালগুলো গাছের ডালে ডালে বাঁধা—এবং অসহায় স্ত্রীলোক দুটি।



মূর্তিটাকে দেখে প্রাণভয়ে দৌড় দিল সবাই যে যেদিকে পারল

তারাও ভয়ে ঠকঠক ক'রে কাঁপছে।

শিউনারায়ণ দু'জনকে টেনে দুটো ঘোড়ায় চাপিয়ে তাদের ভয়-শিথিল হাতে একটা ক'রে বন্দুক গুঁজে দিয়ে—ঘোড়ার রাশ ধরে টেনে নিয়ে চলল বাপের নির্দেশমত উত্তর-পূব দিকে।

বাবার দেহটা কী হ'ল, সে ঘোড়া কোথায় গিয়ে থামল—সে দিকে তাকাবার অবকাশ হ'ল না ওর। তার চেয়ে তাঁর আদেশ বড়, তাঁর সত্য বড়।



পণ্ডিত আর অতিপণ্ডিত

রাধারানী দেবী

পণ্ডিত আর অতিপণ্ডিত এরা দু'টি সহোদর ভাই। এদের নাম পণ্ডিত হলেও এরা কিন্তু সত্যি কেউ পণ্ডিত নয়। আর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তো নয়ই। কারণ জাতে এরা বৈশ্য। পেশা বাণিজ্য। এদের বণিক বাবা শখ করে দুই ছেলের নাম রেখেছিলেন 'পণ্ডিত' আর 'অতিপণ্ডিত'।

পণ্ডিত আর অতিপণ্ডিত দু'টি ভাইয়ের মধ্যে খুব ভাব ছিল। বিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ হবার পর পিতার আদেশে তারা নিজেদের জাতের বণিকের ব্যবসা শুরু করলে। দু'ভাইয়েরই তখন বিয়ে হয়ে গেছে।

পাঁচশো গরুর গাড়ি ভরতি করে হরেকরকম প্রয়োজনীয় আর শখের জিনিস-পত্র নিয়ে তারা দেশবিদেশে বিক্রি করতে চলে গেল। পাঁচশো গরুর গাড়িভরা তাদের রকমারি মাল যখন সব বিক্রি হয়ে গেল, তাদের অনেক টাকা লাভ হয়েছে দেখে তারা দু'ভাই খুশী হয়ে বাড়ি ফিরলো।

মাল বিক্রি করে তাদের যে টাকা লাভ হয়েছিল সবই অতিপণ্ডিতের কাছে ছিল। তারা বাড়ি ফিরে এসে দেখে তাদের বাপের [illegible]। বিদেশে

ব্যবসা করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল বলে তারা এখবর পায়নি। বাবা বেঁচে নেই দেখে তখন দু'ভাই তাদের মাল বিক্রির টাকাটা ভাগাভাগি করে নিতে বসলো।

অতিপণ্ডিত টাকা দেবার সময় পণ্ডিতকে বললে, আমাদের অনেক টাকা লাভ হয়েছে। আমি সে টাকাটা তিনটি সমান ভাগে ভাগ করে রেখেছি। সেই তিন-ভাগের এক ভাগ তুমি নাও আর বাকি দু'ভাগ আমার কাছে থাক। অতিপণ্ডিত ভাইয়ের কথা শুনে পণ্ডিত ভাই আশ্চর্য হয়ে বললে, লাভের টাকাটা তিন ভাগ করলে কেন, আমি তো বুঝতে পারছিনি।

ভাইয়ের কথা শুনে অতিপণ্ডিত বললে, আরে! এই সহজ কথাটা বুঝতে পারলিনি? আমরা দুই ভাইই তো 'পণ্ডিত'? কেমন? সুতরাং, আমাদের দুই পণ্ডিতের দু'টি ভাগ। আর তৃতীয় ভাগটি হ'ল আমাদের দুই পণ্ডিতের মধ্যে যে একটি 'অতি' রয়েছে তার। আমার নাম যখন 'অতিপণ্ডিত' তখন ঐ অতিরিক্ত তৃতীয় ভাগটা আমারই প্রাপ্য। এইবার বুঝতে পারলে তো ভাই। অতএব তুমি এক ভাগই নাও। বাকি দু'ভাগ আমারই থাক।

পণ্ডিত শুনে বিস্মিত হয়ে বললে, সে কি কথা? আমি 'পণ্ডিত', আর তুমি 'অতিপণ্ডিত'। আমরা দুই ভাই মিলে বাণিজ্য করতে যাবার আগে যে টাকা দিয়ে মালপত্র কিনেছিলুন তার অর্ধেক বাবা আমাকে দিয়েছিলেন, অর্ধেক তোমাকে দিয়েছিলেন। তিনি তো তোমাকে 'অতি' বলে অতিরিক্ত টাকা কিছু দেননি? আমাদের পাঁচশো গরুর গাড়ির আড়াইশো ছিল তোমার, আড়াইশো আমার! আর যদি বিক্রির কথা বলো; অর্ধেক মালপত্র আমি বেচেছি, অর্ধেক তুমি বেচেছো। অতএব আমাদের এই কারবারে যা লাভ হয়েছে তার অর্ধেক তুমি পাবে, অর্ধেক আমি পাবো। কিন্তু, তুমি লাভের টাকাটাকে তিন ভাগ করে দু'ভাগ নিজে রেখে একভাগ আমাকে দিতে চাইছো কেন—কিছুতেই বুঝতে পারছিনি!

অতিপণ্ডিত তখন অতি মিষ্টি হেসে বললে, এই সহজ কথাটা তুমি এখনও বুঝতে পারছো না ভাই? তুমি হলে যে শুধু 'পণ্ডিত' তাই তোমার একভাগ। আর, আমি হলুম 'অতিপণ্ডিত' তাই আমার পাওনা দু'ভাগ। তুমি ভাল করে ভেবে দেখ ভাই এটা ন্যায্য কিনা? আমি যখন অতিপণ্ডিত তখন আমি একটা অতিরিক্ত অংশ পাবার অধিকারী বুঝলে?

পণ্ডিত ভাই কিন্তু একথা কিছুতেই মেনে নিতে চায় না। শেষপর্যন্ত লাভের টাকার ভাগবাটোয়ারা নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে তুমুল ঝগড়া বেধে গেল। কিছুতেই পণ্ডিত ভাইকে বোঝাতে না পেরে শেষে অতিপণ্ডিত প্রস্তাব করলে, আচ্ছা বেশ!

● পণ্ডিত আর অতিপণ্ডিত
রাধারানী দেবী

তুমি তো ঠাকুর দেবতা মানো। দেবতা তো আর মিথ্যে বলেন না। চলো কালই গিয়ে আমরা অরণ্যের বনদেবীকে জিজ্ঞাসা করিগে—এভাবে ভাগ করা ঠিক হচ্ছে কিনা। তিনি যা বলবেন আমি তাই মেনে নেবো।

পণ্ডিত ভাই এ প্রস্তাবে রাজী হ'ল। কারণ, সে ঈশ্বর-বিশ্বাসী ধর্মভীরু লোক। দেব দ্বিজে তার অপরিসীম ভক্তি। স্থির হ'য়ে গেল যে, কালই শনিবার অমাবস্যার রাত্রে অরণ্যে গিয়ে বনদেবীর পূজা দিয়ে এ বিষয়ে তাঁর অভিমত জানতে চাওয়া হবে। তিনি যা আদেশ করবেন পণ্ডিত ভাই সেইটেই মেনে নেবে।

তখন অতিপণ্ডিত করলে কি তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে অনেক সাধ্য-সাধনা করে বুঝিয়ে বললে যে কাল শনিবার অমাবস্যার রাত্রে সে যদি বনে গিয়ে বনদেবীর ভূমিকা অভিনয় করে তাহলে তাদের অনেক টাকা লাভ হবে। বনের মধ্যে সবচেয়ে বড় মোটা একটা গাছের গুঁড়ির কোটরের মধ্যে অতিপণ্ডিত তাকে আগে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখে আসবে। তারপর পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে সে যখন বনদেবীর পূজা করতে এসে বনদেবীকে লাভের টাকা কিভাবে ভাগ করা হবে জিজ্ঞাসা করবে তখন সে যেন বনদেবীর কণ্ঠ অনুকরণ করে বলে যে—'তুমি যখন শুধু পণ্ডিত তখন তুমি লাভের অংশ একভাগ মাত্র পাবে, আর অতিপণ্ডিত যিনি তিনি দু'ভাগ পাবেন।'

অতিপণ্ডিতের স্ত্রী স্বামীর পরামর্শমতো এই মিথ্যাচরণে রাজী হলেন না। বললেন যে দেবতার নাম করে কাউকে প্রবঞ্চনা করলে সেই পাপে আমাদের বিপদ আর অকল্যাণ হতে পারে। সুতরাং, অর্থলোভে আমাদের এত বড় অন্যায় কখনই করা উচিত নয়।

কিন্তু, অতিপণ্ডিত স্ত্রীর একথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে বললে, কী! তোমার এত বড় স্পর্ধা! জানো পতিই মেয়েদের পরম গুরু। পতিবাক্য অবহেলা করা মানে গুরুবাক্য লঙ্ঘন করা। আর গুরুর আদেশ অবহেলা করা মানেই মহাপাতকের ভাগী হওয়া। সতী সাধ্বী স্ত্রীর উচিত সর্বদা স্বামীর আদেশ মেনে চলা। পতি পরম গুরুর আদেশ অমান্য করলে তোমাকে অনন্তকাল নরকবাস করতে হবে।

স্বামীর কথা শুনে অতিপণ্ডিতের স্ত্রী ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। অত্যন্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও সে স্বামীর আদেশ পালন করতে রাজী হল। শনিবার সন্ধ্যার আগে অতিপণ্ডিত তার স্ত্রীকে নিয়ে গিয়ে বনের মধ্যে একটি বড় গাছের কোটরে লুকিয়ে রেখে এল।

পরে অমাবস্যার রাত্রে পণ্ডিতকে নিয়ে অতিপণ্ডিত বনের মধ্যে সেই গাছটির তলায় গেল এবং ধূপ ধুনা জ্বেলে মহাসমারোহে বনদেবীর পূজা করে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে

পণ্ডিতকে বললে এইবার তুমি বনদেবীকে জিজ্ঞাসা করো আমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে কার কত লভ্যাংশ পাওয়া উচিত ?

পণ্ডিত তখন বনদেবীর উদ্দেশে ভক্তিভরে প্রণাম জানিয়ে প্রশ্ন করলে, দেবী অরণ্যলক্ষ্মী ! বনভুবনেশ্বরী ! আপনি অন্তর্যামী। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানে যা কিছু ঘটেছে বা ঘটছে সবই আপনার জানা। আমরা যে আজ কেন আপনার আরাধনা করতে এসেছি এও আপনার অবিদিত নয়। সুতরাং করুণাপরবশ হ'য়ে আপনার এই শরণাগতদের বলে দিন আমাদের কারবারের লভ্যাংশ দুই ভাইয়ের মধ্যে কে কত পাবে ? ন্যায়তঃ ধর্মতঃ কার কত পাওয়া উচিত ?

গাছের গুঁড়ির কোটর থেকে অতিপণ্ডিতের স্ত্রী স্বামীর আদেশ ও শিক্ষা মতো নিজের গলার স্বর পরিবর্তন করে বনদেবীর মতো বললে, তোমাদের দু'ভাইয়ের মধ্যে যেহেতু একজন 'অতিপণ্ডিত' আর একজন শুধু 'পণ্ডিত'; তখন পণ্ডিতের প্রাপ্য লভ্যাংশের দ্বিগুণ পাওয়া উচিত 'অতিপণ্ডিতের'।

পণ্ডিত বনদেবীর এ বিচার শুনে অত্যন্ত বিস্মিত ও দুঃখিত হল। কাতরভাবে ভগবানকে ডেকে বললে, জগদীশ্বর ; একি শুনলুম ? তবে কি তোমার রাজ্যে এখন দেবতারাও সত্য ও ন্যায় বিচার ভুলে মিথ্যাচরণের পক্ষপাতী হ'য়ে উঠেছেন ?

পণ্ডিত কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলে না যে ভগবানের রাজ্যে দেবতারা এমন অবিচার করতে পারেন। তার মনে একটা প্রবল সন্দেহ হল যে এই মহাবৃক্ষের কোটরে কি সত্যই বনদেবী আছেন ? না আর কেউ ? আমাকে একবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

এই ভেবে সে করলে কি, কিছু শুকনো ডালপালা কুড়িয়ে এনে সেই গাছের গোড়ায় জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দিলে। অতিপণ্ডিত তাকে একাজ করতে অনেক নিষেধ করেছিল। দেবতার কোপে পড়বে বলে ভয় দেখিয়েছিল। কিন্তু পণ্ডিত তার কথা গ্রাহ্য করেনি।

শুকনো ডালপালা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। সেই অগ্নিশিখার উত্তাপে অতিপণ্ডিত গাছের তলা থেকে সরে এসে দাঁড়ালো। আগুন নিভিয়ে ফেলবার চেষ্টা করেও সে কিছু করতে পারলে না। এমন সময় অতিপণ্ডিতের স্ত্রী সেই গাছের কোটর থেকে, বাপরে ! মারে ! গেছিরে ! বলে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে বেরিয়ে পড়লো। তার শাড়িতে তখন আগুন ধরে গেছে। সর্বাঙ্গ ঝলসে পুড়ে গেছে।

পণ্ডিত তার ভাইয়ের স্ত্রীর এই অবস্থা দেখে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারলে এবং অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে তৎক্ষণাৎ তাকে বাঁচাবার জন্য এগিয়ে গেল। নিজের

● পণ্ডিত আর অতিপণ্ডিত
রাধারানী দেবী

গাত্রবস্ত্র খুলে ভাইয়ের বৌকে দিয়ে বললে, আপনি শীঘ্র জ্বলন্ত শাড়িখানি খুলে ফেলে আমার উত্তরীয়খানি পরে লজ্জা নিবারণ করুন। কোনো ভয় নেই। আমি এখনি আপনাকে বন্যলতা থেকে তৈরি করে একটি প্রলেপ দিচ্ছি যাতে আপনার জ্বালা-যন্ত্রণা সব জুড়িয়ে যাবে।



বাপরে! মারে! গেছিরে!!—বলে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এলো অতিপণ্ডিতের স্ত্রী। [পৃষ্ঠা ২৭৭

অতিপণ্ডিতের স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো, আপনি ঈশ্বরবিশ্বাসী, ধার্মিক ও সত্যবাদী মানুষ। আমার স্বামীর আদেশে বাধ্য হয়ে আপনাকে প্রবঞ্চনা করতে এসে আমি হাতে হাতে আমার মহাপাপের শাস্তি পেলুম। পতি দেবতা হ'লেও তার অন্যায় আদেশ পালন করলে সে স্ত্রীকেও সে পাপের ভাগী হ'তে হয় একথা আমি ভাবিনি। আমার আজ উপযুক্ত শিক্ষা হল। পাপের শাস্তি আমি পেলুম। আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন।

পণ্ডিত লজ্জিত হয়ে বললে, জননী! আমি ভাবতেও পারিনি যে আমার সহোদর ভাই এমন অন্যায়ভাবে আপনাকে বনদেবী সাজিয়ে আমাকে প্রতারণা করবেন। আমি এই বৃক্ষ-মূলে অগ্নিসংযোগ করে আপনার অশেষ দুঃখকষ্টের কারণ হলুম। আপনি বরং আমার এই অজ্ঞানকৃত অপরাধ মার্জনা করবেন।

অতিপণ্ডিত এই দুর্ঘটনায় বিচলিত হয়ে ক্ষোভে লজ্জায় অপরাধীর মতো অপ্রতিভ হয়ে পণ্ডিত ভাইকে তার প্রাপ্য অংশ অর্ধেক ভাগ দিয়ে দিলে।

পণ্ডিত ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে বললে, সৎপথে থাকলে তোমার কোনোদিনই অর্থের অভাব হবে না অতিপণ্ডিত—এই কথাটি আমার মনে রেখো। অতি লোভে মানুষের ক্ষতিই হয় শেষপর্যন্ত।



কঙ্কাল

শ্রীমধুসূদন মজুমদার

দীর্ঘকাল পুলিস-বিভাগে কাজ করে যে সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি তা যেমন চমকপ্রদ তেমনি অবিশ্বাস্য। সত্যি বলতে সময় সময় এর সত্যাসত্য সম্বন্ধে আমার নিজেরই খটকা লেগে যায়। বাস্তবিক সেগুলো রূপকথা, উপকথা বা অলৌকিক কাহিনীর মতই রোমাঞ্চকর আর রহস্যপূর্ণ।

এমনি একটি কাহিনীর কথা আজ বলব।

বিলেতের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে কিছুদিন ট্রেনিং নেওয়ার পর, সরকার আমাকে পাঠালেন বাংলা দেশের একটা জেলার পুলিসের বড়কর্তা করে। কাজকর্ম মন্দ চলছিল না। 'স্মার্ট' বলে বড়কর্তাদের কাছে আমার একটা খ্যাতিও ছিল।

বর্ষাকালে একদিন সকাল থেকেই ঝিমঝিম করে বৃষ্টি হতে শুরু করেছে। বিছানা ছেড়ে উঠি উঠি করছি কিন্তু তবুও উঠতে ইচ্ছে করছে না। এমনি সময় আমার বেরসিক চাকর ভজুয়ার চিৎকারে চোখ চাইতে হল। জিজ্ঞাসা করলাম—কি ব্যাপার?

ভজুয়া বলল—দ্বারিকবাবু দেখা করতে এসেছেন।

দ্বারিকবাবু আমারই অধীনস্থ কর্মচারী। আমার কোয়ার্টার যেখানে তার থেকে প্রায় পনেরো মাইল দূরে রায়পুর থানার তিনি দারোগা।

অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিছানা ছেড়ে উঠতে হল। আমাকে দেখেই দ্বারিকবাবু সসম্ভ্রমে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন। নমস্কার বিনিময়ের পর তিনি যথারীতি আসনগ্রহণ করলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কি খবর দ্বারিকবাবু? আজ যে এতো সকালেই?

দ্বারিকবাবু একটু চিন্তিত হয়ে বললেন—একটা জরুরী ব্যাপারের জন্যে আসতে বাধ্য হলাম স্যার। আপনাকে এখুনি একবার রায়পুরে যেতে হবে।

—রায়পুরে কেন? কি হয়েছে সেখানে?—একটু বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করি।—ব্যাপার কি, ডাকাতদল ধরা পড়েছে, না ছেলেরা মিছিল করে গ্রামের শান্তি ভঙ্গ করছে?

একটু চিন্তিত হয়েই দ্বারিকবাবু উত্তর দিলেন—ঠিক তা নয় স্যার। সম্প্রতি সেখানে গঙ্গার তীরে একটা কঙ্কাল পাওয়া গেছে গাছে টাঙানো অবস্থায়। লোকে ভূতের কাণ্ড ব'লে সন্ধ্যে হবার বহু আগেই গঙ্গার তীর থেকে চলে আসছে। সারা গ্রামটা ভয়ে জড়োসড়ো।

হাসি পেলো আমার, বললাম—আমি তো আর ভূতের ওঝা নই যে ভূত তাড়াতে পারব? আপনি বরং কোনও ওঝার বাড়িতে যান!

এমনি সময় ভজুয়া টেবিলের ওপর আমাদের দু'জনের জন্যে ডিম, টোস্ট আর চা রেখে গেল। একটা টোস্টে কামড় বসিয়ে দ্বারিকবাবু বললেন—ব্যাপারটা ঠিক তা নয় স্যার। আমার যেন মনে হচ্ছে এর সঙ্গে এক বছর আগে রতন রায়ের মৃত্যুর ঘটনার যোগাযোগ আছে।

—কোন্ রতন রায়? কি ব্যাপারটা খুলে বলুন তো?

দ্বারিকবাবু বললেন—গত বছর এই শ্রাবণ মাসেই রায়পুরের জমিদার হরিহর রায় আর তাঁর ছোট ভাই রতন রায় গিয়েছিলেন পাশের বনে শিকার করতে। রতন রায় ছিলেন অবিবাহিত। হরিহর রায়ের আজ তিন বছর হ'ল বিয়ে হয়েছে।

সেইদিনই সন্ধ্যেবেলায় হরিহর রায় বন থেকে এসে কাঁদতে কাঁদতে থানায় এজাহার দেন—দুপুর বেলায় তাঁরা যখন শ্রান্ত হয়ে গঙ্গায় স্নান করতে নামেন তখন হঠাৎ জোয়ার আসায় রতন রায় গঙ্গার জলে ভেসে যায়। দুই ভাই-ই তাঁরা গ্রামের ছেলে। সাঁতারও কাটতে পারতেন নিশ্চয়ই। সুতরাং জলে নেমে সাঁতার কাটা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। তাই আমি সেই বিশ্বাসে গঙ্গায় লোক নামিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করি রতন রায়ের দেহের জন্য। কিন্তু মৃতদেহ বা রতন রায়ের কাপড়ের কোনও হদিস তখন পাওয়া যায় নি।

● কঙ্কাল
শ্রীমধুসূদন মজুমদার

এর দশ দিন পরে শ্রীরামপুরের কাছে রতন রায়ের কাপড় ও আংটি পরিহিত একটা গলিত মৃতদেহ পাওয়া যায়। পোর্টপুলিশ এবং গঙ্গার ধারের সব থানাতেই আমার খবর দেওয়া ছিল। যাহোক, খবরটা পাওয়ামাত্রই আমি হরিহর রায়কে সঙ্গে করে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হই।

হরিহর রায়, রতন রায়ের কাপড় ও আংটি দেখে মৃতদেহকে রতন রায় বলে সনাক্ত করেন।

যথানিয়মে আমি শবব্যবচ্ছেদাগারে মৃতদেহ পাঠিয়ে দিই। কিন্তু বিস্মিত হয়ে যাই পনেরো দিন পরে ডাক্তারের রিপোর্ট পেয়ে।

ডাক্তার লিখেছেন—মৃতদেহটি এতদূর পচে গিয়েছিল যে তার মৃত্যুর কারণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবুও যতদূর মনে হয়, এই লোকটির জলে ডুবে বা কোনরকম আঘাতে মৃত্যু হয় নাই, মৃত্যু হয়েছে স্বাভাবিক কোনও রোগে।

এরপর আমি তদন্ত চালানো একরকম বন্ধই রাখলাম। হরিহর রায়কেও সন্দেহ করিনি, কারণ এনকোয়ারী থেকেই জানতে পেরেছিলাম তিনি তাঁর ভাইকে ভালবাসতেন প্রাণের চেয়েও বেশী। তাছাড়া তাঁকে তখন প্রায় সংসারত্যাগী বললেই চলে। তাঁর গুরুদেবের সঙ্গে দিনরাত সাধন ভজন নিয়েই থাকেন। এরকম সংসার-নির্লিপ্ত লোককে সন্দেহ করা যায় কেমন করে!

আমি প্রশ্ন করি—তাহলে তার সঙ্গে এই কঙ্কালের সম্বন্ধ কোথায় দেখছেন?

আমাদের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। এঁটো বাসনগুলো টেবিলের উপর থেকে সরিয়ে নিয়ে ভজুয়া সেখানে রেখে গেল মসলার কৌটো আর সিগারেটের কেস।

একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে কেসটা এগিয়ে দিলাম তারিকবাবুর দিকে। পদমর্যাদায় আমি বড় হলেও বয়সে ছিলাম তাঁর চেয়েও অনেক ছোট। তাঁকে ইতস্ততঃ করতে দেখে আমি বলি—নিন না একটা সিগারেট, ক্ষতি কি?

আমার মৌখিক অনুমতি পেয়ে তারিকবাবু একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে আবার শুরু করেন তাঁর কথা।—

সেই কথাই বলছি স্যার,—কঙ্কালটা গঙ্গার ধারের বনের মধ্যে টাঙানো অবস্থায় পাওয়া গেছে ঠিক আগের বছর যে তারিখে রতন রায় জলে ডুবে মারা যান, সেই তারিখে। খবর পেয়ে আমিও তদন্তে গিয়েছিলাম। দেখলাম একটি মানুষের কঙ্কাল। কে কাকে হয়তো খুন করে রেখে গেছে এমনি ধরনের একটা কিছু ভাবছি এমন সময় কঙ্কালটা হাওয়ায় দুলে উঠলো। দড়িটা ঘুরে যেতেই কঙ্কালটার পিছন দিক আমার সামনে এলো।

স্তম্ভিত হয়ে আমি তখন লক্ষ্য করলাম পিঠের দিকে হাড়ের গায়ে রয়েছে স্পষ্ট দুটো গুলির দাগ। কী সন্দেহ হল, কঙ্কালটাকে বিশেষ পরীক্ষার জন্যে কলকাতায় পাঠালাম। সেখান থেকে কাল

● কঙ্কাল
শ্রীমধুসূদন মজুমদার

সন্ধ্যায় রিপোর্ট পেয়েছি মানুষটির মৃত্যু হয়েছিল বন্দুকের গুলিতে। এবং সে গুলি করা হয় একরকম বিশেষ ধরনের পিস্তলের সাহায্যে। মৃতের বয়স চব্বিশের বেশী হবে না। রতন রায়েরও বয়স ছিল তাই। নানারকম রিপোর্ট থেকে আমার যেন কেমন সন্দেহ হয়, কঙ্কালটির সঙ্গে রতন রায়ের মৃত্যুর কোনও সম্বন্ধ আছে। তাই কাল গভীর রাত্রে আমি জমিদার হরিহর রায়ের বাড়িতে খানাতল্লাশি চালাই। সেখানে গিয়েই শুনলাম হরিহর রায় আজ এক মাস ধরে অপ্রকৃতিস্থ আছেন। তাঁর সাধন-ভজনও আজকাল বন্ধ এবং উনি আর বাইরে আসেন না। আর আকাশে কালো মেঘ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চেঁচিয়ে উঠছেন,—আমি নয়, আমি নয়!

অথচ মেঘ কেটে আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হচ্ছেন প্রকৃতিস্থ। তখন এলোমেলো কথা বলার কারণ তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি তা মনেও করতে পারেন না। আর একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। জমিদার বাড়ির বাগানের কোণে মাটির তলায় আমি একটি পিস্তল পেয়েছি! যা আমেরিকান সোলজাররা যুদ্ধের সময় ব্যবহার করতো। এ ছাড়া হরিহর রায়কে গ্রেপ্তার করার অন্য কোনও যুক্তিসংগত কারণ আমি পাইনি। এখন আপনি যদি একবার দয়া করে ওখানে গিয়ে নিজের হাতে তদন্তের ভার নেন, তা হলে বড় ভাল হয়। তবে হরিহর রায় যে একজন বিশেষ মানী লোক তাও আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে।

আমি প্রশ্ন করি—হরিহর রায়কে কোনও প্রশ্ন করার সুযোগ কি আপনি পেয়েছেন?

দ্বারিকবাবু বলেন—আজ্ঞে না, কারণ কাল রাত্রির থেকেই আকাশে রয়েছে কালো মেঘ। এখনও তা কাটেনি। আর হরিহর রায়ও ঘরে বসে নিজের খেয়ালেই বলে চলেছেন—"আমি নয়, আমি নয়।"

ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে পারলাম না। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে থাকতে এ ধরনের দু-একটা হত্যাকাণ্ড দেখিনি যে তা নয়। তাই দ্বারিকবাবুকে বলি—চলুন, দেখি যদি কিছু করতে পারি। তবে আমার বেরুতে হয়তো একটু দেরি হবে। আমার বন্ধু মানসিক ব্যাধির চিকিৎসক ডাঃ সিংহকে কলকাতায় একবার ফোন করব। তাঁর সঙ্গে একটু আলোচনা করা দরকার।

একটু বিস্মিত হয়েই দ্বারিকবাবু বলেন—মানসিক ব্যাধির চিকিৎসক এখানে কি সাহায্য করতে পারেন স্যার?

আমি বলি—আচ্ছা, দ্বারিকবাবু, আপনার মনে আছে কি সেতু বাঁধবার সময় রামচন্দ্র একটি কাঠবিড়ালীর কাছ থেকেও সাহায্য নিয়েছিলেন? সুতরাং কার কাছ থেকে কিভাবে কোন্ সাহায্য আসতে পারে তা তো আমরা জানি না। দ্বারিকবাবু, চলুন না একবার দেখে আসতে দোষ কি?

● কঙ্কাল
শ্রীমধুসূদন মজুমদার

আমি যখন রায়পুর থানায় পৌছুলাম ঘড়িতে তখন ১১টা বেজে গেছে। আকাশে কালো মেঘের বদলে উঠেছে তখন প্রখর সূর্য। হরিহর রায়কে ডেকে পাঠালাম আমার কাছে। দেখলাম দিব্যি শৌখিন মানুষ। অপ্রকৃতিস্থতার কোন চিহ্নই তাঁর চোখে বা মুখে নেই। একটু বিরক্তির সঙ্গে আমাকে প্রশ্ন করলেন—আমাকে এখানে আটকে রাখার মানে ? কি ভেবেছেন আপনারা !

আমি শান্তভাবে জবাব দিলাম—দেখুন হরিহরবাবু, আপনার মত সম্মানিত লোককে এখানে আনা হয়েছে শুনে আমি নিজে শহর ছেড়ে ছুটে এসেছি।

একটু ব্যঙ্গের স্বরেই তিনি বললেন—তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কাল রাতে দা'ক আমাকে এখানে ধরে আনা হয়েছিল। কিন্তু কারণটা জানতে পারি কি ?

বেশ খানিকটা হেসে নিয়ে বলি—আমরা খবর পেয়েছিলুম কতকগুলি পিস্তল নাকি আপনার নামে কলকাতার আমেরিকান মিলিটারীদের কাছ থেকে কেনা হয়েছিল। শুনে তো আমি অবাক। ফাইলে দেখছি আপনার নিজের নামে দুটো রিভলভার আর একটা দোনলা বন্দুক রয়েছে। ভেবেই পেলুম না আপনার আবার পিস্তলের কি দরকার হতে পারে। ভাবলাম আপনার মৃত ভাই রতন রায়, সে হয়তো কোন কারণে কিনতে পারে। হয়তো আপনার বিরুদ্ধে তার আক্রোশ ছিল। কারণ, ফাইল থেকেই পেলাম—রতন রায়ের নামে কোনও বন্দুক ছিল না। কিন্তু একথা বললে বড়কর্তারা তো ছাড়বেন না। হতে পারে রতন রায় আজ মৃত, কিন্তু মালগুলো গেল কোথায় ? তাই দ্বারিকবাবুকে বলেছিলুম আপনার বাগানটা একবার ভাল করে সার্চ করতে। এবং সেই জন্যে গত রাতে দ্বারিকবাবু গিয়েছিলেন আপনার বাগান দেখবার জন্যে। দুর্ভাগ্যের বিষয় আপনার বাড়ির বাগানের মাটির তলা থেকে এই পিস্তলটা পাওয়া গেছে। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও দ্বারিকবাবু আপনাকে এখানে আনতে বাধ্য হয়েছেন। দেখুন তো চেনেন কি না এটাকে ? বলে পকেট থেকে দ্বারিক-বাবুর কাছ থেকে পাওয়া পিস্তলটা হরিহরবাবুর হাতে দিলাম।

মুহূর্তের মধ্যে হরিহরবাবুর মুখে একটা কালো ছায়া পড়লো। কিন্তু তা ঐ মুহূর্তেরই জন্য। আমার হাত থেকে পিস্তলটা নিয়ে নেড়ে চেড়ে বললেন—না, এটাকে কখনও দেখিনি তো !

এই ধরনেরই যে একটা উত্তর পাবো তা আমি আগেই জানতুম। তাই সোজাসুজি বললুম—আমার হাতের গোটাকতক কাজ সেরে সন্ধ্যা নাগাদ আমি যখন শহরে ফিরে যাব তখন আপনিও আমার সঙ্গে যাবেন। কারণ ইচ্ছে থাকলেও অত সহজে মুক্তি দেবার ক্ষমতা আমার নেই। এর জন্যে আনুষ্ঠানিকভাবে দরকার হবে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি। আজকে আমার সঙ্গে গিয়ে যদি কোনও কারণে দেরি হয়ে যায়, তা হলে ফিরবেন কাল ভোরের বেলায়। রাতের মতন আমারই বাড়িতে অতিথি হবেন আজ। আপত্তি আছে নাকি রায়মশায় ?

● কঙ্কাল
শ্রীমধুসূদন মজুমদার

হরিহরবাবু বললেন—না, আপত্তির বিশেষ কিছুই ছিল না, তবে আপনি একটু চেষ্টা করবেন যাতে আমি আজই রায়পুরে ফিরে আসতে পারি।

আমরা যখন ফিরে এলাম শহরে তখন ঘড়িতে সাতটা বেজে গেছে। ডাক্তার সিংহ কলকাতা থেকে বিকেল পাচটায় এসে আমার জন্যে কোয়ার্টারে অপেক্ষা করছিলেন। গোপনে তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়ে সমস্ত কথা বললাম। ডাঃ সিংহ সব শুনে বললেন—তুমি যা বলছ মিঃ মিত্র তা হওয়া সম্ভব। মানুষের মনের আর একটা দিক আছে। যাকে আমরা বলি অবচেতনা বা সাবকনসাসনেস। অনেক সময় দেখা যায় নিজের মন থেকে দুষ্কৃতকারী তার পাপের দাগ মুছে ফেললেও মুছতে পারে না তার এই অবচেতন মন থেকে। আমার যতদূর বিশ্বাস ঘটনার সময় আকাশে দেখা দিয়েছিল কালো মেঘ এবং বজ্রপাত হওয়াও অসম্ভব নয়। এই সময় হরিহর রায় তার ভাই রতন রায়কে হত্যা করেছিল। যা হোক, যে করে পার আকাশে মেঘ ওঠা অবধি হরিহর রায়কে তোমায় আটকে রাখতে হবে। তাহলেই তোমার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।



আপনার বাড়ির বাগান থেকে এই পিস্তলটা পাওয়া গেছে—দেখুন তো চেনেন কি না এটাকে! [পৃষ্ঠা ২৮৩

ম্যাজিস্ট্রেট যে তখন শহরে ছিলেন না, সফরে বেরিয়েছিলেন তা আমি জানতুম। সুতরাং অনিবার্য কারণেই যখন সে রাত্রে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারা গেল না তখন বাধ্য হয়েই হরিহর রায় সে রাত্রের মত আমার অতিথি হলেন।

রাত্রে খাওয়ার টেবিলে বসে ডাঃ সিংহ গল্প শুরু করলেন। আমাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন—তুমি ভূত বিশ্বাস কর শুভেন্দু?

● কঙ্কাল
শ্রীমধুসূদন মজুমদার

আমি বলি—পাড়াগাঁয়ের ছেলে আমি, করি বৈকি।

একটু হেসে তিনি বললেন—আমি কিন্তু করতাম না, এখন করি।

আমি প্রশ্ন করি—কারণ?

—তুমি বোধ হয় জানো, বিলেতে আমি গিয়েছিলাম, এফ. আর. সি. এস. পড়তে। হাসপাতালে একটা রোগীকে অপারেশন করতে গিয়ে সামান্য ভুলের জন্য আমি তাকে মেরে ফেলি। লোকটার কেউ কোথাও ছিল না, তাই কোনও মামলাও হল না। ডাক্তার বলে আমি রেহাইও পেলাম কিন্তু রেহাই পেলাম না শুধু মৃত আত্মার কাছ থেকে। দেশে ফেরার পর প্রতিরাত্রে আমার কাছে এসে সে তার মৃত্যুর জন্য কৈফিয়ত চাইতো। কিন্তু কী কৈফিয়ত দোব! যাহোক এইভাবে পাঁচটি বছর যন্ত্রণা সহ্য করার পর একজন তান্ত্রিক সাধু সম্প্রতি আমায় তার হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

আড়চোখে একবার হরিহরবাবুর মুখের দিকে চাই। দেখি সেখানে জমেছে কালো মেঘ। সন্দেহটা আমার তখন বেশ ঘনিয়ে আসছে। ডাঃ সিংহ আপন মনে তাঁর ভূতের গল্প করে চলেছেন। ওদিকে আমাদের অলক্ষ্যে আকাশে জমে উঠছে বর্ষার মেঘ।

খাওয়া দাওয়ার পর আমরা তিনজনে তিনটে কামরায় শুয়ে পড়লাম। ডাক্তার সিংহের নির্দেশে বাড়ির সমস্ত বিজলী আলো নিবিয়ে দেওয়া হল। ঠিক সেই সময় হরিহরবাবুর ঘর থেকে শোনা গেল একটা তীব্র আর্তনাদ। আলো, আলো করে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন। আর ভজুয়া তাড়াতাড়ি তাঁর ঘরে জ্বেলে দিয়ে আসে একটা হারিকেনের আলো। ঠিক এমনি সময় মুষলধারে শুরু হয় বৃষ্টি। আর হরিহরবাবু অপ্রকৃতিস্থ হয়ে বলতে থাকেন—আমি নয়, আমি নয়।

হঠাৎ হরিহরবাবুর ঘরের খাটের নিচে থেকে কে যেন বলে ওঠে—নিশ্চয়ই তুমি!

প্রথমে খাটের তলায়, পরে ঘরের চতুর্দিক থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে থাকে—তুমি—তুমিই আমাকে খুন করেছ!

বাইরে ঠিক সেই সময়ে বাজ পড়লো। হরিহরবাবু আর্তনাদ করে উঠলেন। অদৃশ্য কণ্ঠ কিন্তু না থেমে ঠিক আগের মতই বলে যেতে থাকে—সেদিন বনের মধ্যে তুমি ছিলে পেছনে, আর আমি ছিলাম তোমার সামনে। কারণ তুমি ভালভাবেই জানতে বন্দুকের টিপ তোমার চেয়ে অনেক ভাল আমার। তাই সামনে থেকে আমাকে আক্রমণ করতে তুমি পারোনি। বিদ্যুতের আলোয় পেছন থেকে তুমি আমায় চোরের মত গুলি করেছিলে। *কেন, কেন তুমি তা করলে? সমস্ত জমিদারীটা পাবার* জন্যে? আমাকে বললেই তো তা আমি তোমাকে দিয়ে দিতে পারতাম। তারপর আমার মৃতদেহটাকে গাছের ওপর টাঙিয়ে রেখে তুমি ফিরে এলে বাড়িতে। তুমি আর তোমার সেই তান্ত্রিক গুরু রাত্রে গিয়ে নিয়ে এলে মৃতদেহটাকে। হত্যার কথা ঢাকবার জন্যে কলকাতা থেকে অন্য একটা

● কঙ্কাল
শ্রীমধুসূদন মজুমদার

মৃতদেহ কিনে আমারই জামা কাপড় পরিয়ে ভাসিয়ে দিলে গঙ্গার জলে। আর ভাসালে হুগলীতে গঙ্গার ধারের তোমারই নতুন বাগানবাড়ি থেকে।

হরিহরবাবু চমকে উঠে বললেন—এ সব কথা তুই কি করে জানলি?

—তুমি কি জানো না, অপঘাতে মৃত্যুর জন্যে আমি ভূত হয়েছি। হাওয়ায় ভেসে ভেসে আমি সর্বত্র যেতে পারি। তা ছাড়া যে মৃতদেহটাকে কলকাতা থেকে তুমি কিনে এনে আমার জামা কাপড় পরিয়ে শুধু শুধু পচালে তারও সদ্গতি হয়নি! সেও আমার মতন তোমার ওপরে প্রতিশোধ নেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে।

অপর একটা কণ্ঠ বলে ওঠে—হরিহরবাবু, এই এক বছর ধরে আমি হাওয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমার মৃতদেহের সদ্গতি হল না বলে আমিও তোমায় শাস্তি দেব।

ভয়ে অভিভূত হয়ে হরিহরবাবু বলেন—আমাকে তোমরা ক্ষমা কর। তান্ত্রিক সাধু আমাকে ঐরকম বুঝিয়েছিল বলে আমি অমন কাজ করেছিলাম।

এইবারে মৃত রতন রায়ের কণ্ঠস্বর বলে উঠল—তুমি কি আমার মৃত্যুর আগে ঐ তান্ত্রিক সাধুর সঙ্গে মেশোনি? কি পরামর্শ সে দিয়েছিল তোমাকে?

একটু ঢোক গিলে হরিহরবাবু বলেন—আগে বল তোমরা আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে, তা হলে আমি সব কথা তোমাদের বলব।

মৃত রতন রায়ের কণ্ঠস্বর বলেন—হাজার হোক তুমি আমার বড় ভাই। অমন করে যখন প্রার্থনা করছ তখন আমি কথা দিচ্ছি তোমায় রক্ষা করব।

হরিহরবাবু বলেন—ঐ সাধু আমাকে বোঝায় যে সে আমাকে প্রচুর ধনরত্ন দেবে। তাই আমি তাকে বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলাম। তোতে আমাতে যেদিন শিকারে গিয়েছিলাম সেদিন সেও লুকিয়ে আমাদের সঙ্গে ঐ বনের মধ্যে যায়। হরিণটাকে গুলি করতে তুই যখন ব্যস্ত ছিলি তখন হঠাৎ সেই সাধু পেছন থেকে তোকে গুলি করে। আমি চমকে উঠে পেছনের দিকে চাইতেই তাকে দেখতে পেলাম। তখন সে আমাকে বলে—জগন্মাতার আদেশেই সে তোকে হত্যা করেছে। তোর মৃতদেহটার ওপর বসে তাকে আর আমাকে এখন সাধনা করবার নির্দেশ এসেছে।

আমি হত্যার কথা বলে দেব বলতে সে আমাকে বলে—পুলিস তাকে সন্দেহ করবে না, করবে আমাকে। বাগানে চোরকুঠুরীর মধ্যে তোর দেহকে রাখা হল। সাধনাও চললো। মৃতদেহের পচা দুর্গন্ধ সহ্য করতে না পারার দরুন সে আমাকে নিয়মিতভাবে মদ খাওয়ানো অভ্যাস করালে। মদ খেয়ে আমি মাতাল হয়ে পড়লে আমার কাছ থেকে সে রোজ অনেক টাকা বার করে নিত।

● কঙ্কাল
শ্রীমধুসূদন মজুমদার

গঙ্গায় মৃতদেহ ভাসানোর মধ্যে আমি ছিলাম না। সেইই কাকে দিয়ে কিনিয়ে এই কাজ করেছিল আমার জানা নেই। আমায় বলেছিল, তোর ভালর জন্যই করেছি। ইদানীং আমি প্রায় সর্বস্বান্ত হবার দরুন তাকে আর টাকা যোগাতে পারতাম না। আমাকে পুলিসের হাতে ধরিয়ে দেবার জন্যেই সে তোর কঙ্কালটা ওভাবে গঙ্গার ধারে টাঙিয়ে রেখে এসেছিল। আমাকে সে বলেও ছিল—তুই নাকি আমার ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছিস। এইবার বল ভাই আমার দোষ কোথায়? সেই ভণ্ড সাধু আমার বাড়িতে বসে কী যে অত্যাচার করে চলেছে তা ভগবানই জানেন!—হরিহরবাবু শিশুর মতন কেঁদে উঠলেন।

ঠিক এমনি সময় দ্বারিকবাবু দরজায় ঘা দিয়ে ডাকলেন—হরিহরবাবু, হরিহরবাবু! দরজা খুলুন মশাই।



সেই সাধুই খুন করে — [পৃষ্ঠা ২৮৬]

রাত চারটের সময় দ্বারিকবাবুকে সেখানে দেখে আমি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করি—কি হয়েছে দ্বারিকবাবু?

হাঁফাতে হাঁফাতে দ্বারিকবাবু বলেন—সর্বনাশ হয়ে গেছে স্যার। আপনার আদেশে সারারাত আমি হরিহরবাবুর বাড়ি পাহারা দিতে জেগেছিলাম। রাত আড়াইটের সময় এই লোকটাকে হঠাৎ হরিহরবাবুর বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে দেখে গ্রেপ্তার করেছি। বাড়িতে ঢুকে দেখি হরিহরবাবুর স্ত্রী আর তাঁর ছেলেটি খুন হয়েছেন, গয়নাগাটি টাকাকড়ি সব কিছুই চুরি গেছে। লোকটার চুল দাড়ি গোঁফ

● কঙ্কাল
শ্রীমধুসূদন মজুমদার

ধরে টানতেই দেখি সব কটাই পরচুল! এর আসল মুখটা দেখে মনে হচ্ছে যেন এ একজন বহুদিনের দাগী ফেরারী। তাই আপনার কাছে ধরে নিয়ে এলাম। ব্যাটা সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে পালিয়ে যাচ্ছিল। আগের দিন হরিহরবাবুর বাড়িতে তল্লাশি চালাবার সময় আমি একে দেখেছিলাম বটে। তখন শুনেছিলাম ইনি হরিহরবাবুর গুরু—তাই সন্দেহ করতে পারিনি। লোকটির কাছে একটা রক্তমাখা ছোরা আর একটা আমেরিকান পিস্তলও পাওয়া গেছে।



লোকটার চুল, দাড়ি, গোঁফ, সব কটাই পরচুল!

আমি তীব্র চোখে লোকটার দিকে চেয়ে বললাম—ওর লাল চেলীটা ছাড়িয়ে অন্য কাপড় পরিয়ে দিন। কারণ রক্তের দাগগুলো এখন হাওয়াতে জমাট বেঁধে বেশ কালো হয়ে উঠেছে। কনস্টেবলদের বলুন ওকে "লক-আপ"-এ পুরতে।

তারপর দ্বারিকবাবু আমাকে প্রশ্ন করলেন—রতন রায়ের মৃত্যুর কোনও কিনারা হল স্যার?

আমি বলি—হরিহরবাবুকেও "লক-আপ"-এ পুরতে হবে। তবে খুনী সে নয়। সমস্ত নাটের গুরু হচ্ছে এই লোকটা।

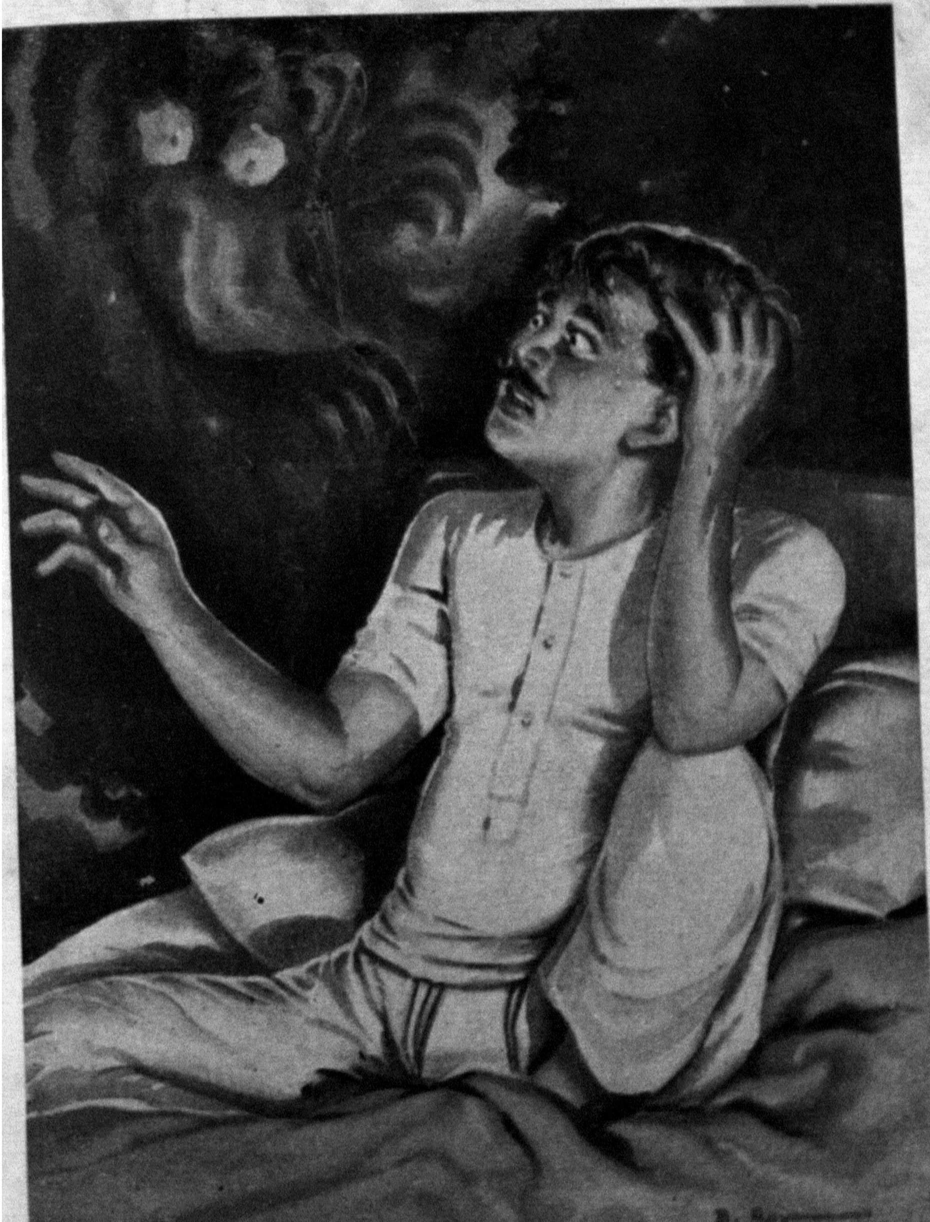
আনন্দে দ্বারিকবাবুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি বললেন—তাহলে হরিহর রায় এজাহার দিয়েছে?

আমি বলি—সে এজাহার, আপনি বা আমি কেউই বার করতে পারতাম না। তা বার করেছেন ডাঃ সিংহ তাঁরই বুদ্ধিকৌশলে এত বড় একটা খুনের কিনারা হল।

দ্বারিকবাবু প্রশ্ন করেন—কোথায় সে এজাহার স্যার?

আমি বলি—ঐ টেপ-রেকর্ডিং মেসিনের ভেতর! এখন আপনি নিশ্চিন্তে জমিদার হরিহর রায়কে ফাটকে পুরতে পারেন।

● কঙ্কাল
শ্রীমধুসূদন মজুমদার



[পৃষ্ঠা—২৮৬

—এসব কথা তুই কি করে জানলি ?

দ্বারিকবাবুর বিস্ময় তখনো কাটেনি। তিনি প্রশ্ন করলেন—কি করে রেকর্ড করা হল স্যার?

আমি বললাম—আমার মুখ থেকে সমস্ত কথা শুনে নিয়ে হরিহরবাবুর ঘরে কয়েকটি লাউড-স্পীকার আর একটা মাইক্রোফোন ডাক্তার সুকৌশলে লুকিয়ে রাখেন। রাত্রি নামার সঙ্গে সঙ্গে হরিহরবাবু হন অপ্রকৃতিস্থ, তখন সেই লাউড স্পীকারগুলির সাহায্যে আমি আর ডাক্তার সিংহ দূরে থেকে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে থাকি। আর তিনি যা উত্তর দেন তা মাইক্রোফোনের সাহায্যে ও ঘরে বসেই টেপ-এ রেকর্ড করতে থাকেন ডাক্তার সিংহ। প্রথমটা আপনার মত আমরাও হরিহরবাবুকে সন্দেহ করেছিলাম। অনুমানের ভিত্তিতেই প্রথমে আমাদের তাঁর সঙ্গে কথা বলতে হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল প্রকৃত অপরাধী তিনি নন। তাঁর অপরাধ—সত্য সংবাদ পুলিসের কাছে গোপন করা।

ডাক্তার সিংহ বললেন—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন দ্বারিকবাবু, হরিহরবাবু ভবিষ্যতে আকাশে মেঘ দেখলে আর অপ্রকৃতিস্থ হবেন না। কারণ তাঁকে বানানো হয়েছিল 'তিনিই প্রকৃত অপরাধী', এখন সত্য প্রকাশ পেয়েছে—তিনিও বিবেকের জ্বালা থেকে মুক্তি পাবেন।

সোনালী কথা

লীভস্ অফ্ গ্রাস্ (ওয়াল্ট্ হুইটম্যান)

'লীভস্ অফ্ গ্রাস্' বর্তমান জগতের সাহিত্যে একখানি অদ্বিতীয় বই। এই বই থেকেই জগতের বিভিন্ন ভাষায় নতুন কবিতা রীতির প্রচলন হয়, যাকে আমরা বলি গদ্য-কবিতা। জগতের বহু কবিই ওয়াল্ট্ হুইটম্যানকে অনুসরণ করে এই নতুন পদ্ধতিতে কবিতা লিখেছেন, কিন্তু আজও পর্যন্ত হুইটম্যানের লীভস্ অফ্ গ্রাসের মতন কাব্য-গ্রন্থ জগতের আর কোন ভাষাতেই সৃষ্ট হয়নি। কিন্তু লীভস্ অফ্ গ্রাসের এটা হলো বাইরের পরিচয়, তার আসল পরিচয় যেখানে সেখানে নিঃসন্দেহে আজ বলা যায়, লীভস্ অফ্ গ্রাস্ কাব্যের দিক থেকে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা-গ্রন্থের একটি এবং এই বইতে হুইটম্যান যে কবি মনের পরিচয় দিয়েছেন, যে ভাব ও যে সুর সৃষ্টি করেছেন জগতের সাহিত্যে তা আজও আর কোথায় দেখা যায় না। একশো বছর আগে যখন প্রথম এই বই আমেরিকায় ছাপা হয় তখন তা আয়তনে খুব ছোট ছিল, এবং তাতে লেখক হিসেবে কারুর নামই ছিল না। ক্রমশঃ বিভিন্ন সংস্করণের ভেতর দিয়ে এই বই-এর আয়তন বাড়তে থাকে এবং জগতের সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তখন আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্র নতুন উদ্যমে জগতে তার স্থান অধিকার করবার জন্যে জাগছে। হুইটম্যান সেই নবীন জাতির প্রাণ স্পন্দনরূপে, প্রেরণারূপে, কবিতার পর কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। তাঁর বাসনা ছিল, আমি আধুনিক জগতের আধুনিক নর-নারীর কাব্য লিখবো, যে আধুনিক মানুষ দূর আকাশের ছায়াপথ থেকে দূরতম মেরু অঞ্চলের রহস্য সন্ধান করতে যায়, যে আধুনিক মানুষের মনের কাছে রেল-টেলিগ্রাফের ঝঙ্কার থেকে আত্মার গূঢ় তত্ত্ব পর্যন্ত কিছুই পরিত্যাজ্য নয়। তাই লীভস্ অফ্ গ্রাসের কবি অপরূপ বলিষ্ঠ ও স্পষ্ট ভঙ্গীতে গেয়েছেন আধুনিক মানুষের সর্বগ্রাসী মনের গান, তাঁর কবিতায় তিনি রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন এই নতুন জগতের বিপুল বিশালতাকে। সে-বিশালতার মধ্যে ভারতবর্ষও বাদ পড়েনি।



ঃ বুকের বিধান ঃ

—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

এক

এক পাড়াতে আখ্ড়া গৃহ—অন্য পাড়ায় টোল,—
সেথায় স্মৃতির বিধান চলে—হেথায় বাজে খোল্।
অকর্মাদের কর্তা যিনি নামটি 'ঘনশ্যাম'—
বলেন 'মোরা ভাগ্যহত, বিধি মোদের বাম,—
নই মধুকর, প্রজাপতি, চাইনে মধুর ভাগ,
জোর করিয়া আমরা লব গরল্ দুখের আগ্।
ধনীজনের নিমন্ত্রণে দক্ষিণা টোল পাক—
আপদ বিপদ সংকটেতে পড়ুক মোদের ডাক।'

দুই

অর্ধোদয়ের যোগের সময় বিপ্র জনেক হায়—
মা বাপ মরা একটি বালক কুড়িয়ে হঠাৎ পায়।
পাদরী সাহেব চাইল তাকে রাখতে কত সুখে—
নড়লো না সে, জড়িয়ে যেন রইলো তাহার বুকে।

টোল্ বলেছে নাইক জানা গোত্র কিম্বা গাঁই—
হিন্দু কিম্বা মুসলমান তার ঠাঁই ঠিকানা নাই।
'বামুন আমি' ছোট্ট ছেলে বলেছে ওই কবে—
সেই কথাতে প্রত্যয়ই বা কেমন করে হবে?

তিন

অনেক ঘুরে ব্রাহ্মণ শেষে বিপদ ভেবে ভারি
অকর্মাদের কর্তা যিনি এলো তাহার বাড়ি।
চক্ষু রাঙা বসে আছে—চাইলে নয়ন মেলে
ঝাঁপায়ে তার উঠ্‌লো কোলে অচেনা সেই ছেলে।
কর্তা শুনে সকল কথা বলেন মৃদু হেসে—
'বিধির দেওয়া পুত্র তোমার চিন্‌লে আমায় এসে।
সন্তানহীন তুমি—বুকে আনন্দ মোর ভারি—
করবে এরে, করবে একেই উত্তরাধিকারী।

চার

বামুন যখন বলেছে সে, ওই সে কচিমুখে—
সত্য তাহাই—স্মৃতির বিধান ভাসাও নদীবুকে।
অধ্যাপককে বলুক গিয়ে রয় যদি দুর্মুখ্
জ্ঞানের আলোয় হয়নি আজও দড়কচে এ বুক।
অকূল থেকে লক্ষ্মী এলেন তিনি কাহার ঝি?
সাগর থেকে উঠ্‌লো ও চাঁদ গোত্র তাহার কি?
টোলের মতে এটি যতই 'আর্ষ' প্রয়োগ হোক,
চিন্‌তে আমি পেরেছি এ বাল্মীকিরই শ্লোক।'

———

অশ্বত্থামার পা

—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

জলপাইগুড়ি আর শিলিগুড়ির মাঝখানে ছোট্ট একটি স্টেশন ভেলাকোবা। নেহাতই ছোট, নাম মনে রাখবার মত কিছুই নয়। কিন্তু একবার, বছর কুড়ি-বাইশ আগে, কয়েকদিন ধরে এই ভেলাকোবার নাম খবরের কাগজের প্রথম পাতায় বড় বড় হরফে ছাপা হয়েছিল। শুধু ছাপা হওয়া নয়—সমস্ত দেশের উদগ্র কৌতূহল যেন জমাট বেঁধে ছিটকে এসেছিল এই ছোট্ট জায়গাটিতে। কারণটাও হয়তো কারো কারো মনে আছে। ঐ স্টেশনেরই কাছাকাছি এক জায়গায় পাওয়া গিয়েছিল অদ্ভুত এক পায়ের ছাপ। অবিকল মানুষের পায়ের ছাপ, কিন্তু এক-একটি পা প্রায় বাইশ ইঞ্চি লম্বা। সাধারণ মানুষের এক-একটি পা সাধারণতঃ ১০।১২ ইঞ্চি হয়, কাজেই এই বাইশ ইঞ্চি বিরাট পায়ের মালিক যে কত বড় অতিকায় মানব তা কল্পনা করাও কষ্টকর। ওটি আদপেই মানুষের পা কিনা তা নিয়েও কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। স্থানীয় লোকদের কিন্তু সন্দেহ ছিল না ও পায়ের মালিক কে। কে আবার? অশ্বথামা! ত্রেতা যুগের হনুমান আর দ্বাপর যুগের অশ্বথামা—এঁরা যে কর্মগুণে অমর হবার বর পেয়েছিলেন এ কথা কে না জানে? সেই অশ্বথামারই পাদস্পর্শে ভেলাকোবার মাটি পবিত্র হয়েছিল। কিন্তু তাঁর দেখা কেউ পায়নি। ঐ রহস্যময় বিরাট পায়ের চিহ্নটুকু মাত্র রেখে আবার তিনি অন্তর্হিত হয়েছিলেন।

বাইশ বছর আগেকার এই ঘটনার কথাটা লোকে প্রায় ভুলেই বসেছিল, আমারও তা উল্লেখ করবার কোন কারণ ছিল না; কিন্তু দুনিয়ায় কত ব্যাপারেরই তো পুনরাবর্তন ঘটে! অশ্বথামাও যে আবার ফিরে আসবেন তাতে আর বিচিত্র কি? তবে বারে বারে একই জায়গায় তাঁকে দেখবার আশা করা অন্যায়। ভেলাকোবা ছেড়ে তাই এক নতুন জায়গায় তাঁর দেখা মিলল।

ব্যাপারটা তবে খুলেই বলি,—এবং, একটু আগের থেকেই জের টেনে নিয়ে আসা যাক্।

দেরাদুনের ফরেস্ট ইনস্টিটিউটে বেশ কয়েক বছর হাতে কলমে কাজ শিখে সুধেন্দু চাকরি নিয়ে চলে এল আসামের জঙ্গলে। শুধু যে চাকরির খাতিরেই এল তাই নয়। আসামের অরণ্যসম্পদ সম্বন্ধে তার বরাবরই কেমন একটা মোহ ছিল—তার টানও বড় কম নয়। এসে দেখল ভুল করেনি সে। প্রকৃতি তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য যেন উজাড় করে দিয়েছেন এখানে। চারদিকে পাহাড়ের প্রাচীর ঘেরা জায়গাটি। এখানে ওখানে ছোট ছোট পাহাড়ী নদী, ঝরনা এঁকেবেঁকে নুড়ির বুকে কলধ্বনি তুলে ছুটে চলেছে মাঝখানে রয়েছে প্রকাণ্ড একটা ঝিল—ছোটখাট হ্রদ বললেও ভুল হয় না। হাজার রকমের নাম-না-জানা পাখিরা ভিড় করে আসে সেখানে সন্ধ্যার দিকে। তাদের কলস্বরে মুখরিত হয়ে ওঠে বনানী। শুধু কি পাখি? কত রকমের বুনো জানোয়ার আসে জলের লোভে। দল বেঁধে আসে বুনো হাতীর পাল—পায়ের ভারে মাটি কাঁপিয়ে। আসে লম্বা-শিং হরিণের দল—মখমলের মত গায়ের চামড়া, তাতে শ্বেত-চন্দনের ফুটকি। কখনও আসে ডোরা-কাটা বাঘ,—হিংসার মূর্ত প্রতীক, কিন্তু কি সুঠাম দেহ! আসে আরো কত ছোটবড় জানা-অজানা জানোয়ার। এত অল্প জায়গায় এত রকম প্রাণীর সমারোহ পৃথিবীর অল্প জায়গায়ই দেখা যায়।

কিন্তু এসবের ওপর সুধেন্দুর মোহ নেই ততটা, যতটা আছে বনের বৃক্ষসম্পদের ওপর। বিরাট বিরাট বনস্পতি যেন যুগ-যুগান্তরের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঝুরি-নামা বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, শাল, সেগুন, পিয়াল, তমাল, মায় মেহগনি—কী নেই সেখানে? কাঁটাঝোপ থেকে শুরু করে নানারকম দুষ্প্রাপ্য গাছের ভিড়। উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও সুধেন্দু তাদের অনেকগুলির নামই জানে না—ধরন-ধারণ তো দূরের কথা। এ যেন একটা বিরাট বোটানিক্যাল গার্ডেন! কিন্তু মানুষের হাতে গড়া নয়—স্বভাবের হাতে গড়া।

মোটা মাইনের চাকরি। সরকারী বনবিভাগের একরকম কর্তা বললেই চলে। অধীনস্থ কর্মচারীরা বলে—সাহেব। আগে আগে সাদা চামড়ার সাহেবরাই ছিল এই সব পদে, এখন একটি দু'টি করে ভারতীয় এসে তাদের জায়গা দখল করছে। সুধেন্দু যার জায়গায় এল তিনিও ইংরেজ—মিঃ টমাস্‌। বয়স্ক লোক, আর বেশ অমায়িক। প্রথম দিনটা তাঁরই ওখানে আতিথ্য নিয়েছিল সুধেন্দু। মিসেস্ টমাস্ মায়ের মতই যত্ন করে এটা-ওটা খাইয়েছিলেন। টমাস্ সাহেবও গল্প করেছিলেন অরণ্যজীবনের নানা অভিজ্ঞতার। সামাজিক লোক—যাদের বলা হয় সোসাইটি ম্যান—তাদের জন্য এ জায়গা নয়। বনকে যারা ভালবাসতে পারে তাদেরই জন্য এ অঞ্চল। কথা বলবার লোকেরও খুবই অভাব এখানে। ভদ্র অর্থাৎ শিক্ষিত লোক বলতে দু'-চারজন সহকারী ছাড়া বেশী কেউ নেই। তবে মজুরের দল আছে। কতক বাইরে-থেকে-আসা,

● অশ্বত্থামার পা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

কতক এখানকার স্থানীয় পাহাড়ী জাত। এই বনের সঙ্গে অদ্ভুত মানানসই তারা। চালচলনে বন্য প্রকৃতির সঙ্গে সহজ সরল জীবনের একটা আশ্চর্য রকম সমন্বয় রয়েছে। টমাস্ বললেন, "এদেরই মধ্যে আপনার দিন কাটাতে হবে। প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হতে পারে, কিন্তু মানিয়ে নিতে পারলে হয়তো ভালই লাগবে এ জীবন।"

তা সত্যিই বলেছিলেন টমাস্। কাজের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে প্রথম প্রথম একটু বিব্রত হয়েছিল সুখেন্দু, কিন্তু কিছুদিন পরেই এ জীবন বেশ সয়ে এল তার। একা মানুষ, আপিসের কাজ খুব একটা বেশী নয়; অবসর তার চেয়ে প্রচুর। সেই অবসর কাটাবার প্রচুর খোরাকও রয়েছে এখানে। আত্মরক্ষার জন্য সঙ্গে একটা বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়লেই হ'ল। কত কি দেখবার, কত কি জানবার রয়েছে প্রকৃতির এই অফুরন্ত প্রাচুর্যের মধ্যে।



গাছটাকে কে উপড়ে ফেলে দিয়েছে আর তারই পাশে —টাটকা মানুষের পায়ের ছাপ।

বেশ কাটছিল দিনগুলি, এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন ছেদ পড়ল। কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ সেই জঙ্গলে দেখা গেল এক পায়ের ছাপ। সেই বাইশ ইঞ্চি লম্বা অশ্বত্থামার পা! প্রথম চোখে পড়ে ঝমরু কুলির বৌ বাসমতিয়ার। ঝরনার ধারে জল আনতে গিয়েছিল সে খটখটে বেলায়। হঠাৎ দেখে একটা বিরাট গাছ কে উপড়ে ফেলে দিয়েছে, আর তারই পাশে—টাটকা মানুষের পায়ের ছাপ। দেখতে হুবহু মানুষেরই মত, কিন্তু আকারে মানুষের পায়ের দ্বিগুণ হবে। তাই দেখে বাসমতিয়ার আর জল নেওয়া হয়নি। মাটির কলসী ঝরনার পাশেই ফেলে রেখে সে ঊর্দ্ধশ্বাসে পালিয়ে এসেছে স্বামীকে খবর দিতে। শুনে ঝমরু ২।৩ জন সঙ্গী নিয়ে, তলোয়ার-সড়কি-বসানো বাঁশের লাঠিটা বগলে করে স্বচক্ষে গিয়ে দেখে এসেছে সেই অভাবনীয় দৃশ্য।

● অশ্বত্থামার পা
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

অশ্বত্থামা কি আবার এলেন? কিন্তু এ তো ভেলাকোবা নয়, এ যে আসামের দুর্গম জঙ্গল! এখানে, এই পাণ্ডববর্জিত দেশে, তাঁর কি প্রয়োজন থাকতে পারে আসবার? না কি এ অশ্বত্থামা-টামা নয়,—কোনও অজানা, অশরীরীর পদচিহ্ন?

দু'-তিন দিন বেশ একটা উত্তেজনায় কাটল। তারপর, ভয়টা যখন একটু স্তিমিত হয়ে এসেছে তখন, খবর পাওয়া গেল আবার দেখা গেছে সেই রহস্যময় পায়ের ছাপ। এবার একটা ঝরনার ধারে, তবে আগের ঘটনাস্থল থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে। এখানেও ঐ রকম 'বরাট' গাছ উপড়ে ফেলা হয়েছে;—একটি নয়, দু'টি নয়—পর পর তিনটি। শুধু গাছ ফেলাই হয়নি, গাছের শিকড়গুলোও কে যেন খুবলে খুবলে নিয়েছে, আর তার পাশের মাটি খাঁচড়ে খাঁচড়ে করা হয়েছে ক্ষতবিক্ষত।

সুধেন্দু এবার আর ব্যাপারটাকে সহজে উড়িয়ে দিতে পারল না।

আরও একটা কারণ ছিল। যে গাছগুলো উপড়ে ফেলা হয়েছে সেগুলো 'বরাট' এক জাতের দুষ্প্রাপ্য গাছ এবং খুব মূল্যবান্ গাছ। মূল্য শুধু ওর কাঠের জন্য নয়—এ গাছের পাতায় এবং কুঁড়িতে এমন কয়েকটা রাসায়নিক গুণ আছে যার জন্য ভেষজ-বৃক্ষ হিসাবেও এর দাম বড় কম নয়। ভেষজ-বৃক্ষ মানে যে গাছ থেকে ওষুধ পাওয়া যায়। কিন্তু মজা হচ্ছে এই, যে ভাবে গাছগুলিকে উপড়ে ফেলা হয়েছে তাতে মনে হয় না যে ওর ঐ সব গুণের জন্য কেউ ওর ওপর হস্তক্ষেপ করেছে। গাছের একটি পাতা কেউ ছেঁড়েনি, একটি কুঁড়িতে কেউ হাত দেয়নি। গাছের গুঁড়ির দিকে তাকালেও স্পষ্ট বোঝা যায় কোনও ধারাল অস্ত্রও প্রয়োগ করা হয়নি গাছ কেটে ফেলতে। কাঠের লোভে গাছ ফেলা হয়ে থাকলে কখনও ওভাবে ওপড়ানো হ'ত না। তাছাড়া আশেপাশে শাল, সেগুন প্রভৃতি আরও বহু গাছ অক্ষত শরীরে দাঁড়িয়ে,—যেগুলি কাষ্ঠসম্পদের দিক্ দিয়ে আরও মূল্যবান্।

"স্যর, এ তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ভৌতিক ব্যাপার। নইলে রাতারাতি, নিঃশব্দে এ কাজ কি কোন পৃথিবীর মানুষের পক্ষে করা সম্ভব?"—বড়বাবু বললেন। তারপর রামবাহাদুরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কি বল রামবাহাদুর?"

রামবাহাদুর জাতে নেপালী। ওর পূর্বপুরুষরা নাকি যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু করেনি। লড়াইয়ের কথা শুনলে ওরও রক্ত নাকি টগবগ করে ওঠে। কিন্তু—এ যে ভৌতিক ব্যাপার! এখানে তার কিছুই করবার নেই। সে শুধু ঘাড় নেড়ে সায় দিল—"জী হুজুর!"

"আমার কিন্তু মনে হয়, স্যর, ও ভূত-টূত কিছু নয়,—এ নিশ্চয় কোন অতিকায় মানবাকৃতি বানরজাতীয় জীবের কাজ। সেই যে সেবার কলকাতায় 'কিং কং' ছবি দেখে-

● অশ্বত্থামার পা
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

ছিলাম—সেই রকম কোনও জীব। পায়ের ছাপটা দেখেছেন একবার?"—বললে একজন ছোকরা সহকারী, শিবতোষ।

কথাটা হয়তো একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়। বাইশ ইঞ্চি লম্বা পায়ের ছাপ যার সে যে আকারে কিং কং এর মতই কেউ হবে এতে আর আশ্চর্য কি? অশরীরী প্রাণীর পক্ষে পায়ের ছাপ থাকা একটু সন্দেহজনক। তবে ওদের সম্বন্ধে যা কিছু তথ্য সবই তো ধোঁয়া ধোঁয়া। কিছুই বলা যায় না। তা যাই হোক, জীবটি যে অসম্ভব শারীরিক শক্তির অধিকারী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ঐ অত বড় গাছ, কুড়ুল ছাড়া শুধু মুচড়ে—হ্যাঁ, রকম দেখে মনে হয় মুচড়েই, গোড়া সুদ্ধ উপড়ে ফেলা চারটিখানি কথা নয়। শিকড়গুলি যে ভাবে নখ দিয়ে—হ্যাঁ, মনে হয় নখ দিয়েই খুবলে ছেঁড়া হয়েছে তাতে কোনও ভয়ংকর প্রাণীর কথাই মনে হবে হয়তো। শুধু শিকড় খুবলে নেওয়া হয়নি, তার পাশে খানিকটা মাটিও তুলে ফেলা হয়েছে।



রায়বাহাদুর শুধু ঘাড় নেড়ে সায় দিল —"জী হুজুর!" [পৃষ্ঠা ২৯৫

সুধেন্দু হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারল না। শিবতোষের কথাটা নেহাত উড়িয়ে দেবার নয়। যদি সত্যি তাই হয়—কোনও প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীরই আবির্ভাব হয়ে থাকে এখানে তা হলে ব্যাপারটার গুরুত্ব বড় কম নয়। হয়তো রাতারাতি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে যাবে এ জায়গা, সেই সঙ্গে এখানকার বাসিন্দা সমেত তারাও। কিন্তু তার আগে দেখতে হবে নিজেদের নিরাপত্তা। বয়সের দিক দিয়ে না হলেও পদমর্যাদার দিক দিয়ে সে-ই এখানকার কর্তা। কাজেই দায়িত্বটা তারই বেশী।

সবাইকে সাবধানে থাকার উপদেশ দিয়ে চিন্তিত মনে বাংলোয় ফিরে এল সুধেন্দু।

কয়েকদিন চুপচাপ কাটল। চারদিনের দিন আবার শোনা গেল সেই একই কাহিনী। আর, ঠিক সেই দিনই বিকেলে এসে হাজির হ'ল সুধেন্দুর অন্তরঙ্গ বন্ধু কৌশিক।

কৌশিক সুধেন্দুর সহপাঠী। এম্. এস্-সি. পাস করে এখন রিসার্চ করছে। অর্থাৎ

কৌশিক বিজ্ঞানী। কিন্তু শুধু বিজ্ঞানী বললে ওর ঠিক পরিচয় দেওয়া হবে না। কৌশিক বিজ্ঞানী, কৌশিক কবি, কৌশিক রসিক, কৌশিক ডানপিটে। একই লোকের মধ্যে এত বিভিন্ন রকম গুণের সামঞ্জস্য বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু কৌশিকের কথা আলাদা। ও যেন একটা মূর্তিমান্ "এক্‌সেপ্‌শন্"।

এখানে আসবার পর থেকেই সুধেন্দু তাকে একবার এখানে বেড়িয়ে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে আসছিল। সময় নেই—এই অজুহাতে এতদিন কাটিয়েছে কৌশিক। আজ, হঠাৎ আচমকা, বলা নেই কওয়া নেই, মূর্তিমান্ বিস্ময়ের মত সে যে এই জঙ্গলে রাজ্যে এসে হাজির হবে সুধেন্দু তা ভাবতেও পারেনি।

"ইচ্ছে হ'ল, চলে এলাম।" ব্যস্, এক কথায় আসবার কারণ জানাল কৌশিক।

কিন্তু যত সহজে এসেছিল তত সহজে ফেরা হ'ল না তার। কারণটা আর কিছু না—সেই অশ্বত্থামার পা। এত বড় একটা রহস্যের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এ অঞ্চল ছেড়ে যাবে সে রকম ছেলে নয় কৌশিক। ফলে, বেড়াতে এলেও, এখন থেকে বেশীর ভাগ সময়ই তার কাটতে লাগল ঐ রহস্যজনক ঘটনাস্থলের আশেপাশে। গভীর মনোযোগের সঙ্গে পায়ের ছাপ থেকে শুরু করে আশপাশের যাবতীয় কিছু পরীক্ষা করে যেতে লাগল সে। শুধু গিয়ে পরীক্ষা করা নয়,—ইট-পাটকেল, পাথরের টুকরো, মাটি, কাদা-জল—কত কী যে ওখান থেকে কুড়িয়ে এনে সে সুধেন্দুর ঘর ভরিয়ে তুলল তার ঠিক নেই। সুধেন্দু ঠাট্টা করে বলল, "সবই তো করলি এ জীবনে। গোয়েন্দাগিরিটা বাকি ছিল, এবারে সেটাও হয়ে যাবে বোধ হচ্ছে।"

কৌশিক গম্ভীরভাবে শুধু বলল, "হঁ।"

দু-তিন দিন এইভাবে কাটবার পর হঠাৎ একদিন কৌশিক গিয়ে ঢুকল স্থানীয় লাইব্রেরীতে। এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় লাইব্রেরী! শুনতে আশ্চর্য লাগে বৈকি! কিন্তু এটি টমাস্ সাহেবের কীর্তি। সময় কাটাবার জন্য বইয়ের মত সঙ্গী নেই—মনের খোরাক মেটাবার জন্যও নেই ওর মত সাথী। টমাস্ সাহেব এটা বুঝেছিলেন এবং ওপরওয়ালাদের লিখে এখানে একটি ছোটখাট লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিতও করেছিলেন। তবে সাধারণ নাটক নভেলের লাইব্রেরী নয়, তাঁর সংগৃহীত বেশীর ভাগ বই-ই ছিল গাছপালা—উদ্ভিদ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে। নানারকম বনজ সম্পদ, বনজ খনি—ইত্যাদি সম্বন্ধেও কিছু ভাল ভাল বই ছিল। মোট কথা, জঙ্গল নিয়ে যাদের কারবার তাদের উপযোগী বইএর অভাব ছিল না ওখানে। কৌশিক দু'দিন ঘুরেই এটি আবিষ্কার করল, তারপর ঢুকল গিয়ে ওর মধ্যে। দু'বেলা খাওয়াদাওয়া আর রাত্রে ঘুমবার সময়টা ছাড়া সারাক্ষণই সে লাইব্রেরীতে। সুধেন্দু বিরক্ত হ'ল। কিন্তু বন্ধুকে সে চিনত, তাই বাধা দিল না।

● অশ্বত্থামার পা
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

ইতিমধ্যে আরও বার দুই দেখা গেছে সেই রহস্যজনক পায়ের ছাপ। কখনও বনের এ-প্রান্তে, কখনও ও-প্রান্তে। সেই রকম ঝরনার ধারে, ঐ একই জাতের গাছ উপড়ে ফেলা। তেমনিভাবে নখ দিয়ে শিকড় খুবলানো, পাশে অদ্ভুত সেই পায়ের ছাপ।

স্থানীয় লোকেরা আতঙ্কিত হয়ে উঠল। সন্ধ্যার দিকে তো নয়ই, দিনের বেলাও কেউ দল না বেঁধে এবং লাঠিসোঁটায় সুরক্ষিত না হয়ে এদিক্-ওদিক্ চলাফেরা করে না। কুলিদের ব্যারাকে তো কথাই নেই। অশ্বত্থামার পুজো দিয়ে তাঁকে শান্ত করার প্রস্তাব উঠেছে সেখানে। কিছু কিছু চাঁদাও উঠে গেছে এরই মধ্যে।

"আচ্ছা সুধা, তোদের এখানে তো বেশ ভালো ভালো মাইক্রোস্কোপ্ আছে। নিকল্ প্রিজম্ দেওয়া জিওলজিক্যাল মাইক্রোস্কোপ্ আছে কি?"—হঠাৎ প্রশ্ন করে কৌশিক।

"আছে বোধ হয়। কেন বল্ তো? এবারে গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে ফের রিসার্চ করবি বুঝি?"

"ঠাট্টা নয়। এই দেখ্ আজ কি পেলাম সেই ঝরনার ধারে।" বলে কৌশিক পকেট থেকে একটা চক্‌চকে চৌকো কালো পাথর বার করল। পাথরটার গায়ে কতকগুলি তামাটে আঁচড় কাটা, দু'একটা আঁচড় বেশ জল্ জল্ করছে।

সুধেন্দু কিছু বুঝতে না পেরে বোকার মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল।

"রহস্যের দশ আনা বার করেছি। বাকিটা—আচ্ছা, তুই না বলেছিলি কয়েকজন মধুয়াল সরকার থেকে পারমিট নিয়ে এই জঙ্গলে এসেছে মধু সংগ্রহের জন্য? আলাপ করেছিস তাদের সঙ্গে? কোথায় থাকে ওরা? চল্, একদিন আলাপ করে আসি।"

"ওঃ! এই তোর রহস্য উদ্ধার? আমি ভাবি না জানি কি! হ্যাঁ, এসেছে বটে। সে তো অনেকদিন হয়ে গেল। পিয়ালকুচির বাঁকে একটা তাঁবুতে আছে ওরা। দু'-তিন জনের বেশী নয়। প্রতি বছরই আসে। একেবারে নিরীহ গোবেচারী লোক। কোন্ গাছে মৌমাছি চাক বাঁধল ঘুরে ঘুরে দেখে আর, সন্ধান পেলে, ধোঁয়া দিয়ে মৌমাছি তাড়িয়ে মধু সংগ্রহ করে ওরা থেকে। এ রকম, একটা ফি নিয়ে বাইরের লোককে মধু নেবার পারমিট দেওয়া,—অন্য কোথাও আছে কিনা জানি না, কিন্তু এ অঞ্চলে ও প্রথা বহুদিন থেকে আছে।"

"চল্, তাহ'লে আজই যাই আলাপ করে আসি। আমরাও তো বিদেশী। বিদেশীতে বিদেশীতে আলাপ ভালই জমবে। তোরও একটু 'পরিদর্শনের' কাজ হয়ে যাবে।"

সারাদিন কৌশিক যন্ত্রপাতি নিয়ে মাইক্রোস্কোপের সামনে বসে কি কাজ করল, দুপুরের পরে চলল মধুয়ালদের ডেরায়। সেখানে গিয়ে দেখা গেল তাঁবুতে কেউ নেই। বোধ হয়

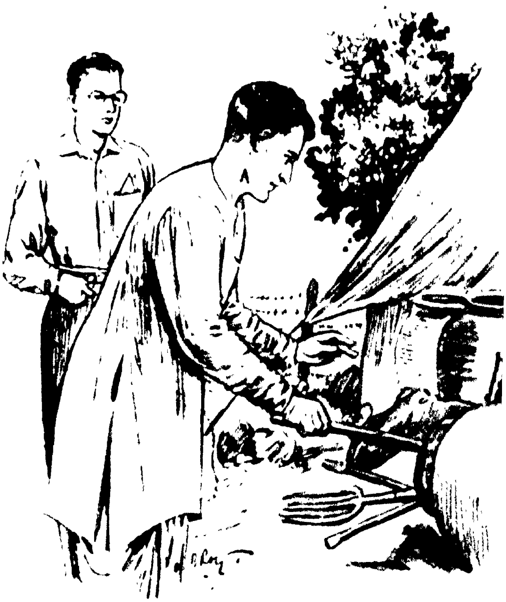
মধুর সন্ধানেই বেরিয়েছে। একটা কাঁটাতার দেওয়া আলগা বেড়া বসিয়ে তাঁবুতে ঢুকবার মুখ বন্ধ করে রাখা হয়েছে। কৌশিক সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে আশেপাশে কি যেন খুঁজতে লাগল।

তাঁবুর পাশেই কতকগুলো বড় বড় জালার মত পাত্র পড়ে রয়েছে। দেখলেই বোঝা যায় এগুলো মধু রাখার পাত্র। কিন্তু বোধ হয় ভাঙা, বা পরিত্যক্ত, কেননা মধুর কোনও গন্ধ নেই ওতে। কৌশিক সাবধানে এগিয়ে গিয়ে একটা লাঠি দিয়ে উল্টে দিল একটা জালা। ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল কয়েকটা মাটি খোঁড়ার সরঞ্জাম আর ফর্ক—কাঁটা-চামচের মত কাঁটাওয়ালা অস্ত্র যা দিয়ে মাটি খুবলে খুবলে আলগা করে নেওয়া যায়। আর পাওয়া গেল কয়েক জোড়া গাম্ বুট্। কিন্তু রবারের তৈরী সেগুলোর তলা সাধারণ বুটের মত নয়—ঠিক যেন এক-একটা বিরাট মানুষের পা—পাঁচটা আঙুল সমেত।

কৌশিক এবার আর কোনও দ্বিধা না করে কাঁটাতারের বেড়া সরিয়ে তাঁবুর ভেতরে ঢুকে পড়ল। সুধেন্দুকে ইশারায় ডেকে বলল—"আয়।"

একটু ইতস্ততঃ করে সুধেন্দু বলল, "ট্রেস্‌পাস্?"

"হুঁ। ভীরু কোথাকার! চলে আয়।"—আদেশের স্বরে বলল কৌশিক।



কৌশিক সাবধানে একটা লাঠি দিয়ে উল্টে দিলে একটা জালা।

তাঁবুর ভিতরে যা দেখা গেল তাতে আর বিস্ময়ের সীমা রইল না সুধেন্দুর। বড় বড় বোতল ভর্তি নানারকম এসিড, আরক আর রাসায়নিক মসলা। এককোণে পড়ে রয়েছে কয়েকটা ভাঙা পাথরের চাঁই—দেখলেই বোঝা যায় মাটির অনেক তলা থেকে টেনে বার করা হয়েছে সেগুলোকে। পাথরের গায়ে আঁকাবাঁকা সুতোর মত কতকগুলো দাগও দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট।

● অশ্বত্থামার পা
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

কৌশিক এটা দেখল, সেটা দেখল, এটা শুঁকল, ওটা শুঁকল। তারপর স্বভাবসিদ্ধ মোক্ষম শব্দটি উচ্চারণ করল—"হুঁ।" অর্থাৎ কাজ হাসিল। সুধেন্দুকে ডেকে বলল, "এখনই কোয়াটার্সে গিয়ে কয়েকজন আর্মড্ গার্ড্‌কে পাঠিয়ে দে। জায়গাটা পাহারা দিতে হবে। আমি অপেক্ষা করছি। এর মধ্যে যদি মধুয়ালরা আসে আলাপ জমিয়ে নিতে পারব। তোর ভয় নেই, যা বলি কর্।"

গল্প বড় হয়ে যাচ্ছে, কাজেই এর পরের সংক্ষিপ্ত ঘটনাগুলিও একটু বাদছাদ দিয়েই বলছি। মধুয়ালরা আসবার আগেই সরকারী প্রহরীর দল জায়গাটা ঘেরাও করে ফেলেছিল। বেচারারা প্রথমটা বুঝতে পারেনি, যখন বুঝতে পারল তখন আর পালাবার উপায় ছিল না। তার পর সরকারী সম্পত্তি ভাঁওতা দিয়ে অপহরণের অপরাধে কি ভাবে তাদের নামে মামলা রুজু করা হ'ল ইত্যাদি ইত্যাদি সে অনেক ব্যাপার। তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আপাততঃ চলে আসা যাক্ সুধেন্দুর বসবার ঘরে।

সন্ধ্যার দিকে বেশ একটি আসর বসেছে সেখানে। গুরুচরণ, শিবতোষ, রামবাহাদুর প্রভৃতি সুধেন্দুর অধীনস্থ বনবিভাগের কর্মচারীরাও এসে জুটেছে। কিছু খাওয়া-দাওয়ারও আয়োজন হয়েছে। আসরের মাঝখানে বসেছে কৌশিক। সে-ই হচ্ছে বক্তা। অশ্বত্থামার পদ-রহস্য কি করে ধরা পড়ল তারই গল্প বলছে সে।

"কয়েকটা জিনিস প্রথমেই লক্ষ্য করবার মত।"—বলতে লাগল কৌশিক। "প্রথমতঃ, এত রকমের গাছ থাকতে একটা বিশেষ ধরনের গাছের ওপরই হয়েছে যত হামলা। অথচ গাছগুলোকে কেউ কুড়ুল দিয়ে কাটেনি, গাছের একটি পাতা বা একটি কুঁড়ি—যার জন্য এ গাছের দাম—তাতেও হাত দেয়নি কেউ। শুধু গোটা গাছটা উপড়ে ফেলেছে শিকড় সমেত, যতটা সম্ভব নিঃশব্দে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে—হামলাদারদের নজর আর যারই ওপর থাক, গাছের ওপর নয়, অন্য কিছুর ওপর। দ্বিতীয়তঃ, যা লক্ষ্য করবার মত, তা হচ্ছে এর সবগুলো গাছই কোন-না-কোন ঝরনার পাশ ঘেঁষে উঠেছে। শুকনো জায়গার কোন গাছের ওপর হামলা হয়নি।

"পায়ের ছাপগুলো সত্যি রহস্যময়। অত বড় ছাপ মানুষের পায়ের হতে পারে না। যদি কারও হয় সে কোনও অতিকায় জীব—অর্থাৎ যার সম্বন্ধে স্বভাবতঃই একটা আতঙ্ক হয়। ঐ পায়ের ছাপ দেখে লোকে যাতে ভয়ে ওর কাছে না যায় তারই জন্য ঐ ছাপের ব্যবস্থা হয়েছিল—এই আমার ধারণা। ছাপগুলো পরীক্ষা করে দেখেছি, প্রত্যেকটি ছাপে বুড়ো আঙুলগুলো যতটা চেপে বসেছে, গোড়ালির দিক্‌টা সে ভাবে চেপে বসেনি। ওভাবে পায়ের সামনের দিকে

ভর দিয়ে আমরা কখন হাঁটি? না, যখন পা টিপে টিপে চলা হয়—চলার শব্দ গোপন করার জন্য, তখনই ঐ রকম করা হয়। অর্থাৎ ছাপগুলোকে যে ঐভাবে ফেলা হয়েছে ও একেবারে ইচ্ছাকৃত। কোন জংলী অতিকায় জীব—প্রাগৈতিহাসিক যুগেরই হোক বা অন্য যে যুগেরই হোক,—হ'লে ওভাবে পা টিপে টিপে চলবার তার কোনও কারণ থাকতে পারে না। অশরীরীর তো নয়ই। ঐ দেখেই আমার প্রথম সন্দেহ হয়—ব্যাপারটা কোনও দুষ্ট লোকের কারসাজি। যতটা সম্ভব গোপনে কাজ হাসিল করার উদ্দেশ্যেই ঐ রকম করা হয়েছিল—যদিও বনের মধ্যে ওর প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না।

"এর পরই একদিন ওখানে পরিত্যক্ত একটা জিনিস কুড়িয়ে পেয়ে আমি আচমকা একটা মস্ত সূত্র পেয়ে গেলাম। জিনিসটা আমি তোকে দেখিয়েছিলাম সুধা, তোর বোধ হয় খেয়াল নেই। আর কিছু নয়, এক টুকরো কষ্টিপাথর। এখানে কষ্টিপাথর এল কোত্থেকে? এখানে তো ও জিনিস হয় না! আর হলেও অমন নিখুঁত চৌকো মাপের পাথর আসবে কোত্থেকে? নিশ্চয়ই কেউ এনে ফেলে গেছে। কিন্তু কেন? আপনারা সবাই জানেন, কষ্টিপাথরের একটা বড় ব্যবহার হচ্ছে সোনা যাচাই করার কাজে। সেকরারা, সোনা খাঁটি কিনা কষ্টিপাথরে ঘসে দেখে। কোনও সোনার জিনিস দিয়ে কষ্টিপাথরে আঁচড় কাটলে তাথাতে রং-এর একটা দাগ পড়ে—বেশ জলজলে দাগ। অভিজ্ঞ লোকেরা ঐ দাগ দেখে বলে দিতে পারে জিনিসটা সোনা কিনা, সোনা হলে খাঁটি সোনা কিনা, কতটা খাদ রয়েছে ওর মধ্যে, ইত্যাদি। অবশ্য রাসায়নিক পরীক্ষা করেও এ তথ্য বার করা যায় কিন্তু সেটা ব্যয়সাধ্য এবং এটার মত চটু করেও হয় না। কষ্টিপাথর দেখেই চন্ করে আমার মনে একটা অদ্ভুত ধারণা এল, আর ব্যাপারটা খোলসা করে নেবার জন্য তখুনি আমি ছুটলাম এখানকার লাইব্রেরীতে। এই জঙ্গলের রাজ্যে এ রকম লাইব্রেরী পাওয়া—এও একটা যোগাযোগ। বেঁচে থাকুন মিস্টার টমাস্।"

চায়ের পেয়ালায় পর পর কয়েকটা দীর্ঘ চুমুক দিল কৌশিক। তার পর ফের শুরু করল :—

"এখানকার লাইব্রেরীতে গল্পের বই থাকুক না থাকুক, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান অর্থাৎ বোটানি, ভূ-বিজ্ঞান অর্থাৎ জিওলজী, মিনারেলজী প্রভৃতি বিষয়ের অনেক আধুনিকতম বই আছে এ আমি আগেই দেখে গিয়েছিলাম। বিশেষ করে জিও-বোটানির কয়েকখানা বইও আমার চোখে পড়েছিল। জিওলজী আর বোটানি মিশিয়ে এই শাস্ত্রটি তৈরী হয়েছে। এইবার সেইগুলোকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করলাম আমি। যারা এই শাস্ত্র বা বিজ্ঞান নিয়ে একটু-আধটু চর্চা করেছে তারা অনেকেই জানে যে কোন কোন জাতের গাছ আছে যারা তাদের দেহের পুষ্টির জন্য সাধারণ খাদ্য পদার্থ ছাড়া কোন কোন মূল্যবান ধাতুও মাটি থেকে টেনে নেয়—ক্রোমিয়াম, মলিবডিনাম,

ভ্যানাডিয়াম্‌ প্রভৃতি ধাতু। একরকম গাছ আছে যাদের নজর সোনার ওপর। সাধারণ ধাতুতে তাদের যেন মন ওঠে না,—তারা টেনে নেয় সোনা। হর্সটেল্‌ এই জাতের গাছ। তবে, বলা বাহুল্য, অধিকাংশ গাছই যে সোনা টেনে নেয় তার পরিমাণ খুব সূক্ষ্ম। কিন্তু কোন কোন জাতের গাছ আছে যারা অল্প সোনায় খুশী নয়—মাটির রসের সঙ্গে বেশ খানিকটা সোনা তারা টেনে নিতে পারে। লাইব্রেরীতে বসে বই ঘেঁটে এই ধরনের কয়েকটা গাছের নাম আর হালচাল বার করলাম। দেখলাম, যে গাছগুলো ওপড়ানো হয়েছে সেগুলো ঐ জাতেরই গাছ।

"গাছ সোনা টেনে নিচ্ছে, কিন্তু সাধারণ মাটিতে তো সোনা থাকে না—নিশ্চয়ই এই সব গাছ এমন জায়গায় জন্মায় যার কাছাকাছি মাটির নীচে পাথরের গায়ে সোনার আকর আছে—তা যতটুকু সোনারই হোক না কেন। সোনা, আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন, অনেক সময়ই অন্যান্য ধাতুর মত অন্য মৌলিক পদার্থের সঙ্গে মিলে মিশে,—অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা যাকে বলেন যৌগিক পদার্থ—সেই ভাবে, থাকে না। একেবারে খাঁটি মৌলিক পদার্থরূপেই পাওয়া যায় ওকে। দল-ছাড়া এই অবস্থাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে "নেটিভ ডিপোজিট্‌"। আবার এও দেখা গেছে—পাহাড়ী নদী, ঝরনা ইত্যাদির নীচেই এই রকম সোনা বেশী পাওয়া যায়। কখনও সূক্ষ্ম রেণুর আকারে, কখনও বা পাথরের ফাটলে সোনার সুতোর আকারে। খুব দূর থেকে রস টেনে নেওয়া গাছের পক্ষে অসুবিধাজনক, তাই খাদ্যভাণ্ডারের যত কাছাকাছি থাকা যায় সেই চেষ্টা করাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। এই গাছগুলোও তাই ঝরনার কাছাকাছিই গজায় বেশী। আবার, এই গাছগুলো যখন রয়েছে তখন তাদের কাছাকাছি সোনা থাকার সম্ভাবনাও খুব বেশী।

"ব্যাপারটা তা হলে খতিয়ে দেখা যাক্‌। এখানকার সরকারী সংরক্ষিত বনে রয়েছে ঐসব 'সোনা-খেকো' গাছ। কাজেই তাদের কাছাকাছি সোনাও রয়েছে। কিন্তু সে হচ্ছে সরকারী সম্পত্তি—সাধারণের পক্ষে তা উদ্ধার করা বে-আইনী। কাজেই ঐসব সোনা নিয়ে রাতারাতি বড়লোক হতে হলে একটু-আধটু কারসাজি করতে হবে বৈকি! এখানেও তাই করা হয়েছে।

"যারা মধুয়াল সেজে এসেছে তারাই হচ্ছে এই স্বর্ণসন্ধানী। ওরা ছাড়া কোন বাইরের লোক এ অঞ্চলে নেই। স্থানীয় লোকদের চালচলন কারও অজ্ঞাত নয়—কাজেই সন্দেহটা ওদের ওপরই পড়া বিচিত্র নয়। সত্যি কিন্তু ওরা মধুয়াল নয়, মধুসংগ্রহটা লোক-দেখানো মাত্র; আসল উদ্দেশ্য বে-আইনী ভাবে সোনা সংগ্রহ। মধুর পারমিট পাওয়া এ অঞ্চলে বেশী কঠিন নয়। মধুয়াল সাজলেও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এদের অনেক বেশী—এবং আমি জানি না, হয়তো মামলায় খবর জানা যাবে, এদের পেছনে কোন উচ্চশিক্ষিত বড় বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানীর দলও রয়েছে। যাই হোক্‌, যা বলছিলাম।

● অশ্বত্থামার পা
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

"লোকের চোখে ধুলো দিয়ে কাজ হাসিল করতে হবে, তাই ঐ অমানুষিক পায়ের ছাপ তৈরি করা হয়েছিল,—ফরমাশ দিয়ে গাম্ বুট তৈরি করে, যার তলাটা ঠিক মানুষের পায়ের মত কিন্তু আকারে অনেক—অনেক বড়। পদশব্দ বন্ধ করার জন্য ঐ ভারী বুট, হোক না তা রবারের, প'রে পা টিপে টিপে চলা ওদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। পায়ের ছাপে তা আগেই ধরা গেছে। কিন্তু ও আর কতটুকু শব্দ? আসল শব্দ তো হবে গাছ কাটতে গেলে। এর উপায়ও বার করতে কষ্ট হয়নি ওদের। তাঁবুতে বোতলের মধ্যে এমন কতকগুলি ওষুধের সন্ধান পেয়েছি যা গাছের গোড়ায় ছড়িয়ে দিলে বিষের কাজ করে এবং কয়েক দিনের মধ্যেই গোড়া সমেত গাছ আলগা হয়ে আসে। তখন তাকে ঠেলে ফেলতে খুব একটা জোর লাগে না, এবং, চেষ্টা করলে, তেমন শব্দ না করেও আস্তে আস্তে তাকে শুইয়ে ফেলা যায়। গাছ না কাটার আর একটা কারণ ছিল। এই সব গাছের শিকড় বহুদূর পর্যন্ত লম্বা হয় আর ঐ শিকড়ই তো সন্ধান দেয় কোথায় সোনা আছে। তাই শিকড়গুলো যাতে না নষ্ট হয়, আলগা ভাবে তুলে তুলে দেখা যায়,—তার চেষ্টা করা হয়েছে সাধ্যমত। যেটা নখ দিয়ে শিকড় খুবলানো মনে হয়েছে সেটা আর কিছু নয়, দক্ত দিয়ে শিকড় আলগা করার চেষ্টা। শিকড় কতদূর গেছে দেখে দেখে সোনার সন্ধান করা হয়েছে এবং যে মাটি বা পাথর পাওয়া গেছে তাতে সোনা আছে কিনা পরখ করবার জন্য কষ্টিপাথর ব্যবহার করা হয়েছে। পাথরকে খুব পাতলা করে, স্বচ্ছ করে ঘষে নিয়ে জিওলজিক্যাল মাইক্রোস্কোপের নীচে ফেললে তার ভিতরকার উপাদান আরও সহজে ধরা পড়ে,—বিশেষ করে সেটা কোন্ পাথর বা কোন্ মিনারেল তা চিনতে পারা যায় সহজেই। যে সব পাথরে সোনা থাকে তাও চিনতে পারা যায় এতে। আর ওখানকার পাথর কুড়িয়ে এনে মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করে দেখেছি যে ধরনের পাথরে সোনা থাকা সম্ভব এ সেই জাতের পাথর। কাজেই আমার ধারণা প্রায় অভ্রান্ত। তার পর সুধেন্দুর 'কিন্তু-কিন্তু' ভাব উপেক্ষা করে ওদের ডেরায় হানা দিয়ে বাকী সমস্ত সন্দেহের নিরসন হয়েছে।"

"কিন্তু—" গুরুচরণ কি বলতে যাচ্ছিলেন, শিবতোষ বাধা দিয়ে বলল, "আর কিন্তু-টিন্তু নয়। সুর এত খাবারের আয়োজন করেছেন, সেগুলোর সদ্ব্যবহার করা যাক আগে।"

"কিন্তু কুলি-ব্যারাকের পুজোটা—?"

"পুজো হোক্ না যেমন হচ্ছে। প্রসাদ—বিশেষ করে মহাপ্রসাদ অবিশ্বাসীদের কাছেও পরম লোভনীয়।"—হাসতে হাসতে বললে কৌশিক।

ইন্দ্রজাল

—জাদুসম্রাট পি. সি. সরকার

আবার পূজাবার্ষিকীর জন্য সহজ সুন্দর অথচ চমকপ্রদ জাদুর খেলা নিয়ে হাজির হচ্ছি। আগেকার দিনে খেলা দেখেছি জাদুকর একটা কাঁচের গ্লাসের মধ্যে কিছুটা কাঠের গুঁড়ো বা ভুষি ভর্তি করে পরক্ষণে তার মধ্যে থেকে মিঠাই বের করে দেখান। আমার লেখা "ম্যাজিকের খেলা" বইতে এই খেলার দুইটি পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করেছি। "তুষ হইতে রসগোল্লা" খেলাতে পাতলা পেস্টবোর্ড দিয়ে 'ফেক' অর্থাৎ নকল গ্লাস তৈরি করার কথা বলা হয়েছিল। সেই 'ফেক' গ্লাসের চারদিকে আঠা দিয়ে ভুষি লাগাতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। ঐ খেলাতে ভুষির থেকে রসগোল্লা, সন্দেশ, মুড়ি, লজেন্স, টফি প্রভৃতি শুকনো জিনিস বের করা যায়—চা, দুধ, কফি প্রভৃতি তরল পদার্থ বের করে দেখানো যায় না কারণ সেক্ষেত্রে পেস্টবোর্ডের 'ফেক'টি ভিজে ওটা একদম নষ্ট এবং অকেজো হয়ে যাবে। চা, দুধ অথবা কফির মধ্যে 'ফেক' ডুবিয়ে রাখলে তা' দিয়ে খেলাই করা যাবে না। ঐ বইতে 'অদ্ভুত রূপান্তর'-নামক খেলার পদ্ধতি অনুসরণ করলে অবশ্য শুকনো, তরল সবরকম পদার্থই বের করা সম্ভবপর। কারণ মধ্যখানে আয়নার 'পার্টিসন' করা থাকে বলে দূর থেকে ঐ অর্ধেক গ্লাসই পূর্ণগ্লাস বলে ভ্রম হয়। ওখানে ঐ গ্লাস দর্শকদের হাতে দেওয়া যায় না এবং দূর থেকে দেখাতে হয় বলে দর্শকদের মনে গভীর রেখাপাত করতে সক্ষম হয় না।

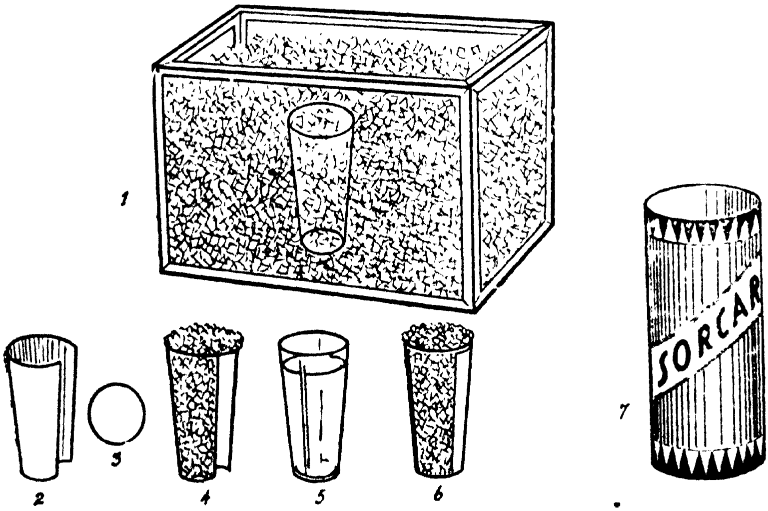
বর্তমানে আমরা এই খেলাটিকে খুবই উন্নত করে ফেলেছি। স্টেজের উপর একটা চৌকো কাঁচের বাক্স রয়েছে। কাঁচের বাক্সটা দেখতে ঠিক রঙিন মাছের একুরিয়ামের মত। একুরিয়ামের মধ্যে জল থাকে—এর মধ্যে তার পরিবর্তে থাকবে লাল-নীল-হলুদ-সবুজ-সাদা-গোলাপী নানা রঙের কাগজের কুঁচি। বিলাতে এই ধরনের কাগজের কুঁচিকে বলে 'কনফেটি' (confette)—ওদেশে বিবাহ প্রভৃতি উৎসবে ঐগুলি মাথার উপর ছিটিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের দেশে খৈ ছড়াবার প্রথা আছে—তার নাম 'লাজবর্ষণ'। বলা বাহুল্য এই খেলা রঙিন কাগজে কুঁচি বা কনফেটির পরিবর্তে খৈ দিয়েও দেখানো

চলে। তবে রঙিন কাগজের কুচি হলে খেলাটি খুবই বাহারী হয় এবং সবাই দেখেও খুশী হন।

জাদুকর একটি স্বচ্ছ কাঁচের গ্লাস নিয়ে এলেন, তারপর টেবিলের উপরে রক্ষিত ঐ কাঁচের বাক্সের মধ্য থেকে রঙিন কাগজের কুচি নিয়ে ঐ গ্লাস ভর্তি করলেন। সবার সামনে কাগজের কুচি ভর্তি গ্লাসটা ঐ কাঁচের বাক্সের উপর কাত করে ধরলেন, তখন আস্তে আস্তে (ঝুর ঝুর করে) কাগজের কুচিগুলি উড়ে উড়ে আবার ঐ কাঁচের বাক্সে পড়তে লাগল। সাধারণ কাঁচের গ্লাসে সাধারণ রঙিন কাগজের কুচি ভর্তি করা হয়েছে মাত্র। জাদুকর দ্বিতীয়বার গ্লাসটাকে বাক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে আবার কাগজের কুচি ভর্তি করে ওপরে তুলে আনলেন আর সবাইর কাছে রেখে দিলেন। তারপর আনা হল একটা সাধারণ পেস্টবোর্ডের চোঙ (cylinder)। এই চোঙের দুই মুখই খোলা—ভিতর দিয়ে তাকালে এদিক থেকে ওদিক স্পষ্ট দেখা যায়। আমি আমার চোঙটিকে খুব বাহারী রং দিয়ে বাইরে 'SORCAR' কথাটা বড় বড় করে লিখিয়ে নিয়েছিলাম। দর্শকদের সামনে ফাঁকা খালি চোঙ দেখিয়ে সেটি দিয়ে ঐ কাগজের কুচি ভর্তি কাঁচের গ্লাসটা সর্বসমক্ষে চাপা দেওয়া হল—পরক্ষণে চোঙটা তুলে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল—ওর আর কোনও দরকার নেই। কারণ গ্লাস ভর্তি কাগজের কুচি তখন কফি হয়ে গেছে বা দুধ হয়ে গেছে। জাদুকর ইচ্ছা করলে সেই তরল পদার্থপূর্ণ গ্লাস সবাইকে ভাল করে দেখিয়ে নিয়ে নিজে সর্বসমক্ষে ঐ দুধ বা কফি পান করে ওর যথার্থতা বা খাটিত্ব প্রমাণ করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে ঐ দুধ, কফি এবং গ্লাস সবগুলিই খাঁটি, কোনও প্রকার কৃত্রিমতা করা নেই কাজেই অনায়াসে দর্শকদের হাতে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে।

এবারে খেলাটির মূল কৌশল বলে দিচ্ছি। এই সঙ্গে দেওয়া চিত্রগুলি পর পর ভাল করে লক্ষ্য করলে সব ঠিকমত বুঝতে পারবে। এখানে এক নম্বর চিত্র হচ্ছে চৌকা একুরিয়ামের মত চারিদিকে কাঁচ দেওয়া বাক্স। ওর মধ্যে রয়েছে কুচি কুচি করে কাটা বিভিন্ন রঙের কাগজের টুকরা 'কনফেটি'। ঐ সমস্ত কাগজের কুচির তলায় লুকানো রয়েছে কফি বা দুধভর্তি কৌশলযুক্ত ফেক-সম্বলিত গ্লাস, ৬ নম্বর চিত্রে ঐ গ্লাসটি বিন্দু বিন্দু চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে। প্রথমে দুইটি একই মাপের সাধারণ কাঁচের গ্লাস লও। একটা গ্লাস খেলা দেখাবার জন্য রাখা হ'ল। দ্বিতীয় গ্লাসটির (চিত্রে প্রদর্শিত ৫ নম্বর গ্লাস) বাইরের মাপে অর্ধেক গ্লাস মত ২ নম্বর চিত্রের ন্যায় একটা স্বচ্ছ সেলুলয়েডের খোলা তৈরি কর আর তার উপরে ঐ সেলুলয়েডের গোল চাকি কেটে নিয়ে ৩ নম্বর চিত্রের মত ঐটাকে দিয়ে ঐ অর্ধেক

গ্লাস বা ফেকের ছাদ তৈরি করে নাও। বাজারে ফিল্ম জুড়বার জন্য যে আঠা বিক্রি হয় ঐ আঠা ব্যবহার করবে—খুব সহজে দুই এক মিনিটেই জোড়া লেগে যাবে। এবার ৪ নম্বর চিত্রের মত আধা-গ্লাস 'ফেক' তৈরি হ'ল। এর ভিতরের পিঠে ঐ একই আঠা দিয়ে কিছু কাগজের রঙিন কুচি জুড়ে দাও। আমি সেলুলয়েডের ভিতর পিঠে আঠা খুব করে মাখিয়ে দিয়ে তারপর কাগজের কুচি ওর মধ্যে ঢেলে দেই আর কয়েক মিনিট পরে সেগুলি উপুড় করে ঢেলে নেই, তখন ভিতরের পিঠে অনেক কাগজ জুড়ে



(১) রঙিন কাগজের কুচি-ভরা কাঁচের বাক্স। ভেতরে বিশেষভাবে তৈরী গেলাস লুকানো রয়েছে
(২) সেলুলয়েড খাপ (৩) ছাদ (৪) সম্পূর্ণ তৈরী 'ফেক' (৫) সাধারণ গ্লাস
(৭) ফেকের মধ্যে গ্লাস (৭) পেস্টবোর্ডের তৈরী চোঙ

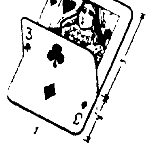
থাকে। উপরের চাকিটার ভিতর পিঠে বা নীচের দিকে আঠা না দিয়ে উপর দিকে আঠা দিয়ে কাগজের কুচি লাগাতে হয়। এবার ৫ নম্বর চিত্রের মত গ্লাসে কফি অথবা দুধ ঢেলে প্রায় ভর্তি করে নাও, তারপর ঐ ৪ নম্বর চিত্রের 'ফেক' গ্লাসটি তার উপরে কভারের মত চাপিয়ে দাও। তখন ফেকের মধ্যে কফিভর্তি গ্লাসটি ঢুকে গিয়ে ৬ নম্বর চিত্রের মত হয়ে গেল। এইটিই হচ্ছে কফি বা দুধভর্তি কৌশলযুক্ত ফেকসম্বলিত গ্লাস বা' ঐ কাঁচের একুরিয়াম বাক্সে কাগজের কুচির তলায় লুকানো রয়েছে।

● ইন্দ্রজাল
জাদুসম্রাট পি. সি. সরকার

কাগজের চোঙটিতে কোনও কৌশল নেই। পেস্টবোর্ড দিয়ে সাত নম্বর চিত্রের ন্যায় একটা চোঙ তৈরি করে নাও যেটি দিয়ে সহজেই ঐ ফেকসম্বলিত কৌশলযুক্ত গ্লাস (৬ নম্বর চিত্র) চাপা দেওয়া যায় আর বাইরে থেকেই অনায়াসে ফেকটা খুলে নিয়ে—শুধুমাত্র গ্লাসটা তলা দিয়ে বের করে নেওয়া যায়। নরম পেস্টবোর্ডে চোঙের বাইরে থেকে চেপে ধরে অনায়াসে ঐ ফেক থেকে গ্লাস বের করে নেওয়া যায়—সামান্য একটু অভ্যাসের প্রয়োজন হয় মাত্র। তখন ফেকসহ ঐ চোঙটি গ্রীনরুমের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেই হ'ল। চোঙের সঙ্গে ফেকটি চলে গেল। চোঙটি খুব বাহারী রঙ করে নিতে হয় আর বাইরে নাম লিখে নিলেও বেশ সুন্দর হয়। আমি আমার এই রকম খুঁটিনাটি যন্ত্রপাতির উপর আর্টিস্ট দিয়ে সুন্দর করে "SORCAR" কথাটা লিখিয়ে নেই। বাকী অংশ অত্যন্ত সহজ। প্রথমে কৌশলযুক্ত ফেকসম্বলিত ৬ নম্বর চিত্রের মত গ্লাসটি কাঁচের চৌকো বাক্সের মধ্যে কাগজের কুচির তলায় লুকানো থাকবে। জাদুকর প্রথমে একটি সাধারণ কাঁচের গ্লাসে কাগজের কুচি ভরে ঢেলে ঢেলে দেখালেন, সাধারণ কাগজের কুচি আর সাধারণ গ্লাস। তারপর দ্বিতীয়বার বাক্সের মধ্যে কাগজের কুচির মধ্যে ডুবিয়ে গ্লাস ভর্তি করার সময় ঐ গ্লাস ওখানে ফেলে রেখে জাদুকর প্রথম থেকে লুকানো ছয় নম্বর চিত্রের মত গ্লাসটি তুলে আনলেন। দর্শকগণ ভাবলেন যে একটা সাধারণ কাঁচের গ্লাস ভর্তি করে কাগজের কুচি তোলা হ'ল মাত্র—আসলে কিন্তু দুধ বা কফি ভর্তি গ্লাসটা উঠে এলো যার বাইরের দিকে কাগজ লাগানো সেলুলয়েডের ফেক লাগানো রয়েছে। জাদুকর এবার এই গ্লাসটা টেবিলের উপর রেখে—রঙিন ফাঁকা চোঙ (৭ নম্বর চিত্র) দিয়ে চাপা দিলেন আর হাতে তুলে নিয়ে আস্তে একটু ঝাঁকানি দিয়েই বাইরের চোঙটা খুলে তুলে নিয়ে গ্রীনরুমের দিকে ফেলে দিলেন। তখন তাঁর হাতে রয়েছে একটা খালি গ্লাস যার মধ্যে পাঁচ নম্বর চিত্রের মত ভর্তি রয়েছে গরম দুধ বা কফি। দর্শকগণ বা জাদুকর নিজে অনায়াসে এই দুধ বা কফি খেয়ে নিতে পারেন। জয় জয় রবে খেলা শেষ হ'ল।

এরপর একটা সুন্দর তাসের খেলা শিখিয়ে দিচ্ছি। এবার নিখিল ভারত জাদুকর সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে খেলা দেখাবার সময় আমি এই ধরনের একটা খেলা দেখিয়েছিলাম। তিনটা তাস আনা হ'ল—মধ্যখানের তাসটা সরিয়ে রাখা হ'ল, তখন দেখা গেল সেটি অন্য তাস হয়ে রয়েছে—আমার ফটোতে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। এবার ঐ জাতীয় একটা খেলা শেখানো হচ্ছে। জাদুকর ২ নম্বর চিত্রের মত ধরে দেখালেন তাঁর হাতে তিনটা তাস আছে—যথাক্রমে হরতনের বিবি,

চিড়াতনের তিন এবং হরতনের সাহেব। সাহেব-বিবি-তিন এই তাস তিনটা সবাই মনে রাখতে পারেন। সবগুলিই হরতন (লাল) না দিয়ে মধ্যখানে একটা (কাল) চিড়াতন দেওয়াতে খেলাটা দেখতে ভাল হয়। জাদুকর চিড়াতনের তিন মধ্যখান থেকে তুলে নিয়ে টেবিলের উপর চাপা দিয়ে রাখলেন—তখন তাঁর হাতে রইল মাত্র দু'টি তাস হরতনের সাহেব ও বিবি। জাদুকর প্রকাশ্যে ঘুরিয়ে ঐ সাহেব ও বিবি তাস দু'টি সবাইকে দেখিয়ে নিজের পকেটে রেখে দিলেন। তা'হলে চিড়াতনের তিন গেল কোথায়? টেবিলের উপর রক্ষিত তাসটা উলটিয়ে দেখা গেল সেটা একটা অন্য তাস, যেমন 'জোকার' অথবা জাদুকরের ফটো হয়ে গিয়েছে। এই খেলা দেখে সবাই নিশ্চয়ই অবাক হবেন।

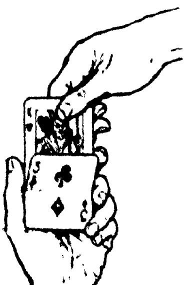


১নং চিত্র



২নং চিত্র

খেলাটা দেখতে খুবই আশ্চর্যজনক কিন্তু কৌশল খুবই সহজ। এই খেলার জন্য প্যাকেট থেকে একটা জোকার, একটা হরতনের সাহেব, একটা হরতনের বিবি, একটা চিড়াতনের তিন এবং একটা যে কোনও তাস, যেমন রুইতনের তিন লও। এর মধ্যে জোকার এবং সাহেব এই দুইটি তাস ভাল—কোনও কৌশল করা নেই। চিড়াতনের তিন এবং হরতনের বিবি এই তাস দু'টিকে পুরা একদিন জলে ভিজিয়ে রেখে পরদিন ওর উপরকার পাতলা ছবিটি তুলে নাও। তারপর চিড়াতনের তিন তাসের এক মাথা থেকে দেড় ইঞ্চি টুকরা ভাঁজ করে নিয়ে ঐ হরতনের বিবির পেছন দিকে এক মাথা ভাল করে আঠা দিয়ে জুড়ে দাও। হরতনের বিবির বাকী তিন ইঞ্চি জায়গাতে আঠা মাখিয়ে চিড়াতনের তিনের ওপর সমানভাবে জুড়ে দাও—তখন ১ নম্বর চিত্রের মত কৌশলযুক্ত তাস তৈরি হ'ল যার তিন ইঞ্চি নীচের দিকে একটা কব্জার মত "ফ্লাপ" তৈরি হ'ল। ঐ দেড় ইঞ্চি ফ্লাপটা নীচের দিকে নামিয়ে দিলে তাসটা সম্পূর্ণ হরতনের বিবি হয়ে গেল আবার উপরের দিকে তুলে দিয়ে তলার অংশটা হরতনের সাহেব দিয়ে চাপা দিয়ে ধরলে (২ নম্বর চিত্রের মত) তিনটা আলাদা আলাদা তাস বলে ভ্রম হবে। তাসগুলি নাড়াচাড়া করবার



৩নং চিত্র

● ইন্দ্রজাল

জাদুসম্রাট পি. সি. সরকার

সময় তিন নম্বর চিত্রের মত হরতনের সাহেব তাসটা ফ্লাপের উপর ধরে নীচের দিকে একটু চাপ দিলেই ফ্লাপ আপনাআপনি ঘুরে নীচে নেমে আসবে আর তাসের রঙ পরিবর্তন হয়ে যাবে। এই হচ্ছে খেলার মূল কৌশল।

এবার খেলাটা ঠিকমত দেখাবার কৌশল বলে দিচ্ছি। হরতনের বিবির নীচ দিককার ফ্লাপটা উপরদিকে তুলে তার উপর হরতনের সাহেব চাপা দিয়ে ধরে দুই নম্বর চিত্রের মত করে দেখাও যে হাতে তিনটা তাস আছে—যথাক্রমে হরতনের বিবি, চিড়াতনের তিন ও হরতনের সাহেব। হরতনের সাহেবের পেছনে সমান সমান করে একটা জোকার তাসও রেখে দিতে হবে। তাস তিনটার সম্মুখদিক দর্শকদের দেখিয়ে ঘুরিয়ে নাও, তারপর তাস তিনটা নাড়াচাড়া করার সময় জোকারসহ সাহেব উপরদিকে তুলে তিন নম্বর চিত্রের মত নীচের দিকে নামাবার ছলে ফ্লাপটি ঘুরিয়ে দিয়ে প্রথম তাসটি সম্পূর্ণটা বিবিতে পরিণত করে নাও। দর্শকদের বল যে চিড়াতনের তিন আমি টেবিলের উপর রেখে দিচ্ছি—আসলে কিন্তু জোকারটিকে রেখে দিলে। এখন হাতে রইল হরতনের সাহেব ও বিবি। জাদুকর এই তাস দু'টি দর্শকদের দিকে ঘুরিয়ে আলাদা আলাদা করে দেখালেন যে ঐ দু'টি সাহেব এবং বিবি, তাঁর হাতে অন্য কোনও তাস নেই। এক্ষণে এই তাস দু'টি পকেটে রেখে দিয়ে দর্শকদিগকে টেবিলের তাসটা দেখতে বললেন, তখন দেখা গেল যে টেবিলের তাসটা জোকারে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। সবাই এই খেলা দেখে অবাক হয়ে যাবেন। ইচ্ছা করলে জাদুকর ঐ জোকারের পরিবর্তে নিজের ফটো তাসের উপর আঠা দিয়ে আটকিয়ে—নিজের ফটো দেখাতে পারেন। নিখিল ভারত জাদুকর সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশনে আমি তাই করে দেখিয়েছিলাম, এতে সবাই অবাক হয়েছিলেন।

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়োবিভিন্না
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।
—মহাভারত

মণি ও মুক্তা

বেদ বিভিন্ন, স্মৃতি বিভিন্ন, এমন মুনি নেই যাঁর আলাদা কোন মত নেই। ধর্মের তত্ত্ব গভীর গুহায় অজানা। সেক্ষেত্রে মহাপুরুষরা যে পথ ধরে চলেন, সেই একমাত্র পথ।



অনুতপ্ত

—প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

মোহনপুর স্কুলে আসছেন নতুন হেডমাস্টার।

ছেলেদের আর উৎকণ্ঠার শেষ নাই। এর মধ্যে ছেলেদের মাঝে একটি কথা ছড়িয়ে পড়েছে—ইনি নাকি বিশেষ সুবিধাজনক লোক নন।

স্কুলটা আগে মাইনর ছিল, বৎসর দুই তিন হল হাইস্কুলে পরিণত হয়েছে; কিন্তু হলেও উন্নতি কিছুই দেখা যাচ্ছে না, সে জন্য কর্তৃপক্ষ চিন্তিত হয়েছেন এবং পুরাতন হেডমাস্টারকে সরিয়ে দিয়ে নতুন লোক নিয়ে আসছেন।

ক্লাস টেনএর ললিত বলছিল—"শুনেছি এ স্যার ভারি কড়া স্বভাবের লোক। আমার দাদা বলছিলেন—এবার যদি মোহনপুর হাইস্কুল দাঁড়াতে পারে—যে জাঁদরেল হেডমাস্টার আসছেন, ইনি নাকি অনেক স্কুলকে দাঁড় করিয়েছেন, বদ ছেলেদের চিট করেছেন।"

দলের নেতা মহিম রুক্ষকণ্ঠে বললে, "তোমার দাদা তা হলে বলতে চান, আমরা সবাই বদ ছেলে, সে জন্যে নতুন হেডমাস্টারকে আনা হচ্ছে যাতে আমরা সবাই চিট হই—"

ললিত ঘাবড়ে গিয়ে বললে, "কিন্তু দাদা তো সে কথা বলেন নি, তিনি বলেছেন—"

সুধীর এতক্ষণ আধখানা আখ নিয়ে দাঁত দিয়ে ছাড়িয়ে খাচ্ছিল আর মনোযোগ দিয়ে এদের কথা শুনছিল। এতক্ষণে সেটা শেষ করে কথা বলবার অবকাশ পেলে, চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, "কি দরকার ছিল নতুন হেডমাস্টার আনবার? বেশ তো ছিলেন আমাদের পুরোনো হেডমাস্টার তারণবাবু, বেশ পড়াতেন—বুঝিয়ে দিতেন; হাজার দুষ্টুমি করলেও একটি কথা বলতেন না। আমরা তাঁকে ভালোবাসতাম শুধু তাঁর ওই গুণের জন্যেই তো—"

তোতলা ভুতো এতক্ষণ কথা বলবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। প্রথম কথা উচ্চারণ করবার জন্য তাকে অনেকক্ষণ কসরত করতে হয়, তারপর দম দেওয়া মেসিনের মত সে গড় গড় করে খানিকটা কথা বলে যায়।

চোখ পাকিয়ে সে খানিকটা তো তো করে বললে, "এ স অ অ ব ক ক কত্তাদের মর্জি—তা তা তা—"

প্রচণ্ড ধমক দেয় মহিম—"থাম্ তুই তোতলা কোথাকার, তোকে কথা বলতে কেউ বলছে না। বলতে গেলেই খালি তো তো—"

অন্য ছেলেদের দিকে ফিরে বললে, "ঘাবড়াও মাৎ, উনি আগে আসুন, আমাদের সঙ্গে পরিচয় হোক, তারপর ব্যবস্থা তো আমাদের হাতে।"

মহিমের কথায় ভরসা পায় সবাই।

যেমনি অদ্ভুত তার ক্ষমতা তেমনই তার বুদ্ধি। স্কুলের সকল ছেলে তার বশ্যতা স্বীকার করেছে। কেবল তাই নয়—বাড়ি হতে তার মাসে মাসে যে টাকা আসে, বোর্ডিং আর স্কুলের খরচ বাদে যা টাকা বাঁচে, সে ছেলেদের খাওয়ায়।

এসে পৌঁচেছেন নূতন হেডমাস্টার সুশীল মিত্র।

লম্বা চওড়া, সুন্দর স্বাস্থ্য। গায়ের রং চকচকে কালো হলেও তাঁর দীর্ঘ চেহারায় সে ত্রুটি মানিয়ে যায়। বয়স যথেষ্ট হয়েছে, মাথায় বিরাট টাক। তাঁর চোখ দুইটি ছোট হলেও অতি উজ্জ্বল, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ!

হেডপণ্ডিত নিবারণ চক্রবর্তী নবাগত হেডমাস্টারকে সঙ্গে করে ক্লাসগুলি ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলেন।

ঘরের অনটনহেতু এখন মস্তবড় হলের মধ্যে পার্টিশান করে একদিকে নাইন, অন্যদিকে টেনএর ক্লাস করা হয়। নাইনএ তখন ছিলেন মুরলী সেন, টেনএ ছিলেন বৃদ্ধ চন্দ্রনাথবাবু।

● অনুতপ্ত

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

ক্লাসে এসে ছেলেদের পড়তে দিয়ে চন্দ্রনাথবাবু নিয়মিতভাবে ঝিমুচ্ছেন। টেবিলের উপর কনুই রেখে দুই হাতের উপর মুখ রেখে তিনি ঢুলছেন। চশমাটা টেবিলের উপর পড়ে আছে, দরকার পড়লেই চোখে দেবেন।

মহিম পাশের কামরায় হেডমাস্টারের আগমনবার্তা পায়; আস্তে আস্তে উঠে এসে চশমা নিয়ে টেবিলের তলায় রেখে ভালোমানুষের মত নিজের সিটে গিয়ে বসে।

ক্লাস নাইন দেখে হেডমাস্টার সুশীল মিত্র টেনএ প্রবেশ করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করে। খুশী হন নূতন স্যার।

তিনি এগিয়ে যান টেবিলের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সচকিত হয়ে উঠলেন চন্দ্রনাথবাবু, এক কথায় তাঁর প্রাত্যহিক তন্দ্রা দূর হয়ে যায়, উঠে দাঁড়িয়ে চশমাটা খুঁজতে থাকেন, চশমা না হলে তিনি কিছুই দেখতে পান না।

কিন্তু কোথায় চশমা—

একবার মাত্র চাপা গর্জন করে ওঠেন—"মহিম—"

আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো মহিম, টেবিলের তলা হতে চশমাটা তুলে চন্দ্রনাথবাবুর হাতে দিয়ে একান্ত ভালোমানুষের মত বললে, "ঘুমের ঘোরে টেবিল মনে করে তলায় রেখেছিলেন স্যার—"

কথাটা বিশ্বাস করতে পারেন না তিনি—এতই ঘুম তাঁর এসেছিল যার জন্ম তিনি টেবিল ঠিক করতে না পেরে টেবিলের তলায় চশমা রেখেছিলেন। এ যে মহিমেরই কাজ তা তিনি বেশ বুঝলেও একটি কথা বলতে পারলেন না কারণ সামনে নূতন হেডমাস্টার দাঁড়িয়ে।

হেডমাস্টার একবার তাঁর পানে তাকালেন তারপর চোখ ফিরিয়ে মহিমের পানে তাকালেন, তারপর ক্লাসঘর ত্যাগ করে চলে গেলেন।

এবারে টেবিলের উপর থেকে রুলখানা হাতে তুলে নিয়ে গর্জন করেন চন্দ্রনাথবাবু, "তুই এদিকে আয় মহিম, তোকে আমি একবার দেখে নি। চশমা খুলে রাখলুম টেবিলের ওপর, সে চশমা লাফিয়ে নামলো টেবিলের নিচে।"

আরো কি বলতে চেয়েছিলেন চন্দ্রনাথবাবু, কিন্তু বলতে পারলেন না। ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে গেল। রুলটা নামিয়ে রেখে বললেন, "যা, এ যাত্রা খুব বেঁচে গেলি, কিন্তু এর পরের জন্যে সাবধান থাকিস বলে রাখছি।"

মহিম নিজের সিটে গিয়ে বসলো।

● অনুতপ্ত

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

হেডমাস্টার সুশীলবাবু অত্যন্ত রাশভারী লোক। ছেলেদের তিনি যথেষ্ট ভালোবাসেন তবু দুষ্টুমির প্রশ্রয় দিতে চান না। ছেলেরা প্রকৃত মানুষ হোক তাই তিনি চান।

স্কুলসংলগ্ন ছাত্রাবাস—

এখানে প্রায় চল্লিশটি ছেলে থাকে—তারা দূর দূর স্থান হতে এখানে পড়তে এসেছে। আশপাশ গ্রামে হাইস্কুল নাই, এখানে থেকে তারা পড়াশুনা করবার সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে।

সুশীলবাবু প্রত্যেক ছেলের উপর দৃষ্টি রাখেন, পড়াশুনায় এতটুকু ত্রুটি তিনি সইতে পারেন না, তাঁর হুংকারে ছেলেরা ভয়ে কাঁপে।



তুই এদিকে আয় মহিম, তোকে একবার দেখে নি। [পৃষ্ঠা ৩১২

সুশীলবাবু মোহনপুরে কার্যভার নিয়ে এসে প্রথম কিছুদিন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা লাহাবাবুদের বাড়িতে ছিলেন, সেখানে অসুবিধা হওয়ায় তিনি বোর্ডিংয়েই এসে উঠেছেন। তাঁর স্বতন্ত্র একখানি ঘর—নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে সেই ঘরে তিনি থাকেন। এই ঘরটির তিন দিকে ঘর, ছেলেরা প্রতি ঘরে চারজন আটজন করে থাকে।

চিরাচরিত বোর্ডিংয়ের খাওয়ার ব্যবস্থা বদলে যায়। মুসুরীডালে ভিটামিন বেশী থাকায় প্রতিদিন মুসুরীডাল, প্রচুর কাঁচকলা ও পেঁপে সমস্ত তরিতরকারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান গ্রহণ করে।

মহিম এই তিনটিই খায় না।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে সহপাঠী সুকুমারকে বলে, "আর তো এই ছাইপাশ গিলতে পারি না ভাই,—

না খেয়ে খেয়ে যে শুকিয়ে গেলাম। এ কথা একবার হেডমাস্টারকে জানানো দরকার, কিন্তু বলবে কে?"

চিঁ চিঁ করে সুকুমার বলে, "না হয় আমিই বলব, কিন্তু তোমাদের আমার পেছনে থাকতে হবে। একা ওঁর সামনে যাওয়ার সাহস আমার নেই—যে রকম করে তাকান—উঃ—"

মহিম শূন্যে মুষ্টি আন্দোলন করে বলে—"নাঃ, বলে কোন ফল হবে না, নিজেদেরই উপায় ঠিক করতে হবে। ওই মুসুরীর ডাল, কাঁচকলা আর পেঁপে খেয়ে আমার আমাশা হয়ে গেল। দোকানের খাবারই যদি রোজ একটাকা দেড়টাকা করে খাব, তবে এখানে এক আঁজলা করে টাকা দিচ্ছি কেন? এর বিহিত আমরাই করব, জোর করে, কেঁদে ককিয়ে নয়—"

বোষ্টম একাধারে স্কুলের চাপরাসী, বোর্ডিংয়ের বাজার সরকার এবং হেড স্যারের অনুগত ভৃত্য।

তার সর্দারীতে মহিমের আপাদমস্তক জলে যায়। চাকর চাকরের মত থাকবে, তারা বোর্ডার, পয়সা খরচ করে থাকে,—তাদের উপর সর্দারী করতে আসবে—মহিম সেটা আদৌ পছন্দ করে না। শক্তভাবে সে বলেছে, "তুমি নিজের চরকায় তেল দাও গিয়ে বোষ্টম, আমরা ছেলেরা কি করি না করি, তুমি উপদেশ দিতে এসো না।"

এরপর বোষ্টম আর একটিও কথা বলেনি।

মহিমকে সে এড়িয়ে চলে। স্পষ্টই মহিমের অজ্ঞাতে বলে, "বাপ, এমন বিচ্ছু ছেলে আর একটি দেখি নি, হাড়মাস ভাজা ভাজা করে দিলে।"

কিন্তু সেবার আমের সময় তাকে নাকাল হতে হল বড় কম নয়। স্কুলের মাঠের একপাশে ছিল একটি আম গাছ এবং এটি ছিল বোষ্টমের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত।

এবার আম হয়েছিল প্রচুর এবং কচি গুটি হতে আরম্ভ করে ফল পাকবার অনেক আগে অর্ধেক শেষ হয়ে গেল।

সেদিন হেডমাস্টারের দৃষ্টি পড়ল আমের উপর এবং তিনি তত্ত্বাবধায়ক বোষ্টমকে তলব করলেন। বোষ্টম ছেলেদের বিশেষ করে মহিমের উপর সব দোষ চাপিয়ে দিলে—স্পষ্টই জানালে—বোর্ডিংয়ের ছেলেরা ভালো হতে পারতো, মহিম ওদের পরামর্শ দিয়ে এইসব কাজ করাচ্ছে।

জলে উঠলেন সুশীলবাবু, মহিমের সামনে তিনি বেশ আস্ফালন করলেন, জানালেন—"এবার মহিমের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ যেন তাঁকে শুনতে না হয়।"

মহিম নতমুখ তুলে, স্থির কণ্ঠে বললে, "দোষ আমার তা আমি স্বীকার করছি স্যার।

● অনুতপ্ত
প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

বোর্ডিংয়ে যে সব ছেলেরা থাকে ওদের সত্যি কোন দোষ নেই, আমি আম এনে তাদের দিয়েছি, তারা খেয়েছে। কিন্তু স্যার, বোষ্টমও কি গাছের বাছা বাছা আম নিয়ে কাল বিকেলে ওর দিদিকে দিয়ে আসেনি—দোষ কি আমি একাই করেছি—জিজ্ঞাসা করুন ওকে?"

বোষ্টম আকাশ হতে পড়ে, —"না বাবু, নন্দবাবু আমাকে আম দিয়েছিল—তাদের বাড়ির আম, সেই আম আমি দিদিকে দিয়ে এসেছি জিজ্ঞেস করুন নন্দবাবুকে।"

কিন্তু নন্দকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

হেডমাস্টার অধর দংশন করেন।

মহিমের নির্দেশে রমন ছুটে যায় বোষ্টমের ঘরে, তার ঘরের কোণ হতে চারটা আম এনে সুশীলবাবুর সামনে রাখে। রুদ্ধকণ্ঠে মহিম বললে, "দেখুন স্যার, এই গাছের আম এখনও চারটে আছে।"

কঠিন বিচার করেন সুশীলবাবু, বোষ্টমের হল তিন টাকা জরিমানা, এ মাসের মাইনে হতে কাটা যাবে।

গরীব বোষ্টমের চোখ দিয়ে জলের ধারা নামে।



দেখুন স্যার, আম এখনও চারটে আছে।

সুশীলবাবুর ঘরখানা একেবারে মাঝখানে—একটা দিকে পড়ে রাস্তা, সেদিকে দুইটি জানালা।

ছেলেরা লক্ষ্য করে—শীত গ্রীষ্ম সব সময়ে তিনি পথের ধারের জানালা স্বহস্তে বন্ধ করে দেন। সারা রাত তাঁর ঘরের এক কোণে লণ্ঠন জ্বলে। একদিন রাত্রে কি করে

● অনুতপ্ত
প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

আলো নিভে গিয়েছিল, তিনি চিৎকার করে পাশের ঘরের শীতলকে ডেকেছেন, সে উঠে আলো জ্বেলে দিয়েছে।

ছেলেরা আরও লক্ষ্য করেছে—রাত্রে পথ দিয়ে বল হরি হরিবোল শব্দ করে শবযাত্রীরা যেদিন যায়, সেদিন তাঁর চোখে ঘুম আসে না, ছেলেদেরও ঘুমাতে দেন না।

সে একটা রাত্রের কথা—

পাশের ঘরের শীতলের ঘুম ভেঙে যায় ভয়ার্ত চিৎকারে—অন্য তিনটি ছেলেও জেগে উঠে বসে। পাশের ঘর থেকে শব্দ আসছে—আঁ আঁ আঁ—

সর্বনাশ, এ যে স্যারের কণ্ঠস্বর!

লণ্ঠন নিয়ে ছুটে আসে দুঃসাহসী শীতল, তার পিছনে কাঁপতে কাঁপতে আসে সঙ্গীরা—

"স্যার—স্যার—"

ডাকাডাকি করে সাড়া না পেয়ে শঙ্কিত শীতল মশারি তুলে তাঁকে ধাক্কা দেয়—"কি হয়েছে স্যার, অমন করছেন কেন?"

দোর্দণ্ডপ্রতাপ হেডমাস্টার ঘেমে উঠেছেন, তখনও তাঁর বুকটা ধড়ধড় করছে, হাত পা কাঁপছে।

আস্তে আস্তে তিনি উঠে বসলেন, একটু হেসে বললেন, "ও, বড্ড বেশী চেঁচিয়েছি বুঝি,—তোমাদের ঘুম ভেঙে গেছে। না না, তোমাদের ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই, স্বপ্নে আমার ও রকম হয়, তোমরা যাও—শোও গিয়ে।"

একটু থেমে বললেন, "আচ্ছা, এক কাজ কর শীতল, তুমি বরং এদের কাউকে নিয়ে এ ঘরে শোও—তাতে কোন দোষ নেই। ওরা পাশের ঘরে দু'জন শুয়ে থাক—ভয়ের কারণ নেই—আমি আছি।"

ছেলেরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। বাধ্য হয়ে শীতল ও পরানকে বিছানা এনে সেঘরে শুতে হয়। নিশ্চিন্তভাবে বিছানায় শোন সুশীলবাবু, বললেন, "ভয় করো না ছেলেরা, আমি সজাগ রইলাম, ভয় পেলে আমায় ডেকো।"

মুহূর্তমধ্যে তাঁর নাক ডাকার শব্দ শোনা যায়।

পূজার ছুটি আসে—ছেলেরা সবাই বাড়ি যেতে আরম্ভ করে, সুশীলবাবুও কলকাতায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন।

যাবে না কেবল মহিম।

আশ্চর্য হয়ে যান সুশীলবাবু, জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি বাড়ি যাবে না কেন মহিম?"

● অনুতপ্ত
প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

করুণ দৃষ্টিতে তাকায় মহিম, বললে, "গতবার পরীক্ষায় ফেল করেছি স্যার, বাবা বলেছেন পাস না করলে মুখ দেখবেন না। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি—পাস করে তবে বাড়ি যাব, তাই এ ছুটিতে যাব না স্যার।"

অত্যন্ত খুশী হন সুশীলবাবু; এমন একটি ছেলে যে পড়ার জন্য বাড়ি যায় না, তাকেই তিনি কত ছোট ভেবেছিলেন। মনে মনে তিনি অনুতপ্ত হন কম নয়।

বললেন, "খুব ভালো কথা, তোমার প্রতিজ্ঞা যেন সফল হয়—তুমি মানুষ হও। বোষ্টম আর সমর রইলো, তা ছাড়া যখন যে পড়া বুঝতে পারবে না—এখানেই তারাবাবু আছেন—তোমাদের ইংলিশের শিক্ষক—তুমি তাঁর কাছে গিয়ে জেনে এসো। আমি তাঁকে তোমার কথা বলে যাব।"

অত্যন্ত ভক্তিভরে স্যারকে প্রণাম করে মহিম।

মোটেই খুশী হয় না বোষ্টম—

সে বুঝেছে মহিম একটা কোন মতলব হাসিল করবার জন্যই এখানে থেকে গেল। সর্বক্ষণ তার মাথায় দুষ্টামি বুদ্ধি খেলছে—সব কিছুই করতে পারে এ ছেলে।

সশঙ্কিত হয়ে ওঠে ভালোমানুষ বোষ্টম, সুশীলবাবুকে কিছু বলবার সাহস হয় না,—আবার যদি তার উপর নূতন কোন আক্রমণ হয়।

মহিমের প্রিয় বন্ধু সুকুমারও বাড়ি গেল, একা রইলো মহিম।

হেডমাস্টার বোষ্টমকে বলে গেলেন—মহিমের যেন এতটুকু কষ্ট না হয়। এ ছেলেকে তিনি যা ভেবেছিলেন, সে তা নয়; এত শান্ত এবং পড়ায় মনোযোগী ছেলে যে ছুটিতে বাড়ি গেল না, পূজার আনন্দে যোগ দিলে না। এ ছেলে যে মোহনপুর স্কুলের নাম রাখবে তাতে তাঁর এতটুকু সন্দেহ নেই।

ছুটি ফুরাবার সাত আট দিন আগেই ফিরলো মহিমের পরম বন্ধু সুকুমার—তার পর ক্রমে ক্রমে ফিরলো বোর্ডিংয়ের অন্য ছেলেরা। স্কুল খোলার দিন সকালে ফিরলেন সুশীল মিত্র।

মহিমের দিকে তাকিয়ে তিনি স্তম্ভিত হয়ে যান।

তার মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ, মাথার চুলগুলো বেশ বড় ও রুক্ষ,—পরনে একখানা ধুতি—অথচ হাফ প্যান্ট ছাড়া সে কোনদিন ধুতি পরেনি। গায়ে তার জামা নাই, একখানা সাদা বিছানার চাদর তার গায়ে, পা পাদুকাহীন।

● অনুতপ্ত
প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

ক্লাসে সে গেল না। স্যারের সঙ্গে দেখা হতে সে ফ্যাল ফ্যাল করে শুধু চেয়ে রইল, প্রণাম করা দূরের কথা, একটা কথাও বলল না।

ক্লাসমেট সুকুমার চুপি চুপি স্যারকে বললে, "জানেন স্যার, সারারাত মহিম ঘুমায় না, ঘরেও থাকে না, ওই আমতলায় সে যোগাসনে বসে সাধনা করে।"

"সাধনা করে—বলছো কি সুকুমার!" সুশীল মিত্রের চোখ দু'টি বিস্ফারিত হয়।

সুকুমার ভীতকণ্ঠে বললে, "হ্যা স্যার, ওর বাবাও কালীসাধনা করেন,—তিনি আবার শ্মশানে সাধনা করেন। মহিম নিশ্চয়ই ওর বাবার কাছ থেকে এসব শিখেছে স্যার।"

সুশীল মিত্র রীতিমত চিন্তায় পড়েন।

সেদিন সন্ধ্যায় তিনি মহিমকে নিজের ঘরে ডাকলেন, গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করলেন—"এসব কি শুনতে পাচ্ছি মহিম? তুমি ছেলেমানুষ—পড়তে এসেছো, এখন পড়াশুনা বন্ধ করে এসব সাধন-টাধনা কি করছো বলতো? এ রকম করলে আমার বোর্ডিংয়ে তোমায় রাখা চলবে না, তোমায় বাড়ি যেতে হবে।"

নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে মহিম, তারপর আস্তে আস্তে বার হওয়ার সময় বলে যায়—"আর এরকম হবে না স্যার, আপনি বাবাকে কিছু লিখবেন না।"

খুশী হন সুশীলবাবু।

সে রাত্রে বিছানায় শুয়ে তিনি মহিমের কথাই ভাবছিলেন। তাঁর স্কুলের ভালো ছেলেকে তিনি নষ্ট হতে দেবেন না।

শীতল তিন দিন পরে আসবে জানিয়েছে। পাশের ঘরে যে তিনটি ছেলে শুয়েছে, তিনি তাদের এ ঘরে শোওয়ার কথা বলতে পারেন নি।

কোন রকমে পাশ ফিরে তিনি ঘুমানোর চেষ্টা করেন।

ঘরের একপাশে একটা বড় জলচৌকির উপরে রাশীকৃত কাগজ খাতাপত্র জমে আছে। সামনের রবিবার সুশীলবাবু এগুলো দেখেশুনে বিক্রয় করে দেবেন, অনর্থক জঞ্জালগুলো ঘরে রাখবেন না।

ঘুমের ঘোরটা অকস্মাৎ ভেঙে যায়,—গভীর রাত্রে হুড়মুড় করে বহু কাগজপত্র পড়ে যায় মেঝের উপর,—

পাশের ঘরের ছেলেরাও জেগে ওঠে—ভয়ে তারা শব্দ মাত্র করে না।

মাথার কাছে লণ্ঠনের জোর বাড়িয়ে দিলেন সুশীল মিত্র, দেখতে পান--স্তূপীকৃত কাগজপত্র মেঝেয় ছড়িয়ে পড়েছে।

● অনুভব
প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

"নারাণ, পাঁচু, তিনকড়ি—"

তাঁর আহ্বানে ছুটে আসে পাশের ঘরের ছেলেরা—

সুশীলবাবু বললেন, "কাগজগুলো সরিয়ে রাখ তো বাপু। যা বড় বড় ইঁদুর তোমাদের এখানে—দেখলে ভয়ই করে। দেখ তো নিশ্চয়ই কাগজের মধ্যে ঢুকে আছে দু' একটা।"

টর্চ জ্বালিয়ে কাগজ সরাতে গিয়ে ছেলে দু'টি সভয়ে চিৎকার করে সুশীলবাবুর পাশে ছুটে আসে, ভয়ে তারা তখন কাঁপছে।

"কি কি—কি হল—?"

শঙ্কিত সুশীলবাবু খাট হতে নেমে দাঁড়ান—"কি দেখলে ওর মধ্যে, ভয় পেলে কেন? আমি রয়েছি ঘরে—ভয় কি তোমাদের—"

বলতে বলতে টর্চ হাতে তিনি নিজে এগিয়ে যান।

কাগজপত্রের ফাঁকে দেখা যায় শ্বেতশুভ্র একটি মড়ার মাথা।

"অ্যাঁ, অ্যাঁ, এ সব কি, এ সব কি ব্যাপার—"

রীতিমত কাঁপতে থাকেন সুশীলবাবু, সরে যাওয়া বা ছুটে পালানোর চেষ্টাও তিনি করতে পারেন না। তিনি নিজে চিৎকার করতে পারছেন না, তাঁকে জড়িয়ে ধরেছে তিনটি বালক—চিৎকার করছে তারাই।



ছেলে দু'টি সভয়ে চিৎকার করে সুশীলবাবুর কাছে ছুটে আসে।

"স্যার, স্যার—ওই আর একটা—"

সুশীলবাবুর খাটের তলায় আর একটা মড়ার মাথা।

● অনুতপ্ত

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যান স্থূলাকৃতি সুশীল মিত্র।

ততক্ষণে এসে পড়েছে অন্য ছেলেরা—বোষ্টম এবং অন্য দ্বারোয়ান চাকরেরাও এসে পৌঁচেছে—কলরবপূর্ণ হয়ে উঠেছে সমস্ত বোর্ডিংটা।

সম্পূর্ণ চব্বিশ ঘণ্টা পরে জ্ঞান ফিরেছে সুশীলবাবুর। ডাক্তার সর্বক্ষণ কাছে আছেন, লোক পাঠিয়ে তাঁর ভাইকে আনা হয়েছে কলকাতা থেকে।

ক্ষীণকণ্ঠে সুশীলবাবু জানিয়েছেন—তিনি এখানে আর একটা দিনও থাকবেন না, একটু সুস্থ হয়ে সন্ধ্যার ট্রেনে চলে যাবেন, আর এই মোহনপুর স্কুলে তিনি আসবেন না।

এটা স্কুল এবং বোর্ডিংয়ের কলঙ্কের কথা।

বৃদ্ধ চন্দ্রনাথবাবু বললেন, "আমার মনে হয় এ কাণ্ড আমাদের হোস্টেলের কোন দুষ্ট ছেলের—হয়তো সে আপনাকে পছন্দ করে না তাই ভয় দেখিয়ে সরাতে চায়। যাই হোক, এর এনকোয়ারী করা দরকার—"

হেডপণ্ডিত বললেন, "ঘরের মধ্যে দু' দুটো মড়ার মাথা এনে রাখা তো বড় সোজা কথা নয়! তারপর সে মাথা দুটো গেলই বা কোথায়, এত খুঁজেও তো পাওয়া গেল না।"

বোর্ডিংয়ের ছেলে সুপ্রকাশ চুপি চুপি হেডপণ্ডিতের কানে কানে বললে, "এ হচ্ছে মহিমের সাধনার ফল স্যার। সে আগে গল্প করেছে—তার বাবা মড়াকে উঠিয়েছেন মন্ত্রের জোরে, কত কাজ করিয়েছেন। মহিমও সাধনা করে স্যার—তাই মড়ার মাথা এসেছিল আবার মিলিয়েও গেছে।"

হেডপণ্ডিত বলেন, "এখন থাক, পরে ওসব বিচার হবে, আগে সুশীলবাবু ভালো হয়ে উঠুন, তারপর—"

চুপচাপ নিজের বিছানায় শুয়ে ছিলেন সুশীলবাবু, পাশে তাঁর ভাই বসে ছিলেন। কথা হয়েছে কাল সকালের ট্রেনে সুশীলবাবু চলে যাবেন।

দরজার কাছে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো মহিম।

চমকে উঠলেন সুশীলবাবু—"কে, কে ওখানে?"

অপরাধী মহিম নতমস্তকে ঘরে প্রবেশ করলে, আদ্রকণ্ঠে বললে, "আমি স্যার;—আমি মহিম—"

সুশীলবাবু শুষ্ককণ্ঠে বললেন, "এখানে এখন কি দরকার তোমার,—যাও, আমি এখন ঘুমাব।"

ক্রমশঃ

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

তাঁর পায়ের কাছে বসে পড়ে মহিম রুদ্ধকণ্ঠে বললে, "আমার কয়টা কথা আছে স্যার,—আমি সব কথা আপনাকে বলতে চাই, সব কথা শুনলে আপনি আমায় ক্ষমা করবেন, চলে যাবেন না।"

সে সুশীলবাবুর পা দু'খানার উপর মাথা রাখে, তার চোখের জলে তাঁর পা ভিজে ওঠে। শশব্যস্তভাবে তিনি উঠতে যান, বলেন, "পা ছেড়ে দাও মহিম—"

তিনি ভাইকে বাইরে যেতে বললেন, তারপর মহিমের দিকে ফিরে বললেন, "যা বলবার এইবেলা বল, এর পর অন্য শিক্ষকেরা এসে পড়বেন।"

হু হু করে কেঁদে উঠলো মহিম—"আমায় মাপ করুন স্যার, এ সব আমার কাজ। আমি পিচবোর্ড ও সাদা রং দিয়ে মড়ার মাথা তৈরি করেছিলাম আপনাকে ভয় দেখানোর জন্যে। এই কারণে আমি ছুটিতে বাড়ি যাইনি—একলা ঘরে বসে মড়ার মাথা তৈরি করেছি। আপনি আমায় শাসন করেন, আমাকে সর্বদা সন্দেহ করেন—তাই আপনার ভয়ের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এ কাজ করেছি স্যার, ভাবতে পারিনি ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে। আমায় মাপ করুন স্যার—কিন্তু আপনার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি এবার থেকে সত্যি আমি খুব ভালো হব।"

সে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে।

সুশীলবাবু তাকে টেনে তুললেন, রুমালে তার মুখ মুছিয়ে দিয়ে শান্তকণ্ঠে বললেন, "আমি তা বুঝেছি। দুষ্টামিবুদ্ধির জন্যে তুমি শাস্তি পেয়েছো—তোমায় ক্লাস হতে বের করে দিয়েছি—মেরেছি—কিন্তু সে তোমারই ভালোর জন্যে তা তো তুমি জানতে মহিম। গুরুজনেরা শাসন করেন তোমাদের মঙ্গলের জন্যে—সে কথাটা বুঝবার বয়স তোমার নিশ্চয় হয়েছে।"

মহিম দুই হাতে মুখ ঢেকে থাকে, একটি কথাও বলে না।

সুশীলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"তারপর সেই নকল মড়ার মাথা দুটো গেল কোথায় মহিম?"

রুদ্ধকণ্ঠে মহিম বললে, "আপনি শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকজন আসার আগেই আমি সে দুটোকে সরিয়ে ফেলেছি স্যার। যখন খুব গোলমাল চলছিল, সবাই এখানে ছিল—আমি বাগানে গিয়ে দেশলাই জ্বালিয়ে দুটোকেই পুড়িয়ে ফেলেছি।"

বলতে বলতে সে আবার সুশীলবাবুর পা দু'খানা জড়িয়ে ধরে—"এবারকার মত আমায় মাপ করুন স্যার, আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি—আমি ভালো ছেলে হব। সুকুমার ভয়ে আপনার কাছে [illegible] না—সেও আমার সঙ্গী ছিল—বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে শুধু

● অনুতপ্ত
প্রভাবতী [illegible]বতী

কাঁদছে। ওকেও মাপ করুন স্যার, ওর কোন দোষ নেই। ওর মা লোকের বাড়ি কাজ করে ওকে পড়াচ্ছেন, এখন যদি পড়া বন্ধ হয়, ওদের দুর্গতির সীমা থাকবে না। আপনি এখান থেকে যাবেন না স্যার।"

সুশীলবাবু একটু হাসলেন, মহিমের মাথায় হাত রেখে শান্তকণ্ঠে বললেন, "বেশ, আমি যাব না আর এসব কথা কাউকেই বলব না। তবে মনে রেখো, তোমাকে খুব ভালো হতে হবে—সুকুমারকেও তোমায় মানুষ করতে হবে।"

দুই হাতে চোখ মোছে মহিম।

... .

সে বৎসর মাচে যখন ম্যাট্রিকের রেজাল্ট প্রকাশ হল—দেখা গেল সকলের প্রথম হয়েছে মোহনপুর হাইস্কুলের ছাত্র মহিম চৌধুরী; বাকি নয়জনের মধ্যে আছে সুকুমার বোসের নাম।

সুশীলবাবুর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

প্রথমেই তাঁকে প্রণাম করতে এলো মহিম এবং সুকুমার; ছেলেরা এবং শিক্ষকেরা তাদের ঘিরে দাঁড়ালেন।

দু' হাতে দু'জনকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আনন্দরুদ্ধকণ্ঠে সুশীলবাবু বললেন, "আমি আশীর্বাদ করছি তোমাদের—আমাদের স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করেছো তোমরা দু'জন—তোমরা এগিয়ে যাও। আরও উন্নতি করা চাই।"

ছেলেরা আনন্দে কলরব করে ওঠে।

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ

—গীতা

মণি ও মুক্তা



শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যা আচরণ করেন, সাধারণ লোকেরা তাই-ই অনুসরণ করে।



সিম্পু খুড়োর জীপ

— বিমলচন্দ্র ঘোষ

১

হপ্তা শেষে সিম্পু খুড়ো
গোমড়ামুখো জোয়ান বুড়ো
খোশমেজাজে জোরসে হাঁকায়
যুদ্ধ ফেরত জীপ।
সঙ্গে খুড়ী আহ্লাদেতে
মাথায় বেঁধে সবুজ ফিতে
যাচ্ছে মজায় পিক্‌নিকেতে
বিপ্ বিপ্! বিপ্ বিপ্॥

২

আওয়াজ ছেড়ে ছুটছে গাড়ি
কাঁপছে শহর কাঁপছে বাড়ি
পুলিস হাঁকে, থামাও! থামাও!
কে দেয় তা'তে কান?
ভিড় জমে যায় পথের পাশে
ফাজিলগুলো মুচকি হাসে
খুড়োর দেখে পিত্তি জ্বলে
সয় না অপমান॥

৩

বাড়ায় গতি রাগের চোটে
জঙ্গী গাড়ি উল্কা ছোটে
তাকায় খুড়ী চাকার দিকে
বুক করে টিপ্ টিপ্।
নস্তি বাবুল ভণ্টি পুঁটে
পথ ছেড়ে সব পালায় ছুটে
বাপরে কী জোর ছুটছে বেগে
সিন্ধু খুড়োর জীপ।।

৪

লড়াই-ফেরত লোহার মোটর
ঘড়্ ঘড়্ ঘড়্ ঘটর ঘটর
শব্দ ওঠে পাথর ছোটে
ধাক্কা লেগে চাকায়।
সিন্ধু চলে শহর ছেড়ে
রেসের ঘোড়া আসলো তেড়ে
পাল্লা দিয়ে হারলো শেষে
লেজ ফুলিয়ে তাকায়।।

৫

ঘুরছে রোদে খুড়ীর মাথা
বন্ধ থাকে শখের ছাতা
জোর বাতাসে খুলতে বুড়ীর
ভীষণ জাগে ভয়।
প্যারাচুটের মতন পাছে
উড়িয়ে নিয়ে ঝোলায় গাছে
'খুড়োর সঙ্গে জীপ চড়া আর
এ জন্মেতে নয়'।।

৬

পণ করে সে দারুণ রেগে!
চারটি চাকার ঘূর্ণি বেগে
উধাও খুড়ো ধূলির মেঘে
তেপান্তরের পার।
খট্ খট্ খটাস্ খটাস্
টায়ার বুঝি ফাটলো ফটাস্
পিছন ফিরে তাকায় খুড়ী
দু'চোখ অন্ধকার।।

৭

গাড়ির চাকা ছিটকে পালায়
উল্টে বুঝি পড়বে নালায়
চেঁচায় খুড়ী, 'শিগ্রি থামাও
একগুঁয়ে মর্কট!'
মারলো মাথায় ছাতার বাড়ি
ঘাবড়ে গেল বোকার ধাড়ী
তেপান্তরে অচল গাড়ি
থামলো ঘটাংঘট।।



সিম্পু খুড়োর জীপ



ভোট ফর অমরেশ মামা!

—শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য

অমরেশ বিরক্ত হয়ে উঠেছে। বিরক্ত হয়েছে নিজের ওপর, পরিবারের ওপর। ক্লান্তি আর একঘেয়েমি কাটাবার জন্য সে টেলিফোন নিয়েছে। ফাঁক পেলেই গাইড খুলে সে কথা বলে। চেনার সঙ্গেও বলে, অচেনার সঙ্গেও বলে।

পুজো আসতে খুব দেরি নেই। মাঝে একটা রবিবারে অমিয় আর ভুবন এসেছিল। তাদের স্ত্রীরা (আমরা তাদের চিনি—অমিয়র স্ত্রীর নাম গোখ্‌রো আর ভুবনের স্ত্রীর নাম হচ্ছে শকুন্তলা। দুজনেই বিয়ের সময় অমরেশকে খুব বেকায়দায় ফেলে'ছিল) নাকি খুব ধরেছে যে "তোমাদের থিয়েটার খুব যুগান্তকারী হয় নাকি, তা আমাদের একবার দেখাও।"

কিন্তু মামা ছাড়া এ করবে কে? কাজেই মামাকে রাজী করাতে ওরা দুজনে এসেছিল। কিন্তু অমরেশ এমনি বেমক্কা মুড়ে ছিল যে—রাজী করানো দূরে থাক, ভাল করে প্রস্তাবও তারা করতে পারেনি। সেও আজ দু সপ্তাহ হ'য়ে গেল। অমরেশ অমিয়কে বলে দিয়েছিল—মামার বাড়ি আসতে চাস—আসিস্। কিন্তু মাচার কেচ্ছায় আর যাসনি।

সেদিন বিকেলে অমরেশ বসে টেলিফোন ক'রে সময় কাটাচ্ছে। অমরেশ যা শুনছে সেই কথাগুলি এমপ্লিফায়ার মারফত দর্শকের কানে আসবে।

অমরেশ :—আরে মশায়, কথা বললে বোঝেন না কেন?

এমপ্লি :—(নারীকণ্ঠ) মশায় কাকে বলছেন? আমি তো মেয়েছেলে!

অমরেশ :—কেন? মেয়েছেলেকে মশায় বললে কে আমাকে জাতিচ্যুত করবে শুনি?

এমপ্লি :—আমি করবো।

অমরেশ :—ইস! পারনা!

এমপ্লি :—পারনা মানে? পারনা বললেন কেন?

অমরেশ :—পারনা এই জন্যে বললাম যে—আমি নিষিদ্ধ মাংস খেলে তবে তো জাতিচ্যুত

করবেন। কিন্তু যে টেলিফোন করছে, সে কি নিষিদ্ধ মাংস খায়না?

এমপ্লি:—(একটু থেমে) কে আপনি?

অমরেশ:—আগে বলুন—আপনি কে?

এমপ্লি:—আমি অম্বুজাক্ষবাবুর স্ত্রী!

অমরেশ:—(খুশী হ'য়ে) ও! নমস্কার! নমস্কার! অম্বুজাক্ষ আছে বাড়িতে?

এমপ্লি:—অম্বুজাক্ষ?

অমরেশ:—হ্যাঁ। দেখুন—সে আমার বিশেষ বন্ধু। পরশুদিনও তার সঙ্গে সন্ধ্যাবেলায় অনেকক্ষণ কাটিয়েছি। একবার ডেকে দিন না দয়া করে!

অমরেশের স্ত্রী দীপা একটা ডিশে খান চারেক লুচি, একটু তরকারি ও দুটো মিষ্টি নিয়ে ঘরে ঢুকে পেছনে দাঁড়িয়ে স্বামীর টেলিফোন ভাষণ শুনছিল।

এমপ্লি:—অম্বুজবাবুকে ডেকে দেব?

অমরেশ:—আজ্ঞে হ্যাঁ। বলুন তার প্রিয় বন্ধু অমরেশ মজুমদার তাকে ডাকছে। তাতেও যদি চিনতে না পারে, তাহ'লে বলবেন যে পরশুদিন রাত্রে হোটেল ও ছোটেলে যার সঙ্গে সে খাওয়া-দাওয়া করেছে—

এমপ্লি:—ছোটেল মানে?

অমরেশ:—বাবা! এত মানে বোঝাতে গেলে তো টায়ার্ড হ'য়ে যাব মনে হচ্ছে। হোটেল ও ছোটেল মানে—ছোটেলালের হোটেল। ইংরিজীর সঙ্গে মিল রাখবার জন্যে ছোটেলালের প্রথম 'ল'য়ের আকারটা নিরাকার করা হয়েছে। যাকগে! এখন অম্বুজকে একবার ডেকে দিন।

এমপ্লি:—আপনি অম্বুজবাবুর বন্ধু?

অমরেশ:—বন্ধু মানে? 'চাম্' বলুন।

এমপ্লি:—চাম্!

অমরেশ:—হ্যাঁ চাম্! যাকগে। সে সব কথা আপনার শুনে দরকার নেই। আপনি অম্বুজকে একবার ডেকে দিন।

এমপ্লি:—দেখুন, তাঁকে ডাকা একটু মুশকিল হবে।

অমরেশ:—বেরিয়েছে বুঝি?

এমপ্লি:—হ্যাঁ।

অমরেশ:—কখন ফিরবে বলে গেছে কিছু?

এমপ্লি:—না।

অমরেশ:—কী আশ্চর্য! অথচ পরশুদিন আমায় বললে যে সন্ধের দিকে আমি বাড়িই থাকি। তুই টেলিফোন করিস।

এমপ্লি:—আ—চ্ছা! পরশুদিন আপনাকে তিনি এই কথা বললেন!

অমরেশ:—হ্যাঁ।

এমপ্লি:—ও! তাহ'লে আপনি দয়া ক'রে আর একটা টেলিফোন করুন!

অমরেশ:—তার মানে এখন যেখানে আছে সে?

এমপ্লি:—হ্যাঁ।

অমরেশ:—বাঃ! বেশ যুক্তি, সুন্দর যুক্তি। বলুন তো নম্বরটা।

এমপ্লি:—নম্বর জানিনে। তবে zoneটা বলতে পারি!

অমরেশ:—বলুন!

এমপ্লি:—স্বর্গধাম!

● ভোট্ কর্ অমরেশ মামা!
শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য

অমরেশ :—এঁ্যা !

এমপ্লি :—ওই জোনে তাঁকে নিশ্চয় পাবেন। কারণ আজ বছর চারেক হ'ল তিনি মারা গেছেন।

অমরেশ :—কে মারা গেছে ? অম্বুজ !

এমপ্লি :—হ্যাঁ, তোমার প্রাণের বন্ধু। যার সঙ্গে তুমি পরশু রাত্রে হোটেল দ্য মুগুতে ডিনার খেয়েছো ! ইডিয়ট্......ননসেন্স...... রাসকেল্...... !

প্রত্যেকবার গালাগালিতে চমকে চমকে উঠছিল অমরেশ। তাড়াতাড়ি রিসিভার রেখে দিল। নিজের মনে বললো—

অমরেশ :—ছি ছি ছি ! কী কেলেঙ্কারী ! লোকটা মারা গেছে, অথচ—! আর মেয়েটাও ভারী তেএঁটে। আরে বাবা, একবারে পরিষ্কার ক'রে বলে দে না যে—যাঁকে খুঁজছেন তিনি—(স্ত্রীকে দেখে) কী চাই ?

দীপা :—টেলিফোনে বকে বকে আয়ুক্ষয় হয়েছে তো ? এবার কিছু খেয়ে নাও !

অমরেশ :—হিউমার না ক'রে বুঝি কথা বলা যায় না ?......আমি তোমার গুরু, না গরু ?

দীপা :—(জিভ কেটে) ছি-ইঃ ! গরু হ'ল মা ভগবতী, তার নামে ঠাট্টা করতে নেই। খেয়ে নাও।

অমরেশ :—যাও, আমি খাব না। হাম নেহি খায়েংগে।

দীপা :—তাহ'লে রইল এখানে। মেজাজ হ'লে খেও।

দীপা চলে গেল। অমরেশ কটমট ক'রে চেয়ে রইল তার যাওয়ার পথের দিকে। তারপর একটানে খাবারের থালাটাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে গপ্ গপ্ ক'রে খেতে আরম্ভ করলো। নেপথ্যে আওয়াজ শোনা গেল—

নেপথ্যে :—মামা !

অমরেশ :—কে ?

নেপথ্যে :—আমি মামা !

অমরেশ :—তুমি মামা তো আমি কে ? ভেতরে এস।

অমিয় আর ভুবনের প্রবেশ। মনে হয় তারা যেন হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে এসেছে।

অমরেশ :—কী আপদ ! তোরা ! আয়, আয় ! আপিস নেই ?

অমিয় :—আপিস আছে। কিন্তু আমরা দুজনেই ছুটি নিয়ে এসেছি।

ভুবন :—খুব জ—জ—জরুরী দরকার, তো —তোমার সঙ্গে।

অমরেশ :—বলে ফেল্ !...শোন্ ! তার আগে চেঁচিয়ে আর দু থালা দিতে বল্ !

ভুবন :—অমিয় ! তুই মা—মামাকে বল্ ! আমি গিয়ে মাম্—মাম্—ইকে বলে আসি !

ভুবন দরজা ঠেলে ভেতরে গেল।

অমিয় :—আমাদের দেশের মনোহর মোদক মারা গেছে শুনেছ ?

অমরেশ :—মনোহর মোদক ? কে বল্

● ভোট্ কর্ অমরেশ মামা !
শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য

দিকি? সেই মোড়ের মাথায় যার মুড়ি-মুড়কির দোকান ছিল?

অমিয়:—আরে দূর! তা কেন? এম-এল-এ!

অমরেশ:—ও! ভেরি স্যাড।

অমিয়:—এখন কথা হচ্ছে—তোমাকে এবার দাঁড়াতে হবে যে!

অমরেশ:—তা' না হয় দাঁড়াচ্ছি। কিন্তু—

বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়াল।

অমিয়:—এই দেখ! উঠে দাঁড়ানোর কথা বলিনি! তোমাকে এম-এল-এ দাঁড়াতে হবে। আমরা whole team খাটবো তোমার জন্যে। এমন কি একথা শুনে গোখ্‌রো শকুন্তলা অবধি তোমার জন্যে ক্যানভাস করবে বলেছে।



দীপা:—তাহ'লে দাঁড়িয়ো না—বসে থাক।

● তোহি নম্‌ অমরেশ মামা!
শ্রীদিবাকর ভট্টাচার্য

অমরেশ:—না—না, সে আমার ভারী লজ্জা করবে! ওরে অমিয়, আমি শিল্পী। দুর্গাদা বলতেন—যদি তুমি সত্যিকারের শিল্পী হও, তবে ভাগ্নেবৌদের কখনো কষ্ট দিও না। শিল্পীদের কখনো ওই সব ঝামেলা পোষায়?…শুধু তাই নয়—দুনিয়ার লোকের হাতে পায়ে ধরা—ভোট দাও ভোট দাও ক'রে। কোন মানে হয় না!

অমিয়:—মানে তো অনেক কিছুরই হয় না মামা। সে মানে হোক, বা না হোক, তোমাকে এবার দাঁড়াতেই হবে।

ভুবন ও দীপার প্রবেশ। অমিয় উঠে গিয়ে মামীকে প্রণাম করলো।

দীপা:—বাড়ির চিঠি পেয়েছ?

অমিয়:—হ্যাঁ, মামী।

দীপা:—ভাল আছে তো সবাই?

অমিয়:—হ্যাঁ।

অমরেশ:—আরে, অমিয় কী বলছে জানো?

দীপা:—কী বলছে?

অমরেশ:—বলছে,—আমাকে নাকি দেশ থেকে এবার এম-এল-এ দাঁড়াতে হবে।

দীপা:—দাঁড়াও!

অমরেশ:—দাঁড়াও! একি বেঞ্চির ওপর দাঁড়ানো? যে দাঁড়াও বললেই দাঁড়িয়ে যাব?

দীপা:—তাহ'লে দাঁড়িয়ো না—বসে থাক। আমি চল্লাম।

অমিয়:—এটা যদি হয়, তাহ'লে মামী তোমার কিন্তু বেঁধে নিয়ে যাব। মামার হ'য়ে ক্যানভাস করতে হবে।

দীপা :—তা' পতি পরম গুরু! করতে হবে বৈকি! আরো কত করতে হবে এখন।

দীপা চলে গেল।

অমরেশ :—আ গেল যা! ভাবতে ভাবতে এদিকে আমাদের মাথার চুল সাদা হ'য়ে গেল—এদিকে উনি হিউমার করছেন।

ভুবন :—তাহ'লে কী হ'ল মামা? তুমি কি তাহ'লে দাঁ—দাঁ—দাঁ—

অমরেশ :—হাঁ। দাঁওটা ছাড়বো না।

অমিয় :—(চুপিচুপি) আর একটি কাজ করতে হবে যে মামা?

অমরেশ :—কী বল্?

অমিয় :—কিছু টাকা বার করতে হবে যে এবার!

অমরেশ :—ক—তো?

অমিয় :—তা' হাজার দুয়েক।

অমরেশ :—সে দেখা যাবে। কত বললি! দু'হাজার? ওরে দু'হাজার যে ক কুড়িতে হয়, আমি যে তাই জানিনে রে। কোথায় পাবো? বাবা!

অমিয় :—পেতে হবে মামা! এই চান্স গেলে আর আসবে না! দেশের সেবা আর কবে করবে? আর কোন ভাল ক্যাণ্ডিডেট্ও নেই। শুধু এক পরিতোষমামা আর তুমি!

অমরেশ :—পরিতোষমামা মানে?

ভুবন :—সেই যে পত্—পত্—পত্—

অমরেশ :—পত পত ক'রে ওড়ে? কিন্তু বাবা ভুবন, পত পত ক'রে জয়পতাকা ওড়ে,—মানুষ উড়তে পারে কি?

ভুবন :—না গো মামা। তা বলিনি।

অমিয় :—ও বলছে পণ্ডিতের মামা পরিতোষ। সেও দাঁড়াচ্ছে কিনা!

অমরেশ :—সেও দাঁড়াচ্ছে? বেশ করলে লাইফ। এইবার জ্বালালে। শেষকালে পণ্ডিতের —হাঁরে অমিয়! ওকে কেউ বলে দিসনি বুঝি যে এটা স্টেজে দাঁড়িয়ে দুঃশাসন করা নয়,—রীতিমত এসেম্বলীতে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতে হবে। দেশের ভালমন্দ বলে কথা। আচ্ছা তাহ'লে—চল্—রাত্রের গাড়িতেই যাওয়া যাক।

অমিয় :—বেশ, তাই চল—সামামা। থ্রি চিয়ার্স ফর অমরেশ মামা—হিপ্ হিপ্ হিপ্—

ভুবন :—হু—হু—হু—

অমরেশ :—খোলো ব্যাটাচ্ছেলে—

তিনজনে বেরিয়ে গেল।

—বিরতি—

● ভোট্ কর্ অমরেশ মামা!
শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় দৃশ্য

পোলিং থেকে একটু তফাতে ক্যাম্পের দরজা। তাঁবুর মধ্যে একটু ফাঁককরা জায়গা। সেইটে দরজা। বাইরে থেকে ছেলেদের চিৎকার শোনা যাচ্ছে।

ভোট্ ফর—অমরেশ মামা!

ভোট্ ফর—অমরেশ মামা!

ভোট্ ফর—অমরেশ মামা!

সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে শব্দ শোনা গেল—

ভোট্ ফর—পরিতোষ মামা!

ভোট্ ফর—পরিতোষ মামা!

ভোট্ ফর—পরিতোষ মামা!

তিনজন লোকের সঙ্গে পণ্ডিত ঢুকলো কথা বলতে বলতে।

পণ্ডিত :—ক্যানভাস করছি না। কিন্তু ভেবে দেখবেন যে, গ্রাম থেকে কাকে পাঠাচ্ছেন। আপনাদের আশা আনন্দ সুখ-দুঃখের খবর নিয়ে যে অ্যাসেম্বলীতে যুদ্ধ করতে পারবে—তাকেই আপনারা পাঠাবেন।

১ম লোক :—কিছু বলতে হবে না ভাই। যাকে দেবার আমরা ঠিক দিয়ে দেব।

পণ্ডিত :—না দাদা। তা বললে চলবে না। পরিতোষ মামার মত মানুষ হয় না। বিড়ি সিগারেট পর্যন্ত খান্ না। খদ্দর পরেন—

অমিয় ঢুকলো—

অমিয় :—মিথ্যে কথা। পরিতোষবাবু খদ্দর পরেন না, খদ্দর পরেন অমরেশ মামা। ধরাতলে মহাদেব আবার এসেছেন অমরেশের মূর্তি ধরে। ধীর, স্থির, জ্ঞানী, গম্ভীর। আমি তাঁকে ডাকছি, আপনারা চড় মারুন তাঁকে, দেখবেন তিনি হাসছেন। তিনি রাগ করতে জানেন না।

বাইরে থেকে গদাই আর অমরেশের গলা শোনা গেল। অমরেশ চিৎকার করতে করতে আসছে।

অমরেশ :- হ্যাঁ। আমি জানি না। তুই জানিস!

গদাই :—আঃ! তুমি রাগ করছো কেন মামা?

অমরেশ :—না, রাগ করবে না! ভজং ভাজং দিয়ে ভোটে নামিয়ে এখন বলে আরো দু'হাজার টাকা চাই! টাকার গাছ আমি? ওই সাধের এম-এল-এর জন্যে আমি বস্তি বাঁধা দেব কি?

অমিয় :—আঃ! মামা!

অমরেশ :—Shut up. বন্ধ ক'রে দাও ভোট। আমি withdraw করলাম। যা হয়েছে খুব হয়েছে। আমি আর এক পয়সাও দিতে পারবো না। ছি ছি ছি!

৩য় লোক :—আপনিই বুঝি অমরেশ মামা?

অমরেশ :—হ্যাঁ। কেন?

২য় লোক :—কই, আপনার পরনে খদ্দর কই?

অমরেশ :—খদ্দর মানুষে পরে? ও দিয়ে শীতে লেপ তৈরী হয়। খদ্দর!

● ভোট্ ফর্ অমরেশ মামা!
শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য

পতিত :—দেখলেন তো দাদারা! এখনও বলছি, যদি ভাল চান, তবে পরিতোষ মামাকে ভোট দিন।

অমরেশ :—পতে! খবরদার বলছি, আমার সামনে তুই মামার জন্যে ভোট ক্যানভাস করবিনে? ইডিয়ট্ কোথাকার!

পতিত :—এখন যে যুদ্ধ চলছে মামা! তুমি যে এখন শত্রুপক্ষ?

অমরেশ :—কী, আমি শত্রুপক্ষ? Get out, Nonsense, Get out.

২য় লোক :—ও বাবা, এই বদমেজাজী লোককে আমরা পাঠাবো না।

পতিত :—ভোট্ ফর—

গদাই :—পরিতোষ মামা!

অমিয় :—গদাই!

গদাই :—এই রে! মনে ছিল না। ভোট্ ফর্—! (কেউ সাড়া দিলো না।)

গদাই :—ভোট্ ফর—(সবাই চুপ)

> কেউ কোন কথা বললো না। অমিয় টানতে টানতে অমরেশকে ক্যাম্পে নিয়ে গেল। দূর থেকে জনতার কোলাহল ও জয়ধ্বনি ভেসে আসছে। মদনবাবু নামে একটি মোটা লোক ও তার পেছনে অমিয়র স্ত্রী গোখরো ঢুকলো।

গোখরো :—আপনি বলুন তো! কী মার্কা বাক্সে ভোট দেবেন?

মদন :—কেন? গরুর গাড়ি!

গোখরো :—এইরে! সর্বনাশ! না না! তাহ'লে তো ভুল লোককে পাঠাবেন। দেবতাকে পাঠাতে দানবকে পাঠাবেন।

মদন :—কেন? কেন? দানবকে পাঠাতে দেবতাকে পাঠাবো কেন?

গোখরো :—না। ষাঁড় মার্কা বাক্সে ভোট দেবেন। ষাঁড় কথাটি মনে রাখবেন। ষাঁড়। যা আমাদের গাড়ি টানে, জমি চষে,—আর শ্রাদ্ধের হ'লে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়।

মদন :—আচ্ছা। মনে থাকবে।

গোখরো :—খবরদার যেন ভুল ক'রে গাড়ির বাক্সে ফেলবেন না।

মদন :—(ভয়ে ভয়ে) না।

গোখরো :—যান!

> দীপার প্রবেশ।

গোখরো :—মামী! এঁকে তুমি সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ভোটটা দিইয়ে দাও!

দীপা :—আসুন!

> মদন চলে গেল। গোখরো সেইদিকে চেয়ে আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছলো। তারপর ক্যাম্পে ঢুকে গেল।
> পতিত আর পরিতোষ ঢুকলো।

পতিত :—তুমি পারবে না অমরেশ মামার সঙ্গে!

পরি :—কেন?

পতিত :—আমাদের দলে তো ফেয়ার সেক্স নেই!

পরি :—তাতে কী হয়েছে?

পতিত :—তাতে কী হয়েছে মানে?

● ভোট্ ফর্ অমরেশ মামা!
শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য

ওরাই তো লোকগুলোকে যা বোঝাচ্ছে, ওরা বোকার মতো তাই মেনে নিয়ে ভোট দিয়ে আসছে।

পরি :—কিন্তু পতিত! আমরাও তো ভোট পাচ্ছি!

পতিত :—তা পাচ্ছি। কিন্তু ওদের মতো নয়। ওই দেখ!

কার্তিকবাবু নামে একজন প্রৌঢ়, সঙ্গে শকুন্তলা—ভুবনের বৌ।

শকু :—দেখুন, কথা তা নিয়ে নয়। যাকে আমরা কাছে পাব, আত্মীয়ের মতো, বন্ধুর মতো, —সুখ দুঃখের কথা বলতে পারবো,—যিনি আমাদের ব্যথা বুঝবেন,—আমাদের স্কুল দেখবেন, স্বাস্থ্য দেখবেন, দরকার হ'লে নর্দমা অবধি দেখবেন, তাঁকেই আমাদের পাঠানো উচিত। কী বলুন?



শকু :—অমরেশবাবুকে। ষাঁড় মার্কা বাক্সে।

কার্তিক :—ঠিক কথা মা। তা' তুমি বলো—কাকে ভোট দেব।

শকু :—অমরেশবাবুকে। ষাঁড় মার্কা বাক্সে।

কার্তিক :—বেশ। ষাঁড় মার্কা বাক্সেই ভোট দিয়ে আসছি আমি।

কার্তিক চলে গেল। পতিত পরিতোষের দিকে চাইলো। পরিতোষ মাথা নাড়লো। শকুন্তলা পতিতের দিকে চেয়ে হাসলো।

শকু :—কেন আর চেষ্টা করছো পতিত ঠাকুরপো? এখন সময় আছে—উইথড্র করো, নইলে দাঁড়িয়ে হারবে।

পতিত :—একটা কথা বলবো বৌঠান্?

শকু :—বলো!

পতিত :—তোমার ওই ক্যানভাসের মাঝে মাঝে আমার মামার কথাও এক আধবার বোলো। ধরো, দশটা তুমি ষাঁড় পাঠালে, একটা অন্ততঃ গাড়ির দিকে দাও।

শকু :—দূর! তাই কখনো হয়?

পরি :—খুব হয় বৌমা! তুমি মন করলেই হয়। হারবো তো ঠিকই। কিন্তু কম মারজিনে হারলে মানটা থাকতো।

শকু :—না না, এ আপনি কী বলছেন?

শকুন্তলা ক্যাম্পে ঢুকলো। দুজন লোক ভোট দিয়ে ফিরছে, সঙ্গে ভুবন। পতিত আর পরিতোষ চলে গেল।

ভুবন :—ভো—ভোট দিয়ে এলেন?

১ম লোক :—হ্যাঁ ভাই।

ভুবন :—কাকে ভো—ভোট দিলেন দাদা—জা—জানতে পারি!

● ভোট্ দে অমরেশ দাদা!
শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য

২য় লোক :—হ্যাঁ, দুটোই আমরা গাড়িতেই দিয়েছি।

ভুবন :—স—সব্বোনাশ করেছেন আপনারা। ও গাড়ির যে চা—চা—চা—চাকা ভাঙা!

১ম লোক :—চাকা ভাঙা?

ভুবন :—হ্যাঁ। ও—গ্—গ্—গ্—গাড়ি চলবে না। পথের মাঝেই আপনাদের ডো—ডো—বাবে।

২য় লোক :—কিন্তু দিয়ে ফেলেছি যে!

লোক দুজন চলে গেল। অমিয়র বাবা নরেশবাবু ঢুকলেন।

নরেশ :—কী ভুবন? কেমন হচ্ছে তোমাদের?

ভুবন :—ভালই হচ্ছে কা—কাকাবাবু! মেয়েরা অদ্—অদ্—অদ্ভুত কাজ করছে।

নরেশ :—হ্যাঁ। ওরা শিক্ষিতা মেয়ে। ওদের নিয়ে তো কোন ভাবনা নেই। ঠিক চালিয়ে নেবে। অমরেশ কোথায়?

ভুবন :—মামা ক্যা—ক্যাম্পে আছে।

নরেশ :—আরে! ওকে বেরিয়ে একটু দেখতে শুনতে বলো। চুপচাপ শুয়ে থাকলে চলবে না। পরের ওপর ভার দিয়ে একাজ হয় না। আমি এগোচ্ছি—ওকে পাঠিয়ে দাও।

ভুবন :—আচ্ছা।

নরেশবাবু চলে গেলেন। ভুবন ক্যাম্পে ঢুকতে যাবে,—এমন সময় শকুন্তলা বেরিয়ে এল।

ভুবন :—তু—তুমি কোথায় যাচ্ছো?

শকু :—বুথে যাই একবার। মামা তো বলছেন শরীর খারাপ করছে। কী জানি বাপু আমি বুঝতে পারছি না।

ভুবন :—আমিও না! তুমি যেন বেশী ভিড়ে যেও না!

শকু :—কেন? হারিয়ে যাব?

ভুবন :—কে—কে বলতে পারে?

ভুবন ক্যাম্পে ঢুকলো। পরাণে ছুটতে ছুটতে ঢুকলো।

পরাণে :—মামাবাবু—মা—মা—বাবু গো!

শকু :—কী? কী হয়েছে পরাণ?

পরাণে :—বৌদিদি! প্যাতোক্কেল্লাম। ইদিকে যে সব নয়ছয় হ'য়ে গেল বৌদিদি?

শকু :—কেন? কী হ'ল?

পরাণে :—উদিকে যে ময়দা ফুরিয়েছে, ডাল ফুরিয়েছে, তরকারি মিষ্টি দই সব ফুরিয়েছে।

শকু :—সব ফুরিয়েছে?

পরাণে :—সব ফুরিয়েছে গো বৌদিদি! পিল্ পিল্ ক'রে লোক ঢুকছে আর বলছে খেতে দাও!

শকু :—খেতে দিচ্ছো তো?

পরাণে :—দিচ্ছি না মানে? হরদম দিচ্ছি। ঢেলে ঢেলে দিচ্ছি। শুধু দই খাওয়ার আওয়াজ শুনলে ভিরমি যাবে তুমি! কিন্তু লোকও যে কমছে না গো বৌদিদি!

শকু :—সেকি! লোক কমলে আমরা ভোটে হেরে যাব যে!

অমিয়র প্রবেশ।

অমিয় :—কী হয়েছে? পরাণে!

● ভোট্ কর্ অমরেশ মামা!
শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য

পরাণে :—লোকই যে শেষ হোচ্ছে না অমিয় ভাই ! ইদিকে খাবার শেষ হ'য়ে গেল।

অমিয় :—খাবার শেষ হ'ল—মানে ?

পরাণে :—হঁ্যাগো ! ময়দা নাই, লুচি নাই, তরকারি নাই, দই নাই, মিষ্টি নাই—

অমিয় :—সর্বনাশ ! আমরা যে হাজার লোকের যোগাড় করে'ছিলাম পরাণে !

অমরেশের প্রবেশ।

অমরেশ :—কী হয়েছে ?

অমিয় :—মামা ! আরো কিছু টাকা লাগবে যে !

অমরেশ :—কেন ?

অমিয় :—খাবার সব ফুরিয়ে গেছে।

অমরেশ :—একহাজার লোকের পেট ভরে খাবার যোগাড় ছিল অমিয়,—পরাণে !

পরাণে :—তা ছিল। তেমনি তিনহাজার লোক খেয়ে গেল যে !

অমিয় :—আঃ ! থাম্‌না পরাণে।

অমরেশ :—না। থামবে না পরাণে। তিন-হাজার লোক কেন খেয়ে গেল পরাণে ?

পরাণে :—বারে ! উদিককার লোক, ইদিককার লোক—সবাই খেল তো !

অমরেশ :—ওদিককার খেল মানে ?

পরাণে :—খেলোনা ?

অমরেশ :—কেন ?

পরাণে :—বারে ! উয়ারা তো কোন খাবার যোগাড় করে নাই ! উ কথা বলতে পারবা না। বুঝলা ? আমি সব্বাইকে ডেকে ডেকে খাইয়েছি।



অমরেশ :—ওরে, ভোট্ কর অমরেশ, থামা ! [পৃষ্ঠা ৩৩৫

অমরেশ :—ওদের লোককেও ?

পরাণে :—হঁ্যা। আমাদের দল, আর পতিত ভায়ের দল,—এ দুট্যাই তো একদল ! শেষকালে বদনাম হবে ক্যানে ? টাকা দ্যাওগো মামা ! আটা, ময়দা, ঘি, তেল, নুন, দই, মিষ্টি সবই কিনতে হবে।

অমরেশ :—(চিৎকার ক'রে) না !

পরাণে :—ল্যাও মজা ! না বলছো ক্যানে গো ?

অমরেশ :—অমিয় !

অমিয় :—(চিঁ চিঁ ক'রে) কী মামা ?

● ভোট্ কর্ অমরেশ মামা !
শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য

অমরেশ :—এখনো আক্কেল হয়নি? বন্ধ ক'রে দে,—এখুনি বন্ধ ক'রে দে!

ভুবন :—মাম্-আ!

অমরেশ :—Shut up.

শকু :—মামাবাবু!

অমরেশ :—চোপরও! নেই মাংতা এম-এল-এ,—দু হাজার টাকা জলে গিয়া তো গিয়া! আর এক পয়সা নেই দেগা! বন্ধ করো!

অমিয় :—মা—মা!

অমরেশ :—চু—প্! আমার বাপের শ্রাদ্ধ আটকেছে—না? ছেলের বিয়ের বৌভাত? না? চলো! হটাও! বন্ধ্ করো!

নেপথ্যে :—ভোট্ ফর—অমরেশ মামা!

অমরেশ :—(চেঁচিয়ে) ওরে থামা!

নেপথ্যে :—ভোট্ ফর—অমরেশ মামা!

অমরেশ :—একদম থামা!

নেপথ্যে :—ভোট্ ফর—অমরেশ মামা!

অমরেশ :—ওরে! ভোট্ ফর অমরেশ, থাম!

বলতে বলতে ছুটে বেরিয়ে গেল। অমিয়, ভুবন, পরেশ ইত্যাদি সব মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো। নেপথ্যে শোনা যাচ্ছে অমরেশের গলা।

ভোট্ ফর অমরেশ, থামা! চাই না ভোট্! গেট্ আউট্! গেট্ আউট্!

সোনালী কথা

ওয়াল্ডেন্ (হেনরী ডেভিড থোরো)

মহাত্মা গান্ধী জীবনে বিশ্ব সাহিত্যের বিশেষ কোন বই পড়েন নি। তিনি পড়ুয়া ছিলেন না। কিন্তু তাঁর যৌবনে দুজন লেখক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন, যে প্রভাবের ফলে তাঁর জীবন-নীতি ও কর্মের আদর্শ তিনি গড়ে তোলেন। একজন হলেন রাশিয়ার টলস্টয়, আর দ্বিতীয় জন হলেন আমেরিকার হেনরী ডেভিড থোরো। এই দুজনের কাছ থেকেই তিনি সিভিল ডিস্ওবিডিয়েন্স আন্দোলনের প্রেরণা পান, অনেকেই জানেন না যে থোরো হলেন এই আন্দোলনের প্রথম প্রবর্তক এবং শান্তভাবে অসহযোগ করে তিনি কারাবরণ করেন। তাঁর একটি প্রবন্ধের নামই হলো, সিভিল ডিস্ওবিডিয়েন্স। আর একটা দিক থেকে থোরো মহাত্মা গান্ধীর চিন্তাধারাকে প্রভাবান্বিত করেন, সেটা হলো সভ্যতার বাহুল্যকে পরিত্যাগ করে প্রকৃতির মধ্যে সহজ প্রাকৃতিক জীবন যাপন করা। সেই আদর্শই অপূর্ব সাহিত্য রসের ভেতর দিয়ে থোরো তাঁর অমর গ্রন্থ 'ওয়াল্ডেনে' ফুটিয়ে তোলেন। ওয়াল্ডেন্ নভেল নয়, এর মধ্যে কোন কাল্পনিক ঘটনা নেই। এ বই হলো থোরোর নিজের জীবনের কাহিনী এবং বড় বিচিত্র সুন্দর সে-কাহিনী। এই বই-এর আরম্ভেই থোরো লিখছেন, "যখন আমি এই বই লিখি, তখন আমি একা গভীর অরণ্যের মধ্যে ওয়াল্ডেন্ জলাশয়ের ধারে নিজের হাতে একটা ছোট্ট কাঠের ঘর তৈরি করে বাস করতাম···সেই ঘরে আমি দুবছর দুমাস বাস করেছি।" সেই ওয়াল্ডেন্ জলাশয়ের নাম থেকেই বই-এর নাম ওয়াল্ডেন্ রাখা হয়েছে। এই বইতে থোরো তাঁর একক অরণ্য-বাসের কথা লিখেছেন। সেইখানে তিনি আদিম মানুষের মতন নিজের সামান্য দরকারের যা জিনিস, যেমন পায়ের জুতো, তা নিজের হাতেই তৈরি করে নিতেন। এই অরণ্য-বাসের মধ্যে, গাছে লতায় ফলে ফুলে, অরণ্যবাসী পশু-পাখির মধ্যে, যে সব অদ্ভুত অপরূপ জিনিস তাঁর চোখে পড়েছে, তাঁর অন্তরকে দোলা দিয়েছে, কবির দৃষ্টি নিয়ে তিনি এই বইতে লিখে রেখে গিয়েছেন।

ন্যাংচাদার 'হাহাকার'



—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ক্যাবলা বললে, বড়দার বন্ধু গোবরবাবু ফিলিমে একটা পার্ট পেয়েছে।

টেনিদা চার পয়সার চীনেবাদাম শেষ করে এখন তার খোলা-গুলোর ভেতর খোঁজা-খুঁজি করছিল। আশা ছিল দু-একটা শাঁস এখনো লুকিয়ে থাকতে পারে। যখন কিচ্ছু পেলে না, তখন খুব বিরক্ত হয়ে একটা খোলাই তুলে নিলে, কড়মড় করে চিবুতে চিবুতে বললে, বারণ কর ক্যাবলা—এক্ষুনি বারণ করে দে!

ক্যাবলা আশ্চর্য হয়ে বললে, কাকে বারণ করব? গোবরবাবুকে?

—আলবাত। নইলে দেখবি তোর গোবরবাবু স্রেফ ঘুঁটে হয়ে গেছে।

—ঘুঁটে হবে কেন? সেই যে কী বলে—মানে স্টার হবে।—আমি বলতে চেষ্টা করলুম।

—স্টার হবে? আমার ন্যাংচাদাও স্টার হতে গিয়েছিল, বুঝলি? এখন নেংচে নেংচে হাঁটে আর সিনেমা হাউসের পাশ দিয়ে যাবার সময় কানে আঙুল দিয়ে, চোখ বুজে, খুব মিহি সুরে 'দীনবন্ধু, কৃপাসিন্ধু কৃপাবিন্দু বিতরো'—এই গানটা গাইতে গাইতে পেরিয়ে যায়।

—বুঝতে পারছি।—হাবুল সেন মাথা নাড়ল : তোমার হ্যাংচাদা-রে ফিলিমের লোকেরা মাইর‍্যা ল্যাংড়া কইরা দিছে।

—হুঃ, মাইর‍্যা ল্যাংড়া করছে!—টেনিদা ভেংচে বললে, খামোকা বকবক করিসনি হাবুল! যেন এক নম্বরের কুরুবক!

ক্যাবলা বললে, কুরুবক তো ভালোই। একরকমের ফুল।

—থাম, তুই আর সবজান্তাগিরি করিসনি। কুরুবক যদি ফুল হয়, তা হলে কানি বকও একরকমের গোলাপফুল! তা হলে পাতি হাঁসও একরকমের ফজলী আম! তা হলে কাকগুলোও একরকমের বনলতা!

ক্যাবলা বললে, বা-রে, তুমি ডিক্‌শনারী খুলে ছাখো না!

—শাট্ আপ! ডিক্‌শনারী! আমিই আমার ডিক্‌শনারী। আমি বলছি কুরুবক একধরনের বক—খুব খারাপ, খুব বিচ্ছিরি বক। যদি বেশি চালিয়াতি করবি তো এক চাঁটিতে তোর দাঁত—

—দাঁতনে পাঠিয়ে দেব।—আমি জুড়ে দিলুম : কিন্তু বকের বকবকানি এখন বন্ধ করো না বাপু। কী হ্যাংচাদার গল্প যেন বলছিলে, তাই বলো।

—অঃ, ফাঁকি দিয়ে গল্প শোনবার ফন্দি? টেনি শর্মাকে অমন 'আনরাইপ্ চাইল্ড্' মানে কাঁচা ছেলে পাওনি—বুঝেছ প্যালারাম চন্দর? হ্যাংচাদার রোমহর্ষক কাহিনী যদি শুনতে চাও তা হলে এক্ষুনি পকেট থেকে ঝাল-নুনের শিশিটি বের করো। একটু আগেই লুকিয়ে লুকিয়ে চাটা হচ্ছিল, আমি বুঝি দেখতে পাইনি?

কী ডেঞ্জারাস চোখ—দেখেছ? কত হুঁশিয়ার হয়ে একটু একটু খাচ্ছি—ঠিক দেখে ফেলেছে! সাধে কি ইস্কুলের পণ্ডিতমশাই টেনিদাকে বলতেন, বাবা ভজহরি—তুমি হচ্ছ পয়লা নম্বরের 'শিরিগাল'—মানে ফক্স্!

দেখেছে যখন, কেড়েই নেবে। কী আর করি—মানে মানে দিতেই হল শিশিটা।

প্রায় আদ্ধেকটা ঝাল-নুন একবারে চেটে নিয়ে টেনিদা বললে, হ্যাংচাদা—মানে আমার বাগবাজারের মাসতুতো ভাই—

হাবুল বললে, চোরে চোরে।

—অ্যাঁ? কী বললি?

—না—না, আমি কিছু কই নাই। কইতাছিলাম একটু জোরে জোরে কও!

● হ্যাংচাদার 'হাহাকার'
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

—জোরে ?—টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে নাকটাকে আলুসেদ্ধর মতো করে বললে, আমাকে কি অল্ ইণ্ডিয়া রেডিয়ো পেলি যে খামোকা হাউমাউ করে চ্যাঁচাবো ? মিথ্যে বাধা দিবি তো এক গাঁট্টায় তোর চাঁদি—

আমি বললুম, চাঁদপুরে পাঠিয়ে দেব !

—যা বলেছিস !—বলেই টেনিদা আমার মাথায় টকাস্ করে গাঁট্টা মারতে যাচ্ছিল, আমি চট্ করে সরে গিয়ে মাথা বাঁচালুম।

আমাকে গাঁট্টা মারতে না পেরে ব্যাজার হয়ে টেনিদা বললে, ধ্যেৎ, দরকারের সময় হাতের কাছে কিচ্ছু পাওয়া যায় না—বোগাস্! মরুক গে—হ্যাংচাদার কথাই বলি। খবর্দার, মাঝখানে ডিস্টার্ব করবি না কেউ।

হ্যাঁ—কী বলছিলুম ? আমার বাগবাজারের মাসতুতো ভাই হ্যাংচাদার ছিল ভীষণ ফিলিমে নামবার শখ ! বায়োস্কোপ দেখে দেখে রাতদিন ওর ভাব লেগেই থাকত। বললে বিশ্বাস করবিনে, বাজারে কাঁচকলা কিনতে গেছে—হঠাৎ ওর ভাব এসে গেল। বললে, ওগো তরুণ কদলী ! এই নিষ্ঠুর সংসার তোমাকে ঝোলের মধ্যে রান্না করে খায়—তোমার অরুণ হিয়ার করুণ ব্যথা কে বুঝবে ! এই বলে, খুব কায়দা করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে 'ওফ্' বলতে যাচ্ছে, এমন সময় কাঁচকলাওলা বললে, কোথাকার এঁচোড়ে পাকা ছেলে রে ! দিতে হয় কান ধরে এক থাপ্পড় ! হ্যাংচাদা আমার কানে কানে বললে—অহো—কী নৃশংস মনুষ্য—দেখেছিস্ ?

এমন ভাবের মাথায় থাকলে কেউ কি আই-এ পাস করতে পারে ? হ্যাংচাদা সব সাব্জেক্টে ফেল করে গেল। আর মেসোমশাই অফিস থেকে ফিরে এসে যা যা বললেন, সে আর তোদের শুনে কাজ নেই। মোদ্দা, অপমানে হ্যাংচাদার সারারাত কান কটকট করতে লাগল। প্রতিজ্ঞা করল, হয় ফিলিমে নেমে প্রতিভায় চারদিক অন্ধকার করে দেবে—নইলে এ পোড়া প্রাণ আর রাখবে না।

খুব ইচ্ছেশক্তি থাকলে, মানে মনে খুব তেজ এসে গেলে—বুঝলি, অঘটন একটা ঘটেই যায়। হ্যাংচাদা তো মনের দুঃখে সকালবেলা 'দি গ্র্যাণ্ড্ আবার খাবো রেস্তোরাঁ'য় ঢুকে এক পেয়ালা চা আর ডবল ডিমের মামলেট্ নিয়ে বসেছে। এমন সময় খুব স্যুট্-টাই হাঁকড়ে এক ছোকরা এসে বসল হ্যাংচাদার টেবিলে। হ্যাংচাদা দেখলে তার কাছে একটা লালরঙের ফাইল আর তার উপরে খুব বড় বড় করে লেখা 'ইউরেকা ফিলিম কোং'। নবতম অবদান—'হাহাকার'।

হ্যাংচাদার মনের অবস্থা তো বুঝতেই পারছিস। উত্তেজনায় তার কানের ভেতর যেন তিনটে করে উচ্চিংড়ে লাফাতে লাগল, নাকের মধ্যে যেন আরশোলারা

সুড়সুড়ি দিতে লাগল। তার সামনেই জলজ্যান্ত ফিলিমের লোক বসে—তাতে আবার নবতম অবদান! একেই বলে মেঘ না চাইতে জল! কে বলে কলিযুগে ভগবান নেই!

প্যাংচাদা বাগবাজারের ছেলে—তুখোড় চীজ! তিন মিনিটে আলাপ জমিয়ে নিলে। লোকটার নাম চন্দ্রবদন চম্পটী—সে হল 'হাহাকার' ফিলিমের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট্। মানে, ছবির ডিরেক্টারকে সাহায্য করে আর কি!

হাবুল বললে, সহকারী পরিচালক।

—চোপরাও!—টেনিদা হাবুলকে এক বাঘা ধমক লাগিয়ে বলে চলল, চন্দ্রবদনকে প্যাংচাদা ভজিয়ে ফেললে। তার বদনে দুটো ডবল ডিমের মামলেট্, চারটে টোস্ট্ আর তিন কাপ চা ঘুষ দিয়ে—শেষে হাতে চাঁদ পেয়ে গেল প্যাংচাদা। ওঠবার সময় চন্দ্রবদন বললে, এত করে বলছেন যখন—বেশ, আপনাকে আমি ফিলিমে চান্স দেব। কাল বেলা দশটার সময় যাবেন বরানগরের ইউরেকা ফিলিমে—নামিয়ে দেব জনতার দৃশ্যে।

হাত কচলাতে কচলাতে প্যাংচাদা বললে, স্টুডিয়োটা কোথায় স্যার?

চন্দ্রবদন জায়গাটা বাত্‌লে দিলে। বললে, দেখলেই চিনতে পারবেন। উঁচু পাঁচিল—বাইরে লেখা রয়েছে ইউরেকা ফিলিম কোং। আচ্ছা আসি এখন, ভেরি বিজি, টা—টা—

হাত নেড়ে চন্দ্রবদন তড়াক করে একটা চলতি বাসে উঠে চলে গেল।

সেদিন রাত্তিরে তো প্যাংচাদার আর ঘুম হয় না। বার বার বিছানা থেকে উঠে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে জনতার দৃশ্যে পার্ট করছে। মানে কখনো স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছে—কখনো জয়ধ্বনি করছে, কখনো অট্টহাসি হাসছে। অবিশ্যি হাসি আর জয়ধ্বনিটা নিঃশব্দেই হচ্ছে—পাশের ঘরেই আবার মেসোমশাই ঘুমোন কিনা!

সারা রাত ধরে জনতার দৃশ্য সড়গড় করে নিয়ে প্যাংচাদা সকাল ন'টার আগেই সোজা ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের বাসে চেপে বসল। তারপর জায়গাটা আঁচ করে নেমে পড়ল বাস থেকে।

খানিকটা হাঁটতেই—আরে, ওই তো উঁচু পাঁচিল। ওইটেই নিশ্চয় ইউরেকা ফিলিম।

গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গেল প্যাংচাদা। বাইরে একটা মস্ত লোহার গেট—ভেতর থেকে বন্ধ। তার ওপরে বোর্ডে কী একটা নাম লেখা আছে—কিন্তু লতার ঝাড়ে নামটা পড়া যাচ্ছে না—দেখা যাচ্ছে কেবল তিনটে হরফ—এল, ইউ, এম।

● প্যাংচাদার 'হাহাকার'
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

এল-ইউ-এম ! লাম ! মানে ফিলাম। তার মানেই ফিলিম।

ক্যাবলা আপত্তি করলে, লাম ! লাম কেন হবে ? এফ-আই-এল্-এম্—ফিলম্ !

টেনিদা রেগে মেগে চিৎকার করে উঠল : সায়লেন্স্ ! আবার কুরুবকের মতো বক্ বক্ করছিস্ ? এই রইল গল্প—আমি চললুম।

প্রায় চলেই যাচ্ছিল, আমরা টেনে টুনে টেনিদাকে বসালুম। হাবুল বললে, ছাইড়্যা দ্যাও ক্যাব্লার কথা—চ্যাংড়া !

—চ্যাংড়া ! ফের ডিস্টার্ব করলে ট্যাংরা মাছ বানিয়ে দেব বলে রাখছি। হুঁঃ !

লোহার গেট বন্ধ দেখে প্যাংচাদা গোড়াতে তো খুব ঘাবড়ে গেল। ভাবলে, চন্দ্রবদন নির্ঘাত গুলপট্টি দিয়ে দিব্যি পরস্মৈপদী খেয়ে দেয়ে সটকান দিয়েছে। তারপর ভাবলে, অন্যদিকেও তো দরজা থাকতে পারে। দেখা যাক।

পাঁচিলের পাশ দিয়ে ঘুর ঘুর করছে—গেট-ফেট তো দেখা যাচ্ছে না। খুব দমে গেছে, এমন সময় হঠাৎ ভীষণ মোটা গলায় কে বললে, হু আর ইউ ?

প্যাংচাদা তাকিয়ে দেখলে পাঁচিলের ভেতর একটা ছোট ফুটো। তার মধ্যে কার দুটো জ্বলজ্বলে চোখ আর একজোড়া ধুমসো গোঁফ দেখা যাচ্ছে। সেই গোঁফের তলা থেকে আবার আওয়াজ এল : হু আর ইউ ?

প্যাংচাদা বললে, আমি—মানে আমাকে চন্দ্রবদনবাবু ফিলিমে পার্ট করতে ডেকেছিলেন। এইটেতে তো ইউরেকা ফিলিম ?

—ইউরেকা ফিলিম ?—গোঁফের তলা থেকে বিচ্ছিরি দাঁত বের করে কেমন খ্যাঁকখেকিয়ে হাসল লোকটা। তারপর বললে, আলবত ইউরেকা ফিলিম। পার্ট করবে ? ভেতরে চলে এসো।

—গেট যে বন্ধ। ঢুকব কী করে ?

—পাঁচিল টপকে এসো। ফিলিমে নামবে আর পাঁচিল টপকাতে পারবে না ?

প্যাংচাদা ভেবে দেখলে কথাটা ঠিক। ফিলিমের কারবারই আলাদা। দ্যাখ্না—বোঁ করে লোকে নল বেয়ে চারতলায় উঠে পড়ছে, ঝপাং করে পাঁচতলার থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ছে—একটা চলতি ট্রেন থেকে লাফিয়ে আর একটা ট্রেনে চলে যাচ্ছে। এসব না করতে পারলে ফিলিমে নামাবেই বা কেন ? প্যাংচাদা বুঝতে পারল, এখানে পাঁচিল টপকে ভেতরে যাওয়াই নিয়ম, ওইটেই প্রথম পরীক্ষা।

প্যাংচাদা কী আর করে ? দেওয়ালের খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে উঠতে চেষ্টা করতে লাগল। দু' পা ওঠে—আর সড়াক করে পিছলে পড়ে যায়। শখের সিল্কের পাঞ্জাবী ছিঁড়ল, গায়ের নুনছাল উঠে গেল, ঠিক নাকের ডগায় আবার কুট্টুস

● প্যাংচাদার 'হাহাকার'
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

করে একটা কাঠপিঁপড়ে কামড়ে দিলে। ভেতরে বোধ হয় আরো কিছু লোক জড়ো হয়েছে—তারা সমানে বলছে—হেঁইয়ো জোয়ান—আর একটু—আর একটু—

প্রাণ যায় যায়—কিন্তু হ্যাংচাদা হার মানবার পাত্তর নয়। একে বাগবাজারের ছেলে, তায় জনতার দৃশ্যে পার্ট করতে এসেছে। আধঘণ্টা ধস্তাধস্তি করে ঠিক উঠে গেল পাঁচিলের ওপর। বসে একটু দম নিতে যাচ্ছে, অমনি তলা থেকে কারা বললে, আয় রে আয়—চলে আয় দাদা—আয় রে আমার কুমড়োপটাশ—

আর বলেই হ্যাংচাদার পা ধরে হ্যাঁচকা টান। হ্যাংচাদা একেবারে ধপাস্ করে নিচে পড়ল। কুমড়োপটাশের মতোই।

কোমরে বেজায় চোট লেগেছিল, বাপ-রে মা-রে বলতে বলতে হ্যাংচাদা উঠে দাঁড়াল। দেখলে পাঁচিলে ঘেরা মস্ত জায়গাটা—সামনে খানিক মাঠের মতো—একটু দূরে একটা বড় বাড়ি, পাশেই একটা ছোট ডোবা—তাতে জল নেই, খানিক কাদা। আর তার সামনে পাঁচ সাত জন লোক দাঁড়িয়ে নানারকম মুখভঙ্গি করছে।

একজন একটা হুঁকো টানছে—তাতে কলকে-টলকে কিচ্ছুটি নেই। আর একজনের ছেঁড়া সাহেবী পোশাক—কিন্তু টুপির বদলে মাথায় একটা ভাঙা বালতি বসানো। একজনের গলায় ছেঁড়া জুতোর মালা। আর একজন—মুখে লম্বা লম্বা গোঁফদাড়ি—সমানে চেঁচিয়ে বলছেঃ 'কুকুর আসিয়া এমন কামড় দিল পথিকের পায়।' বলেই সে এমন ভাবে ঘ্যাক্ করে দৌড়ে এলো যে হ্যাংচাদাকে কামড়ে দেয় আর কি!

সেই সাহেবী পোশাক পরা লোকটা ধাঁ করে রদ্দা মেরে 'কুকুর আসিয়া এমন কামড়'কে দূরে সরিয়ে দিলে। তারপর বললে, বন্ধুগণ, আমাদের নতুন অভিনেতা এসে গেছেন। বেশ চেহারাটি। এঁকেই হিরো করা যাক—কেমন?

সকলে চেঁচিয়ে বললে, হিরো—আলবত হিরো।

হ্যাংচাদা প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিল। কিন্তু হিরো শুনেই চাঙ্গা হয়ে উঠল। বুঝল, সিনেমায় তো নানারকম পার্ট করতে হয়—তাই ওরা সব ওইরকম সেজেছে, যাকে বলে 'মেক আপ'। তারপর তাকেই হিরো করতে চায়! হ্যাংচাদা নাক আর কোমরের ব্যথা ভুলে একেবারে আকর্ণবিস্তৃত হাসি হাসল। বললে, তা আজ্ঞে হিরোর পার্টও আমি করতে পারব—পাড়ার থিয়েটারে দু'বার আমি হনুমান সেজেছিলুম। কিন্তু চন্দ্রবদনবাবু কোথায়?

সেই জুতোর মালাপরা লোকটা বললে, চন্দ্রবদন শ্বশুরবাড়ি গেছে—জামাইষষ্ঠীর নেমন্তন্ন খেতে। আমি হচ্ছি সূর্যবদন—ডিরেকটার!

● হ্যাংচাদার 'হাহাকার'
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বাবতি মাথায় লোকটা তাকে ধাঁই করে এক চাঁটি দিলে : ইউ ব্লাডি নিগার' তুই ডিরেকটার কিরে? তুই তো একটা হুঁকোবর্দার। আমি হচ্ছি ডিরেকটার—আমার নাম হচ্ছে তারাবদন।

সূর্যবদন চাঁটি খেয়ে বিড়বিড় করতে লাগল। আর যে-লোকটা কামড়াতে এসেছিল, সে সমানে বলতে লাগল :

"সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
আজি কি সুন্দর নিশি পূর্ণিমা উদয়
একা নদী পাড়ে ছানা আমগাছে চড়ে
মহৎ যে হয় তার সাধু ব্যবহার—"

তারাবদন ধমক দিয়ে বললে, চুপ! এখন রিহার্সেল হবে। তারপর হিরো বাবু—তোমার নাম কি?

প্যাংচাদা বললে, আমার ভালো নাম বিষ্ণুচরণ—ডাক নাম প্যাংচা।

—প্যাংচা! আহা—খাসা নাম! শুনলেই খিদে পায়।—তারপর ফিস্‌ফিসিয়ে বললে, জানো—আমার ডাক নাম চমচম!

প্যাংচাদা বলতে যাচ্ছে, তাই নাকি—হঠাৎ তারাবদন—মানে চমচম চেঁচিয়ে উঠল : কোয়ায়েট্! সব চুপ। রিহার্সেল হবে। মিস্টার প্যাংচা—

প্যাংচাদা বললে, আজ্ঞে?

—এক পা তুলে দাঁড়াও।

প্যাংচাদা তাই করলে।

—এবার দু' পা তুলে দাঁড়াও।

প্যাংচাদা ভেবড়ে গিয়ে বললে, আজ্ঞে দু' পা তুলে কি—

বলতেই তারাবদন চটাস্ করে একটা চাঁটি বসিয়ে দিলে প্যাংচাদার গালে। বললে, রে বর্বর, স্তব্ধ করো মুখর ভাষণ! যা বলছি তাই করো। ফিলিমে পার্ট করতে এসেছে—দু'পা তুলে দাঁড়াতে পারবে না! এয়ার্কী নাকি?

চাঁটি খেয়ে প্যাংচাদার তো মাথা ঘুরে গেছে। কাঁউমাউ করে দু' পা তুলে দাঁড়াতে গেল। আর যেই দু' পা তুলতে গেল, অমনি ধপাত করে পড়ে গেল মাটিতে।

সবাই চেঁচিয়ে উঠল : শেম—শেম—পড়ে গেলি! ফাই—ফাই!

প্যাংচাদা ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে গেল। ফিল্মে নামতে গেলে নিশ্চয় দু' পা তুলে দাঁড়াতে হয়—কিন্তু কী করে যে সেটা পারা যায় কিছুতেই ভেবে পেলো না।

● প্যাংচাদার 'হাহাকার'
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

তারাবদন হ্যাংচাদার ঝুল্‌পি ধরে এমন হ্যাঁচকা মারল যে তড়বড়িয়ে লাফিয়ে উঠতে হল বেচারীকে। তারপর তারাবদন বললে, এবার গান করো।

—কী গান গাইব ?

—যে গান খুশি। বেশ উপদেশপূর্ণ গান।

হ্যাংচাদা একেবারে গাইতে পারে না—বুঝলি ? মানে আমাদের প্যালার চাইতেও যাচ্ছেতাই গান গায়—একবার রাস্তায় যেতে যেতে এমন তান ছেড়েছিল যে শুনে একটা কাবলীওলা আচমকা আঁতকে উঠে ড্রেনের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু হিরো হওয়ার আনন্দে সেই হ্যাংচাদাই ভীমসেনী গলায় গান ধরল :

'ভুবন নামেতে ব্যাদ্‌ড়া বালক
তার ছিল এক মাসী—
ভুবনের দোষ দেখে দেখিত না
সে মাসী সর্বনাশী—'

এইটুকু কেবল গেয়েছে—হঠাৎ সবাই চেঁচিয়ে উঠল : স্টপ—স্টপ—আর গান না।

তারাবদন বললে, না—আর গান না। এবার নাচো—

—নাচব ?

—নিশ্চয় নাচবে।

—আমি তো নাচতে জানিনে।

—নাচতে জানো না—হিরো হতে এসেছ ? মামাবাড়ির আবদার পেয়েছো—না ?—বলেই কড়াৎ করে হ্যাংচাদার ঝুল্‌পিতে আর এক টান।

গেলুম গেলুম—বলে হ্যাংচাদা নাচতে লাগল। মানে ঠিক নাচ নয়—লাফাতে লাগল ব্যথার চোটে।

সকলে বললে, এন্‌কোর—এন্‌কোর !

যেই এন্‌কোর বলা—অমনি তারাবদন আর একটা পেল্লায় টান দিয়েছে হ্যাংচাদার ঝুল্‌পিতে ! 'পিসিমা গো গেছি'—বলে হ্যাংচাদা এবার এমন নাচতে লাগল যে তার কাছে কোথায় লাগে তোদের উদয়শংকর !

তারাবদন বললে, রাইট। ও-কে। কাট্‌ !

কাট্‌ ! কাকে কাটবে ? হ্যাংচাদা ভয় পেয়ে যেই থমকে গেছে অমনি তারাবদন বললে, এবার তা হলে সন্তরণের দৃশ্য। কী বলো বন্ধুগণ ?

সঙ্গে সঙ্গে সকলে চেঁচিয়ে বললে, ঠিক—এবারে সন্তরণের দৃশ্য !

● হ্যাংচাদার 'হাহাকার'
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

হ্যাংচাদা 'আরে আরে—করছ কি—' বলতে বলতে সবাই ওকে চ্যাংদোলা করে তুলে ফেলল। তারপর চক্ষের পলকে নিয়ে ছুড়ে ফেললে সেই ডোবাটার ভেতরে!

কাদা মেখে ভূত হয়ে উঠতে যাচ্ছে—সবাই আবার ঠেলে ডোবার মধ্যে ফেলে দিলে। বলতে লাগল: সন্তরণ—সন্তরণ!

আর সন্তরণ! হ্যাংচাদার তখন প্রাণ যাওয়ার জো। সারা গা—জামাকাপড় কাদায় একাকার—নাকে মুখে দুর্গন্ধ পচা পাঁক ঢুকে গেছে, আর বিছুটির মতো সে কি জ্বলুনি! হ্যাংচাদা যেমনি উঠতে চায় অমনি সবাই তক্ষুনি তাকে ডোবায় ফেলে দেয়। আর চ্যাঁচাতে থাকে: সন্তরণ—সন্তরণ—



গেলুম গেলুম—বলে হ্যাংচাদা নাচতে লাগল। [পৃষ্ঠা ৩৪৩

শেষে হ্যাংচাদা আকাশ ফাটিয়ে হাহাকার করতে লাগল—মানে 'হাহাকার' ফিলিমে পার্ট করতে এসেছিল কিনা: বাঁচাও—বাঁচাও—আমাকে মেরে ফেললে—আমি আর ফিলিমে পার্ট করব না—কক্ষনো না—

প্রাণ যখন যাবার দাখিল তখন কোত্থেকে তিন চারজন খাকী শার্ট প্যান্ট্ পরা লোক লাঠি হাতে দৌড়ে এল সেদিকে। আর তক্ষুনি তারাবদনের দল একেবারে হাওয়া!

● হ্যাংচাদার 'হাহাকার'
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ন্যাংচাদার তখন প্রায় নাভিশ্বাস। খাকীপরা লোকগুলো তাকে পাঁক থেকে টেনে তুলে কিছুক্ষণ হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে রইল। শেষে বললে, ক্যা তাজ্জব! ই নৌতুন পাগলা ফের্ কাঁহাসে আসলো?

ব্যাপার বুঝলি? আরে—ওটা মোটেই ফিলিম স্টুডিয়ো নয়—লাম—মানে লুনাটিক অ্যাসাইলাম—অর্থাৎ কিনা পাগলা গারদ। উঁচু পাঁচিল আর 'লাম' দেখেই ন্যাংচাদার বুদ্ধি তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল। সাধে কি আর আই-এতে সব সাব্জেক্টে ফেল হয়! ফিলিম স্টুডিয়োটা কাছাকাছি আর কোথাও ছিল হয়তো।

ন্যাংচাদা কী করে বাড়ি ফিরল সে আর শুনে কাজ নেই। কিন্তু সেই থেকে আজো ন্যাংচাদা নেংচে নেংচে হাঁটে—আর সিনেমা হাউসের সামনে এলেই চোখ বুজে করুণ গলায় গাইতে থাকে: 'দীনবন্ধু, কৃপাসিন্ধু—'



ক্যা তাজ্জব! ই নৌতুন পাগলা ফের কাঁহাসে আসলো?

টেনিদা থামল। আমার ঝাল-নুনের শিশি ততক্ষণে সাফ।

হাত চাটতে চাটতে বললে, তাই বলছিলুম, তোর গোবরবাবুকে এক্ষুনি বারণ করে দে। আরে—আসলে ফিলিম স্টুডিয়োগুলোও এমনি পাগলা গারদ—গোবর-বাবুকে স্রেফ্ ঘুঁটেচন্দর বানিয়ে ছেড়ে দেবে!

বেঁটে বাঁটুলের বুদ্ধি



—শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

অনেকদিন আগেকার কথা, বক্রেশ্বরপুর গ্রামে ভোজনেশ্বর ভট্টাচার্য বলে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। পাড়াপ্রতিবাসীরা তাঁকে ডাকতো ভজু ভট্চায্যি বলে।

তাঁর এই নাম হওয়ার একটা ইতিহাস আছে। তিনি ভোজন করতে পারতেন অসম্ভব। বিদ্যেবুদ্ধি তেমন ছিল না বলে তাঁকে দিয়ে কোন কাজ চলতো না—শুধু ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় তাঁর ডাক পড়তো। শ্রাদ্ধশান্তি, বিবাহ, উপনয়ন হলেই লোকের বাড়ি তাঁর নেমন্তন্ন ছিল বাঁধা, আর তিনি সেখানে এসে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ক্রমাগত মুখ চালিয়ে যেতেন।

বিশ গণ্ডা লুচি, আশিটা পান্তুয়া, ছ' হাঁড়ি দই তাঁর মুখের মধ্যে সেঁধুলে নিমেষে যে কেমন করে উপে যেত তার ঠিক পাওয়া অসম্ভব ছিল। যে-মানুষ এত খায় ভগবানও বোধ হয়

তার অত খাবার যোগাড় করে দিতে পারেন না। তবু এক সদাশয় দাতা ভট্‌চাযি্য মশায়ের প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রত্যহ আধমণ সিধে পাঠিয়ে দিতেন ওঁর বাড়ি, কিন্তু তাতেও তাঁর কুলোতো না।

অনেকগুলি ছেলেপুলে থাকায় ভট্‌চাযি্য মশাইকে আধপেটা থাকতে হ'ত বহুদিন—ফলে ছেলেপুলেকে তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। সংসারে তাই নিয়ে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে নিত্য অশান্তি লেগে থাকতো।

ছেলেও একটি আধটি নয়—সাত-সাতটি। কাবুলেশ্বর, গাবুলেশ্বর, তাবুলেশ্বর, হাবুলেশ্বর, টাবুলেশ্বর, ভাবুলেশ্বর ও বাঁটুলেশ্বর। ছেলেদের লেখাপড়ার বন্দোবস্ত করা কিংবা তাদের খাইয়ে দাইয়ে মানুষ করার ক্ষমতা বাপের ছিল না—তার ফলে ওরা পাড়া চষে বেড়াতো।

কারুর গাছে আঁব, ডাব, কিচ্ছু থাকবার জো নেই। কখন রাতের অন্ধকারে, কিংবা নির্জ্জন দুপুরে সপ্তরথী গিয়ে কার বাগানের ফল-পাকুড় যে আত্মসাৎ করে আসবে তার ঠিক নেই।

বাড়িতে তাদের বাবার কাছে নালিশ আর নালিশ। ভট্‌চাযি্যমশাই মাঝে মাঝে ক্ষেপে গিয়ে প্রত্যেককে বেদম পিটতেন। ছেলেগুলো মিচ্‌কে মেরে তখনকার মত চুপচাপ মার হজম করতো, তারপর বাবার বরাদ্দ আধমণি রসদ পথের মাঝ থেকে অর্দ্ধেকের উপর বেমালুম সরে যেত।

লুটের কেরামতি ছিল। যখন ঝুড়ি করে তাঁর জন্যে খাবার আসতো, তখন ছেলেগুলো এক একটা গাছে কায়দা করে এমন বসে থাকতো যে যারা জিনিস বয়ে আনতো তারা টেরও পেত না কি করে পুরো মাল সিকিতে দাঁড়িয়ে গেল।

কিছুদিন পরে অবশ্য আসল ব্যাপারটা টের পাওয়া গেল—ভট্‌চাযি্যমশাই তখন একটা চেলা কাঠ এনে তাদের পিটুতে লাগলেন। অবশেষে তাঁর গিন্নী ছুটে এসে খিঁচিয়ে বললেন, ওদের দোষ কি? বাপ হয়ে ওদের খেতে দিতে পার না, ওরা লুকিয়ে চুরিয়ে খাবে না তো কি করবে?

ভট্‌চাযি্যমশাই চিৎকার করে বলে উঠলেন, তা বলে চুরি করবে?

তাঁর গিন্নী সমান চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, নিশ্চয় করবে! খাওয়াবার মুরোদ নেই, লেখাপড়া শেখাবার মুরোদ নেই, শুধু নিজের ভুঁড়ি ছাড়া যার বুদ্ধিতে এতটুকু ঘি নেই—তার ছেলেরা চোর-ডাকাত হবে না তো কি হবে? বেশ করেছে খেয়েছে! খবরদার ওদের গায়ে হাত তুলবে না বলে দিচ্ছি!

ভট্‌চাযি্যমশাই রাগে গজগজ করতে করতে তখনকার মত বেরিয়ে গেলেন—তারপর রান্তিরে আধপেটা খেয়ে রাগ আরও বাড়লো—ভাবলেন, ছেলেগুলোকে কৌশলে বাড়ি থেকে তাড়াতে হবে। কি কৌশল করবেন সেটাও ঠিক করে ফেললেন।

● বেটে বাঁটুলের বুদ্ধি
শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

পরের দিন সকালে উঠে ছেলেদের বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুব মিষ্টি করে বললেন, ওরে শোন্, তোদের খাওয়াদাওয়ার জন্যে খুব ভাল ব্যবস্থা করেছি। দশ-বার ক্রোশ দূরে "খাইখাইপুর" বলে একটা জায়গা আছে—সেখানে যদি তোরা যাস্ তাহলে খুব উত্তম-মধ্যম খেতে পারবি—যাস্ তো বল্, আমি তোদের নিয়ে যাই। কিন্তু খবরদার মাকে এসব কথা বলিসনি যেন—তাহলেই আর যেতে দেবে না।

সকলে তখুনি সেখানে যাবার জন্যে নেচে উঠল, কিন্তু সবচেয়ে ছোট বাঁটুল কোনো কথা বললে না। সে ভাবলে,—নিশ্চয়ই তার বাবার অন্য কিছু মতলব আছে। বাঁটুল সব্বার ছোট, তার ওপর বেঁটে—মাত্র হাতখানেকের বেশী সে বার বছর বয়েস পর্যন্ত বাড়েনি, কিন্তু বুদ্ধি অসাধারণ। তাছাড়া বাঁটুল গোপনে পাঠশালার ঢিবির নীচে বসে গুরুমশাইদের পড়া শেখানো শুনে শুনে অনেক কিছু শিখে নিয়েছিল। তাই উত্তম-মধ্যম ব্যাপারটা যে ঠেঙানি সেটা সে বুঝতে পারলে। ইচ্ছে করলে সে না যেতে পারতো, কিন্তু ভাইগুলোর ওপর তার টান থাকায় সেও যেতে রাজী হয়ে গেল।

বাপ চলেছে এগিয়ে, পেছনে সাত ছেলে যাচ্ছে। গাঁয়ের বাইরে এর আগে কখনও ওরা যায়নি—নতুন নতুন পথঘাট গাছপালা দেখতে দেখতে চলেছে, মন ভারী খুশী। এঁকেবেঁকে গাঁয়ের মেঠো পথ পার হয়ে, বনবাদাড় ঝোপঝাড় পেরিয়ে তারা এক তেপান্তরের মাঠে এসে পড়ল। তখন ঠিক দুপুর—রীতিমত ক্ষিদে পেয়েছে সবায়ের কিন্তু ভটচাযিমশাই কেবল বলছেন, আর একটু পা চালিয়ে চল্ না, তারপর খাইখাইপুরে গেলে খেতে খেতে পেট ফেটে যাবে। এই রকম নানা কথা বলতে বলতে বিকেল নাগাদ একটা নিবিড় বনের মধ্যে ছেলেগুলোকে নিয়ে এলেন।

বাঁটুল আর হাঁটতে পারে না—মায়ের জন্যে তার মন যেন খুব কেমন কেমন করতে লাগলো, তার ওপর বাবার এই জুলুম সে বরদাস্ত করতে পারলে না, বললে—বাবা, আর নয় এইবার বাড়ি ফিরে চল, আর খাইখাইপুরে গিয়ে দরকার নেই—ক্ষিদের চোটে এখুনি মাথা বাঁইবাঁই করে ঘুরছে।

বাবা খিঁচিয়ে উঠে বললেন, চুপ্ কর বাঁদর, চালাকি করলে এখনি দেখিয়ে দোব মজা।

সকলে কিন্তু বাপের ধমকানিতে ভয় পেল না—তারা আর এগোবে না বলে বিদ্রোহ করে বসে পড়লো। তখন এই তক্কে ভটচাযিমশাইও রাগ দেখিয়ে কোথায় যে সরে পড়লেন তার হদিস পেলে না তারা।

ওদিকে সন্ধ্যে হয়ে আসছে, পথঘাট কারুরই জানা নেই, সেখানে দাঁড়িয়ে কেঁদেই বা কি

● বেঁটে বাঁটুলের বুদ্ধি
শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

হবে? সকলে তো ভয়েই অস্থির! তখন বাটুল ভায়েদের আশ্বাস দিয়ে বললে, তোরা ভয় পাস্‌নি, দাঁড়া, আমি এই উঁচু গাছের একদম মগডালে উঠে দেখি, কোথাও কারুর বাড়িঘর আছে কিনা।

এই বলে সে তর্‌তর্‌ ক'রে কাঠবেড়ালীর মত একটা গাছে উঠে গেল। সেখানে উঠে দেখলে চারিধারে শুধু ঘন বন কিন্তু তারই ভেতরে এক জায়গায় একটা মস্ত সাদা বাড়ির চূড়ো যেন দেখা যাচ্ছে—সম্ভবতঃ কারুর বাড়ি হবে এবং আধ ক্রোশ হাঁটলেই সেখানে পৌঁছানো যাবে।

তাড়াতাড়ি সে কোন্‌দিক বরাবর এগিয়ে যাবে তাই ঠিক করে নিয়ে গাছ থেকে নেমে ভায়েদের বললে, চল্‌, একটা আস্তানার সন্ধান পেয়েছি, আমায় তোরা কাঁধে নিয়ে চল্‌—ওখানেই রাতটা কাটাবো।

বাটুলের কথা শেষ হতে না হতে গাবুল তাকে কাঁধে চাপিয়ে নিলে এবং তার নির্দেশমত সবাই পরস্পরের কাঁধ ধরে, সেই বাড়ির সামনে ঠিক সন্ধ্যে হবার মুখেই এসে পড়ল।

প্রকাণ্ড বাড়ি—মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরী কিন্তু সামনে কোন লোকজন নেই। বাড়ির মধ্যে তখন সন্ধ্যে হয়ে যেতে বড় বড় ঝাড়লণ্ঠন জ্বলে উঠেছে। সামনে উঠোনের পাশ দিয়ে প্রকাণ্ড একটা সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে—কিন্তু লোকজন কেউ কোথাও নেই।

বাটুল বললে, আমায় কাঁধ থেকে নামা, আমি আগে আগে যাই তোরা আমার পেছনে পেছনে আয়। বাটুলের নির্দেশমতই কাজ চললো। বাটুল ওপরে গিয়ে দেখলে একটা ঘর থেকে নানা রঙীন আলো বেরুচ্ছে। হীরে, জহরত, মণি, মুক্তো দিয়ে ঘরটা মোড়া—আর সেইখানে একটা সোনার খাটে শুয়ে আছে এক সুন্দরী রাজকন্যে।

হঠাৎ বাটুল আর তার ভায়েদের দেখে সে বিছানার ওপর উঠে বসলো, চোখ দুটো বড় বড় ক'রে বললে, কী সর্বনাশ! তোমরা কারা? এখানে এসেছ কেন?

বাটুল খাটের একটা খুরোর কাছে দাঁড়িয়ে বলে উঠল—আমরা খাইখাইপুরে যাব বলে এখানে এসেছি—এখানে নাকি খুব খাওয়াদাওয়া পাওয়া যায়।

অতটুকু একহাত ছেলেকে দেখে আর তার কথা শুনে রাজকুমারীর দুঃখের মধ্যেও হাসি এল—কারণ এত বেঁটে সে আগে আর কোথাও দেখেনি। তাকে চট্‌ করে দু'হাত দিয়ে খাটের ওপর তুলে নিয়ে সে হাসি হাসি মুখে তাকে খানিকটা দেখে তারপর গম্ভীরভাবে বললে, তোমরা খাইখাইপুরেই এসেছ ঠিক, কিন্তু এখানে যে সবাই মানুষ খায়। এটা একটা প্রকাণ্ড রাক্ষস রাজার বাড়ি—

এর কাছাকাছি কোন মানুষ এলে সে টপ্ ক'রে তাকে মুখে পুরে ফেলে—তাই এ জায়গাটার নাম খাইখাইপুর।

বাঁটুল গম্ভীর হয়ে বললে, তাই নাকি?

রাজকুমারী বললে, হ্যাঁ।

ওদিকে রাজকুমারীর কথা শুনে বাঁটুলের ছয় ভাই কাঁদতে শুরু করে দিলে। রাজকুমারী তাড়াতাড়ি বললে, চুপ চুপ কেঁদো না, তোমরা বরং পালাও এখুনি—না হলে আর খানিকটা বাদেই রাক্ষস এসে পড়বে।

বাঁটুল বললে, পালাব কোথায়? এই রাত্তিরে তো বাইরে গেলে বাঘে খাবে—তার চেয়ে এখানেই যা হবার হোক।

রাজকুমারী সে কথা শুনে চুপ করে রইল। তারপর বাঁটুল বললে, আচ্ছা, তুমি তো মানুষ, তুমি এখানে এলে কি করে আর তোমাকে রাক্ষস খাচ্ছে নাই বা কেন?

রাজকুমারী ম্লানমুখে বললে যে, সে এক রাজার মেয়ে, তারা ছয় বোন। এই রাক্ষস তার ছয় ছেলের সঙ্গে তাদের ছয় বোনের বিয়ে দিতে চেয়েছিল। তাতে রাজা রাজী হননি বলে রাক্ষস খুব চটে গিয়েছিল। তারপর একদিন রাজকুমারী যখন বাগানে একা ফুল তুলছিল সেই সময় ও তাকে চুরি করে নিয়ে আসে।

বাঁটুল জিজ্ঞাসা করলে, তোমার সঙ্গে রাক্ষসের ছেলের বিয়ে হয়ে গেছে?

রাজকুমারী বললে, না। রাক্ষস বলেছে সে আমার আরও পাঁচটি বোনকে নিয়ে আসবে, তারপর একসঙ্গে ছয় ছেলের বিয়ে দেবে।

বাঁটুল প্রশ্ন করলে, ছেলেগুলো সব কোথায়?

রাজকুমারী বললে, ছেলেগুলো সন্ধ্যে হতে না হতেই খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে—তারা এখন ঘুমুচ্ছে। ভীষণ ঘুম তাদের—তা না হলে এতক্ষণ বাড়ি মাথায় ক'রে তারা চিৎকার করতো। সারাদিনে আজ তারা দুটো গণ্ডার আর চারটে বাঘ মেরে তাদের মাংসের ঝোল খেয়ে এখন নাক ডাকাচ্ছে—কালকে আবার ভোরে উঠবে।

ওঃ বাবা!—কিন্তু আমাদেরও যে খিদে পেয়েছে বেজায়। তবে গণ্ডারের চচ্চড়ি বাঘের ঝোল তো খেতে পারবো না।

রাজকুমারী বললে, না না, সে-সব খেতে হবে না তোমাদের। আমার জন্যে রাক্ষসরা রোজ মিষ্টি নিয়ে আসে—তা কি তোমরা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে পারবে? আমার খাটের তলায় পাঁচ থালা বড় সন্দেশ, তিন গামলা রাজভোগ আর চার গামলা পান্তুয়া আছে—খাও তো নাও।

● বেঁটে বাঁটুলের বুদ্ধি
শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

রাজকুমারীর মুখের কথা সরতে না সরতে অর্ধেক জিনিস ততক্ষণে ওদের পেটে চলে গেল। রাক্ষসের খাওয়ার চেয়ে সে কিছু কম নয়! রাজকুমারী তো হাঁ। এরাও তো দেখছি ক্ষুদে রাক্ষস, মনে মনে ভাবতে লাগল রাজকুমারী।

যাই হোক, তাড়াতাড়ি খেয়ে হাত ধুয়ে তারা কোথায় লুকোবে ভাবছে ইতিমধ্যে রাক্ষসরাজার হাঁকডাক শোনা গেল। সে আওয়াজ শুনলে মনে হয় যেন কেউ কানের কাছে কামান দাগছে।

রাজকুমারী মহাবিপদ দেখে তাড়াতাড়ি তাদের খাটের তলায় লুকিয়ে থাকতে বললে। তারা লুকোবার জন্যে সবাই সড়াক করে সেখানে যেই ঢুকেছে সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতর রাক্ষস এসে হাজির।

রাজকুমারীকে দেখেই সে একগাল হেসে বলে উঠল, কিরে এখনও তুই জেগে আছিস দেখছি—খোকারা কোথায়?

তারা এখন উত্তরের ঘরে ঘুমুচ্ছে বাবা, রাজকুমারী বলে উঠল।

হুম্!—দুটো মরা জলহস্তী হাতে ঝুলিয়ে রাক্ষস ঘরে ঢুকেছিল, সেগুলোকে দেখিয়ে বললে, এইগুলো আমি ছোট ছোট করে কেটে দিচ্ছি, তুই একটু আগুনে সেঁকে দে। এই বলেই সে একটা পাথরের উঁচু আসনে বসে খাপ থেকে তরোয়াল বার করে কচ্ কচ্ ক'রে কাটতে শুরু ক'রে দিলে।

রাজকুমারী কোনমতে সেই এক একটা দশসেরি মাংসের টুকরো নিয়ে গিয়ে রান্নাঘর থেকে ঝলসে নিয়ে আসে আর রাক্ষস তার হাড়গোড় সমেত কড়মড় করে চিবিয়ে খেতে থাকে। তার শব্দ কী!—মনে হয় যেন খোয়ার ওপর দিয়ে লোহার চাকাওয়ালা ডগো গাড়ি চলছে।

খাটের তলায় ছেলেগুলো ভয়ে অস্থির। হঠাৎ রাক্ষসের মনে হ'ল রাজকন্যের খাটের তলায় খস্ ক'রে কে যেন নড়ে উঠল।

—ওখানে কে নড়ে রে? বলেই রাক্ষস চট করে এগিয়ে গিয়ে দেখে গাবুলেশ্বর পা গুটিয়ে নিচ্ছে। আর যায় কোথা? হিড়্ হিড়্ ক'রে রাক্ষস সব ক'টাকে খাটের তলা থেকে টেনে বার করলে, কেবল বাঁটুলকে দেখতে পেলে না। বাঁটুলেশ্বর খাটের পায়ার পাশে দেওয়ালের দিকে সেঁটে রইল। একহাত বেঁটে হওয়ায় তার লুকোবার সুবিধেও ছিল খুব। সে বেঁচে গেল।

এরা ছ'টা ভাই ঠ্যাং ধরে টানাতেই জ্ঞান হারিয়েছে। রাক্ষস কটমট করে রাজকুমারীর দিকে চেয়ে বললে, এরা কোত্থেকে এল রে?

রাজকুমারী হেসে বললে, ওরা পথ ভুলে এখানে এসে পড়েছিল বাবা, আমি আপনার খোকাদের জন্যে ওদের লুকিয়ে রেখেছিলুম।

● বেঁটে বাঁটুলের বুদ্ধি
শ্রীধীরেন্দ্র জন

জিভটা ঠোঁট দিয়ে চেটে রাক্ষসরাজ বলে উঠল, খোকাদের খাবারের জন্যে রেখে দিয়েছিস্, ভাল। তার আগে আমি দু'একটাকে চেখে দেখি—অনেকদিন কচি মানুষের মাংস খাইনি, ভারী লোভ হচ্ছে রে!

রাজকুমারী সে কথা শুনে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না বাবা, দেখছেন না ওরা কি রকম রোগা, দু'চারদিন খাইয়ে দাইয়ে মোটা-সোটা করে খেলে ভাল হয় না?

রাক্ষস একটু ভেবে ভুরু কুঁচকে বলে উঠল, তা মন্দ বলিস্নি, তবে পেটগুলো তো বেশ মোটা দেখছি।

পেটগুলি যে সত্য সন্দেশ রসগোল্লা ঠাসা হয়ে মুটিয়েছে সে কথা তো আর রাক্ষসকে বলা যায় না। রাজকুমারী নানারকমে বুঝিয়ে তখনকার মত রাক্ষসকে ঠাণ্ডা করলে। অবশ্য দুটো জলহস্তী খেয়ে রাক্ষসেরও পেটটা ভর্তি ছিল এই যা রক্ষে।

রাক্ষস শেষে বললে, আচ্ছা তাহলে ওদের নড়া ধরে ধরে এখন দক্ষিণের ঘরে টেনে নিয়ে যা—কালকে ছেলেদের সঙ্গে মতলব ঠিক করে যা হোক করা যাবে।

বলামাত্র রাজকুমারী একরকম হিড়্ হিড়্ করে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে ছেলে-গুলোকে টেনে নিয়ে গেল। উত্তরের ঘরে একটা পালঙ্কের ওপর শুইয়ে কম্বল ঢাকা দিয়ে ফিরে এল।

রাক্ষস জিজ্ঞেস করলে, কোন্ ঘরে ওদের শোয়ালি?

রাজকুমারী বললে, দক্ষিণের ঘরে বাবা।

রাক্ষস বললে, ঠিক আছে—আমি এবার পাশের ঘরে শুতে যাচ্ছি—তুইও শুয়ে পড়।



অনেকদিন কচি মানুষের মাংস খাইনি, ভারী লোভ হচ্ছে রে।

● বেঁটে বাটুলের বুদ্ধি
শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর





অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু :—চারিদিকে দেব দেউলের শাঁখ বেজে মঙ্গলধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে—ধূপধুনায় এবং সম্পূর্ণ ভারতীয় মাঙ্গলিকী পরিবেশে বাংলার কু
থেকে বেরিয়ে আসেন ইন্দ্রজালের ইন্দ্রধনুস্রষ্টা বাঙ্গালীর জাদুসম্রাট্ পি. সি. সরকার।

রাজকুমারী শুয়ে পড়ার ভান করলে, রাক্ষসও দুম্ দুম্ করে পা ফেলে নিজের ঘরে চলে গেল। কিছুক্ষণ চুপচাপ। বাঁটুল সেই ফাঁকে খাটের পায়া বেয়ে রাজকুমারীর বিছানার ওপর উঠে ফিস্ ফিস্ করে বলে উঠল, কি গো, রাক্ষস তো ঘুমুতে গেল, আমরা তাহলে এবার পালাব?

রাজকুমারী ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, না না, শিগ্‌গির লুকোও—এখনও সে ঘুমোয়নি। যখন ঝড়ের মত নাক ডাকবে তখন জানবে সে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। সে ঘুম কুম্ভকর্ণের মত—কাল দুপুরে ভাঙবে। এখন লুকোও।

বাঁটুল চট্ করে আবার স্ব-স্থানে নেমে পড়ল।

ওদিকে রাক্ষস ঠিক নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারছিল না, কত ভাবনাই না মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগলো তার—হাজার হোক, ওরা মানুষ তো বটে, রাজকুমারীকে নিয়ে যদি পালায়! অতএব ওদের আর বাঁচিয়ে রাখা ঠিক হবে না—সাবড়েই দিয়ে আসি, নইলে ঘুম হবে না। এই ভেবে তরোয়াল নিয়ে সে রাজকুমারীর কথামত দক্ষিণ ঘরের দিকে চলে গেল।

অন্ধকারে ঘরে ঢুকে ঠিক ঠাওর করতে না পেরে সে নিজের ছেলেগুলোর গলাতেই কোপ দিয়ে চলে এল—তারা একটা কোঁক্ করে শব্দও করতে পারলে না। দূর থেকে রাজকুমারী শুধু গোটা ছ'য়েক তরোয়ালের ঘা পড়লো শুনতে পেলে।

শত্রুদের সাবাড় করে দিয়েছে ভেবে বেশ নিশ্চিন্ত মনে বিছানার পাশে তরোয়াল আর ভোজালি রেখে রাক্ষস শুয়ে পড়লো। রাজকুমারী বুঝলে যে রাক্ষস যখন দুম্ দুম্ করে দক্ষিণের ঘরের দিকে গেছে, তখনই সে একটা কাণ্ড করে বসে আছে। সে চুপ করে পড়ে রইল।

খানিক পরেই শুরু হল ঝড়—নাকের ডাক শুনে মনে হল যেন কেউ শিঙে ফুঁকছে। বাঁটুল বুঝলে রাক্ষস ঘুমিয়েছে। সে তাড়াতাড়ি আবার রাজকুমারীর কাছে এসে বললে, এইবার পালাবো?

রাজকুমারী ভয়ে ভয়ে বললে, হ্যাঁ, পালাও! তবে আমাকে রাক্ষস কাল কেটে ফেলবে। কারণ, আমার মনে হয় সে অন্ধকারে তার নিজের ছেলেদেরই কেটে রেখে এসেছে।

এ্যাঁ!—তুমি ঠিক জান?—বাঁটুল জিজ্ঞেস করলে।

রাজকুমারী বললে, হ্যাঁ, আমি তরোয়ালের ঘা পড়তে শুনেছি।

বাঁটুল বললে, তাহলে তো পালানো হবে না। তোমায় এভাবে ছেড়েই বা যাই কি করে?

রাজকুমারী বললে, এ ছাড়া উপায় কি বল। তুমি তো এইটুকু ছেলে, ওকে তো কিছু করতে পারবে না।

বাঁটুল বললে, বটে! আমি রাক্ষসকে ঠিক মারবো! এই বলেই সে পাইপাই করে পাশের ঘরে ঢুকে পড়লো। কিন্তু সে-ঘরে ঢুকে দাঁড়াবে কার সাধ্যি!

● বেঁটে বাঁটুলের বুদ্ধি
শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

প্রকাণ্ড আর উঁচু এক খাটিয়ার উপর রাক্ষস নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে, তার আওয়াজ কত রকম। আর নিঃশ্বেস ছাড়ছে মুখ দিয়ে। ফর্‌-র্‌-র্‌—ফ্রথ্‌—ফর্‌র্‌ করে ঝড়ের হাওয়া বেরিয়ে আসছে। সেখানে দাঁড়াবে কার সাধ্যি!

মনে হচ্ছে শ' দুয়েক মোষ ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে ঢুঁ মেরে নাকের মধ্যে তেড়ে ঢুকে গেল, তারপরই একসঙ্গে আবার দল বেঁধে বাইরে এসে দেওয়ালে ঢুঁ মারলে। ঘরের আসবাবগুলো নিঃশ্বেস টানার সঙ্গে সঙ্গে একবার কাত হয়ে পড়ি পড়ি করছে, আবার ঠেলা খেয়ে ঠিক দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।



ভোজালির বাটটি প্রাণপণ শক্তিতে দু'হাতে চেপে ধরে রইল বাঁটুল।

বাঁটুল পায়া বেয়ে উঠে কোনমতে রাক্ষসের মাথার কাছে উঠলো। কিন্তু মাথা কি তার কম উঁচু?—গোটা দশেক বাঁটুল কাঁধে কাঁধে চড়লে তবে তার চাঁদিটা দেখতে পেত হয়তো।

তবু দুর্দান্ত সাহসের সঙ্গে সে এগিয়ে গেল কাছে। দেখলে বিছানার পাশে একটা ভোজালি পড়ে আছে। দু'হাতের মুঠোয় সেটাকে সে চেপে ধরলে, কিন্তু নিজের গায়ের জোরে রাক্ষসের বুকে ভোজালি চালিয়েও তো সে কিছু করতে পারবে না। অথচ একে না মারলে সর্বনাশ! যেন তেন প্রকারে এর দফা নিকেশ করা চাইই।

হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল, ভাবলে কোনমতে যদি ওর নাকের মধ্যে এই ভোজালি চালিয়ে দিতে পারি তাহলেই কম্ম কতে। এই ভেবে সে যেমন নাকের ধারে গেছে, অমনি রাক্ষস নিঃশ্বেস ছাড়লে আর বাঁটুল তার ধাক্কায় বিশ হাত দূরে এক দেওয়ালে ছিট্‌কে পড়ে মাথায় আব গজিয়ে ফেললে।

● বেঁটে বাঁটুলের বুদ্ধি
শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

মাথা ঝন্‌ঝন্‌ করতে লাগলো তার। তক্ষুনি সে মেঝের পড়ে যেত কিন্তু তার আগেই নিঃশ্বাসের টানে সে আবার সিধে চলে গেল নাকের কাছে।

সেখানে গিয়ে আর কথা নেই, একেবারে ভোজালি গেঁথে সে তার কাঠের বাঁটটি প্রাণপণ শক্তিতে চেপে ধরে রইল। রাক্ষস দু' একবার মাথা ঝাঁকুনি দিয়েই কিন্তু শেষ হয়ে গেল তখুনি। নদীর স্রোতের মত রক্তের স্রোত বেরিয়ে এল রাক্ষসের নাক থেকে।

এরপর হৈ হৈ কাণ্ড! বাটুল আর তার ভায়েরা রাজকন্যাকে নিয়ে তার বাপের বাড়ি পৌঁছে দিতে রাজা খুব খুশী।

বাটুলকে তিনি কোলে উঠিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি চাই বল,—আমি তোমায় সব দেব।

বাটুল বললে, দেখুন, আমি আপনার কাছ থেকে কিছু চাই না, আমায় কতকগুলি মুটে দিন—রাক্ষসের বাড়ি থেকে হীরে জহরত সোনা নিয়ে আসি। ঐতেই আমাদের সাত ভাইয়ের সাতপুরুষ চলে যাবে। আর আমার বাবা ঐ টাকায় কত খেতে পারেন এইবার আমি দেখবো।

রাজা বললেন, খুব ভাল কথা, আমি সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।

বাটুলের বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে রাজা খুশী হয়ে তার ইচ্ছামত সব ব্যবস্থা করে দিলেন, আর বাটুলকে করে নিলেন তাঁর মন্ত্রী।

বাটুল বাবা মাকে এনে খুব সুখেস্বচ্ছন্দেই রেখেছিল বটে কিন্তু ভোজনেশ্বরের আর খাবার শক্তি ছিল না—শেষের দিকে কিছুই আর তাঁর হজম হত না। দিনরাত শুধু দেড়সের আড়াইসের সাবু খেয়ে বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে থাকতেন।

বুলি বোল্‌ অমূল্য হায় যো জানে বোল্‌
বুলি এ্যায়সা বোলিয়ে কাঁটা আপ্‌নার তোল।

—প্রাচীন হিন্দী দোঁহা

মণি ও মুক্তা

কথা যে বলতে জানে, তার কাছে কথা অমূল্য জিনিস। নিক্তির ওজনের মতন কথা হওয়া চাই মাপ-জমা।

দুর্ভাগার মুক্তি



—শ্রীমতী অপর্ণা রায়

ভ্লাডিমির শহরে আইভ্যান্ অ্যাক্‌সিওনভ নামে এক বেনে বাস করতো। বেনে ছিল বেশ অবস্থাপন্ন। তার নিজের বাড়ি ছিল আর ছিল দুটো দোকান। সেই দোকান থেকে তার বেশ ভাল আয় হ'ত। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে সে বেশ সুখেই ছিল।

একদিন আইভ্যান্ তার মালপত্র নিজনী শহরের এক হাটে বেচতে যাবে বলে প্রস্তুত হ'ল, এমন সময় ওর স্ত্রী এসে বলল, "তোমাকে আজ কিছুতেই যেতে দেব না।"

আইভ্যান্ বলল, "সে কি? এই মালগুলো বেচতে হবে না? না গেলে চলবে কি করে?"

তখন ওর স্ত্রী বলল, "কাল রাত্রে আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি।"

আইভ্যান্ হেসে জিজ্ঞাসা করল, "এমন কি স্বপ্ন দেখেছ, যার জন্য আমার যাওয়া হবে না?"

স্ত্রী উত্তর দিল, "আমি দেখলাম তুমি শহর থেকে ফিরে এসেছ। আর তোমার সমস্ত চুল দুধের মত সাদা হয়ে গেছে।"

এই কথা শুনে আইভ্যান্ হাসতে হাসতে বলল, "তুমি স্বপ্ন দেখেছ আমার সব

চুল একেবারে সাদা হয়ে গেছে ? এ তো ভাল স্বপ্ন। দেখো এবার সব মাল বেশ ভাল দামে বিক্রি হয়ে যাবে। তোমার জন্য অনেক উপহারও আনব।"

এই বলে আইভ্যান্ যাত্রা করল। সঙ্গে নিল তার মালপত্র আর তার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস গীটার।

পথে যেতে যেতে আর একজন বেনের সঙ্গে আইভ্যানের দেখা হ'ল। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দুই জনে এক সরাইখানায় গিয়ে সেরাত্রের মত আশ্রয় নিল।

তার পরদিন অন্ধকার থাকতে থাকতে আইভ্যান্ একটা ঘোড়ার গাড়ি করে শহরের দিকে রওনা হ'ল। ভাবল খুব তাড়াতাড়ি গিয়ে পৌছতে পারবে।

অনেকদূর যাবার পর গাড়িচালক ঘোড়াকে খাওয়াবার জন্য গাড়ি থেকে নামল, আর আইভ্যানও চা খাবার জন্য সামনের এক সরাইখানায় প্রবেশ করল। কিছুক্ষণ পরে সে যখন তার গীটারটা বাজাতে বাজাতে বারান্দায় বেরিয়ে এলো তখন দেখতে পেল যে দু'জন পুলিস ও একজন দারোগা তার দিকেই এগিয়ে আসছে।

কাছে এসে দারোগা জিজ্ঞাসা করল, "আপনার নাম কি ? এত সকালে আপনি আগের সরাইখানা থেকে বেরিয়ে এসেছেন কেন ? আপনার সঙ্গে যে আর একজন বেনে ছিল তার সঙ্গে দেখা করে এসেছিলেন কি ?"

আইভ্যান্ অবাক হয়ে দারোগার দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর বিস্ময়ের ঘোর কাটলে জিজ্ঞাসা করল, "এসব আমাকে জিজ্ঞাসা করবার মানে কি ?"

দারোগা বলল, "আপনার সঙ্গে যে লোকটি ছিল তাকে আপনি হত্যা করেছেন।"

আইভ্যান্ তো অবাক। "আমি—আমি হত্যা করেছি ? কে একথা বলেছে আপনাকে ?" চেঁচিয়ে ওঠে আইভ্যান্।

"বেশ, আপনার জিনিসপত্র আমি তল্লাশ করব।" এই বলে দারোগা সাহেব পুলিস দু'জনকে ইঙ্গিত করতেই তারা আইভ্যানের জিনিসপত্র খুঁজে দেখতে লাগলো। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর একটা ব্যাগ পাওয়া গেল। আর সেই ব্যাগের ভিতর থেকে বেরোল একটা রক্তমাখা ছোরা।

দারোগা হাসতে হাসতে বলল, "কি ? এর পরও আপনি বলবেন যে আপনি হত্যা করেন নি ?"

আইভ্যান্ শুধু পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। কোন কথাই বলতে পারল না। তারপর পুলিস দু'জন দারোগার হুকুমে আইভ্যানকে বেঁধে হাজতে নিয়ে চলল।

● দুর্ভাগার মুক্তি
শ্রীমতী অপর্ণা রায়

যথাসময়ে আইভ্যানের স্ত্রী এই ঘটনা শুনতে পেল। কিন্তু সে একথা বিশ্বাস করতে পারল না। সে বুঝতে পারল যে কোন দুষ্ট লোক এই হীন কাজ করে তার স্বামীর ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দিয়েছে।

শেষপর্যন্ত বিচারে আইভ্যান্‌কে অন্যান্য খুনী আসামীদের সঙ্গে সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠান হ'ল।

সাইবেরিয়ায় ক্রমে ক্রমে ছাব্বিশ বছর কেটে গেল। আইভ্যানের মাথার সমস্ত চুল পেকে গেল। পাকা দাড়িতে ওর সমস্ত মুখ ভরে গেল। আগের মত আর তার হাসিখুশি ভাব নেই। কারো সঙ্গে সে কথা বলত না। খালি রাতদিন ভগবানের নাম করত। আইভ্যানের ব্যবহারে জেলের সকলেই তাকে বেশ ভালবাসত। কেউ কেউ আবার তাকে দাদু বলেও ডাকত।



াগের ভেতর থেকে বেরোল একটা রক্তমাখা ছোরা। [পৃষ্ঠা ৩৫৭

● দুর্ভাগার মুক্তি
শ্রীমতী অপর্ণা রায়

মাঝে মাঝে তার বাড়ির কথা মনে হ'ত। স্ত্রী, ছেলে মেয়ে কে কেমন আছে, বেঁচেই বা আছে কিনা কে জানাবে তাকে? ভীষণ মন খারাপ লাগত তখন তার। চোখের জল নামত দুই গাল বেয়ে। কে জানে তার ছেলেমেয়েদের সে আর দেখতে পাবে কিনা। মনটা তার হু-হু করে উঠত।

কিছুদিন পরে সেই জেলে আবার একদল নূতন কয়েদী এলো। ক্রমে পুরানো কয়েদীদের সঙ্গে তাদের পরিচয় হ'ল। নূতন দল পুরানো কয়েদীদের কাছে জড় হয়ে পরস্পরের খোঁজখবর নিতে লাগল। আইভ্যান্

ছিল ওদের মাঝখানে বসে। নবাগতদের ভেতর থেকে এক ষাট বছরের বুড়ো তখন তার নিজের গল্প বলছিল।

সে বলল, "আমি একটা গাড়ি থেকে ঘোড়া খুলে নিয়েছিলাম। সেইজন্য আমাকে এখানকার জেলে পাঠিয়েছে। আমি এত করে বললাম যে আমি ঘোড়াটা চুরি করিনি, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবার জন্য ঘোড়াটা নিয়েছিলাম। তা ছাড়া গাড়ি চালক আমার বন্ধু। কিন্তু ওরা কেউ আমার কথা কানেই তুলল না। কিন্তু একবার সত্যি সত্যি একটা পাপ আমি করেছিলাম। ন্যায়ধর্ম অনুযায়ী তখনই আমার এখানে আসা উচিত ছিল। কিন্তু সেবার আমি ধরা পড়িনি। আর এবার আমি মিথ্যা সাজা পেলাম।"

একজন কয়েদী জিজ্ঞাসা করল, "তোমার বাড়ি ছিল কোথায়?"

"আমাদের গাঁয়ের নাম ভ্লাডিমির।" উত্তর দেয় বৃদ্ধ লোকটি।

আইভ্যান্ হঠাৎ চমকে ওঠে ওর কথা শুনে। বলে, "তুমি ভ্লাডিমির গ্রামের আইভ্যান্ বেনের বংশের কাউকে চেন?"

বৃদ্ধ একবার তাকায় আইভ্যানের দিকে। তারপর বলে, "হ্যাঁ চিনি। তার ছেলেরা এখন বেশ নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের বাপ তো সাইবেরিয়াতেই রয়েছে। সেও আমার মত একজন কয়েদী। তা তুমি এখানে কি করে এলে?"

আইভ্যান্ তার অতীত জীবনের কথা কারও কাছে বলতে চায় না, সে খালি বলে, "পূর্বজন্মে নিশ্চয়ই কোন পাপ করেছিলাম। তার জন্যই আমার আজ এই অবস্থা!"

কিন্তু অন্য কয়েদীদের মধ্যে একজন আইভ্যানের সব ইতিহাস নূতন কয়েদীদের বলে।

সব শুনে এক নূতন কয়েদী খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে আইভ্যানের দিকে। তারপর বলে, "আরে এ তো ভারী আশ্চর্য! কিন্তু দাদু, তুমি এর মধ্যে এত বুড়ো হয়ে গেলে কি করে?"

তার কথা শুনে অন্য কয়েদীরা জিজ্ঞাসা করে, "কি—তোমার সঙ্গে আগে পরিচয় ছিল না কি হে?"

আইভ্যান্ ভাবে লোকটা নিশ্চয়ই খুনের ব্যাপারটার কিছু জানে। ও হয়তো বলতে পারবে কে খুনী। তাই জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা তুমি কি আগে আমাকে কোথাও দেখেছ? আর তুমি বোধহয় খুনের ব্যাপারটা আগেই শুনেছিলে, তাই না?"

● দুর্ভাগার মুক্তি
শ্রীমতী অপর্ণা রায়

নূতন কয়েদী বলে, "গল্পটা শুনে থাকলেও আমার এখন তো সবটা মনে নেই।"

আইভ্যান্ জিজ্ঞাসা করে, "কে আসল খুনী তাও হয়ত তুমি জান।"



দি বলে দাও তবে জেনে রেখো মরবার আগে তোমাকে খুন করেই মরব।

লোকটা হেসে ওঠে হো-হো করে। বলে, "যার কাছে ছোরা পাওয়া গিয়েছিল সে-ই খুনী। অন্য লোক খুন করলে তুমি যে থলিতে মাথা দিয়ে শুয়েছিলে তার মধ্যে ছোরা যাবে কি করে?"

তখন আইভ্যানের দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল যে এই লোকটাই খুনী। নইলে সে এত কথা জানবে কি করে? সে ভাবল, যে করেই হোক এর প্রতিশোধ নিতে হবে। ওর জন্যই তো তার সারা জীবন নষ্ট হয়ে গেল।

একদিন রাত্রিবেলা আইভ্যান্ তার ঘরে পায়চারি করছে। এমন সময় এক কয়েদীর বিছানার তলা থেকে কিছু মাটি তার পায়ের উপর এসে পড়ল। ও তো অবাক। কিন্তু একটু পরেই ও দেখতে পেল যে নূতন কয়েদী তার সামনে এসে দাঁড়ালো। ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেছে।

আইভ্যানের হাত চেপে ধরে লোকটি বলল, "আমি প্রাচীরের নীচে একটা গর্ত খুঁড়ছি। রোজ জুতোর মধ্যে করে সেখান থেকে মাটি এনে বাইরে ফেলে আসি। তুমি একথা কাউকে বলো না। কিছুদিন পরে আমরা দু'জনেই পালিয়ে যেতে পারব। আর যদি বলে দাও তবে ওরা বেত মেরে আমাকে মেরে ফেলবে। কিন্তু তার আগে জেনে রেখো আমি তোমাকে খুন করে যাব।"

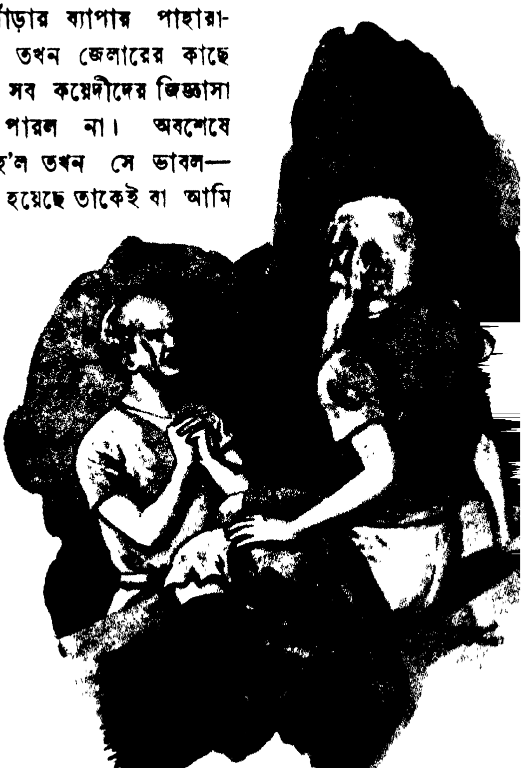
● দুর্ভাবার মুক্তি
শ্রীমতী অপর্ণা রায়

আইভ্যান্ তার শত্রুর দিকে তাকিয়ে রাগে কাঁপতে লাগল। বলল, "আর আমাকে খুন করবার কোন দরকার হবে না। তোমার মাটি খোঁড়ার কথা বলে দেব কিনা সেটা ভেবে দেখব। তবে তুমি হত্যা করার আগেই আমার মৃত্যু হবে।"

পরদিন কিন্তু এই মাটি খোঁড়ার ব্যাপার পাহারাওয়ালারা টের পেয়ে গেল। তারা তখন জেলারের কাছে গিয়ে নালিশ করল। জেলার এসে সব কয়েদীদের জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারল না। অবশেষে আইভ্যান্কে যখন জিজ্ঞাসা করা হ'ল তখন সে ভাবল—যার জন্য আমার সারা জীবন নষ্ট হয়েছে তাকেই বা আমি বাঁচাব কেন? কিন্তু ওর নাম বলে দিলে ওকে ওরা বেত মেরে শেষ করবে। তাতে আমার কি লাভ হবে? আইভ্যান্ নূতন কয়েদীর দিকে একবার তাকাল। তারপর করুণভাবে বলল, "হুজুর, আমি বলতে পারব না।"

জেলার অনেক চেষ্টা করে শেষে বিফল হয়ে ফিরে গেলেন।

সেদিন রাত্রে আইভ্যান্ বিছানায় চোখ বুজে শুয়ে আছে। এমন সময় একটা ছায়া ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে এসে তার খাটে বসল। আইভ্যান্ পায়ের শব্দে চোখ খুলে তাকিয়েই নূতন কয়েদীকে চিনতে পারল। সে চেঁচিয়ে উঠল, "আবার—আবার তুমি আমার কাছে এসেছ? কি দরকার তোমার? আমার কাছ থেকে তুমি আর কি চাও?"



নূতন কয়েদী আস্তে আস্তে বলল—"আইভ্যান্, তুমি আমাকে মাপ কর।"

নূতন কয়েদী আস্তে আস্তে বলে, "আইভ্যান্, তুমি আমাকে মাপ কর।"

● দুর্ভাগার মুক্তি
শ্রীমতী অপর্ণা রায়

"কিসের জন্য মাপ চাইছ তুমি ?" জিজ্ঞাসা করে আইভ্যান্।

কয়েদী বলে, "হ্যাঁ, সেই বেনেকে আমিই খুন করেছি। তারপর ছোরাটা তোমার থলেতে লুকিয়ে রেখেছিলাম। তোমাকে খুন করবার ইচ্ছাও আমার ছিল। কিন্তু হঠাৎ কার পায়ের শব্দ শুনে আমি তাড়াতাড়ি জানলা টপকে পালিয়ে যাই।"

নূতন কয়েদীর কথা শুনে আইভ্যান্ কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসে থাকে।

নূতন কয়েদী আবার বলে, "আমি আমার সমস্ত দোষ স্বীকার করব। তবেই তুমি মুক্তি পাবে। তখন তুমি বাড়ি ফিরে যেতে পারবে।"

আইভ্যান্ বলে, "এখন দেখছি খুব দরদ। কি লাভ হবে বলতে পার, এখন আমার মুক্তি পেয়ে ? আর এখন আমার যাবার জায়গাই বা কোথায় ? স্ত্রী হয়তো বেঁচে নাই। ছেলে-মেয়েরা আমাকে এখন আর চিনতে পারবে না। না—না আমাকে এখন মুক্তি দিয়ে তোমাকে আর বাহাদুরি দেখাতে হবে না।"

কিন্তু নূতন কয়েদী আইভ্যানের কথা শুনল না। সে তার সমস্ত দোষ স্বীকার করল। আইভ্যানের খালাসের হুকুমও দেওয়া হ'ল। কিন্তু তার আগেই আইভ্যানের মৃত্যু হয়েছে।*

* টলস্টয়ের অনুসরণে

সোনালী কথা

এলিস্ ইন্ ওয়ানডারল্যাণ্ড (লিয়ুইস্ ক্যারল)

এলিস্ ইন্ ওয়ানডারল্যাণ্ড ইংরেজী ভাষার শিশু সাহিত্যের ক্লাসিকস্। এই অপূর্ব গ্রন্থের লেখকের আসল নাম হলো রেভারেণ্ড সি এল ডজসন, লিয়ুইস্ ক্যারল তাঁর ছদ্মনাম। এলিস্ নামে সাত বছরের এক বালিকা ছিল তাঁর ভ্রমণের সঙ্গী। বেড়াতে বেরুলেই এলিস্ বায়না ধরতো, গল্প বলো। এলিস্‌কে ভোলাবার জন্যে তিনি তখুনি তখুনি গল্প রচনা করে বলতেন। এই ভাবেই এই অপরূপ গল্পের সৃষ্টি হয়। তাঁর গল্পের নায়িকাও শিশু এলিস্। শিশু এলিস্ একদিন বেড়াতে বেড়াতে দেখলো অদ্ভুত কাণ্ড কে তাকে ডাকছে। ফিরে দেখে, রীতিমত হ্যাট কোট-পরা এক খরগোশ। সেই খরগোশের সঙ্গে এলিসের মিতালি হয়। যে গর্তের ভেতর দিয়ে খরগোশ অদৃশ্য হয়ে যেতো, এলিস্‌কে সেই গর্তের ভেতর দিয়ে খরগোশটি নিয়ে যায় এক আজব দেশে। সেখানে তাসের বিবিরা সব সজীব, সেখানকার জীবজন্তুরা মানুষের মতনই চলেফেরে কথাবার্তা বলে, জ্যোৎস্না রাতে ইঁদুররা সকলকে নীতিতোষে আমন্ত্রণ করে। এই গল্পে আছে সেই বিচিত্র দেশে এলিসের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার কাহিনী।



দুই ভাই

—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

কত অলৌকিক ঘটনা ঘটে মানুষের জীবনে—কেই-বা তার হিসেব রাখে! কেউ-বা গাঁজাখুরি গল্প বলে' উড়িয়ে দেয়, আবার কেউ-বা বিশ্বাস করে।

এমনি একটা গল্পের কথা আমি জানি।

গল্পটি যে জায়গায়, সেটাকে বলে কয়লাকুঠির দেশ। চারদিকে ছোট বড় নানারকমের কয়লার কুঠি। কোনোটা খুলেছে, কোনোটা বন্ধ হয়েছে। আশ-পাশের গ্রামের অধিকাংশ লোক এইসব কয়লাকুঠিতে চাকরি করে।

এমনি একটা কয়লার কুঠিতে চাকরি করে দু' ভাই। কার্তিক আর গণেশ।

দু' ভাই দু'রকমের। কার্তিক যেন একেবারে সত্যিকারের কার্তিক। যেমন সুপুরুষ, তেমনি বিদ্বান। অনেক টাকা রোজগার করে। কলিয়ারীর ক্যাসিয়ার। সাহেবী পোশাক পরে আপিসে যখন আসে, মনে হয় সত্যিকার সাহেব। বাঙালী বলে চেনা যায় না।

কোম্পানির কোয়ার্টারে থাকে। বিয়ে করেছে কলকাতায়। লেখাপড়া-জানা বৌ। হাইহিল জুতো পরে' হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলিয়ে কোথাও যখন যায়, দু'দণ্ড তাকিয়ে দেখতে হয়।

বাড়ির আদব-কায়দাও তেমনি। বাবুর্চি রান্না করে, টেবিলে বসে খায়। বাড়িতে মুরগী পুষেছে।

ওদিকে গণেশ ঠিক তার উলটো। নামেও গণেশ, কাজেও গণেশ। চেহারা—পাঁচপাঁচি আরও দশটা মানুষের যেমন হয় তেমনি। দেহে বিশেষত্ব কিছু না থাকলেও বিশেষত্ব আছে তার দেহের অপরিমিত শক্তিতে। যেমন জোয়ান, তেমনি বলবান।

লেখাপড়া কিছু শেখেনি। নিতান্ত সাধারণ একটা চাকরি। তাইতেই কোনোরকমে তার দিন চলে। বাড়িতে স্ত্রী আর একটি তেরো চোদ্দ বছরের মেয়ে।

স্ত্রী তার সাধারণ গরীব গৃহস্থের মেয়ে। টানাটানির সংসার, তবু তার মুখে হাসি যেন লেগেই আছে।

মেয়েটি কিন্তু পরমা সুন্দরী। নাম রেখেছে নারায়ণী।

দু' ভাই এক কলিয়ারীতে কাজ করে। কিন্তু ভাইএ ভাইএ দেখা হয় না। কার্তিক থাকে একজায়গায়, গণেশ থাকে একজায়গায়। দাদার পাছে অসম্মান হয় তাই গণেশ তার পরিচয় পর্যন্ত দিতে চায় না।

নারায়ণী একদিন বললে, বাবা, আজ আমি দেখলাম জেঠাইমাকে।

গণেশ বললে, ডাকোনি তো জেঠাইমা বলে'?

—না বাবা ডাকিনি, শুধু চেয়ে চেয়ে দেখলাম।

গণেশ বললে, ডেকো না কোনোদিন।

—কেন বাবা, ডাকলে কি হয়? আমাদের তো আপন জেঠাইমা!

গণেশ বললে, তা হোক্। ওরা বড়লোক, আমরা গরীব। আমাদের দূরে দূরে থাকাই ভালো।

নারায়ণীর কিন্তু ভারি ইচ্ছে, ওদের বাড়ি যাবার। প্রতিবেশী মেয়েরা যখন তাকে জিজ্ঞাসা করে তখন তার ভারি লজ্জা হয়। কেউ কেউ আবার বিশ্বাসই করতে চায় না। বলে, গাঁ-সম্পর্কে কেউ হবে হয়তো।

নারায়ণী বলে, না ভাই, আমার বাবার সহোদর ভাই। আপন দাদা।

—ধেৎ, তুই জানিস না তাহ'লে!

নারায়ণী ঝগড়া-ঝাঁটি করবার মেয়ে নয়। চুপ করে থাকে।

● দুই ভাই
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সেদিন এক ভাল্লুকওলা এসেছিল খেলা দেখাবার জন্তে।

পয়সা দিয়ে খেলা দেখবার সামর্থ্য এ-পাড়ায় কারও নেই। কাজেই পাড়ার ছেলেমেয়েগুলো ছুটেছিল ভাল্লুকের পিছু পিছু। ম্যানেজার ক্যাসিয়ারের বাংলোর কাছ পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। নারায়ণীও ছিল ছেলেমেয়েদের সেই দলের ভেতর।

জেঠামশাইএর বাংলোর সুমুখে গিয়ে সে থমকে দাঁড়িয়েছিল। কি সুন্দর বাড়িখানা! তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল সে। হঠাৎ তার নজরে পড়লো—উঠোনের একপাশে জাল দিয়ে ঘেরা একটা জায়গায় কতকগুলো মুরগী রয়েছে। একজন মুসলমান বাবুর্চি এসে একটা মুরগী ধরে নিয়ে গেল।

এইটে কিন্তু ভাল লাগলো না নারায়ণীর।—এরা মুরগী খায় কথাটা সে শুনেছিল, আজ নিজের চোখে দেখলে। মাকে বলতে হবে গিয়ে।

এমন সময় সাহেবী পোশাক পরা জেঠামশাই বেরিয়ে এলো বাংলো থেকে। তারই পাশ দিয়ে পেরিয়ে গেল। তার দিকে একবার ফিরেও তাকালে না।

ভাল্লুকওলা তখন চলে গেছে অনেক দূরে। তার হাতের টুমটুমি বাজনার আওয়াজ কানে আসছে।

গীতা তাদের পাশের বাড়ির মেয়ে। নারায়ণীর কাছে এসে বললে, এখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস? আয়।

নারায়ণী বললে, ভাবছি জেঠাইমার সঙ্গে দেখা করে' যাব কিনা!

গীতা বললে, খুব হয়েছে, আর দেখা করতে হয় না! তোর জেঠামশাই তো পেরিয়ে গেল তোর পাশ দিয়ে। একটা কথাও তো বললে না!

নারায়ণী বললে, আমাকে দেখতেই পায়নি।

বলতে গিয়ে তার গলাটা কেমন যেন বন্ধ হয়ে এলো। চোখ দুটো ছল ছল করতে লাগলো।

সেদিন সে তার মাকে গিয়ে বললে, মা তুমি বকবে না বল।

—কেন রে, বকবো কেন?

নারায়ণী বললে, জেঠামশাই আজ আমার পাশ দিয়ে পেরিয়ে গেল, তবু একটা কথাও বললে না। গীতার কাছে আমার এত লজ্জা করছিল!

মা বললে, কি করবি মা, অদৃষ্ট!

নারায়ণী বললে, ধরো, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আমি যদি একদিন যাই, গিয়ে বলি জেঠামশাইকে—আমাদের বড় কষ্ট জেঠামশাই, বাবার মাইনেটা বাড়িয়ে দাও। জেঠামশাই তো ইচ্ছে করলেই পারে!

● দুই ভাই
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

মা বললে, না। তোর বাবা বকবে।

নারায়ণী বললে, বারে, তোমার একখানি কাপড় নেই, আমার না হয় এই কাপড়টা সেলাই করে' করে' চলছে, বাবার জামাটা সাবান দিয়ে জোরে আছাড় দিতে ভয় করে। বাবার মাইনে না বাড়লে কি করে কি হবে মা?

মা বললে, ভগবান মালিক। সব ঠিক হয়ে যাবে মা, ভাবিসনি।

নারায়ণী বললে, তোমার শুধু ওই ভগবান আর ভগবান! ভগবান কিচ্ছু করবে না তুমি দেখে নিও!

নারায়ণীর কথাই ঠিক হলো শেষ পর্যন্ত। ভগবান কিছুই করলে না।

কলিয়ারীতে হপ্তা পে-মেণ্ট্। শনিবার মাইনে পাবার দিন। কাউণ্টারের এপাশে বসে পে-ক্লার্ক। নাম ধরে ধরে ডাকে। ভাউচারে টিপ সহি দিয়ে টাকা নিয়ে যায় সকলে।

কিছুদিন ধরে কাউণ্টারে খুব গোলমাল চলছে। একে তো মাইনে নেবার দিন। হিসেবের কড়ি, গোলমাল একটু এমনিতেই হয়। তার ওপর কিছুদিন ধরে দেখা যাচ্ছে জন-দশ-বারো কাবলীওলা মস্ত বড় বড় লাঠি হাতে নিয়ে শনিবার দিন রীতিমত গোলমাল শুরু করেছে। আগে তারা কাউণ্টার পর্যন্ত আসতো না। যা করতো দূরে দূরেই করতো। এখন তারা বলছে তাদের বহুৎ টাকা মারা যেতে বসেছে। মাইনে নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে সবাই পালিয়ে যাচ্ছে। টাকা কিছুতেই দিচ্ছে না।

লোকজন বলছে আর পারছি না। আসল যা নিয়েছি সুদ দিয়েছি তার ডবল। আর দিতে পারবো না।

কাবলীওলারা বলছে, দিতে হবে।

উভয় পক্ষে এমনি দু'চার কথা হতে হতে সেদিন একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেল।

এক কাবলীওলা দিলে একজন লোকের ওপর হাত চালিয়ে!

বেচারা নিরীহ বাঙালী। মুখের জোর আছে, কিন্তু গায়ের জোর নেই। মার খেয়ে সে কাঁদতে লাগলো।

কাবলীওলাকে বেশী কিছু বলবারও উপায় নেই। সবাই কিছু-না-কিছু ধারে।

একজন কেবল বললে, তুমি ওকে মারলে কেন?

কাবলীওলা বললে, জরুর মারবো।

দশজন কাবলীওলা একসঙ্গে হৈ হৈ করে উঠলো। তাদের নিজের ভাষায় কি যে বলতে লাগলো বুঝা গেল না।

● দুই ভাই
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

মাইনে দেওয়া তখনও শেষ হয়নি। ওদিক থেকে ডাক হলো—দামু কামার।

দামু কাউণ্টারে গেল টাকা নিতে। সাত টাকা পাঁচ আনা। ভাউচারে টিপ সহি দিয়ে টাকা নিয়ে চলে যাচ্ছিল। একজন কাবলীওলা এগিয়ে এসে বললে, রুপিয়া দেও।

দামু বললে, এ-হপ্তায় দিতে পারবো না সাহেব, আসছে-হপ্তায় দেবো।

সাহেব হাতখানা তার চেপে ধরে' জোর করে' তুলে নিলে দুটো টাকা!

—দ্যাখো ভাই দ্যাখো,—জুলুম দ্যাখো!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে সবাই, কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারলে না। তাদেরও পালা আসছে। হয়ত-বা তাদেরও হাত থেকে এমনি করে' কেড়ে নেবে।

মাইনে নিতে আসছিল গণেশ। ব্যাপার দেখে থমকে দাঁড়ালো।

দামু ছুটে এলো গণেশের কাছে। হাতের মুঠো খুলে দেখালে পাঁচ টাকা পাঁচ আনা। বললে, হাত মুচড়ে দুটো টাকা কেড়ে নিলে। বলছি আসছে হপ্তায় দেবো, তা ব্যাটা ছোটলোক শুনলে না কিছুতেই। বলছি বোকা কাপড় একদম ছিঁড়্ গিয়া—



একজন কাবলীওলা এগিয়ে এসে বললে, রুপিয়া দেও

কাবলীওলা ছুটে এসে দামুর ঘাড়ের ওপর এমন এক থাপ্পড় বসিয়ে দিলে যে, দামু উলটে পড়ে গেল।—গালি দেতা হামকো?

গণেশ সহ্য করতে পারলে না। কাবলীওলা দামুকে ঠিক যেমন করে' মারলে, সেও ঠিক তেমনি করে' কাবলীওলার গালের ওপর ধাঁ করে' একটি ঘুষি দিলে চালিয়ে! কাবলীওলার মাথাটি ঘুরে গেল।

অন্য কাবলীওলারা ছুটে এলো। এরাও তখন মরিয়া হয়ে উঠেছে।

খুব খানিকটা হট্টগোল, মারামারি চললো কিছুক্ষণ ধরে'। কলিয়ারীর অন্যান্য লোকজন

এসে থামিয়ে দেবার চেষ্টা করলে। পে-ক্লার্ক পুলিসে খবর দিতে যাচ্ছিল। বড় ক্যাশিয়ার কার্তিকবাবু এসে দাঁড়ালেন। বারণ করলেন পুলিসে খবর দিতে।

হাঙ্গামা থামলে দেখা গেল, একজন কাবলীওলা খানিকটা জখম হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে। বাকি ন'জন পালিয়েছে। গণেশের গায়ের জামাটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। রক্তের একটা ক্ষীণ ধারা চুলের ভেতর থেকে নেমে গালের ওপর গড়িয়ে আসছে। হাতের একটা জায়গা খানিকটা ছড়ে গেছে।

হাত দিয়ে মুখটা মুছতে গিয়ে গণেশ দেখলে রক্ত। ছেঁড়া জামাটা আরও ভাল করে' ছিঁড়ে তাই দিয়ে হাতের আর মুখের রক্ত মুছে, সে গিয়ে দাঁড়ালো কাউণ্টারের কাছে। কিছুই যেন হয়নি এমনি ভাবে বললে, আমার টাকাটা দিন মানিকবাবু।

মানিকবাবু তার ভাউচারটা বাড়িয়ে দিয়ে বললে, সহি কর, পনেরো টাকা।

সহি করে পনেরোটি টাকা হাতে নিয়ে মুখ তুলে তাকাতেই দেখে মানিকবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে আছে কার্তিক—তার দাদা।

গণেশ চোখটা নামিয়ে নিলে, কার্তিকও কিছু বললে না।

জবাব মিলে গেল তার পরের দিন।

গণেশ রোজ যেমন যায় সেদিনও তেমনি কাজে গিয়েছিল। খাদ-মোহনায় একটা টুলের ওপর বসেছিল টাইমকিপার। ডুলি থেকে বেরিয়ে গণেশ তার টিকিটটা নিতে গেল হাত বাড়িয়ে। টাইমকিপার বললে, দাঁড়াও।

গণেশ দাঁড়িয়েই ছিল, লোকজন চলে যেতেই টাইমকিপার বললে, তুমি একবার দেখা করগে বড়বাবুর সঙ্গে।

গণেশ জিজ্ঞাসা করলে, কেন?

—জানি না ভাই। আমার ওপর এই হুকুম।

ফাঁকা ডুলি উঠছিল ওপরে। গণেশ গিয়ে দাঁড়ালো টাণ্ডোয়ানের কাছে। টাণ্ডোয়ান মানুষ-ওঠার ঘণ্টি মারলে। ওপর থেকে ঘণ্টির জবাব এলো। গণেশকে নিয়ে 'লিফট্ কেজ্' ওপরে উঠে গেল।

আপিসে গিয়ে গণেশ শুনলে তার চাকরি নেই। কাল নাকি সে এক কাবলীওলার সঙ্গে মারামারি করেছে, সেই অপরাধে তার চাকরি খতম্।

গণেশ যেন বোবা হয়ে গেল। মুখ দিয়ে তার কোনও কথা বেরুলো না। হাতদু'টি জোড় করে' কপালে ঠেকিয়ে কার উদ্দেশ্যে যেন একটি প্রণাম করে' বেরিয়ে যাচ্ছিল আপিস থেকে।

● দুই ভাই

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বড়বাবু ডাকলেন, গণেশ !

গণেশ ফিরে দাঁড়াতেই বড়বাবু একটুকরো কাগজে কি যেন লিখে তার হাতে দিয়ে বললেন, এইটে নিয়ে যাও খাজাঞ্চীবাবুর কাছে। কোম্পানি তোমাকে তিরিশটে টাকা দিয়েছে।

হাত বাড়িয়ে কাগজটি নিলে গণেশ। বললে, কোম্পানির জয় হোক !

আপিস থেকে গণেশ বেরুলো তিরিশটি টাকা হাতে নিয়ে। কোথায় যাবে সে ?

ভাবলে একবার যাবে নাকি তার দাদার কাছে ?

না গিয়ে করবেই-বা কি ?

কাল পেয়েছে পনেরো টাকা, আজ তিরিশ টাকা। দেনা মিটিয়ে দিন-সাতেক চলে যাবে কোনোরকমে, কিন্তু তার পর ? এখানে আর কাজ করে' খেতে হবে না তাকে—ত' সে বেশ ভাল করেই বুঝতে পেরেছে।

মাথা গুঁজবার জায়গা একটা ছিল তাদের। এখান থেকে ক্রোশ-পাঁচছয় দূরে তাদের পৈতৃক বাসস্থান হরিরামপুরে। কিন্তু সে কি আর এখনও আছে? মাটির একখানা বাড়ি ইঁটের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, আর সামান্য কিছু ধানের জমি। কলকাতায় বিয়ে করে' শ্বশুরের পয়সায় লেখাপড়া শিখে দাদা তার একটা মানুষের মতন মানুষ হয়ে গেল, গ্রামের বাড়িতে স্ত্রী তার থাকতেই চাইলে না। দাদার টানে টানে সেও চলে এলো গ্রাম ছেড়ে। সহোদর ভাই—যাবেই-বা কোথায় ?

এক কলিয়ারীতে চাকরি—একই সঙ্গে ছিল দু'জনে।

কার্তিকের বাংলোর পেছন দিকে বাবুর্চি-খানসামার ঘরের পাশে একটা ঘর নিয়ে গণেশও ছিল বেশ মনের আনন্দেই, কিন্তু তার বৌদি সেটা পছন্দ করলে না। বললে, তোমার আলাদা থাকাই ভাল ঠাকুরপো। এরকম ভাবে থাকলে আমাদের মান-সম্মান কিছু থাকে না।

গণেশ বুঝলে সেকথা।

নারায়ণী তখন নিতান্ত ছোট। ঘর-সংসারের জিনিসপত্র যৎসামান্য। সেইদিনই সে তার দাদার সংস্রব পরিত্যাগ করে' গিয়ে উঠেছিল কুলি লাইনে।

সে আজ অনেকদিনের কথা।

• •

•

সারাটা দিন সে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালো। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢেকে গিয়ে দাঁড়ালো কার্তিক-সাহেবের বাংলোয়। সাহেব তখন সবেমাত্র কলিয়ারী থেকে ফিরেছে।

● দুই ভাই
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

গণেশকে দেখেই মেম-সাহেব চীৎকার করে' উঠলো : কি জন্যে এসেছ তুমি ?

ভয় কাকে বলে গণেশ জানে না। কাউকে ভয়-ডর করবার ছেলেই সে নয়। বললে, দাদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।



...কে দেখেই মেম-সাহেব চীৎকার করে' উঠলো : কি জন্যে এসেছ তুমি ?

—কেন, কি দরকার ?

গণেশ বললে, কি দরকার তা তো তুমি জানো বৌদি।

মেম-সাহেব বললে, তোমার চাকরি গেছে তাই তোমার দাদাকে বিরক্ত করতে এসেছ—এই তো ?

গণেশ বললে, দাদা বিরক্ত হবে না বৌদি, তুমি দাদাকে একবার ডেকে দাও।

মেম-সাহেব রেগে উঠলো। বললে, এইমাত্তর সে এলো আপিস থেকে। ডাকবার সময়টি বেশ !

এই বলে' মেম-সাহেব ভেতরে চলে গেল।

গণেশ ভাবলে দাদাকে ডেকে সে দেবে না, তাই সে নিজেই একবার চীৎকার করে' ডাকলে—দাদা !

কার্তিক বোধকরি বাথ-রুমের ভেতর থেকে সাড়া দিলে।—কি বলছিস ?

গণেশ বললে, বিনাদোষেই চাকরিটা তো দিলে খেয়ে ! এখন কি করি বল দেখি !

মেম-সাহেব বেরিয়ে এলো : তুমি কি করবে না করবে তাও বলে দিতে হবে ? কানা নও, খোঁড়া নও,—

কথাটা তার শেষ হলো না। কার্তিক বললে, অন্য কোনও কলিয়ারীতে একটা কাজ-টাজ ভাখ্‌গে যা।

গণেশ বললে, নাঃ, চাকরি আর করবো না।

দাদা চুপ করে' রইলো। বৌদিদি কথা বললে। ভেতর থেকে বলে উঠলো ; হ্যাঁ সেই ভালো। গুণ্ডামি করোগে যাও।

● দুই ভাই
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

গণেশ জবাব দিলে না কথাটার। শুধু বললে, দাদা, আমি হরিরামপুরে চললাম। সেই-খানেই থাকিগে যাই।

দাদা বললে, তাই যা।

বলেই হঠাৎ কি যেন তার মনে হলো, তাড়াতাড়ি কলঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, যাচ্ছিস্ তো গ্রামে, বাড়িখানা আস্ত যদি থাকে এখনও তো মাথা গুঁজবার ঠাঁই না হয় হবে, কিন্তু খাবি কি?

গণেশের কাছ থেকে কোনও জবাব না পেয়ে কার্তিক ডাকলে, গণেশ!

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

মেম-সাহেব মুখ বাড়িয়ে দেখলে, কেউ নেই। বললে, কাকে ডাকছো? সে চলে গেছে।

কার্তিক বললে, মরুক্‌গে যাক্!

বলেই সে তার টেবিলে গিয়ে বসলো। বললে, দাও এক পেয়ালা চা দাও।

• •

•

গণেশ হরিরামপুরে গিয়ে দেখলে তাদের বাড়ির আর কোনও 'পদার্থ' নেই। চালের খড় একরকম নেই বললেই হয়। খিড়কির দোরের কপাট দুটো কারা যেন ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেছে।

স্ত্রী আর কন্যাকে নিয়ে সেই বাড়িতে গিয়েই উঠলো গণেশ। পাড়াপড়শীর কাছে চেয়েচিন্তে খড় এনে ঘরছাদন করলে। এতদিনের অব্যবহারে ভুতুড়ে বাড়ির মত যে-বাড়ি খাঁ খাঁ করতো, দিন-দুই পরেই দেখা গেল তার চারদিক ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে।

বাড়িটা না হয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলো, কিন্তু উপার্জনের কিছু ব্যবস্থা না হলে তো আর চলে না!

গণেশ বললে, চাষ করবো।

গণেশের স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলে, তোমার জমি কোথায়?

গণেশ তার বাড়ির সামনের জমিটা দেখিয়ে দিয়ে বললে, আমি জানি এই জমিটা আমাদের।

তারপর প্রতিবেশী রাধারমণ মোড়লের বাড়ি গিয়ে গণেশ বললে, তোমার নাঙলটি একবার দেবে?

—কেন দেবো না?

গণেশ বললে, বলদও দিতে হবে, নাঙলও দিতে হবে।

রাধারমণ বললে, নিয়ে যাও।

● দুই ভাই
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ঝিম্ ঝিম্ করে' বৃষ্টি পড়ছে। মাঠে মাঠে নাঙল দিচ্ছে সবাই। রাধারমণের নাঙল গরু নিয়ে গণেশ নিজেই নামলো তার মাঠের ওপর।

যারা দেখলে, সবাই অবাক হয়ে গেল। নারাণ ভট্‌চাজ যাচ্ছিল স্নান করতে। গণেশ নিজের হাতে নাঙল দিচ্ছে দেখে থমকে থামলো। বললে, এ তুমি কি করছো গণেশ? ব্রাহ্মণের ছেলে—নিজের হাতে নাঙল দিচ্ছ?

গণেশ বললে, হ্যাঁ দাদা, দিচ্ছি।

ভট্‌চাজ বললে, জাতজন্ম সব খোয়ালে যে!

গণেশ বললে, কি করবো ভট্‌চাজ, এ-ছাড়া আমার আর কোনও উপায় নেই।

ভট্‌চাজ বললে, কিন্তু তোমার এ অপরাধ কেউ ক্ষমা করবে না গণেশ, সমাজে তুমি পতিত হয়ে থাকবে।

কথাটার জবাব দিলে না গণেশ। আপন মনে কাজ করতে লাগলো।

ভট্‌চাজের হলো বিপদ। স্নান করতে যাওয়া তার আর হয়ে উঠলো না। এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটছে চোখের সুমুখে, সংবাদটা ঘরে ঘরে প্রচার না করে' সে স্নানই-বা করে কেমন করে'?

দেখতে দেখতে কথাটা রাষ্ট্র হয়ে গেল সারা গ্রামের মধ্যে। ছেলেবুড়ো ছুটে এলো মজা দেখবার জন্যে। গণেশের বাড়ির সুমুখে যেন মেলা বসে গেল।

ব্রাহ্মণেরা নিষেধ করলে গণেশকে। বললে, এ-কাজ তুমি কোরো না গণেশ। তোমার মেয়ে বড় হয়েছে, তার বিয়ে দিতে হবে, গ্রামের ব্রাহ্মণ-সমাজে বাস করতে হবে।

গণেশের সেই এক কথা!—আমার আর কোনও উপায় ছিল না দাদা।

নাঙল দেওয়া তখনও তার শেষ হয়নি, এমন সময় এলো জমিদারের এক হিন্দুস্থানী দরোয়ান। গণেশকে বললে, ওঠো।

—কেন ভাই? তুমি আবার কে?

দরোয়ান বললে, জমিদারের তলব। কাছারিতে তোমার ডাক পড়েছে।

গণেশ বললে, কাজটা হয়ে যাক, তারপর যাব।

দরোয়ান কিন্তু শুনলে না সে কথা। বেশ জোরে জোরে কথা বলতে লাগলো।

গণেশ হাতজোড় করে' অনুনয় করলে প্রথমে। বললে, পরের হাল-গরু চেয়ে এনেছি ভাই, কাজটা শেষ হোক, তারপর যাব বলছি যখন, নিশ্চয়ই যাব।

দরোয়ান বললে, না, এক্ষুনি যেতে হবে।

● দুই ভাই
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

গণেশ বললে, কাজ ছেড়ে যেতে আমি পারবো না।

দরোয়ান বললে, তোমার বাপ পারবে।

এ আবার কিরকম কথা ?

গণেশ বুক টান করে' সোজা হয়ে ফিরে দাঁড়ালো।—কি বললে ?

দরোয়ান বললে, আমি জোর করে' তুলে দেবো তোমাকে।

—কেন ?

—এ জমি তোমার নয়।

—আমার নয় ?

—না। বাকি খাজনার দায়ে নিলাম হয়ে গেছে অনেকদিন আগে।

গণেশ বললে, সে নিষ্পত্তি আমি করে' নেবো জমিদারবাবুর সঙ্গে।

দরোয়ান এবার আর কোনও কথা না বলে এগিয়ে গেল গণেশের কাছে। তার একখানা হাত টেনে ধরে' বললে, এসো বলছি!

ঝট্‌কা মেরে হাতটা ছাড়িয়ে নিলে গণেশ। টাল সামলাতে না পেরে লোকটা মাটিতে পড়ে গেল। এ অপমান দরোয়ানের সহ্য হলো না। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে গণেশের গালে সে সজোরে এক চড় মেরে বসলো।

এবার গণেশ যা করলে তা দেখবার মত।

হাল-গরু ছেড়ে দিয়ে গণেশ ঝাঁপিয়ে পড়লো দরোয়ানের ওপর। দরোয়ান চেষ্টা করলে উঠে দাঁড়াবার, কিন্তু পারলে না। গণেশ তার বুকের ওপর চেপে প্রাণপণে দু'টি ঘুষি চালিয়ে দিলে লোকটির মুখে।

হিন্দুস্থানী দরোয়ান চীৎকার করে' উঠলো : আরে বাপ্!

লোকটার কষ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে এলো। তাই না দেখে গণেশ তার হাতটা তুলেও হাতটা নামিয়ে নিলে। উঠে দাঁড়ালো তাকে ছেড়ে দিয়ে।

দরোয়ান একটি কথাও বললে না। হাত দিয়ে রক্ত মুছতে মুছতে ছুটে পালিয়ে গেল সেখান থেকে।

গরুদুটো চুপ করে' দাঁড়িয়েছিল। কিছুই যেন হয়নি এমনি ভাবে গণেশ আবার তাদের কাছে গিয়ে লাঙলের বোঁটা ধরলে।

• • •

● দুই ভাই
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ক্ষেতে নাঙল চালানো অত সহজ নয়। শরীরে শক্তি থাকলেই হয় না, অভ্যাস থাকা চাই। গণেশ ধীরে-ধীরে কাজ করছিল। কাজ তখনও তার শেষ হয়নি।

মজা দেখবার জন্য গ্রামের অনেক লোক এসে জড়ো হয়েছে।

জমিদারের দরোয়ানকে মেরেছে গণেশ। খবর পাবামাত্র জমিদার রাজেন্দ্রনারায়ণ যেন দপ্ করে' জলে উঠলেন। মনে হলো মারটা যেন তাঁকেই মারা হয়েছে। এই গ্রামের ভেতর কার এত বড় স্পর্ধা যে তাঁর দরোয়ানের গায়ে হাত দেয়? সঙ্গে সঙ্গে হুকুম হয়ে গেল— ধরে নিয়ে এসো তাকে। এমনি আসতে না চায় বেঁধে নিয়ে এসো!

লাঠি হাতে নিয়ে তৎক্ষণাৎ ছুটলো পাঁচজন লাঠিয়াল গণেশকে ধরে আনতে। গণেশের হাতে মার খেয়ে যে-লোকটা পালিয়ে গিয়েছিল মুখে একটা গামছা জড়িয়ে সে-ই এলো সকলের আগে। গণেশের ঘুষি খেয়ে তার মুখটা তখন ফুলে গেছে। মোটা নাকটা সে ঢাকা দিতে পারেনি।

গ্রামের কতকগুলো ছেলে তাদের আগে আগে এলো হৈ হৈ করে' ছুটতে ছুটতে। এসেই বললে, গণেশদা পালাও। তোমাকে মারতে আসছে।

ওদিকে তখন গণেশের মেয়ে নারায়ণী এসে দাঁড়িয়েছে। সেও বললে, বাবা! মা তোমাকে ডাকছে। বাড়িতে এসো।

গণেশ কিন্তু কারও কথা শুনলে না। রাধারমণ মোড়লকে দেখতে পেয়ে বললে, তোমার বলদ আর নাঙল তুমি নিয়ে যাও মোড়ল। এরা আমাকে চাষ করতে দেবে না।

বলতে বলতে লাঠিয়ালদের সঙ্গে নিয়ে, মুখফোলা দরোয়ান এসে দাঁড়ালো মাঠের কিনারে। আঙুল বাড়িয়ে গণেশকে দেখিয়ে দিয়ে বললে, মারো ব্যাটাকে!

তার বীরত্ব দেখে ছেলেগুলো হো হো করে' হেসে উঠলো। তারা ভেবেছিল গণেশের সঙ্গে আবার হয়ত তাদের মারামারি হবে। এই লোকটা আবার হয়ত মার খাবে গণেশের হাতে। মজা মন্দ হবে না। কিন্তু গণেশ নিজেই সব মজা দিলে মাটি করে'। সংখ্যায় তারা পাঁচজন, আর এদিকে গণেশ একা। হয়ত-বা তাদের সঙ্গে পেরে উঠবে না ভেবে গণেশ তাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে, চল আমি যাচ্ছি কাছারিতে।

এই বলে তাদের আর কোনও কথা বলতে না দিয়ে সে নিজেই এগিয়ে চললো জমিদারের বাড়ির দিকে।

• • •

● দুই ভাই
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

গ্রামের ছেলেরা তাদের পিছু পিছু এসেছিল রাজেন্দ্রনারায়ণের বাড়ি পর্যন্ত। ভেবেছিল মজাটা দেখেই যাবে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু মজা দেখা তাদের হলো না। গণেশ যেই ঢুকেছে বাড়িতে, সদর দরজাটা দিলে তারা বন্ধ করে'।

প্রায় আধঘণ্টা পরে জমিদারের ঠাকুরবাড়ির ফটক থেকে বেরুলো গণেশ। সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, মাথার চুলের ভেতর থেকে রক্তের ধারা গড়িয়ে আসছে, ভাল করে' দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছে না।

গ্রামের লোক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলে। জিজ্ঞাসা করবার সাহস কারও হলো না।

গণেশ তার বাড়িতে ফিরে এলো। বাবাকে দেখে নারায়ণী কেঁদে উঠলো। গণেশের স্ত্রী গৃহলক্ষ্মীর বেদীর কাছে আছাড় খেয়ে পড়লো।

নারায়ণী জিজ্ঞাসা করলে, এমন করে' তোমাকে কে মারলে বাবা?

গণেশ বললে, জমিদার রাজেন্দ্রনারায়ণ।

—পারলে তোমাকে মারতে?

গণেশ একটু হাসলে। বললে, পারতো না। তবে ওরা ছিল পাঁচ ছ'জন, আমি একা। সবাই মিলে ধরাধরি করে' আমাকে বাঁধলে ঠাকুরবাড়ির থামে, তারপর জমিদারবাবু নিজে মারলে পায়ের চটি জুতো দিয়ে।

গণেশের স্ত্রী বললে, চল আমরা এখান থেকে চলে যাই।

গণেশ বললে, না, আরও কয়েকটা দিন দেখি।



বাবাকে দেখে নারায়ণী কেঁদে উঠলো।

—কি দেখবে? চাষ করবে?

গণেশ বললে, না। চাষ আর করবো না। জমি আমাদের নেই। বাড়িটা ব্রহ্মোত্তর, তাই শুধু ওইটুকুই আছে।

—এখানে কয়লাকুঠি নেই, কল-কারখানাও নেই, কাজ কোথায় করবে?

● দুই ভাই
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

গণেশ বললে, দেখি চেষ্টা করে'। কোথাও যদি কিছু না পাই, আমাদের ময়নাবুনি রেল স্টেশনে কুলির কাজ করবো।

—কুলির কাজ করবে?

গণেশ বললে, লেখাপড়া শিখিনি, কে আমাকে ভাল কাজ দেবে?

স্ত্রী তার চুপ করে' রইলো।

গণেশ বললে, তোমার লজ্জা করছে? আমার কিন্তু কোনও কাজ করতে লজ্জা করে না।

এই বলে সে সত্যিই বেরিয়ে পড়লো বাড়ি থেকে।

ময়নাবুনি স্টেশনে গিয়ে শুনলে কুলির কাজ করতে হলে লাইসেন্স দরকার। কেমন করে' লাইসেন্স করতে হয় জানবার জন্যে গণেশ যাচ্ছিল স্টেশন-মাস্টারের কাছে। এমন সময় স্টেশনের বাইরে একটা গোলমাল শোনা গেল।

সবাই ছুটছে সেইদিকে।

গণেশ ছুটলো।

গিয়ে দেখে, রাস্তার ধারে প্রকাণ্ড একটা অশ্বত্থগাছের নীচে সর্বাঙ্গে ছাই মেখে এক সাধু বসে আছেন, আর সেই সাধুর কাছে দাঁড়িয়ে আছে একটা মস্ত বড় উট। এই উটে চড়েই তিনি নাকি সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

ওদিক থেকে আসছিল একটা প্রাইভেট ঘোড়ার গাড়ি। কালো রঙের ঘোড়াটা তার চোখের সামনে উট দেখে আচমকা এমন ভাবে লাফিয়েছে যে কোচ্‌ম্যান টাল সামলাতে না পেরে উলটে পড়ে গেছে রাস্তায়। পড়ে গিয়ে কোমরে তার এত জোর লেগেছে যে সে আর উঠে দাঁড়াতে পারছে না। এদিকে ঘোড়াটা তখন গাড়িটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে নামিয়েছে রাস্তার ধারে। কাত হয়ে গিয়ে গাড়ির সামনের একটা চাকা গিয়ে লেগেছে একটা গাছের গায়ে। ঘোড়াটা তখনও লাফাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে।

গাড়ির ভেতরে বসে আছেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী আর দু'টি ছেলে। তাঁদের অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়। গাড়ি থেকে তাঁরা নামতেও পারছেন না, অথচ নিশ্চিন্তে বসে থাকবারও উপায় নেই। উট দেখে ঘোড়াটা ক্ষেপে গেছে। কোচ্‌ম্যান পড়ে গেছে নীচে। এখন এই আলগা ঘোড়া গাড়িটাকে কোথায় কোন্ খাদের ভেতর উল্টে ফেলে দেবে তার কোনও স্থিরতা নেই। গাছের গুঁড়িতে চাকাটা লেগে গেছে তাই রক্ষা। নইলে এতক্ষণ কি দুর্ঘটনা যে ঘটতো কে জানে।

প্রায় শ'খানেক লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। একটা লোকও এগিয়ে যাচ্ছে না।

● দুই ভাই
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

নির্বিকার সন্ন্যাসী বসে আছেন চুপ করে'। ততোধিক নির্বিকার তাঁর উটটি গলা বাড়িয়ে নিশ্চিন্তমনে কি যেন চিবিয়ে চলেছে।

ভিড় ঠেলে গণেশ গিয়ে দাঁড়ালো। দেখলে, যে-কোনও মুহূর্তে গাড়ির চাকাটা গাছ থেকে ছেড়ে আসতে পারে। ভগবান রক্ষা করেছে—গাড়ির চাকা গাছে আটকে গেছে।

গাড়ির ভেতর যিনি বসে আছেন তাঁর অবস্থা ঠিক পাগলের মত। না পারছেন গাড়ি থেকে নামতে, না পারছেন বসে থাকতে। ছেলে দুটো তাদের মাকে জড়িয়ে ধরে চীৎকার করছে, আর নিতান্ত অসহায়া ভদ্রমহিলার দু'চোখ দিয়ে দর দর করে' জল গড়াচ্ছে। কখনও তিনি ভগবানকে ডাকছেন, কখনও-বা সমবেত জনতার দিকে হাত বাড়িয়ে বলছেন, এগিয়ে এসো বাবা, বাঁচাও আমাদের। তোমরা যা চাও তাই দেবো।

'কিছু দিতে হবে না মা।' বলে' ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো গণেশ!

গাড়ির কাছে গিয়ে প্রথমেই সে টেনে ছেলে-দু'টিকে গাড়ি থেকে বের করে' নিলে। তারপর হাত বাড়িয়ে ভদ্রলোককে বললে, আসুন আপনি ধরুন আমাকে।

অতিকষ্টে আড়কোলা করে' তাঁকেও বের করলে। সবার শেষে গিন্নীমাকে।



গণেশ সবার শেষে গিন্নীমাকে গাড়ি থেকে নামালো।

গিন্নীমা রাস্তায় নেমেই ছেলেদু'টিকে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় যেতে যেতে স্বামীকে তিরস্কার করতে লাগলেন, কতদিন থেকে বলছি মোটর কেনো মোটর কেনো, তা না সেই মান্ধাতার আমলের ঘোড়ার গাড়ি! বলে কিনা—সাবেকি চাল! বলে কিনা—আমাদের বনেদী বংশ!

মানুষগুলোকে বাঁচিয়ে গণেশ এবার ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল। গাড়িটা হালকা হয়ে যেতেই ঘোড়াটা যেই লাফিয়েছে, গাড়ির চাকাটা বেরিয়ে এলো গাছের গুঁড়ি থেকে।

ঘোড়াটা এগিয়ে যাচ্ছিল গাড়িটাকে টেনে নিয়ে।

● দুই ভাই
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

গণেশ চট্‌ করে' ঘোড়ার মুখের লাগামটা চেপে ধরলে। প্রাণপণে চেপে ধরেও কিন্তু বিশেষ সুবিধা করতে পারছিল না গণেশ। অত বড় একটা ঘোড়াকে জব্দ করা বড় সহজ কথা নয়। ঘোড়াটা যদি কোনোরকমে একবার রাস্তার ধারে চলে যায়, আর একটা পা যদি হড়্‌কে যায় কোনোরকমে তাহ'লেই সর্বনাশ। রাস্তার ধারেই প্রকাণ্ড একটা খাদ। সেই খাদে গিয়ে পড়লে ঘোড়াটাও মরবে, গাড়িটাও ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

গণেশ চেষ্টা করছে ঘোড়াটার মুখটাকে কোনোরকমে ফিরিয়ে দিতে, আর ঘোড়াটা চেষ্টা করছে রাস্তার ধারে চলে যেতে।

গণেশের শরীরের সব রক্ত যেন তার মুখে এসে জমেছে, শিরাগুলো ফুলে উঠেছে। শক্তি-পরীক্ষা চলছে ঘোড়ায় আর মানুষে।

লোকগুলো মজা দেখছে। দুষ্টু কয়েকটা ছেলে টিট্‌কিরি মারছে, একটা লোক হাততালি দিচ্ছে, বলছে, ব্যাটা এইবার মরবে।

সামনে এতগুলো লোক দেখেই ঘোড়াটা এদিকে আসতে চাইছে না। গণেশ বললে, আপনারা সরে দাঁড়ান।

কিন্তু কে কার কথা শোনে!

—তাহ'লে আর আমার দোষ দেবেন না। বলেই সে প্রাণপণে ঘোড়ার মুখটাকে দিলে সেই অবাধ্য লোকগুলোর দিকে ফিরিয়ে।

ঘোড়া ছুটলো সেইদিকেই। মরি বাঁচি করে' লোকগুলো যে যেদিকে পারলে ছুটে চলে গেল। যে-লোকটা হাততালি দিচ্ছিল, দূরে দাঁড়িয়ে গণেশকে সে গালাগালি দিতে লাগলো।

রাস্তার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালো ঘোড়াটা।

মালিক দূরে দাঁড়িয়ে তখন চীৎকার করে' বলছেন, ছেড়ে দাও তুমি। ছেড়ে দাও ঘোড়াটাকে। যাকগে আমার গাড়ি ঘোড়া। তুমি পালিয়ে এসো।

কোচ্‌ম্যান তখন ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়িয়েছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। কোচ্‌ম্যানকে দেখেই কিন্তু ঘোড়াটা শান্ত হয়ে গেল।

গণেশ তখনও দাঁড়িয়েছিল লাগাম ধরে।

কোচ্‌ম্যান বললে, লাগাম ছেড়ে দাও ভাই, ও আর কিছু করবে না।

বলেই সে হাতদুটো বাড়িয়ে একটা পা তুলে কোচ্‌বক্সে উঠতে গেল, কিন্তু পারলে না। গণেশকে বললে, আমাকে ধরে ধরে কোনোরকমে তুলে দিতে পারো ভাই?

● দুই ভাই
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

গণেশ তাকে তুলে দিলে তার জায়গায়। ওপরে উঠে গিয়ে সে লাগাম ধরতেই শান্তশিষ্ট ঘোড়াটি আবার ধীরে ধীরে চলতে লাগলো।

গাড়ি নিয়ে মনিবের কাছে গিয়ে কোচ্ম্যান বললে, উঠুন। উট দেখে কাল্লুবেটা খুব বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিল হুজুর, ওর কোনও দোষ নেই। উট ও জীবনে কখনও দেখেনি।

মনিব বললেন, আবার চড়বো এই গাড়িতে? এখনও আমার বুকটা যে ঢিপ্ ঢিপ্ করছে।

গিন্নী বললেন, চড়। ছেলেদুটো তো হাঁটতে পারবে না।

গাড়ির দোরটা খুলে দিলেন বাবু নিজের হাতে। ছেলেরা চড়লো, গিন্নী চড়লেন, কিন্তু গাড়ির পাদানিতে পা দিয়েই বাবু থমকে দাঁড়ালেন। বললেন, ছি ছি, আমরা কিরকম নিমকহারাম দেখেছ? যে-লোকটি আমাদের বাঁচালে তার কথা ভুলেই যাচ্ছি।

এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলেন, গণেশ তখন পায়ে হেঁটে হেঁটে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। সেইখান থেকেই ডাকলেন তিনি, বলি ও মশাই, শুনছেন?

গণেশ ফিরে তাকালে। বাবু হাতের ইশারায় ডাকলেন তাকে।

গণেশ কাছে আসতেই বাবু বললেন, কোথায় যাবে ভাই তুমি? কোথায় বাড়ি তোমার?

গণেশ বললে, বাড়ি হরিরামপুর। এমনি বেরিয়েছিলাম বাড়ি থেকে। যাচ্ছিলাম একবার শক্তিপুরের দিকে।

বাবু বললেন, ভালই হলো। এসো তুমি আমাদের গাড়িতে! আমরাও শক্তিপুরে যাব।

গণেশ বসতে যাচ্ছিল কোচ্ম্যানের পাশে। বাবু কিছুতেই তাকে সেখানে বসতে দিলেন না। বললেন, তা হয় না। তুমি আমাদের জীবনরক্ষা করেছ। তুমি ভেতরে এসো।

এই বলে কর্ত্তা-গিন্নী একটা ছেলেকে তাঁদের নিজের কাছে টেনে নিলেন।

গণেশ বললে, ও কি করছেন? আমার জন্যে আপনারা কষ্ট করবেন না। আমি একজনকে কোলে নিয়ে বসছি।

কোলে নিয়ে বসবার দরকার হলো না। নিতান্ত ছোট ছেলে। একটি বছর দশেকের, আর একটি পাঁচ বছরের। তিনজনকেই ধরে গেল পাশাপাশি।

গাড়ি ছাড়তেই বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, শক্তিপুরে কার বাড়ি যাবে তুমি?

গণেশ বললে, চাটুজ্যেবাবুদের বাড়ি।

গিন্নী কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। কর্ত্তা তাঁকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ চাটুজ্যে?

গণেশ বললে, নামটা ঠিক জানি না আমি।

● দুই ভাই
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

মুচকি একটু হাসলেন কর্ত্তাবাবু। তারপর সে সম্বন্ধে আর কোনও উচ্চবাচ্য করলেন না। তবে অতখানি পথ—চুপ করেও তো থাকা যায় না! গাছপালা, চাষ-আবাদ এইরকম সব নানারকমের অবান্তর কথা বলে শেষে তিনি জানালেন যে তাঁর এক শালা আছে, গড়গড়ি স্টেশনের কাছে তার বাড়ি। এককালে বড়লোক ছিল, আজকাল অবশ্য গরীব হয়ে গেছে। সেই ভায়েই কাছে তিনি যাচ্ছিলেন সপরিবারে। ঘোড়াটা বিগড়ে গেল বলে যাওয়া হলো না।

* * *

শক্তিপুর একটা মস্তবড় গ্রাম। গণেশ কিন্তু কখনও সে গ্রামে আসেনি। ময়নাবুনি স্টেশনে কাজ যখন সে পেলে না, তখন হঠাৎ তার মনে হয়েছিল শক্তিপুরের বাবুদের কথা। বাবুরা বড়লোক। তাই ভেবেছিল একটা চাকরি-বাকরি যদি পায় সেখানে তো বড় ভাল হয়।

ঘোড়ার গাড়িটা শক্তিপুর গ্রামের ভেতর ঢুকে প্রকাণ্ড একটা বাড়ির সুমুখে গিয়ে দাঁড়ালো। বাড়িটা রাজবাড়ির মত। বাবু বললেন, এইটেই শক্তিপুরের বাবুদের বাড়ি।

গণেশ বললে, তাহ'লে এইখানেই আমাকে নামিয়ে দিন।

গাড়িটা ফটক পেরিয়ে গাড়িবারান্দার নীচে গিয়ে দাঁড়ালো। গাড়ির দোর খুলে কর্ত্তা-গিন্নী দু'জনেই নামলেন, ছেলেরাও নামলো। গণেশ একটু অবাক হয়ে গেল ব্যাপারটা দেখে। বললে, আপনারা নামলেন কেন?

বাবু বললেন, আমরাও এই বাড়িতেই যাব।

গণেশ এবার আর থাকতে পারলে না। বললে, তাহ'লে আপনি আমার একটু উপকার করুন।

এই বলে সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই গণেশ তার নিজের অবস্থার কথাটা তাঁকে জানিয়ে হাতজোড় করে' অনুরোধ করলে, বাবুকে আমি চিনি না জানি না, শুধু নাম শুনে এসেছি এখানে। আপনি যদি বাবুকে বলে আমার একটা কাজকর্মের ব্যবস্থা করে' দিতে পারেন তো খুব ভাল হয়। আমি লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানি না কিন্তু।

বাবু বললেন, এসো তুমি আমার সঙ্গে।

এই বলে তিনি তাকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখে সবাই মিলে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলেন।

খানিক পরেই একজন চাকর এলো একথালা মিষ্টি নিয়ে। থালাটা তার হাতের কাছে নামিয়ে দিয়ে বললে, খান।

● দুই ভাই
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

গণেশ আর কি করবে, বাধ্য হয়ে খেতে হলো। খেতে খেতে তার ক্রমাগত মনে হতে লাগলো তার স্ত্রী কন্যার কথা।

খানিক পরে সেই বাবুটিই নেমে এলেন দোতলা থেকে।

—তোমার নাম কি ভাই?

—আমার নাম গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বাবু বসলেন একটা চেয়ারে। বললেন, তোমার বাড়িতে কে কে আছেন?

গণেশ বললে, আমি, আমার স্ত্রী আর আমার একটি মেয়ে।

বাবু বললেন, এতক্ষণ তোমাকে বলিনি, ভেবেছিলাম বলব না। কিন্তু আর না বলে পারছি না। শক্তিপুরের বাবুদের বাড়িতে তুমি এসেছিলে একটা কাজের সন্ধানে। আমিই সেই শক্তিপুরের বাবু। আমার নাম দক্ষিণা চাটুজ্যে।

গণেশ উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে' সসম্ভ্রমে চাটুজ্যেমশাইএর পায়ে হাত দিয়ে একটি প্রণাম করলে। বললে, আজ আমার পরম সৌভাগ্য, আপনার সঙ্গে পরিচয় হলো।

দক্ষিণাবাবু বললেন, তার চেয়েও বড় কথা, তুমি আজ আমাদের বিপদে ঝাঁপিয়ে না পড়লে কেউ আমরা বাঁচতাম না!

—না না, ও কি কথা বলছেন? গণেশ বললে, চোখের সামনে কারও বিপদ দেখলে আমি চুপ করে' থাকতে পারি না। ওটা আমার স্বভাব।

—এই তো মানুষের স্বভাব। আমরা তো জানোয়ার নই। মানুষে আর জানোয়ারে এইখানেই তফাত।

গণেশ বললে, আপনি ভাল মানুষ তাই একথা বলছেন। কিন্তু আপনি জানেন না আমার এই স্বভাবের জন্যেই আজ আমার এই দুর্দশা।

দক্ষিণাবাবু বললেন, হোক্ দুর্দশা। এ স্বভাব তুমি ছেড়ো না।

গণেশ বললে, আমি লেখাপড়া শিখিনি, মুখখু-সুখখু মানুষ, আপনারা দশজনে যা বলেন তাই বিশ্বাস করি।

দক্ষিণাবাবু বললেন, শোনো, তোমাকে আমি কিছু দিতে চাই, তোমাকে নিতে হবে। তোমার ঋণ পরিশোধ করবার নয়, তবু যতটুকু পারি আমার করা উচিত।

গণেশ চুপ করে' শুনতে লাগলো।

দক্ষিণাবাবু বললেন, তোমাদের গ্রামে আমার বিঘে দশেক ভাল জমি আছে। সেই

● দুই ভাই
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

জমিটুকু আমি তোমাকে দান করতে চাই। এইটি পেলে তোমাদের তিনজনের সারাবছরের খাওয়ার কথা অন্তত ভাবতে হবে না।

জমি সম্বন্ধে গণেশের একটা আতঙ্ক আছে। আবার সেই জমি? একবার ভাবলে, এ-দান তার প্রত্যাখ্যান করা ভাল। কিন্তু কিছুতেই বলতে পারলে না। বললে, আপনার অনুগ্রহ।

দক্ষিণাবাবু তাঁর ম্যানেজারকে ডেকে বলে দিলেন। বললেন, কালই এই জমিটা তুমি গণেশের নামে দানপত্র রেজেস্ট্রি করে' দলিলটি হরিরামপুরে গিয়ে ওকে দিয়ে আসবে। জমির চৌহদ্দি, কার কাছে জমিটা আছে—এ সব কথা একটি কাগজে লিখে তুমি আজ ওর হাতে দিয়ে দাও।

এই বলে দক্ষিণাবাবু গণেশের হাতে একশ' টাকার একটি নোট দিয়ে বললেন, এইটি আমার স্ত্রী তোমাকে দিয়েছে। তুমি নাও।

একশ' টাকার নোট আর দশ বিঘে জমির চৌহদ্দির কাগজটি নিয়ে গণেশ তার বাড়ি ফিরে এসেই ডাকলে নারায়ণীকে আর তার মাকে।

নারায়ণীর মার হাতে কাগজ দু'টি দিয়ে বললে, এই নাও, দশ বিঘে জমি আর এই একশটি টাকা। এইটি রোজগার করে' নিয়ে এলাম।

নারায়ণীর মা বললে, রোজগার করে' নিয়ে এলাম বোলো না। বল আমার মা দিলেন। মানুষের হাত দিয়ে তিনিই পাঠিয়ে দেন।

এই বলে গণেশের স্ত্রী কাগজ দু'টি নিয়ে গিয়ে তার লক্ষ্মীর বেদীর ওপর রাখলে। তারপর গলায় কাপড়ের আঁচলটা ফেরতা দিয়ে ঘুরিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে প্রণাম করলে। অনেকক্ষণ পরে মাথা যখন তুললে, দেখা গেল, দু'চোখ বেয়ে তার জল গড়াচ্ছে।

সবই হলো। দু'দিন পরে শক্তিপুর থেকে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে ম্যানেজার নিজে এসে দানপত্র দলিলের একটি কপি দিয়ে বলে গেলেন, দানপত্র রেজেস্ট্রি হয়ে গেছে। মাসখানেক পরে দলিলটা পেলেই আমি দিয়ে যাব। জমির চাষের ব্যবস্থাও করে' দিয়ে গেলেন তিনি।

কিন্তু জমির উৎপন্ন ফসল পেতে তখনও ছ'মাস দেরি। এই ছ'টা মাস গণেশকে কষ্ট করে' চালাতে হবে।

একশ' টাকায় যে-কদিন চলে চলুক বলে গণেশ সেদিন আবার বেরুচ্ছিল গ্রাম থেকে, জমিদার বাড়ির একজন লোকের সঙ্গে রাস্তায় দেখা। লোকটা বললে, এসো তুমি আমার সঙ্গে। বাবু তোমাকে ডাকছেন।

● দুই ভাই
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

গণেশ যেতেই রাজেন্দ্রনারায়ণ বললেন, কি রে শয়তান, তুই বুঝি এখানে এলি আমার সঙ্গে শয়তানি করতে ?

গণেশ যেন আকাশ থেকে পড়লো।

—আপনার সঙ্গে শয়তানি কি করলাম ?

—করলি না ? রাজেন্দ্রনারায়ণ বললেন, জমিটা তোর হাতছাড়া হয়ে গেল বলে' খুঁজে খুঁজে গেলি আমার পরম শত্রু—শক্তিপুরের ওই ব্যাটা দক্ষিণে চাটুজ্যের কাছে। সেখান থেকে ব্যাটার ওই দশ বিঘে জমি লিখিয়ে নিয়ে এলি ?

গণেশ বললে, আমি লিখিয়ে নিয়ে আসিনি আপনি বিশ্বাস করুন, উনি আমাকে দিয়েছেন।

—হ্যাঁ দিয়েছেন ! কি দেনেওলা লোক ! দেবার আর লোক পেলে না, তাই তোকে দিতে গেল ? আমি কিছু বুঝি না—না ?

গণেশ বললে, কি আর বলব বলুন ! আমার আর কিছু বলবার নেই।

—বলবি আবার কি ? বলবার তোর আছে কি ? শোন্ ! কত টাকায় কিনেছিস ?

—আমি কিনিনি। কেনবার টাকা আমার কোথায় ?

—আবার মিছে কথা ? জুতিয়ে মুখ ভেঙে দেবো। মনে নেই সেই মার ? এরই মধ্যে ভুলে গেলি ?

গণেশের এবার রাগ চড়ে গেল। বললে, আজ্ঞে না, ভুলিনি। চিরকাল মনে থাকবে।

রাজেন্দ্রনারায়ণ বললেন, তাহ'লে এক কাজ কর্। শ' দুই টাকা দিচ্ছি, ও-জমিটা তুই আমাকে লিখে দে।

গণেশ বললে, আজ্ঞে না, তা আমি পারব না।

—তা পারবি কেন ? ভাল করে বলছি যে ! যা বেরো, দূর হ' আমার সুমুখ থেকে। দিতে হয় কিনা দেখাচ্ছি পরে।

রাজেন্দ্রনারায়ণ একরকম জোর করেই তাকে ঠেলে বের করে' দিলেন ঘর থেকে।

রাজেন্দ্রনারায়ণের কথার ঠিক আছে। যা বলেন তা' না করে' ছাড়েন না।

গণেশ কি কষ্টে যে ছ'টা মাস পার করলে তা একমাত্র জানলেন তার অন্তর্যামী। কাজোড়া কলিয়ারীতে একজন ঠিকাদারের কাছে একটা কাজ পেয়েছিল। মাসখানেক পরেই সে কাজটা

● দুই ভাই
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

গেল। আবার ছুটলো আর-এক জায়গায়। দশ দিন কাজ করে তো বসে থাকতে হয় পনেরো দিন। এমনি করে' কাটিয়ে দিলে কয়েকটা মাস।

দক্ষিণাবাবুর দেওয়া দশ বিঘে জমিতে ধান হয়েছে চমৎকার। এত ধান গ্রামের কোনও জমিতে হয়নি। গ্রামের সব চেয়ে সেরা জমি।

মাঠের পাকা ধানে তখনও কেউ হাত দেয়নি, এমন দিনে রমণ মোড়ল কাঁদতে কাঁদতে এসে খবর দিলে, সর্বনাশ হয়ে গেছে বাবু, দশ বিঘে জমির ধান একটি নেই। সব কেটে নিয়ে চলে গেছে।

সে কি? গণেশ ছুটলো। গ্রাম থেকে দূরে নদীর ধারে বেশ নির্জন জায়গায় একবন্দে দশ বিঘে জমি। গিয়ে দেখে সত্যিই তাই। মাঠে একটি ধান নেই।

গণেশের বুঝতে বাকি রইলো না—কে এ কাজ করেছে। রমণ মোড়ল বললে, পুলিস-থানায় খবরটা দিয়ে আসি বাবু।

গণেশ বললে, না। এর কোনও প্রতিকার করতে পারবে না কেউ। না পারবে পুলিস, না পারবো আমরা! প্রতিকার যিনি করতে পারবেন তাকে জানিয়ে দে। ভগবানকে বল্!

গণেশ সোজা চলে গেল শক্তিপুর।

দক্ষিণা চাটুজ্যেকে গিয়ে বললে, জমিটে আমাকে আপনি বৃথাই দিলেন। জমির সমস্ত ধান কেটে নিয়েছেন আমাদের জমিদার রাজেনবাবু।

দক্ষিণাবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে' বসে রইলেন। বললেন, জমিটা তোমাকে দেওয়াই আমার অন্যায় হয়েছিল। ওই জমির ওপর রাজেন্দ্রনারায়ণের লোভ অনেকদিনের। ভেবেছিলাম তুমি গ্রামের মানুষ তার ওপর তোমার শরীরে শক্তি আছে, তোমাকে কিছু বলবে না।

গণেশ বললে, আমাকে দুশ' টাকা দিতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন জমিটা আমাকে তুই বিক্রি করে' দে।

হাসলেন দক্ষিণা চাটুজ্যে। বললেন, মানুষের লোভ যখন প্রচণ্ড হয়, মানুষ তখন অন্ধ হয়ে যায়।

এই বলে তিনি গণেশকে বললেন, তুমি এক কাজ কর গণেশ, তোমার স্ত্রী আর কন্যাকে এইখানে নিয়ে এসো। আমি তোমাদের ছোট একখানা বাড়ি দিচ্ছি, সেইখানে এসে থাকো। তোমরা তিনটি তো প্রাণী, তোমাকে পঞ্চাশ ষাট টাকার চাকরি একটা আমি অনায়াসে দিতে পারবো।

শেষ পর্যন্ত তাই হলো। দক্ষিণাবাবু তাঁর গাড়ি পাঠিয়ে দিলেন হরিরামপুরে। সেই গাড়িতে চড়ে গণেশ সপরিবারে শক্তিপুরে চলে এলো।

● দুই ভাই
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

দক্ষিণাবাবুর বাড়ি থেকে একটু দূরে হাটতলার পাশে কর্মচারীদের জন্য ছোট ছোট কয়েকখানা বাড়ি ছিল, তারই একটা খালি করিয়ে রেখেছিলেন দক্ষিণাবাবু। সেই বাড়িতেই এসে উঠলো তারা তিনজনে।

কয়েকদিন আগে দক্ষিণাবাবুর শালা হীরালালবাবু তাঁর স্ত্রীপুত্র নিয়ে এসেছেন। শক্তিপুরে কয়েকদিন থাকবার ইচ্ছে।

হীরালালবাবু এক অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ। দিবারাত্রি শুধু ছেলের গল্প। একটিমাত্র ছেলে—মানিক, বি-এ পাস করেছে। ইচ্ছে ছিল বিলেত পাঠিয়ে তাকে ব্যারিস্টার করে আনবেন। কিন্তু তার মা কিছুতেই ছেলেকে বিলেত যেতে দেবেন না। তাঁদের বাড়ির কাছে গড়গড়ি রেল-স্টেশনে মস্ত বড় বাজার। মানিক সেই বাজারে এক মাড়োয়ারীর গদিতে একটা চাকরি নিয়েছে। ইংরেজীতে তাদের চিঠিপত্র লিখে দেয়, আরও কি-সব করে। মাসে তারা দু'শ' টাকা মাইনে দেয়। ছেলের মা তাইতেই খুশী। বলে, একটিমাত্র ছেলে, চোখের সামনে থাকবে। এই যথেষ্ট।

সেদিন সকালে বাইরের ঘরে বসে বসে দুই শালা-ভগ্নীপতি গল্প করছিলেন। দক্ষিণাবাবু বললেন, ছেলেকে বিলেত পাঠাবো বিলেত পাঠাবো বলছো, সেখানকার খরচ জানো? অত টাকা কোথায় পাবে? নিজের অত অত টাকা দিয়েছ তো শেষ করে'।

হীরালাল বললেন, টাকা তুমি দেবে।

দক্ষিণাবাবু বললেন, না, আমি অনেক টাকা দিয়েছি তোমাকে। আর দেবো না।

হীরালাল বললেন, দেবে না তো দেবে না! আর দিতেও হবে না। মানিকের মা ওকে বিলেত যেতে দেবে না। আবার কাল থেকে কি বলছে জানো?

—কি বলছে?

—বলছে, রাত্রে উনি এক স্বপ্ন দেখেছেন। ঠাকুর নাকি একটি কুটফুটে সুন্দর মেয়েকে সঙ্গে করে এনে ওঁর হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন এই নে তোর বৌ নে।

দক্ষিণাবাবু হো হো করে' হেসে উঠলেন। বললেন, তার মানেই এইবার ওঁর মনে সাধ জেগেছে ছেলের বিয়ে দেবার।

হীরালালবাবু বললেন, ওরে বাবা! সেসব কথা বলবার উপায় নেই। কই তুমি একবার বোলো দেখি যে, মনের ইচ্ছাই তোমার স্বপ্নে ঠাকুর হয়ে দেখা দিয়েছেন—তেড়ে মারতে আসবে। ঠাকুর ঠাকুর করেই গেলেন!

● দুই ভাই
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ঠিক এমনি সময় ঘোড়ার গাড়িটা ফিরে এলো। গাড়ি থেকে নামলো একা গণেশ। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে দু'জনকেই। বললে, আমরা এলাম।

দক্ষিণাবাবু বললেন, একবারে ওইখানে গিয়েই উঠলে? প্রথমে এখানে আসতে বলেছিলাম যে! আমার বাড়িতে দু'দিন থেকে তারপর যেতে ওখানে।

গণেশ বললে, ঘর-সংসার আগে গুছিয়ে নিক, তারপর আসবে। আপনার বাড়িতেই তো রইলাম।

দক্ষিণাবাবু বললেন, সংসার গুছোবার কিচ্ছু নেই। তোমরা আসবার আগে আমার স্ত্রী আর হীরালালের স্ত্রী দু'জনে গিয়ে সব গুছিয়ে দিয়ে এসেছে।

—সে তো দেখেই এলাম। উনোনে কয়লা পর্যন্ত দেওয়া রয়েছে। ভাঁড়ারে জিনিসপত্র সাজানো, বঁটি, আনাজ, শিলনোড়া—কিচ্ছুটি বাকি নেই। গণেশ বললে, ও-সবের জন্যে কোন ভাবনা নেই, আমার স্ত্রীর ভাবনা শুধু লক্ষ্মীর আটন কোথায় বসাবে। ভাঁড়ার ঘরের একটা দিক পরিষ্কার করে' দিয়ে তবে আসছি।

হীরালালবাবু বললেন, মেয়েদের এ একটা রোগ। উনপঞ্চাশ বায়ুর মধ্যে এও একটা বায়ু।

দক্ষিণাবাবুর গিন্নী নিজেই গিয়েছিলেন তাঁর ভাজকে সঙ্গে নিয়ে গণেশের সংসার দেখতে খেয়ে দেয়ে গিয়েছিলেন পানের বাটা হাতে নিয়ে, ফিরে এলেন সন্ধ্যায়।

ফিরে এসেই হীরালালবাবুর স্ত্রী ডেকে পাঠালেন হীরালালবাবুকে। তারপর চুপি চুপি অনেকক্ষণ ধরে কি সব তাঁদের কথাবার্তা হলো। প্রথমে হীরালালবাবুও অবশ্য কথা বলছিলেন চাপা গলায়, কিন্তু শেষের দিকে তাঁর গলা যেন ধাপে ধাপে উঠতে লাগলো। মনে হলো যেন তিনি রেগে গেছেন।

বাইরে যখন বেরিয়ে এলেন, মুখখানা দেখে মনে হলো যেন সত্যিই তিনি রাগ করেছেন।

দক্ষিণাবাবুর সঙ্গে তাঁর দেখা হতেই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। হীরালালবাবু বললেন, তোমার এখানে না এলেই যেন ভাল হতো।

—কেন, কি হয়েছে?

—হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু! সেই যে বললাম উনি স্বপ্ন দেখেছেন—ঠাকুর ওঁকে একটি রাঙা টুকটুকে বৌ দিয়ে গেছেন, তোমার ওই গণেশের মেয়েটার সঙ্গে নাকি ওঁর স্বপ্নে-দেখা মেয়েটির হুবহু মিল!

দক্ষিণাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, গণেশের মেয়ে কি দেখতে ভাল?

● দুই ভাই
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

—আমি কি দেখেছি নাকি ছাই! তুমিও যেখানে আমিও সেইখানে।

দক্ষিণাবাবু বললেন, তাহ'লে ছাখো মেয়েটিকে। পছন্দ যদি হয় তো দাও লাগিয়ে।

—ছি ছি ছি, তুমি কি করে' বলছো এ-কথা? আমার ওই বি-এ পাস রাজপুত্রের মত ছেলের বিয়ে দেবো তোমার ওই লোকটার মেয়ের সঙ্গে?

দক্ষিণাবাবু বললেন, দোষ কি? তুমি তো মেয়ের বিয়ে দিচ্ছ না, দিচ্ছ ছেলের।

—যাও। তোমার সঙ্গে কোনও কথা বলা চলে না।

এই বলে থেমে গেলেন হীরালালবাবু।

কিন্তু হীরালালবাবু থামলে কি হবে, তাঁর গৃহিণী থামলেন না।

নারায়ণীকে প্রায়ই আনতে লাগলেন এ-বাড়িতে এবং বাড়ি ফিরে যাওয়া স্থগিত রাখলেন। এ-রকম ঘটনা মানুষের জীবনে খুব কমই ঘটে। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই চেহারা—ঠিক সেই স্বপ্নে দেখা মেয়েটি! ঠাকুর যেন নারায়ণীকেই তাঁর হাতে তুলে দিয়ে গেছেন। এ তাঁর ঠাকুরের আদেশ।

হীরালালবাবু বলেন, না না এ তোমার ঠাকুরের আদেশ নয়, তোমার মনের ভুল।

এ অপবাদ অসহ্য।

হীরালালবাবুর স্ত্রী বিনোদিনী তখন প্রতিজ্ঞা করে' বসলেন, ছেলের বিয়ে না দিয়ে তিনি শক্তিপুর থেকে নড়বেন না।

হীরালালবাবু হার মানতে বাধ্য হলেন।

চমৎকার মেয়ে নারায়ণী। যেমন মিষ্টি চেহারা, তেমনি মিষ্টি তার স্বভাব।

শেষ পর্যন্ত হীরালালবাবু রাজী হলেন।

রাজী হলেন এক শর্তে—নারায়ণীকে নিয়ে যাবেন ছেলের বৌ করে' কিন্তু এই যাওয়াই তার শেষ যাওয়া। বাপ-মার কাছে আর পাঠাবেন না।

গণেশের স্ত্রী তার লক্ষ্মীর বেদীর সুমুখে আছাড় খেয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলো—এ কি করলি মা? তার ওই একটিমাত্র নয়নের মণি নারায়ণী! তাকে কি মার কোল থেকে কেটে ছিঁড়ে চিরজন্মের মত নিয়ে না গেলে তুই শান্তি পাচ্ছিস না?

গণেশ হাতজোড় করে' দাঁড়ালো গিয়ে দক্ষিণাবাবুর কাছে।—আপনার জন্যেই আমার এই সৌভাগ্য। কিন্তু মেয়েটাকে জীবনে আর কখনও দেখতে পাব না?

চোখ দুটো তার জলে ভরে এলো।

● দুই ভাই

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

দক্ষিণাবাবু বললেন, খুব যখন দেখতে ইচ্ছে করবে তুমি নিজে গিয়ে দেখে আসবে মেয়েকে

—আমি নাহয় গেলাম! গণেশ বললে, নারায়ণীর মার পক্ষে যাওয়া তো সম্ভব হবে না!

দক্ষিণাবাবুর স্ত্রী এর মীমাংসা করে' দিলেন। বললেন, মানিক মাঝে মাঝে নারায়ণীকে সঙ্গে নিয়ে আমার বাড়ি আসবে, তাহ'লেই হবে।

হীরালালবাবু বিপদে পড়ে গেলেন। এবার আর না বলতে পারলেন না। বললেন, একদিনের বেশী থাকবে না কিন্তু।

দক্ষিণাবাবু বললেন, তাই হবে। এখন বিয়েটা হয়ে যাক। তুমি কি নেবে তাই বল হীরালাল।

হীরালালবাবু বুঝতে পারেননি কথাটা। জিজ্ঞাসা করলেন, তার মানে?

—মানে—আমাকেই সব দিতে হবে। কারণ যে তোমার বেয়াই হবে তার যে কিছু নেই বোধহয় তুমি জানো সেকথা।

ভাল একটি দিন দেখে বিয়ে হয়ে গেল নারায়ণীর।

দক্ষিণাবাবু সোনার গহনায় মুড়ে দিলেন নারায়ণীকে। হীরালালবাবুর কোন ক্ষোভই রাখলেন না

—শেষে যে বলবে কিছু না নিয়েই গণেশকে তুমি কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করেছ সেকথা বলবার সুযোগ তোমাকে আমি দেবো না।

ছেলে বৌ নিয়ে তারা চলে গেল।

গণেশের বাড়ি একেবারে ফাঁকা।

নারায়ণীর মা বসলো পুজো নিয়ে আর গণেশ তন্ময় হয়ে উঠলো দক্ষিণাবাবুর কাজ নিয়ে।

কিছুদিন পরে গণেশ একদিন দক্ষিণাবাবুকে বললে, আমাদের এখানে থাকা বোধহয় উচিত হচ্ছে না। আমরা কি হরিরামপুরে ফিরে যাব?

দক্ষিণাবাবু বললেন, তোমার মেয়ে জামাই কিন্তু আসবে আমার বাড়ি, হরিরামপুরে যাবে না—সেকথা ভুলে যেয়ো না।

কাজেই গণেশের আর হরিরামপুরে যাওয়া হলো না।

যে-নারায়ণী ছিল তার সব সময়ের সঙ্গিনী, সেই নারায়ণীকে একটিবার দেখবার জন্য মায়ের মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

একটি বছর পার হতে চললো, নারায়ণীর চিঠি আসে মাঝে মাঝে কিন্তু এখানে আসার কথা কিছুই সে লেখে না।

● দুই ভাই
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

নারায়ণীর মা তার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে, এবার একটিবার আসবার কথা লিখবো নারায়ণীকে ?

—না, লিখো না। গণেশ বলে, বেয়াই শুনলে রাগ করবে।

শেষে কিছুতেই আর মানা মানে না মায়ের মন। আশ্বিন মাস। হাতে পুজো। নারায়ণীর মা চিঠিতে লিখলে, পুজোর ক'টা দিন যদি আসতে পারিস মা, তো বড় ভাল হয়।

লিখে কেটে ফেললে। আবার লিখলে।

লিখে চিঠিখানি ডাকে দিয়ে কাঁদতে বসলো।

নারায়ণীর কাছ থেকে জবাব এলো। নারায়ণী লিখেছে, পুজোর সময় এঁরা কিছুতেই আমাকে পাঠাতে চাচ্ছেন না মা, তুমি কিছু মনে কোরো না। তোমাকে একটিবার দেখবার জন্যে আমারও মন বড় ছটফট্ করছে। যাই হোক, অনেক কষ্টে আমি আমার শাশুড়ীর মত করেছি। তিনি বলেছেন, বিজয়ার পরের দিন আমি গিয়ে তোমাকে প্রণাম করে' আসব।

—ওগো শুনছো ?

গণেশ সবে তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, নারায়ণীর মা ছুটে গিয়ে তার হাতে চিঠিখানি দিয়ে বললে, পড়ে ছাখো, নারায়ণী কি লিখেছে।

—কি লিখেছে ?

নারায়ণীর মা আর জবাব দিতে পারলে না। আনন্দে তার চোখে তখন জল এসে গেছে, মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না।

পুজোর ষষ্ঠী।

সারা গ্রাম আনন্দ কলরবে মুখরিত হয়ে উঠেছে। আনন্দ নেই শুধু নারায়ণীর মার মনে। গণেশ গেছে পুজোর পুষ্পাঞ্জলি আনতে। নারায়ণীর মা লক্ষীর বেদীর সুমুখে শুয়ে শুয়ে ভাবছিল নারায়ণীর কথা। ভাবতে ভাবতে বোধহয় সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ তার কানে এলো পরিচিত কণ্ঠস্বর : মা !

কিন্তু ঘুম তখনও বোধকরি তার ভাঙেনি। মনে হলো বুঝি স্বপ্ন দেখছে।

গায়ে হাত পড়তেই চোখ চেয়ে তাকাল। তাকিয়েই দেখে, নারায়ণী তার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে বলছে, মা গো, তাকিয়ে ছাখো আমি এসেছি।

মা তার ধড়মড় করে' উঠে বসলো। নারায়ণী তখন তার কোলের উপর শুয়ে পড়েছে।

—মুখখানি কতদিন দেখিনি বল দেখি ? মুখে গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করে' মা বললে, তবে যে লিখলি একাদশীর দিন আসবি ?

● দুই ভাই

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

—না মা আমি থাকতে পারলাম না। আগেই চলে এলাম ঝগড়া করে'।

—ঝগড়া করে' এলি কি রে? জামাই কোথায়? ও-বাড়িতে?

—না। আমি একাই চলে এসেছি রাগ করে'।

—সে কি সব্বনেশে কথা! কিছু হবে না তো?

মা যেন ভয়ে কাঁপতে লাগলো।



মা গো, তাকিয়ে ভাখো আমি এসেছি। [পৃষ্ঠা ৩৮৯

খিল্ খিল্ করে' হেসে উঠলো নারায়ণী: না না কিছু হবে না। তুমি ভেবো না তো! নাও ওঠো। সকাল থেকে উপোস করে' আছ, কিছু খাওনি, মুখখানা শুকিয়ে গেছে। আমি তোমাকে সরবত করে' দিই, তুমি খাও।

মা উঠে দাঁড়ালো: তোর মুখখানি দেখে আমি সব ভুলে গেছি। তোকেই বরং একগ্লাস সরবত করে' দিই। আমি পরে খাব। তোর বাবা গেছে পুজোর ফুল আনতে। আসুক।

নারায়ণী বললে, আজ উপোস কেন করেছ মা? উপোস তো করে অষ্টমীর দিনে। তোমার সবই বাড়াবাড়ি।

চিনির সরবত তৈরি করে' লেবু দিয়ে যত্ন করে' গ্লাসটি মা তার মুখের কাছে তুলে ধরলে, নে' খা। বললে, উপোস তোর জন্যেই করেছি মা। তোর মঙ্গলের জন্যে।

নারায়ণী জেদ ধরে বসলো, তুমি খাও তবে খাব। ওই গ্লাসে একটু চুমুক দিয়ে দাও। আমার জন্যে আর তোমাকে উপোস করতে হবে না। এই তো আমি এসেছি।

—আমার সেই নারাণী!—মা তাকে আদর করে' জড়িয়ে ধরলে।—তাই কি হয় রে পাগলী, তোর বাবা আসুক।

—কই, কোথায় তুমি? গণেশ এলো বোধহয়।

● দুই ভাই

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

—ওই তো বাবা এসেছে ! বাবা ! আমি এসেছি।

গণেশ ঘরে ঢুকলো।—নারাণী ! তবে যে লিখেছিলি পুজোর পর আসবি ?

নারায়ণী বললে, মা যে কাঁদছিল বাবা। আমি বুঝতে পারছিলাম যে !

পুজোর পুষ্প দিয়ে জল খেলে নারায়ণীর মা। নারায়ণী তখনও পর্যন্ত সরবতের গ্লাসটি হাতে নিয়ে বসেছিল। বললে, দাও এবার একটু চুমুক দিয়ে দাও।

পাগলী মেয়ে ! মেয়ের আব্দার রাখতে হলো মাকে।

নারায়ণী বললে, বাবা, তুমি যেন কাউকে বোলো না আমি এসেছি।

গণেশ জিজ্ঞাসা করলে, কেন রে ?

নারায়ণীর মা তাকে চুপি চুপি বললে, মেয়ে তোমার রাগ করে' ঝগড়া করে' একাই চলে এসেছে। শুনে তো আমি ভয়ে কাঠ !

নারায়ণী বললে, মা ভারি ভীতু। যেদিন নিতে আসবে সেইদিনই চলে যাব। তাহ'লেই হবে।

আলো ঝলমল রূপ নিয়ে নারায়ণী ঘুরে বেড়াতে লাগলো মায়ের পিছু-পিছু।

ঘরের কাজকর্ম মাকে কিছুই করতে দেবে না।

মা বলে, দু'দিনের জন্যে এসেছিস মা, হাত-পা ছড়িয়ে একটু বোস। তা না খেটে খেটে মরছিস দিনরাত।

নারায়ণী হাসে আর বলে, তুমি দ্যাখো না মা আমি কেমন কাজ করতে শিখেছি। শাশুড়ী আমার ওপর ভারি খুশী।

—শাশুড়ীই তো জোর করে' বিয়ে দিয়েছে মা, তা নইলে কি তোর বাবার সাধ্যি ছিল ওই বাড়িতে তোর বিয়ে দেবার !

এমনি করে' মায়ে-মেয়েতে কত কথা ! কত হাসি, কত দুঃখের কাহিনী !

ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী—চারটি দিন কোন্‌দিক দিয়ে যে পার হয়ে গেল কে জানে ! দীর্ঘ বিরহের পর মা যেন তার নারায়ণীকে নতুন করে' পেয়েছে মনে হতে লাগলো।

মেয়ে তার সুখী হয়েছে এইতেই মায়ের আনন্দ যেন আর ধরে না !

কিন্তু দশমীর দিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর শ্বশুরবাড়ি থেকে নারায়ণীর পাল্‌কি এসে হাজির !

নারায়ণীর মা বললে, ও মা, সেকি ? আজ যে বিজয়া দশমী ! আজ কি যেতে আছে বাড়ি থেকে ?

নারায়ণী বললে, তা হোক মা, তুমি আপত্তি কোরো না, আমি যাই। নইলে আবার,—বুঝতেই তো পারছো—

● দুই ভাই

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

—তাও সত্যি। কিন্তু হ্যাঁ মা, বেয়ানঠাকরুন জেনেশুনে আজ পাল্‌কিটা পাঠালে কি বলে ?

—সে তোমরা দুই বেয়ানে বুঝে নিও মা, আমাকে যেতেই হবে।

মাকে প্রণাম করলে নারায়ণী। বাবাকে প্রণাম করলে।

মা কাঁদছিল। নারায়ণী আঁচল দিয়ে তার চোখের জল মুছে দিয়ে বললে, কেঁদো না মা। এই ছাখো, আমি কাঁদছি না। এবার থেকে তুমি যখনই আমাকে দেখতে চাইবে আমি চলে আসবো।

এই বলে চট্ করে' নারায়ণী গিয়ে পাল্‌কিতে উঠলো।

হাজার হলেও মায়ের মন—বিজয়া দশমীর দিন মেয়ে চলে গেল বাড়ি থেকে, মনটা কেমন যেন ভারি হয়ে উঠলো। আবার গিয়ে তার লক্ষ্মীর আটনের কাছে হাতজোড় করে' বসলো। দু'চোখ বেয়ে দর দর করে' জল গড়িয়ে এলো।

কিন্তু এত দুঃখের মাঝেও সারা মন তার ভরে রইলো বিগত চারটি দিনের নিবিড়তম সাহচর্যের আনন্দময় স্মৃতিতে।

কিন্তু কে জানতো যে এমন একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটে যাবে একাদশীর দিন সকালে।

দশমীর রাত্রে টেলিগ্রাম পেয়ে একাদশীর দিন ভোরে দক্ষিণাবাবু গাড়ি পাঠিয়েছিলেন ময়নাবুনি স্টেশনে।

সেই গাড়ি এসে দাঁড়ালো গণেশের বাড়ির দরজায়।

গাড়ি থেকে নামলো মেয়ে আর জামাই। নারায়ণী আর মানিক।

নারায়ণীকে দেখেই গণেশ বলতে যাচ্ছিল—আবার ফিরে এলি ? কিন্তু নারায়ণীর মা কথাটা তাকে বলতে দিলে না। গণেশের হাতে একটা চাপ দিয়ে বললে, চুপ !

নারায়ণী ছুটে এসে মাকে প্রণাম করলে, বাবাকে প্রণাম করলে। বললে, ছাখো মা, একাদশীর দিন আসবো লিখেছিলাম, ঠিক এসেছি।

গাড়ির মাথার ওপর ছিল চামড়ার একটা সুটকেস। মানিক কোচম্যানকে বললে, ওটা ও-বাড়িতে নিয়ে যাও।

এই বলে গাড়িটা ফিরিয়ে দিয়ে বাড়িতে এসে ঢুকলো। শ্বশুরকে প্রণাম করলে, শাশুড়ীকে প্রণাম করলে। বললে, নারায়ণী পিসিমার বাড়িতে যেতে চাইলে না, বললে, মাকে বাবাকে আগে প্রণাম করবো। তাই গাড়িটা প্রথমে এখানেই নিয়ে এলাম।

গণেশ জিজ্ঞাসা করলে, তোমার মা বাবা ভাল আছেন ?

● দুই ভাই
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

মানিক বললে, হ্যাঁ। নারায়ণী থাক এইখানে। আমি আসছি ও-বাড়ি থেকে।

মানিক চলে গেল।

নারায়ণীকে নিয়ে তার মা তখন ঘরে গিয়ে ঢুকেছে। দু'হাত দিয়ে তার মুখখানি তুলে ধরে একদৃষ্টে সেইদিকে তাকিয়ে আছে। দু'চোখ জলে ভরে এসেছে। মুখ দিয়ে একটি কথাও বলতে পারছে না। সমস্ত শরীর শুধু বারবার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে।

নারায়ণী বললে, তুমি অমন করছো কেন মা? কথা বলছো না, কাঁপছো থর্ থর্ করে'—

মা অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করলে। চোখের জল মুছে বললে, না কিছু না। আয়। বোস। কতদিন পরে দেখলাম তোকে—

আসল কথাটা গোপন করে' গেল নারায়ণীর মা। স্বামীকেও বারণ করে' দিলে কাউকে বলতে। যে-কথা কাউকে বলবার নয়, কাউকে বুঝাবার নয়, সে কথা মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে রইলো এই দুই স্বামী-স্ত্রীর।

একাদশীর দিন এলো, দ্বাদশীর দিন থেকে ত্রয়োদশীর দিন চলে গেল নারায়ণী। মানিক নিয়ে গেল। প্রথমতঃ তার চাকরির ছুটি নেই, দ্বিতীয়তঃ বাবার হুকুম নেই।

যাবার সময় নারায়ণী খুব খানিকটা কাঁদলে। কিন্তু তার মার কান্না তখন বন্ধ হয়ে গেছে। তার নারায়ণী তো আঁচল দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলে গেছে, তুমি কেঁদো না মা। যখনই তুমি আমাকে খুঁজবে তখনই আসবো। তবে আর কান্না কেন?

হরিরামপুর থেকে একদিন একটা লোক এলো। গণেশকে বললে, জমিদারবাবু আপনাকে ডেকেছেন। আপনি চলুন।

আবার সেই হরিরামপুরের জমিদার রাজেন্দ্রনারায়ণের ডাক! যেতে ইচ্ছেও করে না, ভরসাও হয় না, তবু গণেশ গেল।

এবার কিন্তু লক্ষ্য করলে এক বিচিত্র ব্যাপার। কাছারিবাড়িতে না বসিয়ে গণেশকে নিয়ে যাওয়া হলো ঠাকুরবাড়িতে। মার্বেল পাথর দিয়ে বাঁধানো ঠাকুরবাড়ির দালানে আসন বিছিয়ে গণেশকে বসিয়ে দেওয়া হলো।

কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল রুপোর থালায় নানারকমের খাবার নিয়ে এসে দাঁড়ালো অবগুণ্ঠনবতী এক মহিলা। পেছনে দাসী এনেছে রুপোর গ্লাসে জল।

গণেশ অবাক হয়ে গেল। এই ঠাকুরবাড়ির ওই থামে বেঁধে তাকে একদিন জুতো মারা

হয়েছিল। আজ সেইখানে বসিয়েই তাকে সমাদর করা হচ্ছে। এও কি সেই বিচিত্ররূপিণী মা নারায়ণীর খেলা? কথাটা ভাবতেই তার সারা অঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। আজকাল কি যে হয়েছে তার, যে-চোখে জল সহজে আসতো না—সেই চোখ যেন জলে ভরেই থাকে। কন্যারূপিণী নারায়ণীকে মনে পড়ে যায়। কারও ওপর কোনও রাগ বা বিদ্বেষের এতটুকু চিহ্ন পর্যন্ত কোথাও খুঁজে পায় না। ক্ষমাসুন্দর একটি অপরূপ অনুভূতি যেন সমস্ত অন্তঃকরণকে অভিভূত করে' রাখে।

অবগুণ্ঠনবতী মহিলা তাঁর মাথার কাপড় একটুখানি তুলে দিয়ে বললেন, আমাকে তুমি চিনবে না বাবা, আমি এ-বাড়ির গৃহিণী। আমার স্বামী তোমার ওপর অনেক অবিচার করেছেন। শুধু তোমার ওপর নয়, অনেকের ওপর করেছেন। আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।

গণেশ বললে, কেন মা?

—মা বলে যখন ডাকলে বাবা, তখন তোমাকে বলি শোনো। আমার থাকবার মধ্যে আছে মাত্র একটি মেয়ে। একটি ছেলে ছিল, মরে গেছে। মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম গত বৎসর। এই বছর পুজোর আগে তার সর্বনাশ হয়ে গেছে। বিধবা হয়ে ফিরে এসেছে আমার সেই একমাত্র মেয়ে।

এই বলে তিনি তাঁর দাসীকে হুকুম করলেন, মালতীকে ডেকে দে। এসে প্রণাম করুক।

দাসী চলে যাবার পর জমিদার গৃহিণী আবার বললেন, কি পাপে যে কি হয় বাবা কিছু বলা যায় না। এই যে মন্দির দেখছো, আমার শ্বশুর এই দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। করেছিলেন দেবতার ওপর ভক্তির জন্যে নয়, অপহরণ-করা কিছু সম্পত্তি দেবোত্তর করবার জন্যে। আমি নিজে একদিন স্বপ্ন দেখলাম, এই মন্দিরের দেবতা আমাকে বলছেন, তোর স্বামীর পাপে তোর সং-কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। এখনও সময় আছে। এখনও তার প্রায়শ্চিত্ত কর্। কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিলেন আমার স্বামী। বললেন, স্বপ্ন কিছুই নয়, ও তোমার মনের কল্পনা। তার পরেই আরম্ভ হলো আমাদের সর্বনাশ। আমার মেয়ে বিধবা হয়ে ফিরে এলো। আমার স্বামী সিঁড়ি থেকে পড়ে খোঁড়া হয়ে পড়ে রইলেন। এখনও তিনি শয্যাশায়ী।

এমন সময় তাঁর সদ্যবিধবা কন্যা মালতী এসে দাঁড়ালো তার কাছে। হাঁটু গেড়ে বসে প্রণাম করলে গণেশকে। নিরাভরণা শুভ্রবসনা সুন্দরী যুবতী।

জমিদার গৃহিণী বললেন, তোমাকে আমি কিছু দিতে চাই বাবা, তোমাকে নিতে হবে। তোমার বাড়িটি আমি ভাল করে' তৈরি করে' দেবো আর পঁচিশ বিঘে জমি দান করবো। তুমি কিছুতেই না বলতে পাবে না। এই আমার অনুরোধ।

● দুই ভাই

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

দান গ্রহণ করবার ইচ্ছা গণেশের ছিল না, তবু এই ভদ্রমহিলার সনির্বন্ধ অনুরোধ সে প্রত্যাখ্যান করতে পারলে না। সম্মতি দিতে হলো।

হরিরামপুরে এলোই যখন, গণেশ ভাবলে, নিজের বাড়িটা একবার দেখে যাই। গিয়ে দেখে, সেখানেও এক বিচিত্র ব্যাপার। বাড়িতে লোকজন বাস করছে বলে মনে হলো।

উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরের কাছে গিয়ে দেখলে, একটি মেয়ে বসে বসে রান্না করছে, আর দু'টি ছোট ছোট ছেলে এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে।

মেয়েটিকে প্রথমে সে চিনতেই পারেনি। মুখ তুলে যখন কথা বললে তখন অবাক হয়ে গেল। দেখলে তার সেই মেম-সাহেব বৌদিদি। কার্তিকের স্ত্রী। সে যে এইরকম দীনদরিদ্র বেশে এখানে বসে রান্না করবে তা সে কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি।

বৌদিদি তার বেশি কথা বললে না। বললে, ত্যাখো ঠাকুরপো, নিজের পৈতৃক বাড়িঘরদোর ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। আমরা তাই এইখানে এলাম বাস করতে। আমাদের অর্দ্ধেক ভাগ তো আছে।

গণেশ জিজ্ঞাসা করলে, দাদা কোথায়?

বৌদিদি বললে, দাদা তোমার আসেনি।

বড় ছেলেটা এতক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁ করে' তাদের কথাবার্তা শুনছিল। এতক্ষণে পরে সে কথা বললে। বললে, মা ভারি মিছে কথা বলে।

মা তাকে চীৎকার করে' ধমক দিয়ে থামাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না থামাতে। ছেলেটা গণেশের কাছে এসে বললে, বাবার যে পাঁচ বছর জেল হয়েছে, আসবে কেমন করে'! বাবা কলিয়ারীর টাকা চুরি করেছিল।

গণেশ পাথরের মত শক্ত হয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলো।

মণি ও মুক্তা

ন কালস্য প্রিয়: কশ্চিন্ন দ্বেষ্য: কুরুসত্তম।
ন মধ্যস্থ: ক্বচিৎ কাল: সর্বং কাল: প্রকর্ষতি।

মহাভারত—ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুর

পুত্রশোকে অধীর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বিদুর বলছেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ, কাল কাউকে ভালবাসে না, কাউকে ঘৃণা করে না। কোন ঘটনাতেই কাল মধ্যস্থ থাকে না, সে সকলকে সমানভাবেই আকর্ষণ করে।



বিজয়ার পর দিগ্বিজয়!

শিবরাম চক্রবর্তী

পুজোর হিড়িক যে শেষ পর্যন্ত এমন হিড় হিড়িক হয়ে পড়বে তা কে জানত! বাড়ির ফেরারী জ্ঞান করে ফের বাড়িতে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাওয়াতে নকুড় মামার সঙ্গে আমার যে জন্মের মত আড়ি হয়ে যাবে তাইকি আমি ভাবতে পেরেছিলুম!

ঝুলু আর আমি সেবার সন্ধ্যে থেকেই প্রতিমাভাসান দেখতে লেগেছিলুম। আহা, দুর্গাপুজোর কদিন কী ফূর্তিতেই না গেল! সারা কলকাতা প্রতিমা দেখে দেখে আর প্রসাদ চেখে চেখে তারপর অবশেষে, বিজয়ার দিন, শ্যামবাজার থেকে শুরু করে প্রতিমার শোভাযাত্রা দেখতে দেখতে, গোটা কলকাতা সারা করে কেওড়াতলায় এসে খতম্ করা গেল। রাত তখন সাড়ে এগারোটা।

ঝুলু বললে, 'বিজয়া তো বেশ হোলো, এবার বিজয়োৎসবে লাগা যাক্!'

'এই—এত রাত্তিরে?' আমি বললাম, 'মাসীপিসীদের কেউ কি এখনো জেগে বসে আছে নাকি আমাদের জন্যে? আমাদের মিষ্টিমুখ করাতে?'

মা দুর্গার দয়ায় মাসী পিসী মামী কাকীর আমাদের অভাব নেই, আর মা লক্ষ্মীর কৃপায় কেউ তাঁরা কৃপণ নন। সকলেই খেয়ে ফতুর, আর খাওয়াতে পাগল, কিন্তু এত রাত্তিরে গিয়ে দরজার কড়া নেড়ে তাঁদের ঘুম ভাঙালে কৃপাণ যদি হাতের কাছে তাঁরা নাও পান, হাতা খুন্তি যা পাবেন, তাই নিয়ে তাড়া করবেন নির্ঘাত।

'তাহলে, কাল সেই ভোরে উঠেই প্রণাম করতে বেরুনো যাবে, কি বলো শিব্রামদা?' ঝুলু শুধোয়।

'না, কালকে নয়। কাল সকালে তো নয়ই। অত সকালে গেলে শুধু জিলিপি খাইয়েই ছেড়ে দেবে। কিংবা মতিচুর খেয়ে ফিরতে হবে। ভরপেট সন্দেশ খেয়ে চুর হয়ে ফেরা যাবে না। অত সকালে তখন কি আর ভাল খাবার মেলে রে? আমি বলি কি, কলকাতার মাসীপিসীদের এখন আক্রমণ করে কাজ নেই। এ'কদিন কলকাতায় সন্দেশের দর হবে বেজায়। দশ টাকা সেরের তো কম না। সে সন্দেশ কেউ কাউকে প্রাণ ধরে খাওয়াতেও পারবে না—প্রাণ ভরে খেতেও পাবো না। তার চেয়ে আমি বলি কি—'

আমার প্ল্যানটা শুনে জুলু তো লাফিয়ে ওঠে—'তুমি বলছো আগে চুঁচড়ো, শ্রীরামপুর, বনহুগলি, বাঁশবেড়ের মাসীপিসীদের সেরে ঘুরে আসা যাক্? মশাগ্রাম, ফসাগ্রাম সব ধ্বসাবার পর—'

'তারপরে কলকাতায় এসে এদেরকে ঘায়েল করা যাবে। সেই কি ভালো না? তদ্দিনে দেখবে কলকাতার সন্দেশ আবার চার টাকায় নেমে গেছে—সঙ্গে সঙ্গে খাবার সাথে খাওয়াবারও চাড় দেখা দেবে। এখন এ'কদিনে দেশ পাড়াগাঁই ভাল, সেখানকার মেঠাইমণ্ডার দাম তো আর বাড়ে না! খাচ্ছে কে?'

'জানো ঠিক?'

'আর যদি একটু বাড়েই তাতে কি? মা ষষ্ঠীর দয়ায় কলকাতায় আমাদের সাতাত্তর জন কাজিনের সঙ্গে ভাগ করে মারামারি করে তো খেতে হবে না? মফস্বলে সে ঝামেলা নেই। কেই বা যাচ্ছে সেই অজ পাড়াগাঁয় মিষ্টি খাবার জন্যে রেলে চেপে বাড়ি বয়ে প্রণাম করতে? শত্তুর মুখে ছাই দিয়ে সাতাত্তর জনের একজনও নয়। আমরা দু'জনই যা যাবো—ফলে সবার পাওনা আমরাই পাবো, বুঝেছিস্ তো? আর, আমরা গেলে, দেখিস্ তুই, তারা যেন হাতে চাঁদ পাবে।'

'দু'জনে মিলে একটা চাঁদ? তাহলে কিন্তু এক একজনের ভাগ্যে অর্ধচন্দ্রই জোটে দাদা!'

'অর্ধচন্দ্র নয়রে, চন্দ্রপুলি। ইয়া থালার মতন গোল, এমনি পুরু পুরু একেকখানা। আর খেতে! আহা, তার বর্ণনা কী দেব রে ভাই, জিভে পড়লেই টের পাবি। তারু মামার বাড়ির চন্দ্রপুলি ক্ষীরের ছাঁচ—আহা, তার কি তার্ রে দাদা!'

'তারু মামার বাড়িই সব আগে যাওয়া যাক তাহলে।' জুলুর তাড়া দেখা যায়, 'সেখান থেকেই আমাদের প্রণামের পালা শুরু করা যাক্—কি বলো?'

'তারু মামা? না না, তারুর থেকে নয়, শুরু করতে হবে নকুড় মামার বাড়ি থেকে। সবার আগে চ পানাগড়—নকুড় মামার আস্তানায়।'

● বিজয়ার পর দিগ্বিজয়
শিবরাম চক্রবর্তী

'পানাগড়ের কী মিষ্টি বিখ্যাত? মিহিদানা, না, ছানাবড়া? নাকি ছানার গজা?' জুলু গজ গজ করে।

'গজা নয়রে পাঁঠা!'

'কী বললে?' জুলু ফোঁস্ করে উঠলো—'পাঁঠা বললে আমায়?'

'পাঁঠারে পাঁঠা! রাগছিস কেন, তোকে পাঁঠা বলিনি। চার পেয়ে পাঁঠার কথা বলছি। আমাদের দেখলেই নকুড় মামা একটা খাসি কেটে ফেলবে দেখিস। আর, নকুড় মামীর মাংস যদি একবার খাস এ জীবনে—'

'তাই বলো।' জুলু বলে।—'খাবই তো!'

'তারপর সেখান থেকে, বর্ধমান হয়ে নামুমাসীদের প্রণাম ঠুকে সেখানকার সীতাভোগ মিহিদানা মেরে, চুচড়ো হুগলী শ্রীরামপুর সেরে—জয়নগর মজিলপুর সমস্ত বিজয় করে—মফস্বলের সব মাসী-পিসীদের মজিয়ে—'



বেঞ্চি জুড়ে লম্বা হয়ে সটান—
আমাদের নকুড় মামা!

—'আরে এ কে রে!' মজার কথার মাঝখানে এক হোঁচট খেতে হয়। দেশপ্রিয় পার্কের ধার ঘেঁষে আমরা যাচ্ছিলুম। এক ধারের গোটা একটা বেঞ্চি জুড়ে লম্বা হয়ে সটান—আমাদের নকুড় মামা!

'নকুড় মামা এখানে!' সবিস্ময়ে আমি বলি: 'আর আমরা এদিকে যাচ্ছি নকুড় মামার বাড়ি বিজয়া করতে!'

'এটা কি রকম হোলো?' মুখ ভার করে ঘাড় নাড়লো জুলু: 'এ তো মোটেই ভালো হোলো না।'

'ভালো তো নয়ই।' সায় দি আমি: 'বরং এক ঝামেলা হোলো। এখন নকুড়-মামাকে ঘুম থেকে তুলে বাড়ি নিয়ে যেতে হয়।'

'আমাদের বাড়ি? তাহলেই হয়েছে। কোথায় আমরা নকুড়মামার বাড়িতে

● বিজয়ার পর দিগ্বিজয়
শিবরাম চক্রবর্তী

বিজয়া করবো, না, নকুড় মামাই উল্‌টে আমাদের ধরে বিজয়া করে দিক। আমাদের বাড়ি গিয়ে আমাদেরই ঘাড় ভেঙে সন্দেশ মারতে থাক।' বলে জুলু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে: 'দশটাকা সেরের দামী সন্দেশ।'

'আরে আমাদের বাড়ি কি! সেই নকুড় মামার পানাগড়ে—তার নিজের বাড়িতেই ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে যেতে হবে।' আমি বাতলাই: 'মনে হচ্ছে নকুড় মামা প্রতিমা ভাসান দেখতে কলকাতায় এসেছিল। তারপর আমাদের মতন সারাদিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পার্কের বেঞ্চে একটু জিরোতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।'

কিন্তু তুলতে গিয়ে দেখা গেল নকুড় মামা সহজে উঠবার পাত্র নন। যতই তাকে তুলতে যাই ততই যেন তাঁর নাকের ডাক বাড়ে। কিন্তু তাই বলে তো আর নকুড় মামাকে পার্কের একটা বেঞ্চে ফেলে রেখে যাওয়া যায় না। অন্ততঃ, ভাগনের সেটা কর্তব্য নয়। আর, নকুড় মামাকে এখানে ফেলে রেখে তাঁর খাসিখানায় হানা দেবার কোনো মানে হয় না।

'নকুড় মামাই বারোটা বাজালো দেখছি।' হাতঘড়িতে চোখ রেখে বলি: 'বারোটা বাজতে আর বেশি দেরী নেই। হাওড়ার শেষ গাড়ি ছাড়ে রাত সাড়ে বারোটায়...সেটা ধরতে পারলে ভোরের মুখে পানাগড়ে পৌঁছুতে পারি। দাঁড়া একটা কাজ করা যাক্। নকুড় মামাকে তুলে একটা ট্যাকসিতে করে নিয়ে যাই'—

'নকুড় মামা সহজে উঠবে না! ট্যাকসি হলেও নয়। মনে হচ্ছে এই বিজয়ার দিনে, নকুড় মামা আজ একটু ইয়ে—কি বলে গিয়ে সিদ্ধি টেনেছে'—জুলু নিজের আশঙ্কা ব্যক্ত করে।

'তাহলে নকুড় মামাকেও টেনে তুলতে হবে। সিদ্ধির মতই টেনে। ট্যাকসি-ওয়ালার সাহায্য ছাড়া কি তা আমরা পারবো?' আমার সুচিন্তিত অভিমত: 'হতে পারে আমি ভীম আর তুই অর্জুন, দু'জনে মিলে কুরুক্ষেত্র করতে পারি, কিন্তু নকুড়ের ক্ষেত্রে আমরা কিছুই নই।'

ট্যাকসিওয়ালা, জুলু আর আমি—তিনজনে মিলে ধরাধরি করে কোনোরকমে তো মামাকে ট্যাকসিতে তুললাম! তারপর হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে সেই ঘুমন্ত মানুষের বোঝা ট্যাকসি থেকে নামিয়ে কুলীদের ঘাড়ে চাপিয়ে—ঠেলাঠেলি করে ট্রেনে তোলা হোলো। ট্যাকসির ভাড়া চোকাতে আর রেলের ভাড়া গুনতেই আমার আর জুলুর পকেটে যা ছিল, তা ফাঁক হয়ে গেল বেবাক্। যাক্‌গে, পানাগড়ে গেলে

আর টাকার ভাবনা নেই। মামা-মামীর কাছ থেকেই মিলবে। ফেরা যাবে সেই টাকায়।

গাড়ি ছেড়ে দিল। মামা তখনো বেহুঁশ—ঘুমে কি সিদ্ধিতে কে জানে! ঘুমুই তো আমিও, যাকে বলে, বেধড়ক ঘুম! এমন ঘুম যে ভূমিকম্পও আমাকে জাগাতে পারে না। চৌকির থেকে ফেলে দিলেও ঘুমের থেকে ঠেলে তুলতে পারে না, কিন্তু সত্যি বলতে, নকুড় মামার মত নিদ্রা—সিদ্ধি খেয়েই কি না কে জানে—এমনতরো নিদ্রা-সিদ্ধি আমিও লাভ করিনি! মামার ঘুমের বহর আর বাহার দেখে আমার হিংসা হতে লাগল।


'বাধকে, বাধকে!' বলে মামা চেঁচিয়ে উঠলেন একবার।

সারাপথ মামার কোন উচ্চবাচ্য নেই। গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমানে নাক ডাকিয়ে চলেছেন। একবার খালি ওতোরপাড়া পেরিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করেছিলেন—

'বাঁধকে, বাঁধকে!' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন একবার।

'এ বাঁধবার গাড়ি নয় মামা!'—জবাব দিয়েছিল জুলু। 'কলকাতার বাস নয় তোমার।'

'অতিশয় অবাধ্য গাড়ি।' বলেছিলাম আমি।

তারপর মামা আর দ্বিতীয় কথাটি না বলে ফের ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছেন। শ্রীরামপুর পেরিয়ে আবার তাঁর একটু উচ্চবাচ্য শোনা গেল—'এই! রোক্‌কে—রোক্‌কে!' বলে তিনি রুখে উঠলেন হঠাৎ!—'কোথায় এলাম আমরা? হাজরা না হ্যারিসন রোড?'

'ছিরামপুর।' বললে জুলু—'পেরিয়ে এসেছি।'

'ছিরামপুর। ছিঃ!' বললেন মামা—'ছিরামপুর এলাম শেষটায়!—ছি-ছি! ঘোঁ ঘোঁ ঘোঁউৎ!'

শেষের কথাগুলো মামা নাকের মারফত জানালেন।

● বিজয়ার পর দিগ্বিজয়
শিবরাম চক্রবর্তী



ট্যাকসিওয়ালা, জনু আর আমি ধরাধরি করে নকুড়মামাকে তুললাম। [পৃষ্ঠা—৩৯৯

তারপর ?

তারপর পানাগড়ের এক কাক-ডাকা ভোরে নাক-ডাকা মামাকে নিয়ে সাইকেল রিক্সায় চাপলাম আমরা। জুলু ধরলো মামার একধার, আর আমি আরেকধার, দু'জন পার্শ্বরক্ষীকে দু'ধারে নিয়ে ঘুমন্ত মামা ঢুলুঢুলু হয়ে রিক্সায় উঠলেন সমানে নাক ডাকিয়ে। মামাকে কোলে কোরে বসলাম আমরা।

কিছু দূর গিয়ে জুলু উসখুস করতে লাগলো, বললো, 'বড্ড লাগছে যে।'

'লাগছে ? কোথায় লাগছে আবার ? রিক্সার পেরেকে ?'

'না, মামার। না না, আমায় নয়—মামায়।' বলে জুলু যা বিশদ করল তার মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, মামারা সাধারণতঃ ভাগনেদের চেয়ে বেশী ভারী হয়ে থাকে। তাছাড়া ভাগনের কোলে কোনো মামার বসবার কথা নয়; সেখানে তারা শোভা পায় না, যদি বসতেই হয় তো ভাগনেই বরং মামার কোলে—

এই বলে সেই চলন্ত রিক্সায়, কি কৌশলে কে জানে, নকুড় মামাকে কোল থেকে খসিয়ে সে নিজেই মামার (এবং খানিকটা আমারও) কোলে জমিয়ে বসলো।



'ফিরে চলো···ফিরে চলো আপন ঘরে!' [পৃষ্ঠা ৪০২

নকুড় মামা আপত্তি করলেন—'এঃ এ কী হচ্ছে! থামাও। গাড়ি থামাও! চেন টানো! চেন টেনে গাড়ি থামাও! করছ কি!'

'কিছু করছিনে। শুধু তোমার কোলে একটু বসেছি।' বলল জুলু।

● বিজয়ার পর দিগ্বিজয়
শিবরাম চক্রবর্তী

কিন্তু কোলে চাপ পড়তেই ঘুম তাঁর চলকে গেছল। তিনি হৈ চৈ করে উঠলেন—'চেন টানো! চেন টানো!'

'চেন-ফেন কিচ্ছু যে নেই এখেনে!' আমি বললাম—'টানবো কি?'

'সিদ্ধি টানো!' বললো জুলু। একটু চাপা গলাতেই।

কিন্তু মামা সেকথা শুনলেন না। আধ ঘুমের ঘোরে তেমনি চোখ বুজে চেঁচাতে লাগলেন।

'সেই গানটা গাইবো দাদা?' জিজ্ঞেস করল জুলু—'মামা যদি তাতে একটু ঠাণ্ডা হয়?' বলে আমার হুকুমের অপেক্ষা না রেখেই সে শুরু করল—'ফিরে চলো—ফিরে চলো আপন ঘরে!'

নির্জন পথ জুলুর কালোয়াতিতে মাত হয়ে গেল। এধারে ওধারে দু' একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠে সেই গানের তালে যোগ দিতে চাইলো বুঝি। একটা গাধা কোত্থেকে তার স্বরলহরী তুললো সেই কোরাসে! আমি শিউরে উঠলাম।

মামা কিন্তু তেমনি কাত আমার ঘাড়ে।

আর জুলু তেমনি অকাতর তার গানে—'আকাশে পাখি কহিছে গাহি, মরণ নাহি মরণ নাহি—'

'থাম্' বলে মামা একটা ঝামটা দিয়ে উঠলেন। চোখ বুজেই এক থাবড়া বসালেন জুলুকে। জুলুর গানটা জমে উঠতে-না-উঠতেই থেমে গেল আচম্কা।

'মামার কিন্তু এটা ভারী জুলুম দাদা!' জুলু বললো।

'পাখি বলেছে মরণ নাহি—মারণ নাহি বলেনি তো? তাই তোকে মার খেতে হোলো, বুঝেচিস?' বলে আমি সান্ত্বনা দিই। 'যাক্! মামার মার! গায়ে লাগে না, মনে রাখতে নেই। মামার বাড়ি গিয়ে মামীর রান্না খাসির কালিয়া কেমন মারবি সেই কথাটা ভাব্ একবার।'

অবশেষে আমরা মামার বাড়ির দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালাম—'বাড়ির মধ্যে চলো মামা!' সাধলাম আমরা।

'বাড়ির মধ্যে। কার বাড়ি?' চোখ না খুলেই তিনি জানতে চাইলেন।

'তোমার নিজের বাড়ি, নকুড় মামা!' বলতে হোলো আমায়।

'পানাগড়ের বাড়ি তোমার।' জুলু আরো প্রাঞ্জল করে—'তোমার আপন পৈতৃক বাড়ি—'

এবার নকুড় মামার চোখ বিস্ফারিত হয়—'পানাগড়ের আমার বাড়ি—তার মানে?'

● বিজয়ার পর দিগ্বিজয়
শিবরাম চক্রবর্তী

'তার মানে—তোমার বাপের বাড়ি, আমাদের মাতুলালয়।' ভুলু কি করে মানে করতে হয় ভালোই জানে।

'তার মানে—তোরা আমাকে এই এখেনে টেনে এনেছিস?' মামা রাগে যেন ফেটে পড়লেন—'এই করেছিস তোরা!' বলে ক্রোধে ক্ষোভে তিনি চোখ খুলে বার বার চারধার দেখলেন, দেখে উথলে উঠলেন তৎক্ষণাৎ।

'কেন কি হয়েছে তাতে?' ক্ষুব্ধকণ্ঠে আমি বললাম।

'কী হয়েছে! আমার বৌ ছেলে সব পড়ে রইলো সেখানে'—নাচতে লাগলেন নকুড় মামা—'পুজোর ছুটিতে আজ সকালেই আমরা সবাই বেড়াতে গেছি কলকাতায়। আমার বৌ ছেলে সব পড়ে রইলো সেই হোটেলে! আর তোরা কিনা—'

—'তোরা কিনা—তোরা কিনা'—রাগে মামার আর রা বেরয় না।

নাচতে থাকেন নকুড় মামা।

সোনালী কথা

দি ক্যাপটেন্‌স্ ডটার (পুশ্কিন)

পুশ্কিনকে রাশিয়ার সব চেয়ে বড় কবি বলা হয় কিন্তু তিনি উপন্যাস, ছোটগল্প আর নাটকও লিখেছেন। পুশ্কিনের সমস্ত লেখার মধ্যে দি ক্যাপটেন্‌স্ ডটার উপন্যাসখানি য়ুরোপীয় সাহিত্য সমাজে তাঁর নামকে বাঁচিয়ে রেখেছে। পরবর্তীকালে রাশিয়ার উপন্যাস লেখকেরা গল্পের ভেতর দিয়ে রাশিয়ার রাজনৈতিক মুক্তির কথাকে প্রচার করেন। দি ক্যাপটেন্‌স্ ডটার হলো এই জাতীয় উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাসের পথপ্রদর্শক। এই উপন্যাসের ভেতর রোমান্সের একটা আবরণ আছে কিন্তু এর প্রধান পুরুষ হলো অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন রুশ বিপ্লবী, পুগাচেভ। পুগাচেভকে দুর্দান্ত ডাকাতদের সর্দার হিসাবে জারের লোকেরা নানা রকমের অপযশ দিয়েছেন। আবার একদল সাহিত্যিক তাঁকে জারতন্ত্রের প্রথম উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহীরূপে এঁকেছেন। পুশ্কিন সেই যুগের নথি-পত্র ঘেঁটে এই উপন্যাসে পুগাচেভের বিদ্রোহকে রাজনৈতিক মর্যাদা দিয়েছেন। দুর্দান্ত কসাকদের মধ্যেও পুগাচেভের দুঃসাহসিকতা বিস্ময় সৃষ্টি করতো। একদল দুরন্ত কসাকদের নিয়ে পুগাচেভ নিজেকে রুশ-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেন এবং জারের বিরুদ্ধে খণ্ডযুদ্ধ চালিয়ে বহু দুর্গ দখল করেন। কিন্তু অবশেষে তাঁর বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়ে যায়।



রূপকথা নয়

—বিমলচন্দ্র ঘোষ

কত কোজাগরী রাত কেটে গেছে দীন দুঃখীর ঘরে
লক্ষ্মী আসেনি কুটিল পেচক ডেকে গেছে ক্রূরস্বরে।
ক্ষিধের জ্বালায় ময়ূর নাচেনি, কোকিল হয়েছে বোবা,
পাপিয়া নীরব, জ্বলে পুড়ে গেছে শ্যাম বনানীর শোভা।
ঘরে ফেরে ভুখা ক্লান্ত কিশোর কবি,
কোজাগরী চাঁদ জাগাতে পারেনি মনে তার কোনো ছবি।

শূন্য ভাঁড়ার, ঘরে হাহাকার, ঘুমায় রুগ্ন মাতা।
স্যাঁতসেঁতে মেঝে তোশক জোটেনি, ছিন্ন মাদুর পাতা,
কচি ভাই বোন ক্ষুন্নিবারণ করেছে পান্তা খেয়ে
তাও একবেলা। অশ্রু গড়ায় ঘুমন্ত চোখ বেয়ে।

রাত্রি নিঝুম চোখে নেই ঘুম কবি আজ উদাসীন
দুখিনী মায়ের কিশোর পুত্র অকালে পিতৃহীন।
পিতার চিতায় উচ্চাভিলাষ শ্মশানে গিয়েছে পুড়ে
তরুণ-মনের স্বপ্ন-পাখিরা দিগন্তে গেছে উড়ে।
যত সাধ যত আহ্লাদ আজ দারিদ্র্যে অবনত
ভাই বোন আর মায়ের দুঃখে নিয়েছে ভিক্ষাব্রত।

সারাদিন ঘুরে বিশাল শহরে জোটেনিকো কানাকড়ি
টিক্ টিক্ টিক্ বেজে গেছে শুধু কালের সাক্ষী ঘড়ি;
কবিতা লেখার স্বপ্নে যে তার মন ছিল মায়াময়
আজো সে মনের মরেনি বাসনা, আজো মন দুর্জয়।
কে জানে আবার কতদিন পরে আসিবে সুদিন তার?
দুঃখজয়ের গরিমায় কবে সুখী হবে সংসার?
ভাঙা কুঁড়ে-ঘরে মন হুহু করে ঘুম যদি ভেঙে যায়—
রুগ্ন মায়ের ওষুধ পথ্য কোথা থেকে পাবে হায়।
নিরন্ন কবি ভাবে বসে মনে মনে—
কোজাগরী রাতে কোথা মা লক্ষ্মী? পেঁচা ডাকে দূর বনে।

ঘর থেকে কবি রুদ্ধনিশ্বাসে চলে আসে ধীরে ধীরে
শঙ্খশুভ্র পূর্ণিমা রাতে নির্জন নদীতীরে।
রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর রূপালী আকাশে চাঁদ
দেখেও দেখে না কিশোর মনের কী করুণ অবসাদ।

● রূপকথা নয়
বিমলচন্দ্র ঘোষ

সমুখেই তার বিলাসী রাজার অট্টালিকার কোলে
পুষ্পকানন, নদীতরঙ্গে চঞ্চল ছায়া দোলে।



শ্বেতপাথরের বাঁধানো ঘাটের
নির্জনতায় এসে
বিষণ্ণ কবি বসে থাকে একা
জীর্ণ মলিন বেশে ;
ভুলে যায় ব্যথা দুঃখ অভাব
দারিদ্র্য অপমান
ক্ষণকাল যেন জ্যোৎস্না-সায়রে
করে সে মুক্তিস্নান!

সোনালী স্মৃতির তরঙ্গ ওঠে
কবি-কিশোরের মনে
অমৃতপিয়াসী উচ্চাশা জাগে
নিভৃতে সঙ্গোপনে।
কত যে প্রশ্ন, কত জিজ্ঞাসা,
তোলপাড় করে মন
কল্পলোকের বীণা-ঝংকারে
শোনে সে অনুরণন!

সোনার পথে সুরের ভ্রমর গুজন গান করে
সুরভি-মদির স্বপ্ন-মুকুল ফুটে ওঠে থরে থরে!
দূর আকাশের চাঁদে ঝলমল সূর্যের মরীচিকা,
লতাপল্লবে বনজ্যোৎস্নার কাঁপে রক্তিম শিখা।

● রূপকথা নয়
বিমলচন্দ্র ঘোষ

নিথর রাতের সীমান্তে নীল নীলিমার ছায়াপথ
নদীতটে ঐ কে এসে নামলো, কার পুষ্পক রথ?
রথ নয় রাঙা কৃষ্ণচূড়ার পাপড়ি চৈতী-ঝড়ে,
এলোমেলো দিকভ্রান্ত মনের দিগন্তে ঝরে পড়ে।
তবু এ রাতের সংসার রূপকথার রাজ্য নয়,
রাজকুমারী ও রাজকুমারের সুখের স্বপ্নময়।

বিলাসী রাজার প্রাসাদের দিকে চেয়ে চেয়ে মনে ভাবে,
সোনার কাঠি ও রূপার কাঠি কি ওরাই কেবল পাবে?
রূপকুমারীরা ওদেরি কণ্ঠে পরাবে বিজয়মালা?
স্ফটিকের সাতমহলা প্রাসাদে মাণিক্য-দীপ জ্বালা।
ওরাই কেবল ডিঙুবে পাহাড় সমুদ্র নদী বন?
কবিরা শোনাবে ওদেরি কাব্যকাহিনীর গুঞ্জন?
ইতিহাস শুধু শেখাবে ওদেরি দিগ্বিজয়ের কথা—
জন্ম-মৃত্যু-দর্প-দম্ভ-হিংসা-বর্বরতা?
হায় মা লক্ষ্মী, ওরা তো ঘুমায় কোজাগরী জ্যোৎস্নাতে,
ঐশ্বর্যের ঝাঁপি কেন তবে ওদেরি কলুষ হাতে?
    স্বপ্নবিভোর কিশোর কবির মন—
ছল ছল করে ব্যথার অশ্রু-কুয়াশায় দু'নয়ন।

'চোর!' 'চোর!' বলে হঠাৎ কে যেন স্তব্ধ জ্যোৎস্না রাতে
অদূরে চেঁচায়, কিশোর তাকায় বিভল দৃষ্টিপাতে।

● রূপকথা নয়
বিমলচন্দ্র ঘোষ

স্তম্ভিত হয়ে শোনে কলরব স্বপ্ন দেখছে রাজা,
চোর এসে সিঁদ কেটেছে প্রাসাদে। 'ধরে আনো! দাও সাজা!'
স্বপ্নবিলাসী রাজার প্রাসাদে দীপমালা জ্বলে ওঠে,
'চোর!' 'চোর!' বলে রক্ষীর দল হাতিয়ার নিয়ে ছোটে।



স্বপ্নের চোর? সে কেমন চোর? দারুণ কৌতূহল
কিশোর কবির মনে জাগে, শোনে চারিদিকে কোলাহল।
রাজঘাটে একা কিশোরকে দেখে রক্ষীরা ছুটে আসে
চোর ভেবে তাকে লাঞ্ছনা করে ভাগ্যের পরিহাসে!
কেউ ঘাড় ধরে, কেউ ধরে হাত, কেউ এসে টানে কান,
নিরীহ গরীব বেচারাকে করে অকথ্য অপমান।
কোনো প্রতিবাদ শোনেনাকো দেয় নিদারুণ পদাঘাত
নিরন্ন ক্ষীণ কণ্ঠের কেউ শোনে না আর্তনাদ!
ধরে নিয়ে আসে রাজার সমীপে স্বপ্নালু চোখে রাজা
বলেন, "বেটাকে কারাগারে দাও! সিঁদেল চোরের সাজা
এক শো চাবুক! পাঁচটি বছর ঘোরাক তেলের ঘানি।"
রাজস্বপ্নের মাহাত্ম্য দেখে হেসে কুটি কুটি রানী!!

কিশোরকে বেঁধে নিয়ে যায় কারাগারে
কোজাগরী চাঁদ মূর্ছিত হয়ে
লুটায় নদীর ধারে।
নিরীহ বালক বিনাদোষে পায় সাজা
স্বপ্ন সত্য হোক বা না-হোক,
ন্যায়-বিচারক রাজা।*

* একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত।



হীরাকুনি

—সুকুমার দে সরকার

সমুদ্দুর থেকে সূয্যি মামা বেশ ঢেউয়ের মাথায় দুলতে দুলতে হাসতে হাসতে উঠে থাকেন কিন্তু পাহাড় পার হতে লাফ দিতে হয় সূয্যি মামাকে।

এ তো পাহাড় শুধু পাহাড় নয়, পাহাড়ের সম্রাট হিমালয়। পাহাড়-পর্বতের শ্রেণী ডিঙিয়ে, বরফান পাহাড়ের চোখ সোনালী রুপোলী রঙে রঙে ধাঁধিয়ে দিয়ে মস্ত লাফ মেরে সূয্যি মামা আকাশে ওঠে। পাহাড়ের কোলে কোলে, রোদ মেখে, খোলা আকাশের ঝমঝমে বর্ষার জলে গড়ে উঠেছে বন। কত গাছ, কত গুল্ম, কত লতা। ফার গাছের বন, পিরামিডের মত সরু হতে হতে ডগটুকু তুলে দিয়েছে আকাশে। দেওদারের দল ধাপে ধাপে সোজা লম্বা আর একটু বাড়িয়ে দিয়েছে গলা। রডোডেনড্রনের ঝোপ মাঝে মাঝে।

বনে ফুল ফোটে। সে কি ফুল! কোথাও যেন সারা বনে রঙের দাবানল। আবার কোথাও বন সাদায় সাদায় শুভ্র শুচি।

সুনীল স্বচ্ছ আকাশে, এদিকের পাহাড়ে বন্য পৃথিবীর ওপর দিয়ে উড়ে যায় যাযাবর হাঁসের দল। নাথুলা গিরিসংকটের মাথায় পাহাড়ী বুনো গাধা কিয়াং-এর দল একবার সেদিকে চেয়ে দেখে বৈকি। তাকলা মাকান উপত্যকায় মেহনতী যাযাবর মানুষেরাও একবার আকাশ দিগন্তের পানে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। অদৃশ্য ইয়েতিরাও কি চেয়ে দেখে না?

একটা ভীমভবানী পাহাড়ের কোলের বনে বুনো বাদাম গাছের নীচে, গর্ত খুঁড়ে লতা-গুল্ম চাপা দিয়ে হীরাকুনি আর তার বোকা বৌয়েরা বাসা বেঁধেছিল। হীরাকুনিরা একটা ছোট্ট বন-মোরগের দল। এই বনমোরগেরা অনেকক্ষণ টানা না হলেও খানিকটা উড়তে পারে। বনমোরগদের বৌগুলোর বেশ গোলগাল, পেটমোটা, মেটে মেটে, বোকা বোকা চেহারা কিন্তু হীরাকুনির বেলা ভগবান যেন বেশ রয়ে সয়ে, রঙ মিলিয়ে মিশিয়ে ছবি এঁকে, এক ফুঁয়ে তাতে প্রাণ ভরে দিয়েছিলেন। মাথায় তার রক্তপলাশের কাঁচা রঙ মাখা উষ্ণীষের মতো বাঁকা ঝুঁটি, মাথার থেকে গলা অবধি কচি পাতার নরম সবুজ, তারপর গলার কাছে পড়ন্ত-সূর্যরঙের একটা

লাল বেড়। বুকের কাছটা শিউলি ফুলের কমলা রঙ আর সারা দেহ পত্রমোচী বনের হাল্কা থেকে গাঢ় সবুজ হতে হতে ঝরাপাতার হলদে পাশুটে হয়ে কালোর একটা তুলির টানে গিয়ে মিশেছে। মোটামুটি, ফুলন্ত বনে গাছের পাতার ঢেউয়ের ভেতর এক হয়ে মিশে যাওয়ার জন্যে এই নানা রঙই হীরাকুনির আত্মরক্ষার অস্ত্র।

গত দিনটা এই ছোট্ট বনমোরগের দলটার ওপর দিয়ে একটা প্রচণ্ড বিপর্যয় চলে গেছে। শত্রুর তো তাদের অভাব নেই! পাহাড়ী বনবেরাল, স্বর্ণ ঈগল, ভাম শেয়াল, আরও কত কে। বুনো ছাগল ধরতে না পেরে হিমালয়ী চিতাবাঘগুলোরও সময়ে সময়ে বনমোরগদের দেখে জিভটা লকলকিয়ে ওঠে। বাঘের পেছু নেওয়া কেউয়ের তো কথাই নেই।

এই গতকাল পর্যন্ত হীরাকুনির দলে, সে ছাড়া তার আরও পাঁচটা নাদুস-নুদুস পেট-মোটা বোকা বৌ নেচে নেচে ঠুকরে পোকা শিকার করেছে, বুনো শস্যও খেয়েছে তারা। শস্য না থাকলে, শুঁয়োটা গুবরেরা ডেঁয়ে পিঁপড়েরা, রঙ-ঝলসান প্রজাপতিরা, বহুরূপী ফড়িঙেরা আসবে কেন বল? অবশ্য মানুষের গড়া শস্য? আঃ সে শুনলেই বনমোরগদের জিভে জল আসে। ভুট্টার দানা, ধানের কড়াই, গমের শীষ? আগ! বোলো না বোলো না!

খেতে বসলে, ল্যাজের ডগা, মাথার টিকি এমন কি সারা দেহ অর্থাৎ নিজেকেই সামলান শক্ত। বিশেষতঃ ভুঁড়িদার খাওয়া-পাগলা লোকদের। আর হীরাকুনির বোকা বৌ পাঁচটা তো ছিল ভুঁড়িদার খাওয়া-পাগলার পাগলা। কাজেই একটা নিল শ্যালে। একটা সগ্যে গেল স্বর্ণ ঈগলের থাবার চড়ে। আর দুটো গেল পাতালে, রাতের আঁধারে, নীলকান্ত চোখ-জলা বনবেরালের মুখে করে।

সেই রাতের আঁধারে বাদাম গাছটার মাথায় এসেছিল উড়ুক্কু বাদুড়শেয়ালেরা। তাদের কাছে শুনল হীরাকুনি—এবারে মানুষদেরও আপেল গাছে কি ফলন! তেমনি কমলালেবু। যেন উড়ুক্কুদের জন্যেই মানুষেরা ফলিয়েছে ফল।

হীরাকুনি ভাবল—আরে ছোঃ! আপেল আর কমলালেবু। কেউ খায় নাকি?

উড়ুক্কু শেয়ালদের সুখ সত্বেও দুঃখুর শেষ ছিল না, মানুষগুলো কিনা আপেল কমলা-লেবু পেয়ারা আমলকী হরতুকী আতা না বসিয়ে বেশীর ভাগ করেছে ভুট্টা ধান আর গম?

আরে ছোঃ! বোকা! বোকা! বোকা! সব তো খাবে পোকা! উড়ুক্কুরা ছুঁয়েও দেখবে না ওসব।

হীরাকুনি বলে উঠেছিল চটেমটে—চালাক! চালাক! চালাক! আঃ, মানুষেরা কি চালাক! বনমোরগদের জন্যে তারা কী না বানায়! হ্যাঁ একটু একটু ভুল করে বটে। আপেলটা, কমলালেবুটা না করে শুধু তার বিচিটুকু করলেই তো পারতো!

● হীরাকুনি
সুকুমার দে সরকার

উড়ুক্কু আর বনমোরগদের ভেতর একটা প্রকাণ্ড গেরুয়া আর লালঝাণ্ডার লড়াই লেগে যেতে পারতো যদি উড়ুক্কুরা বনমোরগদের খাস ইংরেজী ভাষা বুঝতে পারত আর বনমোরগেরা উড়ুক্কুদের খাঁটি জলমেশানো হিন্দী ভাষা বুঝতে পারতো।

কাজেই মনে মনে মনের কথা বলে নিয়ে চুপ করে যাওয়ার থেকে ভাল আর কি? কিন্তু খবরগুলো তো কানে আসে আর জমা থাকে মনে মনে।

* * *

ভোরের সূয্যির সাতটা ছটা পাহাড়ের রুপোলী মাথায় লেগেছে কি না লেগেছে, ঘাসের ডগা থেকে শিশিরের নোলক ঝরেছে কি না ঝরেছে, হীরাকুনির নীলমণি বোকা বৌটা গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে সূর্য-বন্দনার আনন্দ ডাক ডেকে উঠল।

হীরাকুনিও উঠে প্রথমে ডানাটা ঝাপটে আড়ামোড়া ভেঙে নিল, তারপর গলা ছেড়ে তার বোকা বৌটার সঙ্গে সূর্য-বন্দনায় গলা মিলিয়ে দিল।

—নমস্কার, নমস্কার সূর্যিঠাকুর! আজকের দিন তুমি ফুলে ফলে, পাহাড়ে, গাছে পাতায় আলো দিও। যেন অনেক অনেক পোকা জন্মায় আর বনমোরগেরা খেয়ে বাঁচে।

হঠাৎ হীরাকুনির কানে এল যেন বাতাসে প্রায় নিঃশব্দ একটা ছ ছ ক'রে শব্দ। কৈ বাতাস তো ওঠেনি। বোকা বৌটা তার তখন মহা আনন্দে একটা পোকা ঠুকরে ধরেছে। হীরাকুনি চেঁচিয়ে উঠল—মিশে যা! মিশে যা!

এই বেচারী বনমোরগদের আত্মরক্ষার একটা অস্ত্র হোল গাছপালা, পাতা লতা, মাটি বালির সঙ্গে গায়ের রঙ মিশিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া।

এই তো গতদিন হীরাকুনির চার-চারটে বোকা বৌ মারা পড়েছে বোকামি করে। হীরাকুনি বিপদের প্রথম আভাসেই তাদের সাবধান করে দিয়েছিল, কিন্তু সেই যে কথায় বলে না—বোকারা এগিয়ে যায় সেই পথে যেখানে যমরাজার পেয়াদাও যেতে ভয় পায়।

হীরাকুনির এই বোকা বৌটা কিন্তু আর সে ভুল করল না। একেবারে বালি পাথরে মেশানো মাটির সঙ্গে গায়ের রঙ মিশিয়ে দিল সে। আর হীরাকুনি? সে তো বহুরূপী। ঝোপে-ঝাড়ে গাছের পাতায় লতাগুল্মে নিজেকে নিঃশব্দে মিশিয়ে দেবার রঙ ভগবান তাকে দিয়েছিলেন।

একটা স্বর্ণ ঈগল ছোঁ মেরেছিল কিন্তু তাক ভুল হয়ে গেল। কোথায় গেল বনমোরগ ছটো? হুস্ করে বেরিয়ে গেল ঈগলটা। রাগে তার গা করকর করছে। এখন খায় কি বাচ্ছা-কাচ্ছা?

● হীরাকুনি

সুকুমার দে সরকার

হীরাকুনি ঝোপের ভেতর গা-ঢাকা অবস্থায়ই জিগেস করল—যাবি নাকি? মানুষদের গাঁয়ে? যেখানে আছে অনেক ধানের শীষ, আর ভুট্টার দানা?

—আর শ্যাল নেই? বোকা বৌটা জিগেস করল।

—দূর! শ্যালে কি ধান খায়?

—তবে কি শ্যালে শুধু বনমোরগই খায় নাকি?

হীরাকুনি হঠাৎ চাপা গলায় বলল—উড়ে চলে আয় আমার সঙ্গে। চট্ করে।

গতদিনের অভিজ্ঞতায় বোকা বৌটা বুঝেছিল হীরাকুনির কথা মেনে চলাই ভাল। মুহূর্তের মধ্যে হীরাকুনি আর তার বোকা বৌটা উড়ে এসে একটা গাছের ডালে পাতার মধ্যে গা মিশিয়ে দিল।

একটা শেয়াল বেশ তাকে তাকে বোকা বৌটাকে ধরবার তালে ছিল। শিকার ফসকে যাওয়ার শেয়ালটা এমন মুখ করে চলে গেল যেন এদিকে সে নিছক তপস্যা করতে এসেছিল।

হীরাকুনি শুধু আকাশে মুখ তুলে একবার ডেকে উঠেছিল—ছুয়ো! ছুয়ো!

কিন্তু তার ডাক জমে গেল। আকাশে মুখ তুলতেই আড়চোখে তার নজরে পড়েছিল ওপরের ডালে গুড়ি মেরে একটা বনবেরাল।

একবার ডেকে উঠে বোকা বৌটাকে সাবধান করে দেবার সময়টুকুও পেল না হীরাকুনি। এই লিঙ্ক্স্ (lynx) জাতের পাহাড়ী বনবেরালগুলো খুব ভাল গাছে চড়তে পারে। আর মাটিতে তো তাদের বিদ্যুৎগতি। পা'গুলো তাদের পেশীময় লম্বা লম্বা। সাধারণ বেরালের থেকে এরা আকারেও একটু বড়। চোখ কপালে টানা টানা একটু বাঁকানো। আর মাথার ওপরের পাশ দিয়ে কালো পাড় দেওয়া ছোট ছোট দুটো কান যেন ছোট দুটো শিং। গায়ে ধোঁয়াটে রঙের মিহি সাদা লোম। দেখতেও যেমন স্বভাবেও তেমনি হিংস্র, ঠিক যেন শয়তানের বাচ্চা।

হীরাকুনি আর মুহূর্ত দেরী না করে ঝাঁপিয়ে পড়ল নীচে। বনবেরালটাও তাকে লক্ষ করে মেরেছে লাফ। বোকা বৌটা তাই বেঁচে গেল।

এদিকে হীরাকুনি মাটিতে নেমেই মারল ছুট। কিন্তু দু'পায়ের ছুট আর চারপায়ের তীরের মত গতির তফাত আছে বৈকি। কিন্তু হীরাকুনির উদ্দেশ্য ছিল বনবেরালটাকে টেনে নিয়ে ক্রমাগত ক্লান্ত করে দেওয়া।

ফ্যাস্ ফ্যাস্ করে হেসে উঠল বনবেরালটা তার পেছনে। শিকার যেন তার মুঠোর ভেতর। শিকারী জানোয়ারেরা শিকারের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার আগে একচোট গর্জন-হাসি হেসে শিকারকে ভয় পাইয়ে দেয়। কিন্তু ঠিক বনবেরালটার মুঠোর ভেতর থেকে উড়ে গেল হীরাকুনি সামনের গাছটার একটা ডালে। চুপ করে বসে দম নিতে লাগল সে।

● হীরাকুনি

সুকুমার দে সরকার

এই বনবেরালটা ছাড়বার পাত্র নয়। দৌড়ের গতি একটুও না থামিয়ে তরতর করে গাছে চড়তে লাগল সে। হীরাকুনি নিথর। আর বনবেরালটা যখন ক্ষিপ্রপায়ে ডালের পর ডাল পার হয়ে প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে আবার ঝুপ করে নীচে নেমে এল হীরাকুনি।



হুড়হুড় করে গাছে চড়তে লাগল বনবেরালটা।

এখানে মনে হতে পারে যে হীরাকুনি একেবারে উড়ে পালিয়ে গেল না কেন? পালাবারই তো চেষ্টা করছিল হীরাকুনি। একবার মাটিতে একবার গাছের ডালে। এই বনমোরগদের যেন ভগবান অনেকক্ষণ একটানা ওড়ার ক্ষমতা দেননি, আর বনবেরালদের দিয়েছেন শিকার ধরার জেদ। কোনও প্রাণী পালায় সোজা বা বাঁকা বা এঁকে বেঁকে ছুটে আবার কোন প্রাণী পালায় ওপর নীচু ছুটে।

হীরাকুনিকে ওপর নীচু ছুট ধরতে হয়েছিল। এমনি করেই চলতে লাগল তাড়া আর তাড়া খাওয়া। হীরাকুনি একবার নীচে নেমে আসে আবার উড়ে গিয়ে একটা ডালে বসে। বনবেরালটাও নাছোড়বান্দা। হীরাকুনিও ভাবছে কতক্ষণে শয়তান বনবেরালটা হাঁফিয়ে গিয়ে হাল ছেড়ে দেবে আর বনবেরালটা ভাবছে বাছাধন আর কতক্ষণ পারবে।

হীরাকুনির ডানা ভারী হয়ে এসেছে। তাইতো শয়তান বেরালটা তো তাকেই কাবু করে আনছে। একটা বুদ্ধি এল তার মাথায়। সেবার সে উড়ে গিয়ে একেবারে গাছের মগডালে বসল যেখানের ডাল বনবেরালটার ভার সইতে পারবে না। কিন্তু শয়তান বেরালটাও বুদ্ধিতে কম যায় না। সেও যতদূর উঠতে পারে উঠে এসে বেশ হাত পা টান করে হীরাকুনির দিকে চোখ রেখে গাছের ডালে বসে রইল। দেখা যাক কে কতক্ষণ না খেয়ে থাকতে পারে!

● হীরাকুনি

সুকুমার দে সরকার

কথায় আছে পাখির আহার। পাখিদের অনবরত খেয়ে যেতে হয়, না হলে শরীরের গরম বজায় থাকে না। বনবেরালদের এমন কি একদিন উপোস দিলেও কিছু আসে যায় না। কাজেই হীরাকুনির মতলব খাটল না। সেও জানতো শয়তান বনবেরালটা ওখানে বসেই থাকবে। তার মুখের খাবার সামনেই যদিও নাগালের বাইরে। কিন্তু হীরাকুনির নিজের তো বেশীক্ষণ না খেয়ে থাকা চলবে না।

হঠাৎ হুস্ করে নীচে নেমে এল হীরাকুনি। আর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের মত ডালের পর ডাল লাফাতে লাফাতে নেমে এল বনবেরাল। সঙ্গে সঙ্গে সেই ফ্যাঁস্ ফ্যাঁস্ হাসি। কেমন জাদুধন ফাঁকি দেবে ?

হীরাকুনি এবারে বনবেরালের তাড়ায় মাটিতে ছুটে নিল খানিকটা, ঝুপ্ ঝুপ্ করে উড়ে আবার মাটিতেই পড়ল আর কাঁ্যা কাঁ্যা করে ডাকতে লাগল। ভীষণ ভয় পেয়েছে যেন। বনবেরালটা খুশীর উত্তেজনা আর রাখতে পারছে না! হঠাৎ আবার হুস করে উড়ে গিয়ে হীরাকুনি এবারে গাছের একটা নীচু ডালে বসল।

অ্যাঁ পালাবে? বনবেরাল মুহূর্তে লাফিয়ে গাছে উঠতে লাগল। হীরাকুনি নড়ে না, যেন আর সে উড়তে পারছে না। প্রায় যখন ধর ধর হীরাকুনি উড়ে ঠিক তার ওপরের ডালটায় বসল। বনবেরালটা মহা উত্তেজিত। প্রায় তো ধরেই ফেলেছে। আর তেমন উড়তেও পারছে না।

রসোগোল্লা পাখিটা! আর প্রতিবারই প্রায় খাবার মধ্যে থেকে হীরাকুনি ঠিক ওপরের ডালটায় গিয়ে বসে। বনবেরালটা উত্তেজনায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। ক্রমশঃ উঁচু আরও উঁচু। নীচের মোটা ডাল থেকে একটু সরু ডাল। আরও একটু সরু, আরও, আরও। একদম সরু ডাল—আকাশ ছোঁয়া যায় যেন। বনবেরালটা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

হঠাৎ মট্ মট্ করে বনবেরালটার পায়ের নীচের শেষ ডালটা ভেঙে গেল। আর পড়তে লাগল বনবেরালটা। একটা সরু ডাল আঙুল দিয়ে তাকে মারল এক খোঁচা। আর একটা একটু মোটা ডাল তাকে সজোরে মারল এক চাবুক। যতই নীচে পড়তে লাগল গতি বাড়তে লাগল তার আর ক্রমশঃ পেটমোটা ডালগুলো জোরে আরও জোরে ঠকাঠক তার মাথা ঠুকে দিতে লাগল। এমন কি শেষে মাটিও তার সারা দেহ জুড়ে দিল এক বিরাশী সিক্কা ওজনের থাবড়া। সেই মাটিতেই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল বনবেরাল।

• • •

● হীরাকুনি

সুকুমার দে সরকার

গাছের মগডালে বসে পৃথিবীটা কত ছোট। হীরাকুনি সেখান থেকে ডেকে উঠল —ভুয়ো! ভুয়ো! সেই তার বিজয় ডাক।

তারপর—ওমা বোকা বৌ? হীরাকুনি গলা ছেড়ে ডাক দিল বোকা বৌটাকে। কিন্তু কোথায় বোকা বৌ? না হলে আব বোকা কেন?

ওই দূরে ধোঁয়াকাঁপা নীল আকাশ ছাড়িয়ে রুপোলী বরফান পাহাড়ের নীচে, কত নীচে—সাপ-চিকচিকে বরফগলা ঝরনা জড়ান সবুজ, সবুজ কালচে উপত্যকায় মানুষদের গাঁ না? যেখানে আছে আপেল কমলার বিচি, ভুট্টার দানা আর ধান যবের নোয়ানো শীষ। পোকা, কত পোকা! আহা নাদুসনুদুস ট্যাপাটোপা বোকা বৌটা পোকা খেতে কি ভালই বাসতে। যাকগে পেটের খিদে চনচনিয়ে উঠেছে।

হীরাকুনি নেমে এল, আর ক্লান্ত পাখায় উড়ে, কখনও ছুটে, মানুষদের গাঁয়ের সবুজ কালচে পাতা উপত্যকার দিকে নামতে লাগল।

সত্যং বদ। ধর্মং চর। স্বাধ্যায়ন্মা প্রমদঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

মণি ও মুক্তা



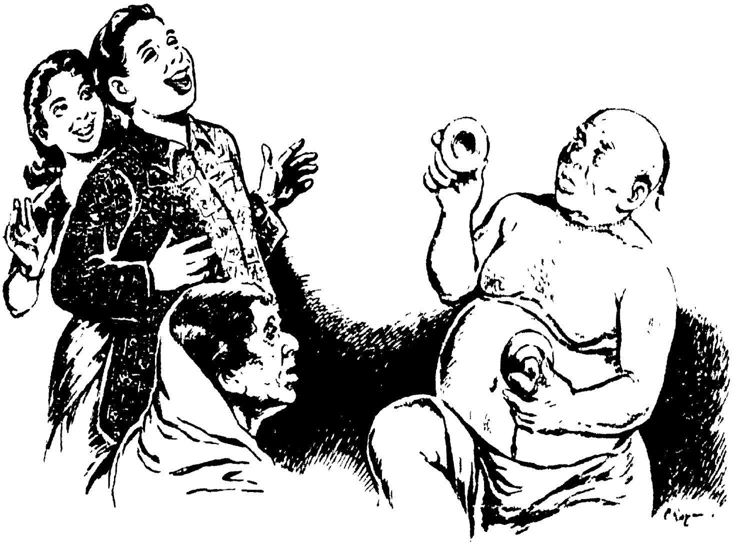
অধ্যয়ন শেষ করার পর ছাত্র যখন গুরুর আশ্রম থেকে সংসারে ফিরে যেতেন, তখন গুরু আশীর্বাদ করতেন,—

সত্য কথা বলবে, ধর্ম আচরণ করবে। অধ্যয়নে যেন কোন ত্রুটি না ঘটে। সত্য অনুসরণে যেন কোন ত্রুটি না ঘটে। মাতাকে দেবতার মতন জানবে। পিতাকে দেবতার মতন জানবে। আচার্যকে দেবতার মতন জানবে।



একটি স্বর্ণ ঈগল ছোঁ মেরেছিল কিন্তু তাক্ ভুল হয়ে গেল।

[পৃষ্ঠা—৪১১



যুগের চাকা

—শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

"শান্তিপুর ডুবু-ডুবু ন'দে ভেসে যায়,
তোরা আয় রে ছুটে আয়—"

রাস্তা থেকে গানের আওয়াজ আসতেই সুজাতা ডানহাতের তর্জনী উঁচিয়ে বললে—"ঐ যে, এসেছে!"

"কে এসেছে?"—অবাক হয়ে জানতে চাইল অজিত। সে সবে আজ ভোরেই কলকাতা থেকে বাড়ি পৌঁছেছে; এখানকার কোন-কিছুই তার জানবার কথা নয়।

ঠাকুমা ততক্ষণে সদর খুলে দিয়েছেন—"এস গো বাবাজী এস, একটু নাম শুনিয়ে যাও।"

নাম ? কার নাম ? হরিনাম নাকি ? এখনো এই সব জিনিস এ-বাড়িতে চলছে নাকি ? বাবা একটা জেলার হাকিম, দাদা মার্কিন মুলুকে পাড়ি দিয়েছে অ্যাটম বোমার গবেষণার জন্যে, তবু দেশের বাড়িতে বসে ঠাকুমা এখনো খোশমেজাজে হরিনামের মালা ঘুরিয়ে সংসারে থেকে মুক্তির পথটা খুলে রেখেছেন!—কলকাতায় বসে কারো মুখে একথা শুনলে অজিত তাকে মুখের উপর বলে দিত যে—সে মিথ্যুক।

খন্ খন্ ক'রে নীচের রোয়াকে খঞ্জনি বেজে উঠেছে তখন। জানালা দিয়ে সেইদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে সুজাতা যখন দাদার পানে ফিরে চাইল, তখন তার ভুরু কুঁচকে উঠেছে। সেই সঙ্গে বুঝি একটা চাপা স্বর ফুটি ফুটি করছে—"দেখে যাও, কী সুখে এখানে আমি আছি—" সুজাতার কথার সুরে যেন সীতার বনবাসের ব্যথা আর অভিমান ষোল-আনা ফুটে উঠল।

কথাটা এই, ঠাকুমা একা থাকতে পারেন না বলে নাতনীদের এক একজনকে পালা ক'রে এসে তাঁর কাছে থাকতে হয়—এই অজ-পাড়াগাঁ বোস্টমপুরের বাড়িতে। বছরে একবারের বেশী কাউকে আসতে হয় না, থাকতেও হয় না মাসখানেকের বেশী। কারণ, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে ঠাকুমার ছয়টি ছেলে, আর মেয়ের সংখ্যা তাঁদের কারও তিন, কারও চার। অবশ্য নেহাত বাচ্চাগুলো আসে না, আট-দশ-বারো-চোদ্দ বছরের নাতনীগুলোকে নিয়েই টানাটানি পড়ে।

এ নিয়ে অশান্তি কম ঘটে না। বৌমারা মেয়েদের পাঠান বটে, কিন্তু খুশী হয়ে পাঠান না। তাঁদের পক্ষ নিয়ে ছেলেরা অনেকবারই ওকালতি করেছেন বুড়ীর দরবারে "তুমি কেন আর ঐ পড়ো বাড়ি আগলে রয়েছ মা ? কলকাতায় এসে থাক, না হয়—কাশী বাস কর। কিংবা প্রয়াগে থেকে নিত্য ত্রিবেণী দেখ। এক এক জায়গায় তোমার এক এক ছেলের বাড়ি। যেখানে খুশী থাক, তিন বেলা গঙ্গাচ্চান কর, মন্দিরে পুজো দাও, বামুনদের কাঁচা-পাকা ফলার খাওয়াও। ঐ ভাঙা বাড়িতে তোমাকে কবে সাপে ছুব্‌লে মারবে—এই ভয়ে রাত্তিরে আমাদের ঘুম নেই মা!"

ছেলেদের কথা বুড়ী একেবারেই কানে তোলেন না। আর নাতনীদের কাউকে-না-কাউকে কাছে রাখবার যে ধনুকভাঙা পণ তিনি করেছেন—তাও একদিনের তরে ছাড়েন না। তাঁকে রাগাবার সাহস কারো নেই। না ছেলেদের, না বউদের। মাতৃভক্তি, শাশুড়ীভক্তি তো আছেই; তা-ছাড়াও খুব জোরাল কারণ একটা আছে, যেটা শয়নে স্বপনে এক মিনিটের জন্যও কারও ভুলবার জো নেই। ব্যাঙ্কে সারদেশ্বরী দেবীর নামে

● যুগের চাকা
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরো একটি লক্ষ টাকা জমা রেখে গিয়েছেন তার স্বামী। উনি যাঁর উপর চটে যাবেন, তাঁর ভাগ্যে জুটবে না ঐ লক্ষ টাকার বখরা। টাকাকড়ির ব্যাপারে বুড়ী বেজায় শক্ত, তাঁর নিজের ভাইপো হ'ল উকিল, তাকে দিয়ে তিনি বছর-বছর নতুন-নতুন উইল করান। এ-কথাটা কি জানি কেমন ক'রে প্রকাশ হয়ে পড়ে ছয় ছেলেরই কাছে।

সারদেশ্বরীর নাতনীরা তাই পালা ক'রে বোস্টমপুরে বাধ্য হয়েই আসে বছরে অন্ততঃ একটিবার; ঠাকুমার পুজোর ফুল তোলে, আলপনা দিতে শেখে, আর "ভাল লাগে না, ভাল লাগে না" বলতে বলতেও হাঁড়ি-হাঁড়ি আচার কাসুন্দি কাবার করে। এ বয়সেও বুড়ী নিজের হাতে নানান রকমের আচার তৈরি করেন, আর খুব শুদ্ধাচারে সেগুলি মাটির হাঁড়িতে ভরে রেখে তৃপ্তি পান।

আট থেকে চোদ্দ বছরের ভিতর সারদেশ্বরীর যে-নাতনীরা পড়ে, তাদের সংখ্যা ডজনের উপর। তাই সুজাতাকে বাদ দিলেও মাসে একজন ক'রে বডিগার্ড তিনি অনায়াসেই পেতে পারেন। তারই সুযোগ নিয়ে কী-একটা ফিকির ক'রে সুজাতা গেল বছরটা ঠাকুমাকে ফাঁকিও দিয়েছিল। সেটা কিন্তু ভোলেননি ঠাকুমা। এবার যখন কলকাতা থেকে নাতনী আনাবার পালা এল, তখন তিনি সুজাতার কোন কাঁদুনিকেই আর আমল দিলেন না। ছেলের কাছে কড়া হুকুম পাঠিয়ে দিলেন—"সুজাতাকেই আমার চাই, চুলের ঝুঁটি ধরে তাকে পাঠিয়ে দাও।" এ-কথার উপর আর কথা কইতে সাহস করল না কেউ। মা কেবল মেয়েকে ভরসা দিলেন—"যা না একবারটি। একটা মাস তো মোটে! আমি না হয় তোর মেজদাকে মাসের মাঝামাঝি একবার পাঠিয়ে দেব, তোকে শহরের খবরাখবর শুনিয়ে আসবার জন্য।"

সেই থেকে সুজাতা বোস্টমপুরে আছে, মেটে হাঁড়িতে জিয়োনো সিঙ্গি মাছের মত।

অজিত এই আজ সকালেই এসেছে—সঙ্গে একগাদা সিনেমা পত্রিকা, আর একপাল ছেলেমেয়ের বনভোজনের একটা ফটো। নতুন ছবির সমালোচনা প'ড়ে যে-পরিমাণে আনন্দ পাচ্ছিল সুজাতা, ঠিক সেই পরিমাণে তার হচ্ছিল দুঃখ—বন্ধু আর বান্ধবীদের সুজাতাহীন গ্রুপ-ফটো দেখে। ভাবছিল—ঐ পারুল শিপ্রা দেবাশীষ অভিমন্যুদের আক্কেলের কথা! বোটনিকেল গার্ডেন কি রাতারাতি গঙ্গার জলে ডুবে যাচ্ছিল? আর দুটো হপ্তা পরে বনভোজনটা করলে হ'ত না? এ শুধু সুজাতাকে দেখানো যে তার জন্যে ওদের কিছু যায়-আসে না। আ-চ্ছা—! দেখে নেবে সুজাতা। কলকাঠি নাড়তে সেও কিছু কম যায় না।

● যুগের চাকা
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

অজিত এসেছে। কেক-সন্দেশের বদলে মোহনভোগ দিয়েই কোনমতে চা-পর্ব সমাধা করছে—এমন সময় রাস্তায় শোনা গেল গান, আর সুজাতা তর্জনী উঁচিয়ে বলে উঠল—"এস, এসে দেখে যাও দাদা, কী সুখেই আমি এখানে আছি।"

নীচের রোয়াক সাদা ধবধব করছে, যেন শ্বেতপাথর দিয়ে আগাগোড়া মুড়ে-দেওয়া। সেই রোয়াকে পা ঝুলিয়ে বসেছেন গোলোকবাসী বাবাজী, আর তাঁর থেকে অনেকটা দূরে সিঁড়ির উপর চেপে ব'সে ঠাকুমা শুনছেন তাঁর গান—"তোরা কে কে যাবি আয়! ওরে বাহু তুলে নাচে গোরা, আয় রে ছুটে আয়রে তোরা; কীর্তনেতে প্রেমের বান, ন'দে ভেসে যায়!"

বাবাজী বুড়ো, গলা তাঁর ভাঙা; কিন্তু সেই ভাঙা গলায় এমন এক প্রাণঢালা আবেগ যে পাষাণও গলে যায় তাঁর কীর্তন শুনে। কামানো মুখখানা এই সত্তর-পঁচাত্তর বছর বয়সেও পাকা আমের মত টসটস করছে। আর দু'টি পুরন্ত গাল বেয়ে অঝোরঝোরে ঝরে পড়ছে চোখের জলের দু'টি পবিত্র ধারা। গান গাইতে গেলেই বাবাজী কাঁদতে থাকেন। আর এমন লোকও গাঁয়ে কম আছে, বাবাজীর গান শুনেও যে চোখের জল না ফেলে স্থির থাকতে পারে।

ঠাকুমা তো পারেনই না। সিঁড়িতে বসে বসে ক্রমাগত চোখের জলে ভাসছেন তিনি, আর মাঝে মাঝে আকুল হয়ে ডেকে উঠছেন—'গৌর! গৌর!'



"দেখে যাও দাদা, কী সুখেই আমি এখানে আছি!"

অজিত আর সুজাতা এসে কখন যে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়েছে, তিনি তা খেয়াল করেননি। হঠাৎই এক সময় খেয়াল হ'ল সেটা, যখন হাঃ হাঃ হোঃ হোঃ ক'রে

সতেরো-আঠারো বছরের নাতিটি তাঁর, বাবাজীর গানের মাঝখানেই অট্টহাসি হেসে উঠল।

নীল আকাশ থেকে হঠাৎ সেই মুহূর্তে যদি বাজ পড়ত ঠাকুমার সামনে, তিনি এমন থ' মেরে যেতেন না। কথা বলা দূরে থাকুক, অনেকক্ষণ যেন তিনি বুঝতেই পারলেন না যে ব্যাপারখানা কী ঘটেছে।

গোলোকবাসী বাবাজীও কম অবাক হননি। কিন্তু আগে তিনিই সামলে উঠলেন। খঞ্জনি ঝোলায় পুরে নিজের চোখমুখ থেকে জলের ধারা মুছে ফেললেন নামাবলী দিয়ে। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে সারদেশ্বরীকে বললেন—"এরা বুঝি তোমার নাতি-নাতনী মা? তুমি মনে কষ্ট পেয়ো না; জগাই মাধাই সব যুগেই আছে। আমি এখন যাই, আর একবার স্নান না করলে মনটা শুচি হবে না।"

ঠাকুমা ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন—"সিধেটা—"

"আজ আর নয় মা!"—মাথা নেড়ে বাবাজী বললেন—"আজ আমার উপোস! ঠাকুরকে আগে প্রসন্ন করি, তবে তো তাঁর ভোগ!"

বাবাজী বেরিয়ে গেলেন, ঠাকুমাও উঠে দাঁড়ালেন। নাতি-নাতনীরা দাঁড়িয়ে আছে পিছনেই, কিন্তু তাদের দিকে ফিরেও চাইলেন না সারদেশ্বরী। পৃথিবীতে অজিত নামে একটা ছেলে আর সুজাতা নামে একটা মেয়ে যে জলজ্যান্ত বেঁচে আছে তাঁর হাতের নাগালের ভিতরেই, এ-কথাটা যেন জানাই নেই তাঁর। তিনি সোজা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলেন, দোতলার বারান্দায় একবারটি তাঁকে দেখা গেল এক পলকের মত, তারপর একটা দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হ'ল—ব্যস্! আর কোথাও টুঁ শব্দটি নেই।

"ঠাকুরঘরে ঢুকলেন"—চুপি চুপি বলল সুজাতা।

ধারে কাছে জনপ্রাণী নেই, তবু এমন চুপি চুপি কথা কিসের জন্য? সুজাতার মুখ দিয়ে জোর-জোর কথা বেরুতেই যেন চাইছে না আর। তার যেন ভয় করছে। জ্বর আসবার আগে যেমন শীত করে ম্যালেরিয়া-রুগীর, তেমনি-ধারা শীত করছে যেন সুজাতার। তার যেন মনে হচ্ছে—নিজের ঘরে ঢুকে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়তে পারলেই হ'ত ভাল।

আর অজিত? খুব একটা বাহাদুরির কাজ করা গিয়েছে বলে সেও মনে করতে পারছে না যেন। নিজের মনকে শক্ত করবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে বেচারী। এ সব ভণ্ডামি ন্যাকামি পুতুলপুজো ছুঁচোর কেত্তনের গোড়ায় কালাপাহাড়ী আঘাত হানাই দরকার, এই কথাই সে বার বার বলতে চাইছে নিজেকে। কিন্তু কোন কথার পিছনেই জোর নেই যেন। নড়বড়ে বাঁশের খুঁটির মত তার যুক্তিগুলো যেন কেবলই

এপাশে-ওপাশে কাত হয়ে পড়ছে, মনটাকে চাড়া দিয়ে কোনমতেই আর খাড়া করতে পারছে না।

নিজের দুর্বলতায় নিজেই সে ক্ষেপে উঠল হঠাৎ। একটা বি-এ ক্লাসের ছাত্র সে, কান্ট হেগেল মার্ক্‌স্‌ প'ড়ে প'ড়ে দুনিয়ার আদি-অন্ত নখদর্পণে এনে ফেলেছে এই আঠারো বছর বয়সে। তার কি সাজে একটা ভীমরতি-ধরা বুড়ীর ভয়ে এমন মুষড়ে পড়া? না, না, না! ঠিক কাজই করেছে সে! যুগের চাকা এগিয়ে চলেছে। বুড়ীর চোখরাঙানির ভয়ে পাঁচশো বছর আগেকার কেত্তনের উঠোনে আর আটকে থাকবে না সে-চাকা। বাবাজীদের সঙ্গে নিয়ে ঠাকুমা-রা বনবাস করুন না এইবার! রায়বাড়ির ছয়-ছয়টা ডাকসাইটে পুরুষ—অজিতের বাবা কাকা জেঠারা—যাঁরা কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ-বা ব্যারিস্টার, কেউ বা আবার আই-সি-এস হাকিম—তাঁরা কেউ গোলোকবাসী বাবাজীর কেত্তন শুনে গলে যেতে রাজী নন। তাতে যদি রেগেমেগে ঠাকুমা তাঁর লাখ টাকা বঙ্গোপসাগরে ছুঁড়ে ফেলে দেন, তাতেও না।

রাগের মাথায় অজিত ভাবতে লাগল—রায়বাড়ির ইজ্জত বজায় রাখবার ভার আজ হঠাৎই ভগবান তার এই ব্যাক্‌-ব্রাশ-করা মাথায় একান্তভাবে চাপিয়ে দিয়েছেন; বাবা-কাকা-জেঠাদের প্রতিনিধি হয়ে তাকেই আজ এ-বাড়ি থেকে বিদায় করতে হবে সেই পাঁচশো বছর আগেকার ঘোলাটে আবহাওয়া।

জোরে জোরে দুই চারবার হাত-পা ছুঁড়ল অজিত। জোরে জোরে নিশ্বাস নিল দুই চারবার। তারপর সুজাতার কাঁধে একটা ঝাকুনি দিয়ে বলে উঠল—"চল্‌ ঠাকুমার কাছে!"

"গিয়ে?"—ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল সুজাতা।

"গিয়ে বলব—'বেছে নাও ঠাকুমা! একদিকে নাতি-নাতনী, আর একদিকে গোলোকবাসী! একদিকে তোমার ছেলেদের সুখসুবিধে, আর একদিকে তোমার বাবাজীর সিধে! কোন্‌টা বেছে নেবে, নাও! দুই নৌকোয় পা দিও না। তুমি দিতে চাইলেও আমরা তা দিতে দেব না।'

সুজাতার ভয় তবু যায় না। সে বলে—"ঠাকুমা গোঁসায় আছেন। তাঁকে রাগিয়ে দিলে ভারি গোলমাল হবে। বাবা রেগে যাবেন হয়ত আমাদের উপর। জানো তো সেই লাখ টাকার কথা? ওটা যাতে হাতছাড়া না হয়, বাবা-মা সেদিকে হুঁশিয়ার!"

একটু দমে গেল অজিত। এদিকটা সে ভেবে দেখেনি। খোলাখুলি বিদ্রোহটা এখন থাকুক তাহলে! কলকাতায় চলে গিয়ে এখানকার কীর্তন-ফীর্তনের ব্যাপার বাবাকে খুলে বলা যাবে। তিনি তো আজ দশ বছর দেশে আসেন না, ঠাকুমার

● যুগের চাকা
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকালকার কাণ্ডকারখানা তাঁর জানা থাকার কথা নয়। সব খুলে বলে তাঁকে পষ্টো জিজ্ঞাসা করা হবে—বোষ্টমপুরে পাঠিয়ে দিয়ে সুজাতাকে তিনি কি বোষ্টুমি করেই তুলতে চান?

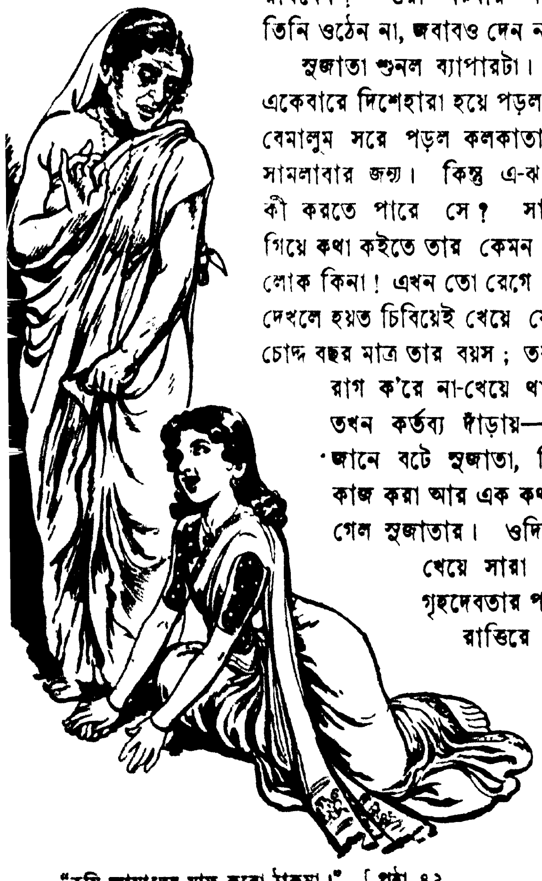
ঠাকুমা ঠাকুরঘরেই প'ড়ে আছেন সারা সকাল, সারা দুপুর। চোখের জল তাঁর মানা মানে না। অবিরল ধারায় গড়িয়েই চলেছে। বড় আঘাত লেগেছে আজ মনে। তাঁরই বংশধর তাঁরই ভিটেয় দাঁড়িয়ে ঠাকুরের অপমান করছে। মহাপ্রভুর নামকীর্তনে করেছে উপহাস। অকল্যাণের ভয়ে শিউরে উঠেছে তাঁর অন্তর। ছেলেদের মতিগতি ভাল নয়, তা তিনি জানেন। তারা ধর্ম মানে না, ঠাকুরদেবতার উপর ভক্তি নেই তাদের, সায়েবিয়ানা তাদের হাড়ে মাসে জড়িয়ে গিয়েছে, এসবও বোঝেন তিনি। তাই নিজের দিক থেকে ষোলো-আনা নিষ্ঠাকে তিনি আঠারো-আনা পরস্ত চড়িয়ে দিয়েছেন। দিবারাত্তির ঠাকুরকে ডেকেছেন—"প্রভু, আমার মুখ চেয়ে আমার ছেলেগুলোকে তুমি দয়া কর। ক্ষমা কর ওদের অনাচার। রায়বংশ যদি পাপের আগুনে জ্বলে পুড়েই যায়, তোমার দয়াল নামের মহিমা তবে রইল কোথায়?"

মনে মনে এতদিন একটা দুরাশা ছিল যে তাঁর কাকুতি হয়ত ঠাকুরের ক্রোধকে থামিয়ে রাখতে পারবে। আজ হঠাৎ রূঢ় আঘাতে সে-আশা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। পাষণ্ড নাতিটা দানবের মত হেসে উঠল নামকীর্তনের সময়। অপমান হ'ল গোলোকবাসী বাবাজীর, অপমান হ'ল মহাপ্রভুর, অপমান হ'ল ভগবানের। এ-অপরাধ কখনো ক্ষমার যোগ্য নয়। বিচারের ভার যদি ভগবান নিজের হাতে না রেখে সারদেশ্বরীর উপরেই ছেড়ে দেন, তিনি নিজেই বলতে বাধ্য হবেন—এ-পাপে রায়বংশের ধ্বংস হওয়াই উচিত। নাঃ,—আর বুঝি থাকে না কিছু! এতদিন বুক দিয়ে তিনি যা আগলে রেখেছিলেন, তাঁরই বোকামিতে তা নষ্ট হয়ে গেল। বোকামি নয়? কিসের জন্য তিনি এই সব নাতি-নাতনীকে ডেকে ডেকে আনেন এই পুণ্যের ঘরে? ওরা আঁধারের জীব, ওদের কেন তিনি ঢুকতে দেন এই আলোকের দেশে?

সারা দুপুর কেটে গেল চোখের জলে, অনুশোচনায়। বেলা আড়াই পহরে তাঁর দরজায় পড়ল মৃদু টোকা। সারদেশ্বরী জবাব দিলেন না। রাঁধুনী ক্ষীরি বামনী তাঁকে ডাকছে। তাঁর খাবার বেলা কখন পেরিয়ে গেছে, ব্যস্ত হয়ে উঠেছে বেচারী ক্ষীরি। মাইনে নিয়ে কাজ করে, তা সত্যি। তবু বুড়ীর উপর একটু দরদ আছে তার। ডেকে ডুকে খাওয়ায়, অসুখেবিসুখে গা-হাত-পা টেপে। বেলা গড়িয়ে গেল দেখে সে সাহস ক'রে উপরে উঠে এল; দরজায় টোকা দিয়ে তাঁকে ডাকল—"মা উঠুন!"

সারদেশ্বরী ওঠেন না। রায়বংশের সর্বনাশ হবে, এ তিনি পষ্টো বুঝতে

পেয়েছেন। ছেলে-বৌ-নাতি-নাতনী জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাবে দেবতার রোষে, এতে আর কোন সন্দেহ নেই তাঁর। কিসের লোভে তবে তিনি আর এ-জীবন রাখবেন? ওরা মরবার আগে নিজে মরতে চান সারদেশ্বরী। তিনি ওঠেন না, জবাবও দেন না।



"তুমি আমাদের মাফ করো ঠাকুমা!" [পৃষ্ঠা ৪২

সুজাতা শুনল ব্যাপারটা। আগেই সে ভয় পেয়েছিল, এবার একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ল। দাদাটা তো গোল বাধিয়ে দিয়ে বেমালুম সরে পড়ল কলকাতায়। প'ড়ে রইল সুজাতা, সব ঝক্কি সামলাবার জন্য। কিন্তু এ-ঝক্কি তো সামলাবার মত ঝক্কি নয়! কী করতে পারে সে? সাধারণ অবস্থাতেই ঠাকুমার কাছে গিয়ে কথা কইতে তার কেমন ভয়-ভয় লাগে। বেজায় রাশভারী লোক কিনা! এখন তো রেগে কাঁই হয়ে আছেন তিনি! সুজাতাকে দেখলে হয়ত চিবিয়েই খেয়ে ফেলবেন। কী তা হলে করে সে? চোদ্দ বছর মাত্র তার বয়স; তবু এটা সে জানে যে বাড়ির কেউ রাগ ক'রে না-খেয়ে থাকে যখন, বাড়ির অন্য লোকদের তখন কর্তব্য দাঁড়ায়—তাকে খোশামোদ ক'রে খাওয়ানো। জানে বটে সুজাতা, কিন্তু জানা এক কথা আর সে-অনুসারে কাজ করা আর এক কথা। মন স্থির করতেই দিনটা কেটে গেল সুজাতার। ওদিকে ঠাকুমা দোর খুললেন না। না খেয়ে সারা দিন সারা রাত্তির প'ড়ে রইলেন গৃহদেবতার পায়ের তলায়।

রাত্তিরে লুচিগুলো যেন গলা দিয়ে নামতে চায় না সুজাতার। বুড়ী ঠাকুমা সারা দিন না খেয়ে শুকিয়ে রইল? ছিঃ ছিঃ—বড় অন্যায় হয়ে গেল। মেজদা-টা যেন কী! একেবারে বেহায়া, বেপরোয়া, বেয়াক্কেল! অমন মিলিটারি হাসি না হাসলেই কি চলছিল না, কীর্তনের মাঝখানে? কই, সুজাতা তো এ-বাড়িতে এসে অবধি রোজ ঐ গান শুনছে, বিরক্তও হয়েছে রোজই! কিন্তু লোক দেখিয়ে হাসতে তো সে যায়নি! কোথায় কী-



গান গাইতে গাইতে বাবাজী কাঁদতে থাকেন। [পৃষ্ঠা—৪২০

রকমভাবে চলতে হয়, তা সুজাতা যতটুকু জানে—তার চেয়ে চার-বছরের বড় মেজদা কি জানে না!

রাত্তিরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে যেন কেবল ঠাকুমাকেই স্বপ্ন দেখতে থাকল। ঠাকুমা ঠিক সেইভাবে কেঁদে চলেছেন, যেভাবে কাঁদছিলেন সকালবেলা বাবাজীর গান শুনে। অঝোরে দু'চোখ দিয়ে ধারা ব'য়ে যাচ্ছে, তার আর বিরাম নেই। সুজাতা ঘুমের ঘোরে ভেবে পায় না—এখনও তিনি কাঁদেন কেন। সে-কীর্তন তো আর কেউ গাইছে না এখন! তবে এখন কিসের জন্য এ-কান্না?

ঘুম যখন ভাঙল সুজাতার, মনটা তার খারাপ। অবাক হয়ে সে দেখল—বালিশটা তার ভিজে গিয়েছে। স্বপ্নে ঠাকুমাকে কাঁদতে দেখে নিজেও সে কেঁদেছে সারা রাত। অবাক কাণ্ড! তবে কি সুজাতা ঐ বুড়ীটাকে ভালবাসে নাকি? কই, সুজাতা তো তা টের পায়নি! এমন কথা সে ভাবতেই পারেনি যে তার মত আধুনিকা ইংরেজী-পড়ুয়া শহুরে মেয়ের পক্ষে এমন একটা তিনকেলে জবড়জঙ্গ পাড়াগেঁয়ে পেত্নীকে এক তিলও ভালবাসা সম্ভব! তবে, এটা হ'ল কী? বালিশ তার ভিজে কেন?

ভোরবেলা উঠে ঘর খুলতেই সারদেশ্বরীর সঙ্গে তার চোখোচোখি হয়ে গেল। মুখ হাত ধোবার জন্য একবারটি ঠাকুরঘরের বাইরে তিনি এসেছিলেন। এইবার আবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে যাবেন, এমন সময়—

সুজাতা দেখল ঠাকুমার ফর্সা মুখখানা একদম কালো হয়ে গিয়েছে এক রাত্তিরে। ভাসা-ভাসা চোখের কোলে গাঢ় ক'রে কালি লেপে দিয়েছে কে-যেন। চোখের চাউনিতে কেমন-যেন একটা উদাস ভাব!

সুজাতার কী হ'ল, কে জানে! সে দড়াম্ ক'রে আছাড় খেয়ে পড়ল ঠাকুমার পায়ের কাছে—ককিয়ে উঠে বলল—"তুমি আমাদের মাফ কর ঠাকুমা! আমার মুখ চেয়ে মাফ কর। আমি আর কক্ষনো তোমার অবাধ্য হব না, দেখে নিও তুমি।"

ঠাকুমা তাকে কী বলতেন, তা কেউ জানে না। কিন্তু কোন কথা তিনি বলতে পারলেন না। তিনি অবাক ভাবটা কাটিয়ে ওঠার আগেই সিঁড়ির মাথা থেকে শোনা গেল একটা মিষ্টি হাসি।

আজকের হাসিটা গোলোকবাসী বাবাজীর। শ্রীহরি তাঁকে ডেকে এনেছে—সারদেশ্বরীকে সান্ত্বনা দেবার জন্য।

হাসি থামলে বাবাজী বললেন—"অবাধ্য না হয়ে তো তুমি পারবে না দিদিমণি!

● যুগের চাকা
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

যুগের হাওয়া তোমায় টানছে যে! কাল আমি জগাই-মাধাই বলেছিলাম তোমাদের। সারা দিন ভেবে ভেবে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি শেষ পর্যন্ত। জগাই-মাধাই তোমরা নও, তোমরা শুধু একটু নতুন রকম। পুরোনোদের মত হতে তুমি পারবে না, পারা উচিতও নয়। যে যুগের যা। রামের হাতে ধনুকবাণ, শ্যামের হাতে বাঁশি। তোমার ঠাকুমার জন্যে জপের মালা, তোমার জন্যে কলেজের কেতাব। যে যুগের যা। আমাদের দিন ফুরিয়েছে; তল্পি কাঁধে নিয়ে আমাদের এখন সরে পড়াই দরকার।"

সুজাতাকে সেইদিনই ফিরতে হ'ল কলকাতায়। কয়েকদিন পরে সুজাতার বাবা-কাকা-জেঠারা এক একটা চিঠি পেলেন। লেখক হচ্ছেন সারদেশ্বরীর উকিল ভাইপো। একই রকম চিঠি সকলের কাছে। সারদেশ্বরী তাঁর লক্ষ টাকা সমান বখরা ক'রে দিয়েছেন তাঁর ছয় ছেলেকে। তিনি খানকতক গয়না মাত্র সম্বল ক'রে চলে গিয়েছেন বৃন্দাবনে। ঐ গয়না বেচে সেখানে একটু ছোট্ট মন্দির গড়া হবে। তাতে থাকবেন রায়বংশের গৃহদেবতা, সারদেশ্বরী আর গোলোকবাসী বাবাজী।

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ
সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়োহি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে॥

কঠোপনিষদ



মণি ও মুক্তা

প্রত্যেক মানুষের কাছে দুটি জিনিস আসে, একটি হলো শ্রেয়, আর একটি হলো প্রেয়। যিনি প্রকৃত জ্ঞানী তিনি শ্রেয়কে বরণ করেন, আর যারা অল্পবুদ্ধি তারা আপাত সুখের জন্যে প্রেয়কেই বরণ করে।



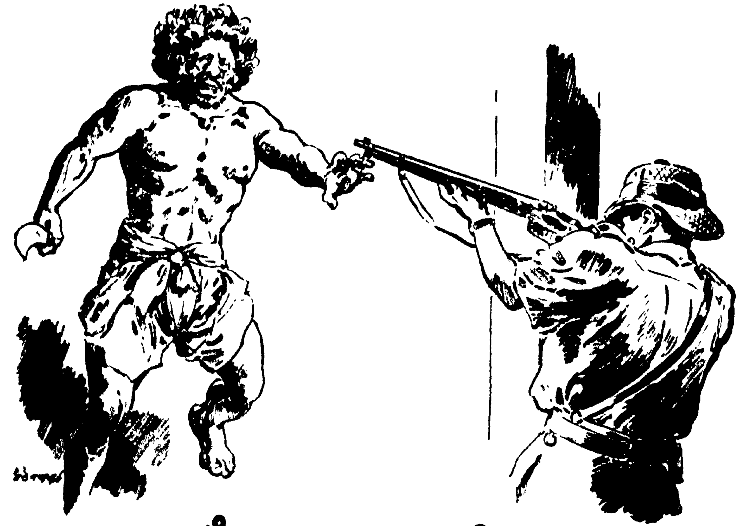
॥ কালুর গল্প ॥

— ফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রায় বাবুদের ছিল কালু বলে বেহারা
মিশ্ কালো রঙ তার মোটা সোটা চেহারা।
দাঁত তার সাদা বটে, ঘোর কালো মুখটা
দেখ্‌লেই ভয়ে যেন কেঁপে ওঠে বুকটা।
হয় দোয়াতের কালি, নয় আল্‌কাতরা
মেখে বুঝি বসে আছে কালুরাম সাঁতরা।

রায় বাবুদের মামা যেন পাকা আতাটি
চুল সব পেকে গেছে ধপধপে মাথাটি।
কলপ রয়েছে তাঁর টেবিলের শিশিতে,
মাথাতে মাখেন রোজ সযতনে নিশিতে।
সাদা চুল কালো হয়, দেখে কালু চুপটি
ভাবে—ওকলপ খেলে বাড়ে যদি রূপটি।

একদিন মামাবাবু গিয়েছেন বাহিরে—
কালুরাম দেখে তবে চারিদিকে চাহি রে।
ঘরে এসে কলপের শিশি নিয়ে হাতে সে
ঢক ঢক কলপটি খেয়ে ফেলে রাতে সে।
তার পর অদ্ভুত বল্‌ব কি ভাই আর—
ঝক্‌ঝকে রঙ হল কালো কালু সাঁতরার।



আঁধারে ফুটল আলো

—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

কাঁটাবন ভেঙে খাল বিল পেরিয়ে তিনদিনের পথের মাথায় অবশেষে এই বড়রাস্তা। আর হাঁটতে পারে না কালোমানিক। শালকাঠের মুগুরের মত তার যে একজোড়া পা, তাও ফুলে গোদ হয়েছে। কত জায়গা দিয়ে রক্ত ঝরে ঝরে শেষকালে যে পায়েতেই শুকিয়ে ধূলোকাদার তলায় চাপা প'ড়ে গিয়েছে, লেখাজোখাই নেই তার। লোহার ভীমের মত পুরুষ থেকে থেকে থামোকাই থর থর ক'রে কেঁপে উঠছে—আর সে পারে না, সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারে না।

চওড়া রাস্তা, উঁচুনীচু, খাল খন্দকে ভরা। গরুর গাড়ি চলে চলে এর এই দশা। গাড়ির লিক্ বাঁচিয়ে কালোমানিক শুয়ে পড়ল একটা গাছের ছায়ায়। একটু জিরোতে না পেলে আর

জান বাঁচে না তার। জিরোনো দরকার আর লোকালয়ে পৌঁছোনোও দরকার। তিন দিন খাওয়া হয়নি কিছু, যা হোক কিছু পেটে দিতেই হবে। হোক ভাত, হোক চিঁড়ে মুড়ি, হোক না-হয় কলাধুলো ফল পাখালি। যে-রাস্তায় সে ছুটে এসেছে এই তিন দিন ধরে, তাতে মানুষের মুখও তার চোখে পড়েনি, খাওয়ার জিনিসের পাত্তাও তার কোথাও মেলেনি। রাক্ষসের মত মানুষ যে মানিক সর্দার, সেও তাই না-খেয়ে না-খেয়ে মড়ার সামিল হয়ে পড়েছে। দাঁড়াতে গেলে ধুঁকছে, চোখ চাইতে গেলে চোখে দেখছে সর্ষেফুল।

চোখ বুজে বুজে সে-রাত্তিরের কাণ্ডগুলোকে সে যেন আবার চোখের উপরই ঘটতে দেখছে। হারে-রে-রে ক'রে পোনেরোটা ডাকাত নিয়ে সে লাফিয়ে পড়ল কুঞ্জ সাউয়ের তেমহলা বাড়িতে। কাকপক্ষীর জানবার কথা ছিল না, কিন্তু কুঞ্জ ব্যাটা পুলিস আনিয়ে রেখেছে। এর মানেটা তা হলে কী? দলের কেউ বেইমানি করেছে নিশ্চয়! কে সেটা? তাকে একদিন ধরবেই কালোমানিক! নিজের হাতে তার চোখ দুটো যদি প্যাট্ প্যাট্ ক'রে সে গেলে না দেয়, তবে কালোমানিকের নামই যেন সবাই ফিরিয়ে রাখে।

কালোমানিকেরাও লাফিয়ে পড়ল বাড়ির উপর, পুলিসেরাও লাফিয়ে পড়ল কালোমানিকদের উপর। হাতাহাতি লড়াই, মুখোমুখি বন্দুকবাজি। লালপাগড়ি-সমেত একটা সেপাইয়ের মাথা দশ হাত দূরে ছিটকে পড়ল কালোমানিকের রামদায়ের এক কোপে। ধড়াচুড়ো-পরা দারোগা সাহেব বারান্দার থামের আড়াল থেকে বন্দুক তাক্ করছিল। সুন্দরবনের বাঘের মতই একটি লাফে কালোমানিক গিয়ে পড়ল তার উপরে। বন্দুকটা কেড়ে নিয়ে দারোগারই কপালে ঠেকিয়ে করল ফায়ার,—মুণ্ডুটা গুঁড়িয়ে থেঁতলে ছরকুটে পড়ল, কাকের-মুখ থেকে পড়ে যাওয়া পায়রার ডিমের মত। তারপর কালোমানিক পালাল। দলের বেশির ভাগেরই হাতে হাতকড়া পড়েছে দেখে ছাদ থেকে সে নেমে পড়ল জলের পাইপ বেয়ে। তারপর বাগান পেরিয়ে চষা-মাঠ, চষা-মাঠ পেরিয়ে কাঁটা-ঝোপের জঙ্গল, জঙ্গল পেরিয়ে চিত্তিরের দহ—চলা-পথের এক পা এধার-ওধার হলে যে-দহের কাদায় হাতী পর্যন্ত বেমালুম তলিয়ে যাবে—

—ক্যাঁচোর-ক্যাঁচ!—গাড়ি আসছে একটা।

চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল কালোমানিক, "বাবা গো! আমায় একটু তুলে নাও! আর চোখ চাইতে পারছিনে।"

গাড়োয়ান ইস্টিশনে যাচ্ছে। কালোমানিক যদি সেদিকে যেতে চায়, গাড়িতে তাকে তুলে নিতে আপত্তি নেই গাড়োয়ানের। আহা! পথ-চলতি লোক বিপদের সময় এ ওকে দেখবে বই কি! আহা! জ্বর হয়েছে বেচারার। আহা! গাড়িতে এস! এস গাড়িতে!

● আঁধারে ফুটল আলো
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

"একটু ধরে তোল দাদা!"

ধরে তুলবার জন্য গাড়ি থেকে নেমে এল গাড়োয়ান, কিন্তু কাছে এসেই সে আঁতকে উঠল। এ কী চেহারা! কালো মুষকো এই গাঁট্টা জোয়ান, গায়ে মাথায় শুকনো রক্তের দাগ—এ কি কথনো ভাল মানুষ হতে পারে?

এক পা পিছিয়ে দাঁড়িয়ে গাড়োয়ান চোখা নজরে তাকাল কালোমানিকের দিকে। কালোমানিকও তাকিয়ে আছে ঝাঁকড়া ভুরুর তলায় কুতকুতে লাল চোখের মিটিমিটি চোরা-চাউনি দিয়ে। গাড়োয়ানকে থমকে যেতে দেখেই সে তড়াক্ ক'রে উঠে পড়ল—যেমন ক'রে উঠে পড়ে কাল-কেউটের ফণা। কোথায় গেল তার দেহের থরথরানি, কোথায় গেল তার বুকের ধড়ফড়ানি! চড়াত ক'রে মাথায় খুন চেপে বসল তার। বদমাইশ গাড়োয়ান! তুমি ভয় পাচ্ছ? কালোমানিককে পথে ফেলে রেখে পালিয়ে যাবার মতলব করছ? গাঁয়ে গিয়ে পাঁচজনাকে বলতে চাইছ যে একটা ডাকাত আধমরা হয়ে বড়রাস্তায় প'ড়ে আছে?—তা হলে আর রক্ষে আছে মানিক সর্দারের? পাঁচজনার মুখ থেকে কথাটা উঠবে পুলিসের কানে, আর থানায় থানায় সাড়া প'ড়ে যাবে—পলাতক মানিক সর্দার এই অঞ্চলে ঘোরাফেরা করছে, পাকড়ো তাকে, পাকড়ো!

তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠেই বাঘের মত গাড়োয়ানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কালোমানিক। মিনিট পাঁচেক ধস্তাধস্তি! তারপরই লাশটাকে ঝোপের ভিতর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে গাড়িতে চড়ে বসল, আগের মতই হেলে দুলে চলল গাড়ি ইস্টিশনের দিকে।

গামছায় বাঁধা চিঁড়ে-মুড়ি রয়েছে গাড়িতে, বসে বসে চিবুতে লাগল কালোমানিক। তিন দিন পরে এই তার প্রথম খাওয়া। শুকনো চিঁড়ে গলায় বেধে যায়, রাস্তার ধারে একটা ডোবা দেখে সেখানেই নেমে পড়ল সে। চিঁড়েও ভিজিয়ে নিল, গলাও ভিজিয়ে নিল। জলটা নোংরা, কিন্তু তা বলে আর উপায় কী! কলেরায় যদি মরতে হয়, হোক না। ফাঁসিতে মরার চাইতে সেটা খারাপ কিসে?

ক্যাঁচোর-ক্যাঁচ, ক্যাঁচোর-ক্যাঁচ—গরুর গাড়ি চলতেই থাকে। মাঝে মাঝে দেখা হয় মানুষের সাথে। কেউ পায়ে হেঁটে চলেছে, কেউ গাড়িতে চড়ে। তারা আলাপ করতে চায় কালোমানিকের সঙ্গে। তারা চায়, কিন্তু কালোমানিক চায় না। কথা কইতে গেলে ধরা পড়ে যাবে যে সে এদিক্‌কার লোক নয়। ধরা সে পড়তে চায় না। তাই কালোমানিক শুয়ে পড়ল গাড়ির উপরে। গাড়ির গরুর চেনা পথ, নিজের মনেই ঠিক পথে চলে। কালোমানিক ঘুমের ভান করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল একসময়।

● আঁধারে ফুটল আলো
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

ঘুমটা হঠাৎই ভেঙে গেল। গাড়ি আর চলছে না।

চমকে মাথা তুলতেই কানে এল একটা কড়া হুকুম। "মাথা তুলেছিস্ কি গুলি করব। চুপ্ ক'রে শুয়ে থাক, যেমন আছিস্!"

চুপ ক'রেই শুয়ে রইল কালোমানিক। শুয়ে শুয়েই দেখতে পেল, গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে এক পুলিস। দারোগা-টারোগাই হবে, কারণ মাথায় তার পাগড়ি নয়, টুপি। মাথায় টুপি, আর হাতে রিভলভার। রিভলভার অস্তরটাকে চেনে কালোমানিক।

মাটিতে একটা সাইকেল কাত হয়ে প'ড়ে আছে। ঐতেই দারোগাটা এসেছে বটে। গাড়োয়ানের লাশটা দেখতে পেয়েছে বোধ হয় রাস্তায়। না-দেখবেই বা কেন? দিনের বেলা, এতক্ষণ নিশ্চয় শকুনের মেলা বসে গেছে সেখানে—জানাজানি হয়ে গেছে খুনের ব্যাপারটা। দারোগা হয়ত অন্য কাজে কোথাও যাচ্ছিল; খুনের গন্ধ পেয়ে সন্দেহ ক'রে এই দিকেই চলে এসেছে সাইকেল নিয়ে। এঃ হে হে! কী বোকামিই করেছে কালোমানিক। এভাবে গাড়ির উপর ঘুমিয়ে পড়ে কখনো! না ঘুমোলে পুলিসটাকে দূর থেকেই তো সে দেখতে পেত! রাস্তার দু'দিকে পাটক্ষেত, লুকিয়ে লুকিয়ে সে যে কখন ওর নাগালের বাইরে চলে যেতে পারত!

"খবর্দার! নড়লেই গুলি করব!"—আবার গর্জে উঠল দারোগা—"হাক গাড়োয়ানকে খুন ক'রে তারই গাড়িতে চড়ে ইস্টিশানে চলেছ? বাহবা শখ বাবা তোমার!"

দারোগা তম্বি করছে, আর এদিক ওদিক চাইছে। কোনদিকে একটি লোকও সে দেখতে পায় না, রাস্তা একেবারে খালি। একা একা এই যমদূতের গায়ে হাত দিতে সাহস হয় না তার। হাত-পা ভেঙে দিতে পারা যায় গুলি ক'রে। কিন্তু তারপর যদি প্রমাণ হয়ে পড়ে যে লোকটা খুনে বা ঘাতুক মোটেই নয়, সত্যি সত্যিই গাড়োয়ান—তাহলে? উলটে যে দারোগাকে নিয়েই টানাটানি শুরু হবে তখন!

দারোগা এদিক ওদিক চাইছে—মানিক চাইছে শুধুই দারোগার পানে। একটা সুযোগ কি আসবে না? জোড়া মোষ বনচণ্ডীর কাছে মানত ক'রে ফেলল কালোমানিক। একটা-কিছু ঘটুক, যাতে দারোগা এক পলকের জন্যও পিছন পানে ফিরে তাকাতে বাধ্য হয়।

হ্যাচ্চো!—বনচণ্ডীর বাহাদুরি আছে বইকি! হঠাৎ কী হ'ল দারোগার, কিছুতেই বেচারী আর নিজেকে সামলাতে পারল না, গোটা রাস্তাটা কাঁপিয়ে দিয়ে ভীষণ শব্দে সে হেঁচে উঠল। রিভলভার-ধরা হাতটা তার কেঁপে গেল। আর সেই মুহূর্তে তার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ল কালোমানিক। লোকটা কি শুয়ে শুয়েই লাফ দিল নাকি?—দারোগার তো অন্তুতঃ তাই মনে হয়েছিল।

● আঁধারে ফুটল আলো
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

গলা টিপে দারোগাকে শেষ ক'রে দিতে মিনিট দুইয়ের বেশী লাগল না কালোমানিকের। তারপর রিভলভার সুদ্ধ লাশটাকে গাড়ির উপর শুইয়ে দিয়ে কাছের গরুটার লেজ মলতে মলতে জিভে-তালুতে শব্দ ক'রে উঠল—"চক্-চক্-চক্"—ক্যাঁচোর-ক্যাঁচ আওয়াজ তুলে আবার গাড়ি চলতে লাগল ইস্টিশানের দিকে।



দারোগার উপর লাফিয়ে পড়ল কালোমানিক। [পৃষ্ঠা ৪৩১

কালোমানিক এইবার মাঠে নামল। পাটক্ষেতের ভিতর দিয়ে ছুটে চলল প্রাণপণে। জল কাদা সাপ! মাঠের পর বিল, বিলের পর নদী। সারাদিন অপথে-বিপথে ঘুরে সন্ধ্যেবেলা নদীর স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে কালোমানিক ভাবল—"এবারকার মত বেঁচে গিয়েছি বোধ হয়।"

দুপুর রাতে এক ফালি চাঁদ উঠল আকাশে। নদীর জল চিকমিকিয়ে হাসতে লাগল—বুঝি কালোমানিকেরই দুর্দশা দেখে। রাগ হয়ে গেল নদীটার উপরে। জোরে জোরে কালোমানিক দু'চারবার পা ছুড়ল জলের উপরে। নদীকে লাথি মেরে মেরে রাগটা প'ড়ে এল যখন, তখন কূলে উঠে জিরোতে লাগল একটু।

চাঁদের আলোতেই চোখে পড়ে একটা সরু পায়ে-চলা পথ নদী থেকে উঠে নলখাগড়ার বন চিরে উপর পানে চলে গিয়েছে। লোকালয় ওদিক পানেই হবে হয়ত। মানুষই কালোমানিকের দুশমন। ওরা কালোমানিককে দেখলেই ধরতে আসে; আর ধরতে এসে উলটে নিজেরাই মারা পড়ে। বাঘে-মানুষে যে সম্পর্কো, ঠিক তেমনি আর কি!

মানুষই দুশমন। পারলে কালোমানিক ওদের এড়িয়েই চলে। কিন্তু এখন তো তা পারবার

● আঁধারে ফুটল আলো
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা



গাড়োয়ানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কালোমানিক। [পৃষ্ঠা—৪৩০

জো নেই! কিছু না খেলে তো জীবন বাঁচে না। আজ চার দিন গেল। সেই সকালবেলার দু'মুঠো চিঁড়ে-মুড়ি আর কয়েক আঁজলা পচা জল! আর-কিছু পোড়া পেটে যায়নি আজ চার দিনের ভিতর। কিছু খেতেই হবে! আর খেতে যদি হয় তাহলে ঐ মানুষের দোরেই যেতে হবে! চুরি ক'রে হোক, গায়ের জোরে কেড়ে নিয়েই হোক, কিছু খাবার তাকে পেতেই হবে এই রাত্তিরের ভিতর। তারপর, খাবার ট্যাঁকে থাকলে সে জঙ্গলেও সুখে থাকবে। পুলিসের বাবার সাধ্যি কি তাকে ধরে?

চিরদিন আটঘাট বেঁধেই কাজ করে কালোমানিক। নদী ছেড়ে যাওয়ার আগে সে ভাল ক'রে নেয়ে ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে নিল। গায়ের ধুলোকাদা শুকনো রক্ত সব ঘষে ঘষে তুলে ফেলল অনেকক্ষণ ধরে। কাপড়খানা কেচে নিংড়ে, আবার সেই ভিজে কাপড়ই প'রে ফেলল বাবুয়ানি ঢঙে। মাথার চুলে আঙুল দিয়েই কেটে ফেলল লম্বা টেড়ি।

এইবার বনচণ্ডীর কাছে আর একবার মানত। জোড়া মোষের কড়ার তো আগে থেকেই দেওয়া রয়েছে, এবারে মানত করতে হলো মচ্ছব। মা-বনচণ্ডী তাকে খেতে দিক আজ রাত্তিরে, দেশের যত ডাকাত ঠ্যাঙাড়েকে নেমন্তন্ন ক'রে শুয়োরের মাংস দিয়ে খিচুড়ি খাওয়াবে কালোমানিক। বনচণ্ডীর থান হ'ল ডাকাতের বনে। ভোজটা হবে সেইখানেই।

কিন্তু, মানুষ ত' এদিকে বাস করে বলে মনে হয় না মোটেই! নলখাগড়ার বনটা পেরিয়ে উঁচু ডাঙা। তাল নারকোল খেজুর আর লম্বা ঘাসে ভরা মস্ত একটা মাঠ। মাঠের ওপারে কী আছে, চাঁদের মিটমিটে আলোতে তা ঠাহর হয় না।

অনেকক্ষণ সেই মাঠের ভিতর খামোকাই চক্কোর দিতে থাকল লোকটা। অবশেষে হতাশ হয়ে আবার নদীর দিকেই ফিরে যাবে ভাবছে, এমন সময় চোখে পড়ল একখানা তালপাতার কুঁড়ে। তাল-খেজুরের গাছের এমন ভিড় সেখানটায় যে খুব কাছে গিয়ে না পড়লে সে কুঁড়ে কারও নজরে আসবার কথা নয়। গাছের গায়ে গাছ, গুঁড়িতে গুঁড়িতে ঠেকাঠেকি, তারই ভিতর দিয়ে ডিঙি মেরে মেরে গিয়ে অবশেষে কালোমানিক পৌছোলো সেই কুঁড়ের দরজায়।

প্রথমে উঁকিঝুঁকি, তারপর নীচুগলায় ডাকাডাকি। ভিতরে আঁধার, মানুষের কোন সাড়া পাওয়া যায় না সেখানে। কী করা যেতে পারে,—বেশ কিছুক্ষণ সেই কুঁড়ের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতেই থাকল কালোমানিক। চলে যাবে? কোথায় যাবে? যাওয়ার জায়গা কোথায় আছে? তার চেয়ে ভোর হোক। এই কুঁড়ের ভিতর কী আছে দেখা যাক। সুবিধে মনে হলে দু'একটা দিনও তো থাকা যেতে পারে এখানে! 'সুবিধে' বলতে অবশ্যি বুঝতে হবে

● আঁধারে ফুটল আলো
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

খাদ্যের সুবিধে। এমনটা হওয়া তো অসম্ভব নয় যে এ-কুঁড়ের আশেপাশে নারকোল গাছে ডাব, তালগাছে তালশাঁস আর খেজুরগাছে খেজুররস অঢেল পাওয়া যাবে! তা যদি হয় আর লোকজনের আমদানি যদি তেমন না থাকে, কিছুদিন বেশ আরামেই কাটবে কালোমানিকের।

কুঁড়ে থেকে বেশকিছুটা দূরে গিয়ে গাছের গুঁড়ি-দিয়ে-ঘেরা একটা জায়গায় শুয়ে পড়ল কালোমানিক। ঘুমের ভিতর শত্রুর হাতে পড়তে সে আর রাজী নয়, যেমনটা পড়েছিল গরুর গাড়িতে। সেবারে বনচণ্ডী খুব বাঁচিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু যে-বোকা ঠেকেও না শেখে তার উপরে কোন দেবতারই দয়া বেশীদিন থাকে না।

সকালে যখন ঘুম ভাঙল কালোমানিকের, বেলা তখন অনেকটা। লম্বা লম্বা অগুনতি গাছ চারদিকে। তাদের তলায় এখনো যথেষ্ট ছায়া বটে, কিন্তু যেখানে গাছ নেই সেখানে খড়ভুঁই-গুলো রোদ্দুরে জ্বলছে সোনার পাতের মত।

উঠে দাঁড়িয়ে চারদিক একবার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল কালোমানিক। মাঝে মাঝে খড়ভুঁই, আর তাদের ঘিরে গাছের পর গাছের শ্রেণী। যতদূর নজর চলে, তাল নারকোল খেজুরেরা মাথা উঁচু ক'রে আকাশের ভাসন্ত মেঘের আড়ালে কী-যেন-কী পরম নিধির সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে আছে। হু হু-হু-হু ক'রে বাতাস বইছে এলোমেলো, তালপাতায় উঠছে খর্‌খর্‌ শব্দ, খড়গুলো মাথা লুটিয়ে কোন্ দেবতার পায়ে প্রণাম জানাচ্ছে তা তারাই জানে।

কী জানি কেন—পাষণ্ড দস্যুটার মনও হু-হু ক'রে উঠল কয়েক মুহূর্তের জন্য। বুঝি তার মনে হ'ল—পৃথিবীতে একা যদি কেউ থাকে তবে সে হ'ল কালোমানিক। সমাজের ধারে-কিনারে কোথাও তার ছায়াটি দেখতে পেলেই ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ একসাথে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠবে—"ঐ যে, ঐ সেই খুনে ঘাতুক!" হন্যে হয়ে পুলিস ছুটবে তার পিছনে, প্রাণ নিয়ে তাকে ছুটে পালাতে হবে খালে বিলে জলায় জঙ্গলে। এভাবে প্রাণ কতদিন বাঁচবে? বাঁচিয়েই বা লাভ কি? তার চেয়ে—

না, না,—এসব ভাবনাচিন্তাকে মনে ঠাঁই দিতে নেই। ওরা মানুষকে অমানুষ ক'রে ফেলে, সাহসী পুরুষকে ক'রে দেয় ভীতু। গা ঝাড়া দিয়ে কালোমানিক ঢুকে পড়ল তালপাতার কুঁড়ের ভিতর।

ঢুকেই সে আঁতকে উঠল। পায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল তার; চোখ দুটো ঠিকরে বেরুবার মত হ'ল কোটর থেকে। একটা মড়া মাটিতে প'ড়ে আছে লম্বা হয়ে।

মড়াটার মুখে মাছি বসছে, পিঁপড়ে ঢুকছে। দুই একদিন আগেই মরেছে হয়ত, মুখটা ফুলো-ফুলো মনে হয়। ভাগ্যিস কাল রাতে আঁধারে কালোমানিক ঘরের ভিতরে ঢোকেনি! তাহলে

● আঁধারে ফুটল আলো
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

এই মড়ার উপরে হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে হয়ত তার মত অসমসাহসীও ভয়ে চেঁচিয়ে উঠত। বেশ কিছুক্ষণ বাদে একটু ধাতস্থ হয়ে কালোমানিক মড়াটার দিকে ভাল ক'রে তাকাল, মনে হ'ল এ-লোকটা সাধুসন্নিসী ধরনের লোকই ছিল বোধ হয়। লম্বা দাড়ি ঠিক কালোমানিকেরই মত। পরনে গেরুয়া কাপড়, দড়ির উপর ঝুলছে একটা গেরুয়া রং-এর আলখাল্লা। আর লম্বা এক ফালি কাপড় রয়েছে সেই আলখাল্লারই পাশে, তারও রং গেরুয়া। অত লম্বা অথচ অত সরু কাপড়টা পাগড়ি বাঁধা ছাড়া অন্য কোন্ কাজে লাগতে পারে, বুঝতেই পারল না কালোমানিক।

• • •

আধ ঘণ্টা বাদে আর মড়াটাকে দেখা গেল না কুঁড়ের ভিতরে। কালোমানিক তাকে নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছে।

তারপর? তারপর সেই তেপান্তর মাঠে শুরু হ'ল কালোমানিকের নতুন জীবন। খাওয়া-দাওয়ার চিন্তা নেই, হাঁড়িতে চাল রেখে গিয়েছেন মৃত সাধুজী! মেটে হাঁড়ি মেটে কড়া মেটে বাসন, আগুন জ্বালবার শুকনো কাঠ এমন কি দেশলাইটি পর্যন্ত গুছিয়ে রেখে গিয়েছেন চালের বাখারিতে। মনে মনে সাধুজীর স্বর্গ কামনা করতে করতে পাঁচ দিন পরে আজ দু'টি ভাত রান্না ক'রে খেল কালোমানিক।



একটা মড়া মাটিতে প'ড়ে আছে লম্বা হয়ে। [পৃষ্ঠা ৪৩৪

দিন যায়, দেখা হয় না একটাও মানুষের সাথে। খায়, আর ঘুমায়, আর আনমনে তাল খেজুরের বনে ঘুরে বেড়ায় কালোমানিক। অতীতের কথা কদাচিৎ মনে পড়ে। ঐ যে হু হু বাতাস বইছে খড়বনের উপর দিয়ে, ঐ বাতাসই যেন পুনজথম রাহাজানির শতেক স্মৃতি উড়িয়ে

নিয়ে গিয়েছে কালোমানিকের অন্তর থেকে। থড়থড় মড়মড় শব্দ উঠছে তালগাছের মাথায় মাথায়, কী যেন ভেঙেচুরে গুঁড়ো হয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে চারপাশে। কী সে? কালোমানিকের অজান্তে তার অতীত জীবনটাই ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে—তারই বুঝি ঐ আওয়াজ!

অতীতের কথা মনে জাগে না, ভবিষ্যতের কথাও ভাবতে চায় না সে। কিসের জন্য ভাববে? বহু—বহুদিন বাদে আজ সে নির্ভাবনায় দিন কাটাচ্ছে। মানুষ তার দুশমন, সে-মানুষ তার ধারে কাছে কোথাও নেই, সে ভয় করবে কাকে?

তবে একটা ছোট ভাবনা—চাল ফুরিয়েছে। খাবার ভাবনা আছে বটে। ঐ ভাবনায় পাগল হয়ে একসময় সে মানুষ খুনও করেছে। আজ ও-চিন্তা তাকে পাগল করা দূরে থাকুক, ব্যাকুল পর্যন্ত করতে পারছে না। একটু সে ভাবছে তা ঠিক। ভাবছে, কাল সকালে নারকোল গাছে চড়তে হবে, ডাব পাড়তে হবে কিছু। ডাব খেয়ে ঢের ঢের দিন বাঁচতে পারে মানুষ। অমন জিনিস আর হয় না। ভাঙলেই দু'খানা রুটি, এক গেলাস জল। আর কি চাই? ভগবান তার জন্য গাছে গাছে অফুরন্ত খাবার যুগিয়ে রেখেছেন। চিন্তা কী?

হঠাৎই চমকে উঠল কালোমানিক। কার কথা সে ভাবছে? ভগবান? সে আবার কে? স্বপ্নের মত মনে হয়—যখন সে এতটুকু ছোট ছিল, মায়ের আঁচল ধরে সে গাঁয়ের মন্দিরে মন্দিরে পুজো দেখতে যেত। শিব কালী নারায়ণ—ধূপধুনোর গন্ধ শাঁখের শব্দ, পুরুতঠাকুরের মুখের মন্তর! হ্যাঁ, তখন মায়ের মুখে সে শুনত বটে—ভগবান ঐখানেই আছেন। তারপর, দীর্ঘ—দীর্ঘ দিন, বহু বহু বৎসর; বনচণ্ডী ছাড়া আর কোনও দেবতার সঙ্গে সে সম্পর্ক রাখেনি। আর বনচণ্ডীকে মোষ-পাঁঠা যতই সে মানত করুক, কোনদিন একথা সে ভাবেনি যে ছেলেবেলায় মায়ের মুখে যাঁর কথা শোনা যেত সেই ভগবানের সঙ্গে বনচণ্ডীর কোন সম্পর্ক আছে।

ভগবান? ভগবান খাবার যুগিয়ে রেখেছেন? এঃ হে হে, এতকাল কালোমানিক তাহলে এ কী ভূতের ব্যাগার খেটে বেড়াল? এই খাওয়ার জন্যই চুরি, এই খাওয়ার জন্যই ডাকাতি, এই খাওয়ার জন্যই এ-যাবত কয়েক ডজন মানুষকে সে খুন করেছে। কী বোকামি! ছি ছি ছি —নিজের উপর ঘেন্না এসে যায় এ বোকামির কথা ভাবতে গেলে!

সকালে উঠে তাল খেজুর নারকোলের বনে ঘুরছে কালোমানিক। কোন্ গাছটায় সহজে ওঠা যাবে, অথচ উঠলেই নারকোল পেড়ে আনা যাবে পাঁচ সাত দিনের মত,—এগাছ ওগাছ দেখে দেখে তাই ঠাওরাবার চেষ্টা করছে, এমন সময় একটা হৈ-হট্টগোল! অনেক লোক যেন কথা কইছে! নদীর দিক থেকে অনেক লোক যেন এগিয়ে আসছে এদিক পানেই।

কালোমানিক লুকিয়ে পড়ল। যে-অতীতকে সে ভুলতে বসেছিল, সেই অতীতই বুঝি হাত

বাড়িয়েছে তাকে ধরে নিয়ে ফাঁসিতে লটকে দেবার জন্য। পুলিস যদি হয় এরা তাহলে কালোমানিককে আবার পালাতেই হবে।

কিন্তু নাঃ, পুলিস তো নয়!

কোমরে খাটো কাপড়, গায়ে জামার বালাই নেই! কালো-কালো কৃষাণ, হাতে কাস্তে পিঠে বোঁচকা। গোটা একটা দল—জন কুড়ি-পঁচিশের কম নয়। কারা এরা?

"বাবাঠাকুর! বাবাঠাকুর!" বলে তারা ডাকতে লাগল পাতার কুঁড়ের পাশে দাঁড়িয়ে। তারা যে কালোমানিককে ধরতে আসেনি এটা বুঝতে এক মিনিটও সময় লাগে না। এরা নিশ্চয় সেই সাধুকে খুঁজছে, যাকে কুঁড়ের ভিতর মরা অবস্থায় দেখতে পেয়েছিল কালোমানিক।

দলের ভিতর একজন বলে উঠল—"বাবাঠাকুর তপিস্যে করছেন, কেউ হল্লা করবি না তোরা। যে যা ভুজ্যি এনেছিস্—দোরগোড়ায় নামিয়ে রেখে যে যার কাজে যা। দলে যারা নতুন আছিস্ তাদের আবার বলে রাখছি—ঠাকুরের কাছে কেউ আসবি না। আমরা অন্-জাত, চিরদিন তাঁর থেকে দূরে দূরেই থাকি, দূর থেকেই গড় করি। দূর থেকেই হাত তুলে তিনি আশীর্ব্বাদ করেন, তাতেই আমাদের ভাল হয়। দোরগোড়ায় গড় ক'রে যে যার কাজ শুরু কর। খড়টড় কেটে ঘরে ফিরতে হবে দিন সাতেকের ভেতর।"

টিপ্ টিপ্ ক'রে দোরগোড়ায় গড় ক'রে লোকগুলো কেউ চাল, কেউ ডাল, কেউ আনাজ-পাতি, কেউ-বা এক তাল গুড় নামিয়ে রাখল বাবাঠাকুরের জন্য। তারপর দল বেঁধে গিয়ে পড়ল খড়ের ভুঁইয়ে। খড় কাটবার সময় এটা। ওরা খড় কেটে নৌকো বোঝাই ক'রে নিয়ে যাবে।

ওদিকে বিশখানা কাস্তে ঘস্ ঘস্ শব্দে খড় কেটে নামাচ্ছে, এদিকে বাবাঠাকুর গাছের আড়ালে আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে কোনমতে এসে ঘরে ঢুকল। ওরা দূরে দূরে থাকে, দূর থেকেই গড় করে? কালোমানিক যদি দূর থেকে হাত তুলে আশীর্বাদ করে, তাহলেই ওরা খুশী হবে? এ তো মন্দ নয়! কালোমানিক তো সাধুবাবার গেরুয়া কাপড়ই পরছে এ-কয়েকদিন। আজ থেকে আলখাল্লাটা পরে আর পাগড়িটা মাথায় চড়িয়ে রাখবে সে। দূর থেকে দেখে ওরা ভাববে—তাদেরই সেই মামুলী বাবাঠাকুর ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছেন। হাত তুলে আশীর্বাদ করা? অত-অত খাবার জিনিস যারা দিয়েছে, তাদের আশীর্বাদ করা কালোমানিকের মত পাষাণের পক্ষেও শক্ত নয়।

দিন যায়। রোজই দূর থেকে গড় করে কৃষাণেরা। রোজই হাত তুলে আশীর্বাদ জানায় কালোমানিক। তাতেই তাদের ভক্তি উথলে ওঠে। কালোমানিক যেখানে দাঁড়িয়ে থাকে, সে সরে যাবার পরেই সেখানকার ধুলো খাবলা খাবলা তুলে নিয়ে তারা গায়ে মাখে। কেউ বা সে-ধুলো

● আঁধারে ফুটল আলো
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

কাপড়ের খুঁটেও বেঁধে নেয় বাড়ির লোকদের জন্য। বলাবলি করে—ও-ধুলোর অনেক গুণ। কঠিন কঠিন ব্যারাম সেরে যায় বাবাঠাকুরের পায়ের ধুলো পেলে। তা নইলে কি আর তারা অত ভক্তি করে বাবাকে ?

দিন সাতেক পরে ওদের কাজ শেষ হয়ে গেল। খড় উঠে গেল নৌকোয়। তখন তালপাতা কেটে বাবাঠাকুরের কুঁড়ে মেরামত করতে লেগে গেল তারা। পাতার চালা, খড়ের মটকা। পাতা দিয়ে বেড়া দেওয়া চারদিকে। বছর বছরই এইভাবে তারা মেরামত ক'রে দিয়ে যায়। বছর দশেক ধরে দিচ্ছে। বাবা-ঠাকুর ঐ বছর দশেক আগেই প্রথম আসেন এই তালবনে বাস করতে। সাক্ষাৎ দেবতা! তা নইলে এই ভুষুণ্ডির মাঠ—দুই দিনের পথে কোথাও জন-মনিষ্যি নেই, এখানে মানুষ থাকতে পারে ?


পুলিসের দারোগা এসে প্রণাম করলো কালোমানিককে। [পৃষ্ঠা ৪৩৯

সবাই মিলে ঘর মেরামত করছে, কালোমানিক ধ্যানস্থ হয়ে আছে তালগাছের গোড়ায়। ওদের সমুখে ওকে ধ্যানস্থ হয়েই থাকতে হয়। ধ্যানের ভান ক'রে চোথ বুজে ! সাত-পাঁচ অনেক-কিছু ভাবে। এক এক সময় এও ভাবে যে সত্যিকার একটা সাধুই যদি সে হোত, ব্যাপারটা হোত কত আনন্দের। এখন এটা যা ঘটছে তাতে আনন্দ নেই, আছে মাত্র একটু নির্ভাবনার সোয়াস্তি। খাবার চিন্তা নেই পুলিসের ভয় নেই—এইটুকু মাত্র সোয়াস্তি। কিন্তু তার সঙ্গে ? সেই সোয়াস্তির সঙ্গে মিশে রয়েছে অনেকখানি লজ্জা, অনেকখানি ধিক্কার ! ছিঃ ছিঃ

● আঁধারে ফুটল আলো
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

—এ সে কী করছে? এত বড় পাপিষ্ঠ হয়েও সাধু সেজে বসে লোকের ভক্তি কুড়োনোর কী অধিকার আছে তার? মানুষ খুন করার চাইতেও এতে বুঝি বেশী পাপ!

চোখ বুজে বসে এইরকমই কী-একটা ভাবছিল কালোমানিক, হঠাৎ একটা চীৎকার—"বাবাঠাকুর! বাবাঠাকুর!" চট্ ক'রে চোখ মেলে কালোমানিক দেখল—নফর কৃষাণ নদীর দিক থেকে দৌড়ে আসছে, তার পিছনে—কী সর্বনাশ! পুলিস!

নৌকা খড় বোঝাই হয়ে নদীতে ভাসছে তারই পাহারায় ছিল নফর। যেমন কালো, তেমনি জোয়ান, তেমনি কালো দাড়ি। কালোমানিক অনেক সময় ভেবে দেখেছে—তার নিজের সঙ্গে নফরার অনেকখানি চেহারার মিল আছে। সেই নফরা ছুটে আসছে পুলিসের তাড়া খেয়ে। উপায় থাকলে কালোমানিকও উঠে ছুটে পালাত। কিন্তু তা আর এখন সম্ভব নয়। ঐ ভক্ত কৃষাণদের সমুখে ছুটে পালানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। কে যেন তাকে জোর ক'রে বসিয়ে রেখে দিল তালতলাতেই।

আজ আর দূরে দূরে থাকা নয়, নফরা ছুটে এসে পা জড়িয়ে ধরল তার—"বাঁচাও দেবতা! তুমি জানো আমি খুন করিনি।"

পুলিসের দারোগা এসে প্রণাম করল কালোমানিককে। "আপনি মাথাভাঙার মাঠের বাবাঠাকুর, আপনার কথা আমরা শুনেছি। মহাপুরুষ আপনি। এ-লোকটাকে আমরা ধরে নিয়ে যাব, আপনি অনুমতি করুন। আপনি একে জানেন না, জানবার কথা নয় আপনার। এর নাম মানিক সর্দার ওরফে কালোমানিক। কুক্ সাহেবের বাড়িতে ডাকাতি করতে গিয়ে ছটো খুন করে নিজহাতে। তারপরে তিন দিনের রাস্তা পেরিয়ে এসে খুন করে একটা গাড়োয়ানকে, আর আমাদেরই এক দারোগা হরিনাথবাবুকে। এখন কৃষাণদলে মিশে ও এই মাঠে এসে খড় কাটছে শুনে আমরা ধরতে এসেছি ওকে। ও এতবড় মহাপাপী যে পঞ্চাশবার ফাঁসি হলেও যোগ্য দণ্ড হয় না।"

একা নফর নয়, পঁচিশটা কৃষাণ তখন কালোমানিকের পায়ে লুটোচ্ছে—"বাঁচাও বাবা-ঠাকুর, বাঁচাও! তুমি তো জানো নফরা ডাকাত নয়! তুমি দেবতা, তুমি তো সব জানো!"

কালোমানিক উঠে দাঁড়াল। একটু হাসল ওদের পানে চেয়ে,—"হ্যাঁ বাবারা আমি সব জানি। নফরা ডাকাত নয়, ওর কোন ভয় নেই! দারোগাবাবু, আপনি ভুল খবর পেয়েছেন। ও লোকটা সত্যিই কৃষাণ, ডাকাত নয়। আসল ডাকাত হ'ল এই!"

নিজের বুকে হাত রেখে কালোমানিক ধীরে ধীরে বলল—"আসল ডাকাত, মানিক সর্দার ওরফে কালোমানিক—এই আমি—পঞ্চাশবার ফাঁসি হলেও সত্যিই যার যোগ্য দণ্ড হয় না।"

স্বাস্থ্যের ফোয়ারা

—শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়



ধোঁয়া! কী গাঢ় সে ধোঁয়া! ধোঁয়ার কুণ্ডলী!—

ধোঁয়ার কুণ্ডলী-জড়ানো একটা বাজপাখি যেন উল্কার মত বেগে নীচে নেমে আসছে!

সেদিন সে ছবি যারা দেখেছিল, আজও তারা তা ভুলতে পারেনি। মনে হলে ভয়ে ও আতঙ্কে আজও তারা শিউরে ওঠে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এমন দৃশ্য অবশ্যি একেবারেই নতুন নয়। আকাশের পটে এমনিধারা বিমান-ধ্বংসের ছবি যখন-তখন ফুটে উঠতো, আর যুদ্ধের ভয়াবহতা সকলকে স্মরণ করিয়ে দিতো। এমনি ঘটনা তখন প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছিল।

তবু শত শত ধ্বংসদৃশ্যের মধ্যে ২৩শে জুন তারিখের সেই দৃশ্য আজও যেন সকলের মনের পাতায় অক্ষয় ভাবে আঁকা রয়েছে!

এর একমাত্র কারণ—পাইলট বব্ হ্যারিস্ নিজে।

পাইলট বব্ হ্যারিস্ ছিল সেদিনের সেই হতভাগ্য বিমানের চালক। মাত্র দশ মিনিট পূর্বে সে একটা স্টেশন থেকে রওয়ানা হয়েছিল। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাকে তাড়া করে আসে শত্রুপক্ষের দু'টি বোমারু-বিমান।

পাইলট হ্যারিস্ খুব কৃতী বৈমানিক। কিন্তু দু' দু'টি মারাত্মক শত্রুর আক্রমণ থেকে সে তার বিমানখানিকে সেদিন বাঁচাতে পারলো না। শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণ—গোলার আঘাত—কিছুক্ষণ সে এড়িয়ে গেল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এক জ্বলন্ত গোলা এসে পড়লো বিমানের সম্মুখ দিকে।

প্রচণ্ড শব্দে এক ভয়ংকর বিস্ফোরণ! সঙ্গে সঙ্গে থর্ থর্ করে কেঁপে উঠলো প্রকাণ্ড বিমানখানি। আর—তার পরেই এক তুমুল অগ্নিকাণ্ড!

হ্যারিস্ চেষ্টা করে তখনো—কোন রকমে যদি বিমানখানি বাঁচান যায়! কিন্তু তার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। আহত পাখির মত তীরবেগে নেমে আসতে লাগলো বব্ হ্যারিসের বিশালকায় বিমান!

হ্যারিসের নাকে-মুখে তখন ধোঁয়া ঢুকতে শুরু করেছে—আগুনের উত্তাপ তাকে তখন ঝলসে দিতে চায়!

বব্ হ্যারিস্ শুধু বৈমানিকই নয়, একজন পালোয়ানও বটে। তার শক্তি, সাহস ও ধৈর্য সামরিক বিভাগের অনেকের কাছেই ঈর্ষার বস্তু। কিন্তু সে'ও আজ যেন হতভম্ব হয়ে গেল! এমন বিপদে মাথা ঠিক রাখা তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠলো।

হতাশার কোলে সে প্রায় এলিয়ে পড়ছিল। কিন্তু পরক্ষণেই কে তার অন্তরে তাকে তীব্র কশাঘাত করে বললে, কি আশ্চর্য! তুমি না একজন মল্লবীর? তুমি না পালোয়ান?—

হ্যারিস্ আর দেরী করলো না এক মুহূর্ত। চোখের পলকে সে তার প্যারাশুট্ খুলে, তাই নিয়ে নীচে লাফিয়ে পড়লো।

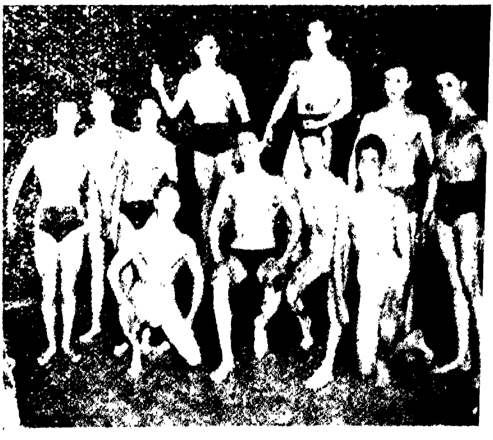
বিমান তার বাঁচেনি বটে, কিন্তু সে বেঁচে গেল সে যাত্রা! বুঝি জননী বসুন্ধরার স্নেহময় আকর্ষণেই সে রক্ষা পেয়ে গেল!

জননী বসুন্ধরা,—মাটি-মা।—

সুদূর অতীতে মাটি-মায়ের ছিল তরুণ বয়স। সেই তরুণ বয়সেই মাটি-মায়ের ছিল এক বিশিষ্ট রূপ। তার দেহ ছিল কোমল, অন্তরে ছিল সরসতা!

বুঝি আঙুলের মৃদু টিপুনিও সেদিন তার অন্তর-বাহিরে দাগ রেখে যেতো! তরুণ বয়সের পৃথিবী সেদিন ছিল এত কোমল ও কমনীয়!

কিন্তু তারি সন্তান, মানুষগুলি, —তারা তো মায়ের মত হলো না! বব্ হ্যারিস্ তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।



দেহ সুকঠিন, আর অন্তর বন্ধনহীন অনন্ত উদার! [পৃষ্ঠা ৪৪২

মায়ের কোমলতা আঁকড়ে ধরে তারা দেহ-মনে নিজেদের এলিয়ে দিতে চাইলো না! তারা হয়ে উঠলো বিপরীত।

তরুণ মানুষ আজ হিমালয়ের কাঠিন্য নিয়ে মাথা উঁচু করে উঠে দাঁড়াতে চায়! এক নতুন পৃথিবী গড়বে বলে তারা যেন অহংকারে ফেটে পড়তে চাইছে!

● খাদের কোয়ারা
শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

তাই দিকে দিকে আজ শুধু তরুণের জয়ডঙ্কা, তরুণের মিলন-তীর্থ! তাদের একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা—তারা দেহে গড়বে আল্পস্-এণ্ডিজ্-হিমালয়, কিন্তু তারা অন্তরে ছড়িয়ে দেবে শরতের নীলাকাশ, অথবা লুটিয়ে বিলিয়ে দেবে সীমাহীন প্রশান্ত মহাসাগর!

মোট কথা,—দেহ সুকঠিন, আর অন্তর বন্ধনহীন অনন্ত উদার! এই তাদের আকাঙ্ক্ষা! এই তাদের উচ্চাশা!

তরুণ স্যাণ্ডো একদিন এমনি মানস নিয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন! জীবন-সাধনা তিনি শুধু শক্তিলাভের জন্যই নিয়োজিত করেছিলেন।

সাধনা তাঁর ব্যর্থ হয়নি—পাথর গুঁড়িয়ে তিনি তাঁর সারা দেহ দিয়ে লৌহ-কাঠিন্য উপভোগ করেছিলেন!

বুঝি স্বর্গের দেবতাও সেদিন তাঁকে ঈর্ষা করেছিল—বিস্ময়ে চোখের পলক স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল!

শক্তি-সাধক স্যাণ্ডো সেদিন যথার্থই বুঝেছিলেন, জননীর দেহ-মন কখনো সন্তানের অনুকরণীয় হতে পারে না। তরুণ বয়সে জননী যে মূর্ত কোমলতা নিয়ে সন্তানের সুমুখে দাঁড়াবে, এতো খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু সন্তান তার তেমনিধারা হলে চলবে কেন?

স্যাণ্ডো তাই দেহ-মনে অপরূপ শক্তিধর হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন,—পৃথিবী আজও তাঁকে ভুলতে পারেনি!

কিন্তু তাই বলে কেউ যদি মনে করেন যে, অতীতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় মহামল্ল, তাহলে খুবই ভুল ধারণা করা হবে। কারণ মল্লবীর স্যাণ্ডোর শত গৌরবের মধ্যেও কেমন করে এক বিন্দু কলঙ্ক-কালিমা পড়ে গিয়েছিল!



হার্কিউলিস্ ম্যাক্‌ক্যান্

স্যাণ্ডোর মত শক্তিশালী ব্যক্তিও একদিন এক শক্তি-পরীক্ষায় পরাজিত হয়েছিলেন!—

সে হলো ১৮৯০ সালে। হল্‌বর্নের 'রয়েল মিউজিক হলে' আজও তা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। স্যাণ্ডোকে সেদিন যিনি হারিয়েছিলেন, তাঁর নাম হার্কিউলিস্ ম্যাক্‌ক্যান্ (Hercules Mc Cann)।

কিন্তু আশ্চর্য! সেদিনের সেই বিজয়ী মল্ল ম্যাক্‌ক্যান্—আজ তিনি কোথায়? পরাজিত স্যাণ্ডোর তুলনায় বিজয়ী ম্যাক্‌ক্যান্ যে বিস্মৃতির মহাসমুদ্রে তলিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করছেন!

তাহলে কিসের দৌলতে স্যাণ্ডোর এই মহা সৌভাগ্য ?

বিজয়ী ম্যাক্‌ক্যান্ যে শক্তিচর্চা করেছিলেন, তিনি নিজেই ছিলেন তার উদ্দেশ্য। তিনি শুধু নিজেকেই গড়ে-পিটে শক্ত-সমর্থ করে তুলেছিলেন। কিন্তু স্যাণ্ডোর অনুশীলন ছিল অন্যরূপ।

শক্তি-সাধনায় তিনি তাঁর দেহ-মনে বজ্র-কাঠিন্য এনেছিলেন। কিন্তু শুধু নিজের জন্যই নয়, অসংখ্য তরুণের কাছে তিনি তাঁর নিজের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, দিয়ে গেছেন এক নতুন পথের ইঙ্গিত।

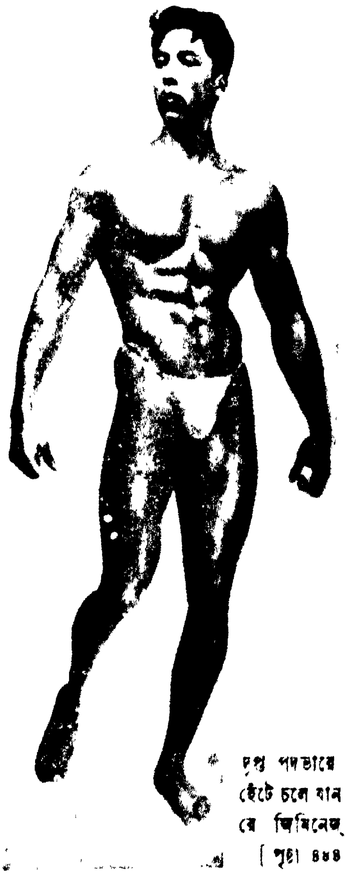
স্যাণ্ডো আজও তাই অমর হয়ে আছেন। আর ম্যাক্‌ক্যান্—তিনি যে কোথায় তলিয়ে যাবার পথে যাত্রা করেছেন কে জানে ?—

কৃতী শক্তি-সাধক যাঁরা, পৃথিবী তাদের কোনদিনই ভুলতে পারেনি। বরং শক্তিকে কেন্দ্র করে আরো কত কিছু পৌরাণিক চরিত্র আমাদের চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে !

তাই স্যামসন্ ও হার্কিউলিস্ আজও আমাদের কাছে শক্তির মূর্ত প্রতীক।—

কিন্তু শক্তি-সাধক যাঁরা, আদর্শের সংঘাত তাঁদের মধ্যে চিরদিনই রয়ে গেছে। এত বড় দুর্দম শক্তিশালী স্যামসন্, কিন্তু তার সে শক্তি কোন পৌরুষের কাজে নিয়োজিত হলো না; আর তার ফলে শুরু হলো তার শক্তির হ্রাস।

কিন্তু বীর হার্কিউলিস্ বুঝি অন্য ধাতুর তৈরী। তবে ভাগ্য তার বিরূপ। তাই পুনঃ পুনঃ তাকে টেনে নিয়ে গেছে বিপদের মুখে। কিন্তু তার অতুলন পৌরুষ তাকে সকল সংগ্রামে জয়যুক্ত করেছিল। তাই দিকে দিকে আজ অনুভূত হয়েছে শক্তি-সাধনার প্রয়োজন।



দৃপ্ত পদভারে হেঁটে চলে যান যে জিমিনেজ্

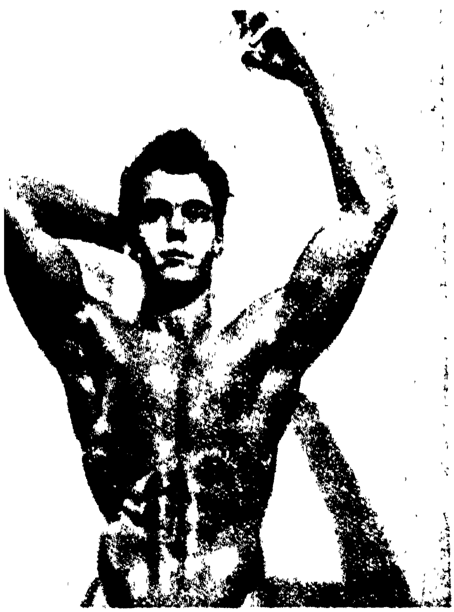
[পৃষ্ঠা ৪৪৪

● স্বাস্থ্যের ফোয়ারা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পাশ্চাত্ত্য জগতে তরুণের দল তাই আজ আর শুধু তাস-পাশা ইত্যাদি কুড়েমি খেলায় সময় কাটায় না। তারা আজ সংঘ-তৈরির কাজে উঠে পড়ে লেগেছে।

এদেশ যখন সিনেমা-হিল্লোলে নৃত্যের ছন্দে ভেসে চলে, ওদেশ তখন স্বাস্থ্যচর্চায় মনোনিবেশ করে। নিজেদের দেহে আল্‌স্‌ পর্বতমালার উঁচু-নীচু তরঙ্গের সৃষ্টি করে যায়।



তরুণ ব্যায়ামবীর ফ্রাঙ্ক ভাস্কেজ

ওদেশের রে জিমিনেজ্ (Ray Jimminez) যখন তাঁর দৃপ্ত পদভারে জননী বসুন্ধরার কোলের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে যান, তখন মদমত্ত সিংহও বুঝি লজ্জায় নতশির হয়ে থাকে!

এক বিখ্যাত সাহিত্যিক ঘোষণা করেছিলেন, অন্ধকারেরও রূপ আছে। অন্ধকারের রূপ দেখেই তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। কোন কিছুর সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে হলে তেমনি অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন।

অন্ধকারের রূপ আছে; কিন্তু উঁচু-নীচু এবড়ো-খেবড়ো জিনিসের কি তেমনি রূপ থাকতে পারে না। সন্দেহ যদি কারো থাকে তাহলে সে একবারটি তরুণ ব্যায়ামবীর ফ্রাঙ্ক ভাস্কেজের (Frank Vasquez) দেহের দিকে তাকাও দেখি।

স্বাস্থ্যের পেশী-তরঙ্গ তাঁর সর্বদেহে!
স্বর্গের সুষমা তাঁর দেহ-মনে লীলায়িত!

কিন্তু একদিনে কি শক্তি-সাধনা সার্থক হতে পারে? না, তা কখনো সম্ভব নয়। সে জন্য প্রয়োজন মাসের পর মাস কঠোর সাধনা।

সরু লিক্‌লিকে কিশোর, রাসেল্ গ্রে (Russel Gray) ব্যায়াম আরম্ভ করার পূর্বে পৃথিবীর এক আবর্জনার মতই ছিল। কিন্তু মাত্র কয়েক মাস ব্যায়াম করার



ব্যায়ামের পূর্বে—রাসেল্ গ্রে

পরেই তার যে চেহারা হয়েছে দেখা গেল, স্বাস্থ্যের সুষমা তায় তখনই বিকশিত হয়ে উঠেছে।

স্যাম ব্রিয়ারলী বাহাত্তর বছরের বৃদ্ধ। তিনিও যখন অনেক কিছু ব্যারামে ভোগার পর চিকিৎসকের পরামর্শে স্বাস্থ্যচর্চা শুরু করে দেন, তখন সকলে তা এক বিস্ময় বলেই মনে করেছিল। কিন্তু কিছুকাল স্বাস্থ্যচর্চার পর তারও দেহ-মনে যখন স্বাস্থ্যের জলুস ফুটে উঠলো, তখন হলো আর-এক মহা-বিস্ময়!



ব্যায়ামের তিন বছর পরে—রাসেল্ গ্রে

স্যাম ব্রিয়ারলী ও বব্ হ্যারিস্ দু'জনাই বলেছেন, শুধু ব্যায়াম করলেই স্বাস্থ্য ও শক্তিলাভ করা সম্ভব নয়। বিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার হোয়াইট্হেড্ও (Dr. Whitehead) তেমনি কথাই বলেছেন।

ডাঃ হোয়াইট্হেড্ বলেন, ব্যায়ামচর্চার সঙ্গে আমাদের একটি দেহযন্ত্রের দিকে সতর্ক দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। সে যন্ত্রটি হচ্ছে—লিভার (Liver) বা যকৃত।

আমাদের দেহযন্ত্রের যে কয়েকটি কোষ আছে লিভার তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কোষ। দেহের দূষিত রক্ত বিশুদ্ধ করাই লিভারের কাজ। সে কাজ যদি রীতিমত সম্পন্ন না হয়, তাহলে নানা রকম ব্যারাম হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

● স্বাস্থ্যের ফোয়ারা
শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

লিভার তার কাজ করে যায় বলেই আমাদের তেল-ঘি-চর্বি সহজে হজম হয়ে যায়। আমাদের রক্তের মধ্যে একরকম চিনি মেশানো আছে। লিভার সেই চিনির অংশকে 'গ্লাইকোজেন' নামক একটি সার-পদার্থে পরিণত করে। আর এ জিনিসটাই আমাদের খুবই আবশ্যক। আমাদের যা কিছু উৎসাহ ও শক্তি, গ্লাইকোজেনকে তার উৎস বলা যায়।

লিভারের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন না হলে আমাদের ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হয় না, কোষ্ঠকাঠিন্য এসে যায়। বুক-ধড়ফড়ানি, কামলা বা ন্যাবা রোগ ও রক্তচাপ লিভারের অক্ষমতার জন্যই এসে যায়। কাজেই লিভারকে একেবারেই তুচ্ছ করা সংগত নয়।

লিভারকে কর্মক্ষম ও সতেজ রাখতে হলে কতকগুলি খাদ্য একেবারেই বর্জন করা উচিত। তৈলাক্ত বা বেশী চর্বি-মেশানো খাবার, ভাজা জিনিস, কোকো, চকোলেট ইত্যাদি স্পর্শ করাও অন্যায়।


বাহাত্তর বছরের বৃদ্ধ স্যাম ত্রিয়ারনী [পৃষ্ঠা ৪৪৫

লিভারের পক্ষে ভালো হচ্ছে নানারকম ফল, তাজা শাক-সবজি ও দুধের সঙ্গে মিশিয়ে ফল বা সবজির রস। প্রতিবার আহারের পূর্বে এক চামচ (টেবিল-চামচ) নেবুর রস খাওয়া খুবই ভালো। লিভার যাদের বড় হয়ে গেছে, এই-ভাবে নিয়মিত নেবুর রস পান করলে তাদের সেই ব্যাধিগ্রস্ত বড় লিভারও ছোট হয়ে আসে। নেবুর রস একটুখানি সেঁকে নিয়ে নুন মিশিয়ে খেলে দুর্বল হৃৎপিণ্ড শীঘ্রই সবল হয়।

লিভার যাদের সতেজ ও কর্মক্ষম থাকে, অসাধারণ কাজের চাপেও তারা মুষড়ে পড়ে না। তাদের কর্মশক্তি হয় অদম্য ও অফুরন্ত।

অমন বিপদে পড়েও পাইলট বব্ হ্যারিস্ যে তার কর্তব্য ভুলে যায়নি, তখনো যে তার মাথা গুলিয়ে যায়নি তার একমাত্র কারণ,—তার বলিষ্ঠ লিভার।

বব্ হ্যারিস্ একথা নিজের মুখে বলেছে।

স্বাস্থ্যের জোয়ার
শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সর্বাঙ্গে অসংখ্য ক্ষত-চিহ্ন নিয়ে বব্ হ্যারিস্ আজও পৃথিবীর বুকে চলাফেরা করছে।

ভয়ে বা আতঙ্কে সে তার বিপজ্জনক কাজ ছেড়ে দেয়নি, আজও সে সামরিক বিভাগের এক বিখ্যাত পাইলট।

পেন্সন সে নিতে পারতো অনেক আগেই। কিন্তু তা সে নিলে না। আজও এখানে-সেখানে নানা যুদ্ধের নানা রঙ্গমঞ্চে সে তার সুবিশাল বিমানখানি নিয়ে ছোটাছুটি করে।

শত্রুর গোলাগুলি বা আগুনে-বোমাকে আজও সে ভয় করে না।



আজও হ্যারিস্ বিমানের ওপর সদর্পে বসে থাকে।

আজও সে যখন তার বিমানের ওপর সদর্পে বসে থাকে, তখন স্বর্গের দেবতা স্বয়ং ইন্দ্রও বুঝি তার পাশ কাটিয়ে যেতে চান!

মনে হয় একখানি স্বাস্থ্যের ফোয়ারা যেন তার উপযুক্ত বাহনের ওপর সদর্পে বসে রয়েছে!



রায়ডাকে বাঘের ডাক

—শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

অর্জুন সেনকে তোমরা নিশ্চয়ই চেন না? কী করেই বা চিনবে? আমার সঙ্গে সে কখনো কখনো শিকারে গিয়েছে বটে, কিন্তু একটি দিনও বন্দুক ধরেনি। তবে মাঝে মাঝে তার দু'চারটে উপদেশ এমন 'লাগ্সই' হত যে আমারই অবাক হবার পালা। তবু কেন যে সে কারো কাছে ধরা দিতে চাইতো না, তার রহস্যটা এখনো খুঁজে পাইনি।

পাক্কা ছ' ফুট লম্বা দোহারা গড়ন, ঘন-কুঞ্চিত কেশে ব্যাক্-ব্রাশ—খাকী পোশাকে তার জাঁদরেল চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। লম্বা নাক, বড় বড় চোখ দু'টিতে অস্বাভাবিক দীপ্তি। চিবুকের ভাঁজে এমন একটা চাবুকের মত রেখা, দেখলেই মনে হয়, তার সব কিছুতেই 'ডোণ্ট কেয়ার' ভাব। চাপা ঠোঁটের আড়ালে এমন একটা চাপা হাসি লুকিয়ে থাকতো, যার অর্থ, প্রয়োজন হলে সে যেন সব কিছুই একটিমাত্র ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারে। যুদ্ধফেরত কিনা—আবিসিনিয়ার যুদ্ধে সে নাকি নাম করেছিল। তবে সৌভাগ্যের কথা, তার মিলিটারি মেজাজের পরিচয় এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

সহজে কথা বলতে সে নারাজ—কিন্তু একদিন কবি-বন্ধু অবনীকান্তের খোঁচায় মনের কোন্ এক সূক্ষ্ম তারে ঘা পড়তেই অর্জুন সেন একটার পর একটা তার শিকার অভিজ্ঞতা বলতে থাকে। তার দ্বিতীয় গল্পটাই আজ তোমরা শোনো।

সেদিন বর্ষার সন্ধ্যা। প্রথম কিস্তি চা দিতে চাকরটা এত দেরি করে কেন, খোঁজ নিতে বাইরে এসেই দেখি বন্ধু অর্জুন সেন জলে ভিজতে ভিজতে সিঁড়ি দিয়ে খট্‌মট্ ক'রে উঠে আসছে। দু'হাত তুলে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলি, আরে এসো ভাই সব্যসাচী, এসো। এমন দিনে যে তোমাকে কাছে পাব তা ভাবতেও পারিনি। এসো, বর্ষায় আসর জমিয়ে বসা যাক্।

কবি-বন্ধু অবনী কল্পনায় যেমন সিদ্ধহস্ত, খাদ্য-পরিকল্পনাতেও তার জুড়ি নেই। তিনি তখুনি কাব্য-প্রতিভার একটি ঘিয়ে-ভাজা নমুনা ছুঁড়ে দিলেন—

এমন ঘন ঘোর বরিষায়—
এমন দিনে তোরে বলা যায়—
পরান চা-চা ক'রে 'সসারে' ঝরঝরে
বসে যে আছি তারি ভরসায়।

—অতএব বেয়ারা ডাকো—অন্দরে খবর পাঠাও—আনুষঙ্গিক মালগুলো না আসা পর্যন্ত স্থিরো ভব—তারপর চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে শ্রীল শ্রীযুক্ত অর্জুন সেনের সিনা-ফুলিয়ে-গল্প-বলার স্রোতে ভেসে যাও—কী বল হে?

অবনীর উচ্ছ্বাসে বাধা দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না—কিন্তু অর্জুনের মুখের ভাবটা হঠাৎ থমথমে হয়ে উঠতেই স্পষ্ট বুঝতে পারলাম—তাকে থামিয়ে দেওয়া দরকার। বলা যায় না, মিলিটারি মেজাজ কখন বিগড়ে ওঠে। 'কবিরা নিরঙ্কুশ'—এ পাঠশালার ছাত্র সে তো নয়। তাই অবনীকে চোখ টিপে বলি—হয়েছে, হয়েছে, তোমার কবিত্ব এখন মুলতুবী থাক্—চা কচুরির ফরমাশ আগেই দিয়ে রেখেছি। আজ নাকি মাছের কচুরি হবে—তাই কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। অতএব আমি প্রস্তাব করি, ততক্ষণ অর্জুন তার গল্প আরম্ভ করে দিক।

সেদিনকার মজলিসে পোস্টমাস্টার মশাই উপস্থিত ছিলেন। একটা জরুরী কাজ নিয়ে তিনি এসেছিলেন, বৃষ্টি এসে পড়ায় তাঁর যাওয়া হয়নি। তিনিও এক কোণে একটি চেয়ারে চুপ করে ঝিমোচ্ছিলেন। আহা বেচারী! কতই না খাটতে হয়—কত দূরদূরান্তের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার খবর ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার মালিক তিনি। তারপর কলমপেশা তো আছেই—তাই সন্ধ্যা লাগতেই তিনি

● রায়চাকে বাঘের ডাক
শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

চলতে শুরু করেন। হঠাৎ তিনিও যেন সজাগ হয়ে উঠলেন—সেই ভাল, গল্পটাই আরম্ভ হোক।

একটা ভ্রুভঙ্গী করে অর্জুন একবার সেদিকে চাইলে। আমি তাকে বুঝিয়ে দিলাম—কিছু মনে করার নেই—ইনি কৃষ্ণভক্ত জীব—নেহাত গোবেচারা। তবে যখন বাঘ শিকারের গল্প শুনতে এঁর উদগ্র বাসনা, চালিয়ে যাওনা কেন ?

অর্জুন সেন আর কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করেই বললে, আজকের কাহিনীটা তেমন বড় নয়—তবে বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে কিছু কম যায় না।

অবনী বললে, সেই ভাল, কারণ একটু পরেই তো চা-টা সব আসছে—সেটাও তো আরামসে গিলতে হবে !

অর্জুন বলে যায়—অনেক দিনের কথা বলছি। আমার যুদ্ধে যাওয়ার আগের ঘটনা।

সেবার কোশী নদীর উজান ধরে তরাই অঞ্চলে আমাদের তাঁবু পড়েছে। সামনে ভয়াবহ অরণ্যপথ। একদিন একাই জঙ্গলে ঢুকে পথ হারিয়েছি। সন্ধ্যা আগতপ্রায়—আকাশেও পুঞ্জীভূত মেঘ। চিন্তায় ও পরিশ্রমে সমস্ত শরীর বেয়ে ঘাম ঝরে পড়ছে। হঠাৎ দেখি এক গাছতলায় একটি বৃদ্ধ গালে হাত দিয়ে বসে আছে। আমাকে দেখেই হাতছানি দিয়ে ডাকলে, আর কী বললে, জানো ?

—বুঝেছি সাহেব, তুমি পথ হারিয়েছো। আমার সঙ্গে এসো—তোমার আস্তানায় পৌঁছে দি। কাঠ কাটতে এসেছিলাম—হাঁপটা বেড়েছে কি না, তাই আজ আর কিছুই হোল না।

তাঁবুতে পৌঁছে তাকে কিছু বকশিশ দিতেই সে হাতজোড় করে আপত্তি জানায়—আপনাকে পথ দেখিয়েছি, পয়সা নেব কেন ?

বৃদ্ধের কথায় মুগ্ধ হলাম। কিছুতেই কোনো মতেই তাকে কিছু নেওয়াতে পারিনি। সেদিনের সেই কথা আজও আমার মনে দাগ কেটে বসে আছে।

পোস্টমাস্টার মশাই হঠাৎ গলা বাড়িয়ে বলে উঠলেন—এর মধ্যে বাঘের গল্প কৈ ?

অর্জুন সেন বাধা পেয়ে চট্ করে বলে ওঠে—ওঃ, তোমরা বুঝি ভূমিকা বাদ দিয়েই শুনতে চাও? তাহলে থাক এখানকার কথা। এবার সোজা বাঘের দেশেই যাওয়া যাক। শোনো—

কলকাতা থেকে আমরা জনাচারেক বন্ধু একদিন দার্জিলিং মেলে চেপে বসলাম। উদ্দেশ্য শিকার—কিন্তু দার্জিলিঙে নয়—ডুয়ার্সের এক চা-বাগানে আমার

● রায়ডাকে বাঘের ডাক
শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

এক বন্ধুর নিমন্ত্রণে আমরা চলেছি। ডুয়ার্সের যেমন খ্যাতি, তেমনি অখ্যাতি। খ্যাতির কারণ, সেদিকে শিকার নাকি প্রচুর। আর অখ্যাতিটা খুবই মারাত্মক, কারণ একবার যদি ম্যালেরিয়া প্রভুর দয়া হয়, তাহলেই কালাজ্বর, তার ওপরেও ব্ল্যাক-ওয়াটার ফিভারের কথা আর বলে কাজ নেই।

কবি অবনীকান্তের প্রশস্তি-বচন—যা বলেছ, ভাই,

ম্যালেরিয়া, ম্যালেরিয়া, দুরু দুরু কাঁপে হিয়া,
ধনে প্রাণে মারা যায়, হায় হায়, হায় রে !

অর্জুন সেনের রোষকষায়িত দৃষ্টি। হাত তুলেই ধমক দিয়ে বলে—বাগড়া দিও না—শুনে যাও। পার্বতীপুরে গাড়ি বদল করে সেই লালমণিরহাট, আবার গাড়ি বদলে ছোট লাইনে গড়িয়ে গড়িয়ে কোনওরকমে নির্দিস্ট স্টেশনে পৌঁছুতেই দেখি বন্ধুবর তাঁর চা-বাগানের গাড়িটি নিয়ে সশরীরে হাজির। আদর-আপ্যায়ন কোনও কিছুরই ত্রুটি নেই। প্রথমতঃ বিশ্রাম, ও রপর জলযোগান্তে কিছুটা এদিক-ওদিক ঘুরে ফিরে দেখে নেওয়া গেল।

শিকারের জায়গা একটা বেছে নেওয়া দরকার। বন্ধু বললেন, সে জন্যে চিন্তা নেই—এখান থেকে মাইল বারো দূরে একটা পাহাড়ী গাঁয়ে বাঘের খুবই অত্যাচার। অবশ্য বাঘ ঘুরে ফিরে আমাদের এদিকেও কৃপা করে দর্শন দিয়ে যান, কিন্তু বড় বেশী হামলা করেন না, এই যা রক্ষে !

—সে কি হে? এখানেও বাঘ আছে নাকি? তবে আর দূরে গিয়ে কী লাভ?

একটি সহাস্য উত্তর পেলাম—যা বলেছ ভাই! তবে কি জানো? কবে কোন্ দিন ব্যাঘ্র মহারাজের কৃপা হবে, তিনি পাহাড় থেকে নেমে এদিকে শুভাগমন করবেন তার তো কিছুই ঠিক নেই—কাজেই ঠিক অকুস্থলে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। তবে জঙ্গলে যাওয়ার পথে ভালুকের দেখাও মিলবে—বুনো শুয়োরও আছে—বিস্তর হরিণও দেখতে পাবে, যদি চাও তো এন্তার পিটুতে পারো।

শুনে পুলকিত হলাম। আর কথা কি? আমরা পরের দিন সকালেই রওনা হয়ে পড়ি। বলাই বাহুল্য, সঙ্গে কয়েকটা টিফিন কেরিয়ারে প্রচুর খাবার, পানীয় জল, বন্দুক, টোটা ইত্যাদি সরঞ্জামের কোনই ত্রুটি নেই। আর সঙ্গে ছিল বন্ধুবরের অফিসের গাঁট্টাগোঁট্টা দারোয়ান খড়্গ সিং—জাতে নেপালী। তারও শিকারীর বেশ—কথায় বেশ চট্‌পটে—সব কাজেই চৌকশ।

বেলা আটটা নাগাদ আমরা সেই গ্রামে এসে পৌঁছুতেই কয়েকজন গ্রামবাসী

আমাদের মোটরকে ঘিরে দাঁড়ালো। তাদের মধ্যে একজন মাঝবয়সী লোকের হাতে একটা টাঙ্গি, কোমরে ভোজালি দেখে তাকেই ডেকে নিলাম। ভাঙা-ভাঙা হিন্দীতে তাকে জিজ্ঞেস করি—বাঘ কোথাও মারি করেছে কিনা।

উত্তরে সে বললে—বাঘ গরুটার কোমর থেকে খানিকটা মাংস খেয়ে উধাও হয়েছে।

বুঝলাম এটা বাঘের কীর্তি নয়—নিশ্চয়ই বাঘিনী। কারণ বাঘ হলে সে গরুটার মাথার দিকে কিংবা ঘাড়ে আক্রমণ করতো।


...জানতে পারা গেল বাঘটা উধাও হয়েছে।

গ্রামের কথাটা সংক্ষেপেই বলে রাখি। পাহাড়ী গ্রাম, ছোট ছোট কুঁড়ে-ঘরের বস্তি সব। কেবল দূরে মিশনারী-দের একটি গির্জা দেখা যায়—কাঠের তৈরী। আর একটু পশ্চিমেই গ্রামের একটি বিশিষ্ট মোড়লের বাড়ি। যেমন তেমন লোক নয়—হয়তো হাজার বিঘে জমির মালিক—চাষ বাস করা, খাজনাপত্র আদায় ইত্যাদি কাজে সে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে থাকে। ভাবে ভঙ্গীতে চেহারায় বেশ বোঝা যায়, সে কারও পরোয়া করে না। ধানের মরাই কয়েকটা তার বাড়িতে। হাঁস মুরগী, গোটাকয়েক ভেড়া ছাগল, কয়েক জোড়া বলদ, একপাল পাহাড়ী গরু, দু-দুটো গাধা, একটা খচ্চর—এই সব নিয়ে বিরাট তার সংসার। একপাশে আছে পিলখানা—গোটা আষ্টেক হাতী পায়ে শিকল বেঁধে মোটা মোটা শালকাঠের খুঁটির সঙ্গে বাঁধা। প্রত্যেকের সামনেই রাশীকৃত পুণ্ডীগাছ (কলাগাছের মত একজাতীয় সরু সরু গাছ—হাতীর খাদ্য)। একটা ছোট বাচ্চা হাতীও দেখলাম। ঘন মেঘের মত তার গায়ের রং—ছোট্ট শুঁড় দুলিয়ে সে যখন কান দুটো নাড়তে লাগলো—মনে হ'ল, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তাই দেখি।

● রায়ডাকে বাঘের ডাক
শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

কিন্তু সে সময় কৈ? মোড়লের সঙ্গে কথা বলে গোটা দুই হাতী চেয়ে নিতে হবে—তা ছাড়া আরও অনেক কিছু সাহায্যই সে করতে পারে।

খড়্গ সিংকে পাঠিয়ে খবর দেওয়া হ'ল। কিছুক্ষণ পরেই মোড়লের আহ্বানে আমরা তার কাছে হাজির হলাম। চেয়ার টেবিলের বালাই নেই। কাঠের খুঁটির ওপর কাঠের তক্তা বিছিয়ে অনেকটা বেঞ্চের মত করা আছে। তারই ওপর বসা গেল।

আমাদের উদ্দেশ্য বলতেই মোড়লও উৎসাহী হয়ে তৎক্ষণাৎ আমাদের দু'দুটো হাতী দেবার কথা তার মাহুত-প্রধানকে বলে দিল এবং নিজেও সে একটা পৃথক হাতীতে আমাদের সঙ্গে যাবে, এই সংকল্প ঘোষণা করলে।

আমরা যদিও সকালের খাওয়াটা বেশ ভালভাবেই সেরে এসেছিলাম, কিন্তু মোড়লের নিমন্ত্রণকে এড়ানো গেল না। তবে উপকরণে আড়ম্বর ছিল না,—চিড়ে, কাঁচা দৈ, গুড় আর সঙ্গে গুটিকয়েক পাকা কলা।

আতিথ্যধর্মে বাধা দেওয়া চলে না; কাজেই দই, চিড়ে, কলা আর গুড় দিয়ে অপূর্ব এক মণ্ড তৈরি করে অতিকষ্টে গলাধঃকরণ করা গেল। মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছিল—এই বুঝি বমি হয়ে যায় আর কি! অভ্যেস নেই তো! কিন্তু চা-বাগানবাসী আমার সেই বন্ধুটি খুব তৃপ্তির সঙ্গে সেই কাঁচা ফলারের উৎসবে মেতে গেল।

অতঃপর যাত্রাপর্ব। একটি হাতীর উপরে আমার সেই বন্ধুবর, আমি আর খড়্গ সিং—আর একটা হাতীতে আমার সহগামী বন্ধু সুবীর, অনন্ত আর অতুল, পেছনে তৃতীয় হাতীর ওপরে গাঁয়ের মোড়ল, তারও পেছনে জন বিশেক লোক, হাতে টাঙ্গি, বর্শা, লাঠি ইত্যাদি।

পাহাড়ী নদী রায়ডাক—কোন্ অজানার ডাকে ছুটে চলেছে, কে জানে!

অবনীকান্ত ঠোঁটে একটি আঙুল চাপা দিয়েই বসে ছিল, সে তড়াক্ করে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠেই আর এক নম্বর ভাবপ্রবণতা জাহির করে বলল—আহা, কী সুন্দর! যেন সে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে কোন্ নাম-না-জানার সন্ধানে, পর্বতে বনে বনান্তে ছুটে চলেছে!

অহেতুক বাধা পড়ায়, অর্জুন সেন এক ঝটকায় তাকে বসিয়ে দিয়েই আবার বলতে থাকে—নদীর জল গভীর নয়, কিন্তু তার স্রোতে বুঝি সব কিছুই ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বুনো মোষগুলো যখন নদী পার হয়, তখন তাদেরও খুব সন্তর্পণে এক একটা করে পা তুলে ফেলতে হয়—একটু অসাবধান হলেই স্রোতে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। হাতীর পিঠেই আমরা নদীর ধারে এসে থমকে দাঁড়ালাম। এখন কোন্

● রায়ডাকে বাঘের ডাক
শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

দিকে যাওয়া যাবে? এমন সময় সেই মোড়ল তার দলবল সঙ্গে সেখানে এসে আমাদের সেই নদীর ধার দিয়ে বরাবর পুব দিকে যাওয়ার নির্দেশ দিলে। প্রায় মাইলটাক সেই উঁচু নীচু জমির ওপর দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পর সামনে একটা ধানের ক্ষেত পাওয়া গেল। সেটাকে ডাইনে রেখে আরও কিছুটা যেতেই কয়েকটা ঝোপ, তার ওপারেই কয়েকটা বস্তি। মোড়ল বললে—বাঘটা সেখানেই মারি করেছে। প্রায়ই কৃষকদের গরু ছাগল ধরে নিয়ে যায়। কয়েকদিন আগেও একটা লোক বাঘের হাতে ঘায়েল হয়েছে।

আমরা খুব সন্তর্পণে পথ এগিয়ে চলি। মোড়লের হাতীটা একটা জঙ্গলের পাশ দিয়ে যেতেই, কেমন যেন গুড় গুড় করে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের হাতীদুটোও থমকে দাঁড়িয়ে গেল। পেছনে যারা, তারা সবাই মিলে এমন একটা হৈ চৈ শুরু করে দিলে যে মনে হ'ল, সত্যি বুঝি বাঘ বেরিয়েছে।

কিন্তু, কোথায় বাঘ?

সামনে তাকিয়ে দেখি, গ্রামখানা ছাড়িয়েই তরাই অঞ্চলের ঘন অরণ্য আরম্ভ হয়েছে। বিরাট বিরাট শালগাছ মাথা উঁচু করে যেন আকাশ ছুঁতে চায়। নীচে জঙ্গল, তার মধ্যে নানারকম ফার্ন জাতীয় গাছ। জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে সরু পায়ে-চলা পথ। যারা জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহ করতে যায় তারা, আর বন-বিভাগের কর্মচারীরা সকলেই ঐ হাঁটাপথেই জঙ্গলে প্রবেশ করে। শোনা গেল, ওর মধ্যেই নাকি বাঘের আড্ডা। কিন্তু বিনা অনুমতিতে ওখানে যাওয়া যাবে না।

আপাততঃ যে বাঘটা গ্রামে অত্যাচার শুরু করেছে এবং আশপাশেই হয়তো কোথাও আছে তারই খোঁজ করা যাক। গ্রামবাসীদের দু'চারজনকে জিজ্ঞেস করতে তারা সবাই একবাক্যে জানালে—বাঘটা আর কোথাও যায়নি, নিশ্চয়ই ঝোপে-ঝাড়ে কোথাও লুকিয়ে আছে।

একটা জঙ্গলের খানিকটা বাঁশের বন। সরু তল্‌তা বাঁশের ঝোপ—কঞ্চিগুলো এপাশে ওপাশে ছড়িয়ে যেন মাটিকে ছুঁয়ে প্রণাম করতে চায়। তার পাশেই একটা বেতের জঙ্গল। বাঘ যদি বেতবনে ঢুকে থাকে, তা হলেই তো মুশকিল! নাঃ, তা বোধ হয় নয়। তাদেরও তো সুবিধা-অসুবিধা আছে! এইরকম অনেক কিছু জল্পনা-কল্পনাই করে চলি।

বাঘটা যেখানে মারি করেছে, তার পাশ দিয়েই ছোট্ট একটি ঝরনা তরতর করে বয়ে এসে রায়ডাক নদীতে পড়েছে। আমরা আশেপাশেই খোঁজাখুঁজি করি, বাঘ হয়তো কোথাও লুকিয়ে আছে—সন্ধ্যা হলেই আবার সে আহার-পর্বে যোগদান করবে।

● রায়ডাকে বাঘের ডাক
শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

এদিকে বেলাও প্রায় গড়িয়ে এসেছে—সূর্যদেব পাটে বসবেন এইবার। এর মধ্যেই যদি কিছু করা সম্ভব না হয়, তবে সমূহ বিপদ। মরিয়া হয়ে মোড়ল তখন হুকুম দিলে—জঙ্গলগুলো 'বিট্' করা হোক।

তৎক্ষণাৎ হুকুম তামিল। জঙ্গল বিট্ শুরু হতেই আমার হাতীটা হঠাৎ শুঁড় উঁচু করেই বিকট একটা আওয়াজ তুললে—সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য হাতীগুলোও তার সঙ্গে যোগ দেয়। বন্দুক হাতে নিয়ে আমি তৈরী হয়েই রইলাম। খড়্গ সিং তার টাঙ্গিটা বাগিয়ে বসে রইল। কি জানি যদি বাঘটা লাফিয়ে হাতীর ওপর আক্রমণ চালায়, তবে সেও টাঙ্গির সদ্ব্যবহার করতে একটুকুও দেরি করবে না।

ঠিক সামনেই, বোধ হয় বিশ গজও হবে না, জঙ্গলের ফাঁকে হঠাৎ একটা বাঘের মুণ্ডু জেগে উঠেই ডুবে গেল—তার ওপর একটা আক্রমণ আসন্ন বলেই বুঝি সে আত্মগোপন করতে চায়!

কিন্তু তা' তো নয়! বাঘটা যেন সোজা বেরিয়েই ছুটে চলে, যেন ঐ ঝরনাটা পার হয়ে, আমাদের কলা দেখিয়ে ঐ অরণ্যে ঢুকে পড়বে। মুহূর্তের জন্যে আমি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। বাঘ ঝরনাটা লাফিয়ে পার হওয়ার চেস্টা করতেই আমার রাইফেলও গর্জন করে উঠল।


দ্বিতীয় গুলিটা বাঘটার মুখগহ্বর ভেদ করে চলে গেল। [পৃষ্ঠা ৪৫৬

গুলিটা লাগলো বাঘের কোমরে—একটা বিরাট গর্জনে রায়ডাকের বনভূমি কেঁপে উঠল। বাঘটা ঘুরে দাঁড়িয়েই হাতীকে লক্ষ্য করে বিদ্যুতের মত ছুটে আসে—প্রকাণ্ড হাঁ—মুখের ভেতর সাদা দাঁতগুলো ঝিকমিক

করে উঠল—"হয় তুমি মর, নয় আমি মরি," এমনি একটা বেপরোয়া ভঙ্গী তার।

আর মুহূর্তকাল বিলম্ব নয়। আমার দ্বিতীয় গুলিটা তার মুখগহ্বর ভেদ করে বেরিয়ে গেল। হতভাগ্য জানোয়ারের অমিত বিক্রম তখন ধুলোয় গড়াগড়ি।

পরীক্ষা করে দেখলাম আমার অনুমানই ঠিক—বাঘ নয়, একটা বেশ বড় রকমের কেঁদো বাঘিনী!

গল্প শেষ করে অর্জুন একটা মোটা বার্মা চুরুটে অগ্নিসংযোগ করে অবনীকে বল্লে—কৈ হে কবিবর, তোমার কচুরি আর চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ওগুলো তো অনেকক্ষণই টেবিলে তোমার রসনার অপেক্ষায় আছে।

চম্‌কে উঠলাম।

সত্যিই তো—চা-টা যে একেবারেই ঠাণ্ডা—!

—ওরে কে আছিস্, শীগ্‌গির গরম গরম আর এক কাপ চা নিয়ে আয়।

কবিবরের ভাবে ঢল ঢল চোখে তখনও বাঘের ছবি—সেটা সরে যেতেই সে চিৎকার করে উঠল—আরে, দেখেছো মজাটা—পোস্টমাস্টার মশাই দিব্যি গরম গরম চা কচুরি খেয়েই কখন সরে পড়েছেন!

অর্জুন সেনের টিপ্পনী—মাস্টার লোক কিনা তাই সর্ববিষয়েই মাস্টার!

মণি ও মুক্তা

"স্থির হঞা ঘরে যাহ না হও বাতুল,
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু কূল।
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া।"

শ্রীচৈতন্যদেব

বিরাট জমিদারীর উত্তরাধিকারী রঘুনাথ যখন যৌবনে সংসারের সব কাজ ছেড়ে দিয়ে বৈরাগ্য নিতে যান, তখন চৈতন্যদেব তাঁকে এই উপদেশ দিয়েছিলেন।





অপরূপ কথা

—দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

—তুমি কি পার?

—সাঁতার কাটতে!

সত্যি, মাছের সঙ্গে সাঁতার কেটে কেউ-ই পারলে না। শঙ্খ শামুকের দল তো অবাক হয়েই রইল মাছেদের সাঁতারের দৌড় দেখে।

সমুদ্র হাসলো।

খুবই খুশী হয়ে।

—সাঁতারের অমন অদ্ভুত গুণপনা তো দেখালে, কিন্তু তোমরা কি হাঁটতে পার?

মাছেরা হাঁ করতে গিয়ে বন্ধ করলে, মুখ বুজে সরে এলো।

কুমীরের দলেরা বললে, তা পারিনে? সাঁতারে প্রায় হেরে যাই বটে, কিন্তু হাঁটতে? জল আর মাটি সবই বেড়িয়ে এলেম।

সমুদ্র, মাটি হাসল দুজনেই খুশীতে।

—তোমাদের সুখ্যাতি না করে পারিনে। তা, উড়তে পার কি?—দাঁতগুলি তারা এঁটে বন্ধ করতে যাবে, হঠাৎ পিছন থেকে একজন উঁচু হয়ে বললে,—আমার খুড়তুত ভাইয়েরা তাও পারে।

—পারে!

বাদুড়ের মত পাখা নেড়ে তাদের খুড়তুত ভাইয়েরা এসে তাদের দাঁত আর লেজ সুদ্ধ ওড়বার কসরত দেখিয়ে দিলে।

আকাশ হা! হা! করে হেসে উঠল খুশীতে।

হাসির সে হাওয়াতে গাছের পাতা নেচে উঠলো সমুদ্রের কিনারা-পাহাড়ের চুড়োয়, যেখানে মেঘ জমেছে তার কাছাকাছি।

বনে বনে নাচল ফুলের পাঁপড়িরা।

—নাচ দেখে খুশী হলেম।

—বেশ তো। তাহলে তোমরা কি গান গাবে?

পাতার ভিতর থেকে পাখিরা ঠোঁট বের' করে বলে—না।—বলেই গান জুড়ে দিল।

নিজেদের গানের সুরে তাদের রঙে শিউরোলো পাখা, শেষে তাদের উধাও উড়িয়ে নিয়ে চলল।

বন, পাহাড়, দ্বীপ, দেশ, মহাদেশ, মেঘের মুলুক—সুরে ভরে গেল।

তবু গান শেষ হয় না!

কথা বলবে কে?

পাখিরা হেসে বললে—গান গাইতেই পারি, কথা তো আমরা জানি নে!

বাতাস থমকে ছিল।

গাছের ডালের পাশ থেকে উঁকি মেরে বানরেরা নেমে এসে বললে—কিচি মিচি খিচি!

বলেই তারা চুপ করে গেল; মাটিতে পড়া ফল, ফলের আঁটি তারা কামড়াতে লাগল।

পাথরেরা, শুকনো পাতারা, সবুজ ঘাসেরা হেসে বললে,—ভাই, তোরা সাহস করে মুখ তবু খুলতে যাচ্ছিলি যা হোক্!

ধরা পড়ে, লজ্জায় চোখ মিটিমিটি করে বানরেরা কেউ গাছে উঠে ফল খেতে লাগল, কেউ পালাল পাহাড়ে।

হাওয়ার সোঁ সোঁ ঢেউয়ের গর্জন, মেঘের আওয়াজ, জানোয়ারদের শোরগোল, পাখির সুর, কিন্তু কথা কোথায়?

পাহাড়ে কোন গুহায় প্রথম জন্মাল মানুষ।

জন্মেই সে বললে

—"মা"

জলে, স্থলে, আকাশে, পৃথিবীতে যেন অনন্ত মধু ঢেলে দিলে!

সেইরূপ অপরূপ 'মা' কথা।

হাজার হাজার বছর চলেছে, গহ্বর ছেড়ে বনে, বন ছেড়ে কুঁড়েয়, কুঁড়ে ছেড়ে অট্টালিকায় মানুষ এসেছে।

যুগ যুগ যাচ্ছে চলে।

মানুষ যে কত দেশে কত ভাষায় কথা বললে, কত কথা শেখালে, কথার আদরে পশুদের বশ করলে, কত ভাষায় লিখলে কত সহস্র বই, তবু আজো পৃথিবীর যেখানে যে মানুষ জন্মাল, জন্মেই সবখানে মানুষ সেই অনুপম প্রথম কথাই বলেছে—'মা'।

পৃথিবীর সবখানের সব মানুষ কি ভাইবোন?



সাজা

—কুমারী অপতারা

মদনার কথা শুনে রায়-বাহাদুরের কালো মুখ আরো কালো হয়ে উঠল। শান্ট করবার সময় ইঞ্জিনের ধোঁয়া যেমন ভক্‌ভক্ ক'রে বেরোয়, ঠিক সেই রকম বেরুতে লাগল তাঁর মুখের ধোঁয়া। গড়গড়ার নল ছিল হাতে, সেটাকে মুঠি ক'রে ধরলেন, যেন তাই দিয়েই মদনার মুখে এক ঘা বসিয়ে দেওয়ার মতলব।

ঘা-গুঁতো দিলেন না বটে, কিন্তু চিবিয়ে চিবিয়ে কথা যা শোনাতে শুরু করলেন, তার জ্বালা চাবুকের জ্বালার চাইতে কম নয়। "একেই বলে ঘোর কলি। বর্ষা নেমেছে কি না নেমেছে, কেঁদে এসে পড়লি, ঘরে খাবার নেই বলে। হাজার টাকা তোলা ছিল হারু সিকদারকে দেব বলে, তাই থেকে একশো টাকা বার ক'রে তোকে দিলাম। সিকদারের পো চালানী ব্যবসা ফেঁদেছে, তিন বছর খাটাবে আমার টাকা, সুদের নাম নেই কানা কড়ি। দেখ্ ভেবে, সেই সোনারচাঁদ খাতকের মুখ থেকে আমি একশো টাকা কেড়ে নিয়ে এলাম—তোর ছাইমুখো গুষ্টিকে খাইয়ে বাঁচাবার জন্য। আর এখন? তুই ব্যাটা অঘ্রাণ পড়তে না-পড়তেই নাচতে নাচতে এসে হাজির, 'টাকাটা হিসেব ক'রে নিন কর্তা!'—একে যদি ঘোর কলিই না বলব, কাকে আর বলব শুনি?"

অপরাধটা যে ঠিক কোন্‌খানে হয়েছে, বুঝতে না পেয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে রায়বাহাদুরের পানে তাকিয়ে রইল মদনা। কথা ছিল—এক বছরের ভিতরে টাকা শোধ করবে। সেইখানে সে ছয় মাসও পেরুতে দেয়নি। আশা ছিল—চটপট টাকা ফেরত পেয়ে কর্তা খুশী হয়ে

দু' এক টাকা সুদ হয়ত মাফ ক'রেই দেবেন। কিন্তু এ যেন উলটো-বুঝলি রামের মত শোনাচ্ছে!

মদনাকে নিশ্চুপ দেখে আবার ভক্ ভক্ ক'রে খানিক ধোঁয়া ছাড়লেন রায়বাহাদুর। তারপর হাঁক দিলেন মেজো ছেলে কেষ্টোর নাম ক'রে। পাশের ঘরেই হিসাবের খাতার পাতা ওলটাচ্ছিল কেষ্টো, দেনদার টাকা শুধতে এলেই গোমস্তার হাত থেকে খাতা টেনে নিয়ে সে সুদ কষতে বসে। এসব ব্যাপারে তার খুব উৎসাহ। বাপের পাওনা আঠারো-আনা আদায় ক'রে দেবার পর সে খাতককে আড়ালে টেনে নিয়ে যায়, আর হাসি-হাসি মুখে তার কানে কানে বলে—"দেখলি তো কী-রকম সুবিধে ক'রে দিলাম তোর? দে—আমায় একটা টাকা দে! আবার তো আসছে বছর আসবি!"



ভক্ ভক্ ক'রে খানিক ধোঁয়া ছাড়লেন রায়বাহাদুর

মনে মনে এই বেহায়াটার উপরে যতই চটুক, বেশীর ভাগ খাতকই একটা ক'রে টাকা ওকে দিয়ে যায়। সত্যিই তো! আসছে বছর আবার এখানেই হাত পাততে হবে তো! কেষ্টোবাবুকে চটিয়ে দিলে সে-সময় বহুত ঝাগড়া পড়তে পারে। রায়বাহাদুরের পাঁচটা ছেলের মধ্যে এইটেই খুখ্খু। চাকরিবাকরি করে না, সেরেস্তা ঘেঁটে এমনি করেই দু'পয়সা কামায়। রায়বাহাদুর বোঝেন সব; কিন্তু খুখ্খু বলেই বোধ হয় ওর উপরে বাপের দয়া বেশী। বুঝেও কোন কথা বলেন না।

মদনা আসতেই খাতা খুলে বসেছিল কেষ্টো, এখন বাপের হাঁক শুনে খাতা হাতে করেই এসে দাঁড়াল তাঁর সামনে।

● ছবি

কুমারী তপতীরানী

"কত সুদ ?" জানতে চাইলেন রায়বাহাদুর।

"শতকরা আড়াই টাকা মাসে।"—জবাব দিল কেষ্টো।

"আড়াই টাকা?"—কাতরে উঠল মদনা। "না, না, ওটা দু'টাকা হবে, মেজোবাবু! ওটা দু'টাকা হবে।"

"দু'টাকা হবে? কেন হবে, শুনি?"—গর্জে উঠলেন রায়বাহাদুর।

মদনা ভয় পেয়েও মরিয়ার মত জবাব দিল—"মেজোবাবুই আমায় আড়ালে বলেছিলেন—ওটা দু'টাকা হবে। বলেছিলেন—দলিলে যত-ইচ্ছে লেখা থাকুক, আদায়ের সময় এ-বাড়িতে দু'টাকার বেশী কোন খাতককে দিতে হয় না।"

রায়বাহাদুর হাত চাপা দিয়ে মুখের হাসি ঢাকলেন, তারপরই গড়গড়ায় নল ফেলে দিয়ে চটি ফট্‌ফট্ করতে করতে সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন—তাঁর তেল মাখবার সময় হয়ে গিয়েছে। কাগজ-পেন্সিল নিয়ে কেষ্টো হিসেব করতে বসল—মাসে আড়াই টাকা হলে বছরে হ'ল গিয়ে—দু' টাকা করেই আগে হিসেব করা যাক—বারো মাসে বছর তো?—বারো দু'গুণে হ'ল গিয়ে ছাব্বিশ—"

কেষ্টো দেখে নি মদনার পিছনে বসে ছিল কালোকোলো একটি নয় দশ বছরের ছেলে। সে এতক্ষণ একটি কথাও কয়নি। কিন্তু কেষ্টোর মুখে বারো দু'গুণে ছাব্বিশ শুনে, এবং বাবা তার কোন প্রতিবাদ করছেন না দেখে, সে আর চুপ ক'রে থাকতে পারল না। মৃদুগলায় বলে উঠল—"ছাব্বিশ নয়, চব্বিশ। ও বাবা, তুমি শুনছ না? বাবু যে ভুল হিসেব করছেন! বারো দু'গুণে ছাব্বিশ নয়, চব্বিশ!"

ছাব্বিশ-চব্বিশের হিসেব আদবে কানেই ঢোকেনি মদনার। কি ক'রে ঢুকবে? সে ভাবছিল অন্য কথা। এক বছরের সুদ মেজোবাবু হিসেব করে কেন? আষাঢ় থেকে অঘ্রাণ—ছয় মাস মোটে। তাও আবার, নিয়ম যদি মানতে হয়, আষাঢ়ের সুদ নিলে অঘ্রাণের নেওয়া চলে না, অঘ্রাণ নিতে হ'লে ওদিকে আষাঢ়টা বাদ দিতে হবে। কাজেই, তার দেনা হ'চ্ছে পাঁচ মাসের সুদ। দু'টাকা হিসেবে দশ টাকা। আসল একশো, আর সুদ দশ—সব মিলিয়ে একশো দশ টাকা সে এনেছে। অথচ মেজোবাবু যে-রকম হিসেব করছে—

সে-কথা সে বলেই ফেলল। "বারো মাসের হিসেব কেন করছ মেজোবাবু? কচি ছেলের কথা শুনে রাগ কোরো না। কিন্তু চব্বিশই বা কিসের, ছাব্বিশই বা কিসের? সুদ তো আমি দেব মোটে পাঁচ মাসের।"

মোটা খাতাখানা দুম্ ক'রে বন্ধ ক'রে ফেলল কেষ্টো। চেঁচিয়ে বলে উঠল—"পাঁচ মাসের?

● বাকী

কুমারী তপতীরানী

যা, তা হলে আদালতে গিয়ে জমা দিগে যা! বাহবা রে আব্দার! এখন তুমি পাঁচ মাসের সুদ দিয়ে দেনাটি শোধ ক'রে গেলে। তারপর ঐ টাকাটা নিয়ে আমরা করব কী? এখন তো চাষীর ঘরে ঘরে গোলা ভর্তি; কেউ কি এখন ধারকর্জ নিতে আসবে? টাকা যে সিন্দুকে পচবে আমাদের! লগ্নি করার সময় হ'ল বর্ষা। যে ধার করবে, তাকে এক বর্ষা থেকে আর এক বর্ষা পর্যন্ত সুদ দিতেই হবে।"

মদনার মনে হ'ল—তার মাথায় এক ঘা ডাণ্ডা বসিয়ে দিয়েছে মেজোবাবু। ধারকর্জ এর আগে তাকে কখনো করতে হয়নি, অবস্থা তার মোটামুটি ভালই। গেল-বছর আকালের দরুন ও-বিশ্বের হাতেখড়ি হয়েছে তার।

কেষ্টোর কথা শুনে জ্ঞানগম্যি যেন লোপ পেয়ে গেল বেচারার, কথা বেরোয় না মুখ দিয়ে, ফ্যাল ফ্যাল ক'রে সে কেবল তাকিয়েই রইল কেষ্টোর পানে।

কেষ্টো? তুখোড় ছেলে! খাতকদের দশ দশা দেখে দেখে সে পাকা খেলোয়াড় ব'নে গিয়েছে। এবারে একটু নরম হয়ে বলল—"সব টাকা আনিস্‌নি বুঝি? তাতে আর হয়েছে কি? যা এনেছিস, জমা দিয়ে যা! বাকী তো থাকবে সামান্যই! বারো দু'গুণে ছাব্বিশ, আর বারো আধে ছয়—একুনে হ'ল গিয়ে চৌত্রিশ টাকা। তা তুই এনেছিস বুঝি বারো, না দশ? দিয়ে যা একশো দশ টাকাই দিয়ে যা, খাতায় টুকে রাখব আমি। হুঁ হুঁ, এ হ'ল রায়বাহাদুরের গদি, এখানে এক পয়সার তঞ্চক হবার জো নেই!"

মদনা আর হালে পানি পায় না। নয় বছরের ছেলেটার পানেই সে ফিরে তাকাল অসহায়ভাবে। ভাবটা এই—"তুই কি বলিস্ নখিন্দর?" নখিন্দরের যা বলবার তা সে বলতই, বাপ ফিরে না তাকালেও। ছোট বড় সব ব্যাপারে নিজস্ব মতামত জোরগলায় জাহির করা এই বয়সেই তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।

নখিন্দর যা বলল, তা রায়বাহাদুর শুনলে জুতো মারবার হুকুম দিতেন তক্ষুনি। কেষ্টো তা শুনে বাঁকা হাসি হাসল, এবং গট্‌গট্‌ ক'রে উপরে উঠে গেল, বাবার সঙ্গে পরামর্শ করতে।

অর্থাৎ নখিন্দর বলেছে—টাকা জমা রাখা না-রাখার কথা এখন নয়। তারা গিয়ে রসিক মোক্তারকে ডেকে আনবে, সে হয় নখিন্দরের দূরসম্পর্কের বোনাই। টাকা যদি দিতে হয়, দেওয়া হবে রসিকের সামনে।

এতবড় আস্পর্ধার কথা কেষ্টো তো কখনো শোনেইনি, রায়বাহাদুরও না। তাঁর এই পঞ্চান্ন বছর বয়সের ভিতরে ছাপ্পান্ন রকম মানুষ নিয়ে কারবার করেছেন তিনি। তাঁর আর তাঁর খাতকের

● সাজা
কুমারী তপতীরানী

ভিতরে তৃতীয় লোক ঢোকাবার প্রস্তাব করতে পারে, এমন বেয়াদব কাউকে এযাবৎ তিনি চোখে দেখেননি। কেষ্টোর কাছে সব কথা শুনে তিনি হুকুম দিলেন—"টাকা ছেড়ো না। যাকে খুশী ডেকে আসুক, যে রকম খুশী লিখিয়ে নিক। একশো দশটা টাকা অবহেলায় ছেড়ে দেবার জিনিস নয়। টাকা নিয়ে নাও, তারপর ওকে দেখে নিচ্ছি আমি—।"

তাই-ই হ'ল! ছেলের যুক্তি অনুযায়ী আধঘণ্টার ভিতরই রসিক মোক্তারকে নিয়ে এল মদনা, আর পাঁচ মাসের সুদ দিয়েই রেহাই পেয়ে গেল। একশো দশ টাকা সুদে আসলে পাওনা, তার কেষ্টোর নিজের এক টাকা—বাস্! রসিকই টাকা গুনে দিল, রসিকের হাতেই দ'লল ফেরত দিল কেষ্টো।

মদনা পিঠ চাপড়ে দিল ছেলের। রসিককে বলল—"জানো জামাই, এতটুকু ছেলের কী বুদ্ধি! তোমায় ডেকে আনবার কথা ঐ বলেছিল। আর তুমি এসেছিলে বলেই এত সহজে মিটল ঝামেলা। আমি তো দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম বাবা!"

• • •

একটা বছর গেল। রায়বাহাদুর ভোলেননি যে মদনাকে টিট করতে হবে। তাঁর এতকালের একচেটিয়া ব্যবসার বারোটা বেজে যাবে—এ তিনি সইবেন না।

কোথাও কিছু নেই, একদিন নীলামের ঢোল বেজে উঠল মদনার বাড়িতে। গাঁয়ের লোক ছুটে এল কাজকর্ম ফেলে। কী হ'ল? ব্যাপার কী?

কেষ্টো ছিল আদালতের পেয়াদার সঙ্গে। গোঁফে তা দিয়ে বলল—"সোজা আঙুলে ঘি বেরোয় না, কী করি বল? টাকা তো আদায় করতেই হবে!"

"টাকা? কিসের টাকা?"—চেঁচিয়ে উঠল মদনা।

কেষ্টো বলল—"তমসুক লিখে ও-বছর আষাঢ়মাসে একশো টাকা ধার করনি?"

"করেছি তো হয়েছে কী!"—রেগে উঠল মদনা—"সে-টাকা সুদে আসলে শোধ ক'রে দিইনি? একশো দশ টাকা! আর তোমায় পান খাবার এক টাকা! দিইনি তা?"

গাঁয়ের লোক অবাক হয়ে শুনছে। মদনাকে তারা জানে একান্ত নিরীহ লোক বলে। ঠাকুরদেবতার উপর ওর অটুট ভক্তি, বামুনের পাদোদক খায় এই ক'দিন সক্কালেও। সে যে একটা আজগুবি মিথ্যে কথা বলবে এত লোকের সামনে দাঁড়িয়ে, এ কারো যেন বিশ্বাসই হতে চায় না।

মদনার কথার উত্তর যোগানোই আছে কেষ্টোর মুখে। "টাকা সুদে-আসলে শোধ ক'রে দিয়েছিস্? মরে যাই আর কি!"—জনতার দিকে ফিরে সে টিটকারি দিয়ে বলল—"হ্যাগো

● সাজা
কুমারী তপতীরানী

ভালমানুষের ছেলেরা, টাকাপয়সার লেনদেন তোমরাও ক'রে থাক, বলি—একটা দেনা শোধ ক'রে দিলে তক্ষুনি তার দলিলখানা তোমরা ফেরত নিয়ে থাক কিনা ?"

"তা আবার নিই না ?"—একসাথে বলে উঠল বিশ জন লোক।

"নিশ্চয়ই নাও।"—জোর দিয়ে দিয়ে কথা বলতে লাগল কেষ্টো। "নিশ্চয়ই তা নিতে হয়। মদনাও যদি টাকা দিয়ে থাকে, সেও অবশ্যি তার দলিল ফেরত নিয়েছে।"

"নিয়েছিই তো !"—সায় দিল মদনা।

"বেশ, দেখাও সে দলিল !"—হুকুম করল কেষ্টো—"এই সব ভালমানুষের ছেলেকে দেখাও সে দলিল !"

দলিল ?—মদনা মাথা চুলকোতে লাগল। দলিলখানা কোথায় !—বাক্সে ? সে ছুটল ঘরের ভিতর। বাক্স খুলে উলটে পালটে খুঁজতে লাগল। না, নেই তো !

জনতার ভিতর কেউ-একজন বলে উঠল—"শোধ-করা দলিল কি আর কেউ যত্ন ক'রে তুলে রাখে ? ছিঁড়ে ফেলে দেয় তখুনি !"

কেষ্টো জবাব দিল—"কই, তোমাদের মদন হালদার তো তা বলছে না ! সে তো খুঁজতে গেল ঘরের ভিতর।"

"পেলাম না তো ! ওটা কি তবে রসিকের হাতেই রয়ে গিয়েছিল ?"—ফিরে এসে কেষ্টোকেই জিজ্ঞাসা করল মদনা।

কেউ কেউ হেসে উঠল, কেউ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মদনার দিকে। লোকটা কি পাগল ? না—এক মিথ্যে ঢাকবার জন্য মরিয়া হয়ে আর এক মিথ্যে চাপাচ্ছে তার উপর ?

ওদিকে কেষ্টো যেন আকাশ থেকে পড়ল—"রসিক ? রসিক আবার কে ? রসিকের হাতে দলিল রয়ে গেল, এ কথার মানে কী ?"

"রসিক গো ! রসিক মোক্তার !"—কান্নার মত শোনাল মদনার কথা। "আমার দূর-সম্পর্কের ভাগ্‌নী জামাই—তাকে নিয়েই তো টাকা মেটাতে গেলাম। সেই তোমরা পাঁচ মাসের জায়গায় পুরো এক বছরের সুদ চাইলে কিনা—তাইতে নখিন্দরের পরামর্শো মত রসিক মোক্তারকে ডেকে নিয়ে এলাম আমি—"

আর দেরি করতে রাজী নয় আদালতের পেয়াদা। সে ঢোল পিটিয়ে, বাঁশ পুঁতে, নুটিশ এঁটে দেশশুদ্ধ লোককে জানিয়ে দিল যে—মদন হালদারের জমি-জায়গা সব একশো টাকার দেনায় নীলামে বিক্রি হয়ে গিয়েছে মাসখানেক আগে। নীলাম কিনেছেন স্বয়ং রায়বাহাদুর।

রাজা
স্বামী ভপতীরামী